তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৩৭ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্

সাল ১৩২২। সম্বৎ ১৯৭২। কলিগতাব্দ ৫০১৫।

বৈশাখ ৮৬১ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৮৬২ সংখ্যা।

আষাঢ় ৮৬৩ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৮৬৪ সংখ্যা।

ভাদ্র ৮৬৫ সংখ্যা।

আশ্বিন ৮৬৬ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৮৬৭ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৮৬৮ সংখ্যা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ঊনবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

নববর্ষের উদ্বোধন।

আজ শুভ নববর্ষের প্রথম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এস, আমরা সেই সূর্য্যের অন্তরস্থ দেবতাকেও দর্শন করে আসি। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আজ আমরা গৃহে ফিরিব না। আজ পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে দেখা করব, যথাযথ প্রণাম ও অভিবাদন করব, সকলের মুখে হাসি দেখতে চাইব; আর যিনি আমাদিগকে তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে রেখেছেন, যাঁর আদেশে কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্র, কোটী কোটী গ্রহনক্ষত্র আমাদের মঙ্গল সাধনে নিয়তই নিযুক্ত রহিয়াছে, যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, যাঁর জন্য আমরা জগতের এত আনন্দ পাচ্ছি, তাঁকে একবার ভক্তিভরে প্রণাম করে আসব না? তাঁর বিমল হাসি কি একবার দেখতে চাইব না? আমাদের ভক্তি না পেলে, আমাদের কাছে প্রীতি-পূর্ণ প্রণাম না পেলে সেই জীবনবল্লভ প্রাণনাথের যে কষ্ট হয় সে কথা আমরা সকল সময়ে মনে করি নে। তিনি তাঁর অন্তঃপুরে নির্জ্জনে বসে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করছেন যে আমাদের মধ্যে কে কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে বুকভরা গাঢ় আলিঙ্গন নিতে পারে। যাঁর অন্তরে আমাদের জন্য এত ভালবাসা, তাঁকে প্রণাম না করে, তাঁর আলি-ঙ্গন না নিয়ে কি আজ গৃহে ফিরতে পারি? তাহলে সম্বৎসরই যে আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে। সম্বৎসরই কি আমাদের জীবন দুঃখনিরাশার অন্ধ-কারে কাটাতে চাই? কখনই নয়। এস, আমরা অমৃতনিকেতনে গিয়ে সেই অমৃতপুরুষের চরণে আমাদের সকল দুঃখশোক, নিরাশা নিরানন্দ নিবেদন করে আসি, আর তাঁর হাসি প্রাণেতে উপলব্ধি করে আনন্দসাগরে ডুবে যাই।

সেই প্রাণের দেবতাকে, প্রাণের পূজার এক-মাত্র পাত্রকে আজ থেকে, এই মুহূর্ত্ত থেকে এমন করে ভালবাসব যে এ কথা যেন মন থেকে বলতে পারি যে তাঁর বিরহে প্রাণ বেরোচ্ছে। তাঁর অদর্শনে প্রাণের ভিতর দিবানিশি যেন আগুন ছুটতে থাকে। একবার তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসলে তাঁর অভাব তিনি ছাড়া আর কেহই পূর্ণ করতে পারবে না। তাঁকে প্রাণের ভিতর বসাতে না পারলে, তাঁর হাতের শীতল স্পর্শ না পেলে তাঁর বিরহজনিত আগুন আর কেহই নিবাতে পারবে না।

দয়াময়, দেখা দাও হৃদয়ে। আমার মত অকিঞ্চনেরও হৃদয়ে দেখা দাও বলেই তো তোমার নাম দয়াময়।

তাঁকে একবার প্রাণভরে ডাকলেই তিনি নিজেকে একেবারে ঢেলে দেন। আমাদের লৌহহৃদয়ে যদি মরিচা ধরে তাহা বন্ধ হয়ে থাকে, আমরা যদি সেই হৃদয়কবাট খুলতে না পারি, তবে এস সেই বজ্রপাণি জীবনসখাকে মুক্তকণ্ঠে ডেকে

বলি যে তিনি তাঁর বজ্রদণ্ডে এই মুহূর্ত্তেই হৃদয় ভেঙ্গে সেখানে তাঁর নিজের আসন রচনা করুন।

আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের বাঁধন আমরা কখনই স্থায়ী করতে পারব না। তাঁর সঙ্গে যে প্রেমের বাঁধন, সেই বাঁধনের বলেই আমরা আজও বেঁচে আছি, আর অনন্তকালও বেঁচে থাকব। তাঁকে ছেড়ে আমরা অমর জীবন পেলেও বাঁচতে চাইনে। তাঁর প্রেম তাঁর স্নেহ একবার হৃদয়ে অনুভব করলে আর কি ভুলতে পারি? তখন যে আমরা এই পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ কিছুই চাই নে—সে সকলই যে আমাদের কাছে বিষের মত বোধ হয়। তখন প্রাণ যে কেবল তাঁরই কোলে আশ্রয় পেতে চায়, তাঁরই শান্তিরূপের স্পর্শ পেতে চায়।

আমার সেই প্রাণনাথ আনন্দময়। আজকার এই প্রাতঃ সূর্য্য তাঁরই নাম নিয়ে অরুণাচল ভেদ করে উদিত হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরাশি জগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পশু পক্ষী জীবজন্তু সকলেই সেই অগাধ আনন্দরাশির কণামাত্র লাভ করে কতনা আনন্দ কলরব করছে। ফুলেরা তাঁরই গাত্রের সুগন্ধ বহন করে এনে আনন্দরসে বিভোর হয়ে আছে।

আমরাও, এস, আজ এই নববর্ষের শুভ মুহূর্ত্তে সেই আনন্দময় প্রাণের প্রাণকে হৃদয়ের মধ্যে আঁকড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রাণ ভরে ডেকে বলি—

হে প্রাণের প্রাণ, তোমার জন্য আজ প্রভাত হতে না হতে আমরা হৃদয়সিংহাসনকে পবিত্র করে রেখেছি। তুমি এস, হৃদয় ভরে এস। তুমি আমার এই প্রাণ দিয়েছ—যখনই তোমার ইচ্ছা হবে তখনই তোমার দেওয়া প্রাণ তুমি নিও। কিন্তু সেই প্রাণকে তোমাকে দিয়ে মহান করে, তোমার নেবার উপযুক্ত করে তবে তুমি নিও। আমার যাহা কিছু আছে, সকলই এই পুণ্য মুহূর্ত্তে তোমাকে নিবেদন করে দিলুম—তুমি আমার সকলই তোমার চরণের যোগ্য করে নাও।

আলো ও আনন্দ।

মানুষের মনের সঙ্গে একদিক দিয়া গাছপালার মস্ত একটা মিল আছে। আলোর দিকে গাছপালার স্বাভাবিক টান আছে; যে দিকে আলো তার শাখাপল্লব গুলি সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে—যেন সে হাজার হাজার পাতার আঙুলের ইসারায় আলোকে সর্ব্বদাই ডাকিতেছে। মানুষের মনও ঠিক এমনি। আলোর জন্য তার ব্যাকুলতা আছে। আলো পাইবার জন্য সে প্রতিকূলতা ভেদ করিয়া উন্মুক্ত হইয়া আছে। আলো তার চাই-ই-চাই, তাহা না হইলে সে কেমন করিয়া বাড়িবে? কেমন করিয়া ফুটিবে?

গাছের রস না হইলেও চলে না। এই জন্য গাছ তার মূলটিকে এমন স্থানে পাঠাইয়া দেয় যেখানে কোনো কালে রসের অভাব হয় না। গাছ যদি তার মূলটিকে রসের ঠিক ভাণ্ডারটিতে না পাঠাইতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সে শুকাইয়া মরিয়া যায়।

মানুষের মনও রস না পাইলে বাঁচে না, মনও তার আসল মূলটি কোনো একটি রসের প্রস্রবণের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। সেই আসল জায়গাটির খোঁজ না পাইলে ছিটাফোটা রস পাইয়া তার বেশি দিন চলে না, সে শুকাইয়া মৃতকল্প হয়।

গাছপালার মত মানুষের মন আলোর ও রসের দিকে ঝুঁকিয়াই আছে। মন যেন এই কথাই বলে "আমার আনন্দ চাই—সুখ চাই—উৎসব চাই—আমি অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া সারাটা কাল অন্ধের মত হাতড়াইয়া চলিতে পারিব না—কোথায় হুঁচট খাইয়া পড়িব, কোথায় ডোবায় খানায় ডুবিয়া মরিব, কোথায় মাথায় আঘাত খাইয়া রক্তাক্ত হইব—এসব ঝঞ্চাট কেন? আমাকে আলো দেও কোথায় কি আছে দেখি; চলা ফেরার রাস্তা কই, কি ভাল কি মন্দ সব আমি নিজের চোখে দেখিয়া লই।"

মানুষের মনটা কোন্ সেই অনাদি কাল হইতেই আলোর জন্য আনন্দের জন্য এমনি ক্ষেপিয়া আছে। সে ক্রমাগত বলিতেছে "আলো চাই—আরো আরো আরো আলো; আনন্দ চাই—আরো আনন্দ আরো

আনন্দ।" মানুষ আপনার মনের এই দাবী মিটাইতে যাইয়া এত বড় হইয়াছেন। আলোর খোঁজ করিতে করিতে মানুষ এমন আলোর কাছেই গেলেন যে সেখানে আগুণের আলো, নক্ষত্রের আলো, চাঁদের আলো, সূর্য্যের আলো, বিদ্যুতের আলো, আলো বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না—সেই পরম জ্যোতির এক এক কণা পাইয়া এদের এত আলো এত রূপ এত তেজ। আনন্দের খোঁজ করিতে করিতে মানুষ এমন এক পরম আনন্দকে আবিষ্কার করিলেন যে সেই আনন্দসাগরের মধ্যেই, শুধু তুমি আমি কেন, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর জন্মিতেছে, বিচরণ করিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে। এই ভূমানন্দের এক এক কণা পাই বলিয়াইতো আমরা বাঁচিয়া আছি। মানুষ ইহা দেখিয়াছেন যে তিনি এই আনন্দ পারাবারের বিচরণশীল জন্তু। এই খানেই তাঁর সৃষ্টি, এই খানেই স্থিতি, এই খানেই লয়।

যে আলো বা তেজ এবং যে আনন্দ বা অমৃতের সন্ধান মানুষ করিলেন সেই তেজ সেই অমৃত তিনি কোথায় পাইলেন? খোঁজ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাকে দূরে যাইতে হয় নাই—কারণ এই আকাশে এই হাতের কাছের বৃহৎ বিরাট আকাশে এক তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাস করিতেছেন। মানুষ তাঁহার প্রাণের বাঞ্ছিত আলো ও রসের উৎস হাতের এত কাছে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু এই যে রস ও এই যে আলো এ কি কেবল বাহিরেই? মানুষের ভিতরে কি ইহার সন্ধান হয় নাই? হাঁ হইয়াছে বইকি। মানুষ যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে অনন্ত আকাশে বাহিরে দেখিলেন নিজের ভিতরে আত্মায়ও তাঁহাকেই দেখিতে পাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। সেই একই পুরুষ মানুষের ভিতর ও বাহির রসের ধারায় ও আলোকের প্রবাহে পূর্ণ করিয়া চির কাল বিরাজিত আছেন।

ছোট মানুষ—এই যে বড় এই যে বিরাট যিনি বিশ্ব জুড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝিলেন? বামন হইয়া চাঁদ হাতে পাইলেন! পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলেন! এ অতি আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই।

ইহা যতই আশ্চর্য্য হউক না কেন এই অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে। বড় আপনি আসিয়া ছোটর কাছে ধরা দিয়াছেন, অসীম আপনি আসিয়া সীমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই মিলন হইতেই আনন্দের উৎপত্তি। এই মিলন না হইলে মানুষ তাঁহাকে চিনিতই না। মানুষ ছোট হইলেও অসীম তাঁহাকে আপনার আয়না করিয়া লইয়াছেন। ছোট গর্ত্তের একটুখানি জলের মধ্যে প্রকাণ্ড আকাশ যেমন তার ছবি ফেলে, ভূমাও তেমনি মানুষের উজ্জ্বল পবিত্র আয়নার মত স্বচ্ছ মনটির উপর তাঁহার ছবি ফেলিয়াছেন। এই মিলন কি আনন্দের মিলন! অনন্ত যিনি তিনি মানুষের মধ্যে আপনার রূপ দেখিয়া আপনি সুখী হইলেন; আবার মানুষ বুদ্ধি দিয়া, বিদ্যা দিয়া, বাক্য দিয়া, কিছুতেই যাঁহাকে কোন দিক দিয়াই ধরিতে পারিতেছিল না, সেই স্বপ্রকাশ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ছোট মনটির মধ্যে আপনি ধরা দিলেন। এই পাওয়ায় মানুষের কত আনন্দ! মানুষ তাহা কত বাণীতে কত মন্ত্রে কত গাথায় কত শ্লোকে কত গানে কত ছন্দে কত সুরে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। সেই অনাদি কাল হইতে মানুষ তাঁহার এই আনন্দের কথা বলিতেছেন কিন্তু বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না।

মানুষের আসল সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনা, এই আনন্দেরই সাধনা। যাবৎ এই আনন্দের সহিত মানুষের মনের একটু যোগ না হয় তাবৎ তাঁর বাক্য শুষ্ক, উপাসনা শুষ্ক, জ্ঞান শুষ্ক, কার্য্য শুষ্ক। আর সেই রসের প্রস্রবণের সহিত মনের একটি শিকড়ের যোগ থাকিলে চিন্তা মধুময় হয়, বাক্য সরল হয়, উপাসনা সরস হয়—জ্ঞান রসময় হয়, কার্য্য আনন্দের রসে স্নিগ্ধ ও অনায়াস হয়।

অন্তরে এই রসের সন্ধান না পাইলে বাহিরের আয়োজন দ্বারা ইহার সঞ্চার করা অসাধ্য ব্যাপার। সাধনার ক্ষেত্রে এমন ব্যর্থ উদ্যম বারংবার দেখা গিয়াছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে প্রেমের লীলা কামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পবিত্রতার সুন্দর উদ্যান পাপের আগাছায় কণ্টকে গুল্মে ভরিয়া গিয়াছে। দেবতার আসনখানি দানবেরা দখল করিয়া লইয়াছে।

মানুষ ভুল করিয়াছেন, হয়তো আবারও ভুল করিবেন—দেবতার স্থানে অপদেবতাকে বসাইয়া আপনি আপনার দুঃখের পাপের তাপের হেতু হইয়াছেন, হয়তো আবারো হইবেন; কিন্তু তবু তিনি আনন্দের সাধনা ছাড়িবেন না। মানুষের মন যাঁহাকে কামনা করে তিনি "রসোবৈ সঃ" "রস-স্বরূপ"; তাঁহাকে না পাইলে যে আনন্দ নাই। এই আনন্দ লাভই যে তাহার চরম পুরস্কার মনের মধ্যে মানুষ তাহা ঠিকই জানে।

এই ভূমানন্দ আমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে। কারণ দুর্লভ মানুষজন্ম লাভ করিয়া আমরা যত যত উচ্চ অধিকার পাইয়াছি, সেই সমুদায়ের মধ্যে এই অধিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি তিনি রস-স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ আর আমরা ক্ষুদ্র মানুষ হইলেও সেই অমৃতের আনন্দের অধিকারী। এত উচ্চ অধিকার পাইয়া যদি আমরা এই আনন্দকে না জানিয়া

না বুঝিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করি তাহা হইলে আমরা একান্ত হতভাগ্য, একান্ত কৃপার পাত্র। আর আমরা যদি সেই আনন্দময়কে জানিতে পারি তাহা হইলে সকল শোক, সকল পাপ, সকল বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

কিন্তু এই আনন্দময় বিশ্বব্যাপী দেবতাকে জানাতো একান্ত সোজা নহে। আমাদের অন্তর ও বাহির পূর্ণ করিয়া থাকিলেও তিনি এমন সূক্ষ্ম যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারে না। তাহা না পারিলেও আমাদের নিরাশার কারণ নাই যেহেতু এই স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ প্রতিনিয়ত আমাদের মনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। সেই মঙ্গল বুদ্ধি তাঁহারই আদেশ লইয়া আমাদের মনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে, সেই বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যাহা সত্য বুঝিব ধর্ম্ম বুঝিব মঙ্গল বুঝিব সেই সত্যে সেই ধর্ম্মে সেই মঙ্গলে লাগিয়া থাকিতে হইবে।

এই সত্যকে, ধর্ম্মকে, মঙ্গলকে একেবারে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে মন শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইতে পারে না। আর মন সুবিমল না হইলে বিরাট তাঁহার ছবিখানি কোথায় দেখাইবেন?

মন পরিষ্কার করার জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান বলিতে কেহ কেহ অস্বাভাবিক যোগযাগ বুঝিতে পারেন। ধর্ম্ম তেমন উৎকট কিছু নহে। মানুষ মাত্রের যাহা যাহা করণীয় তাহা তাহাই ধর্ম্ম। আপনার সম্বন্ধে তাহার অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাহা ছাড়া তাঁহার পিতামাতা স্ত্রী পুত্র প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধব আছেন—তাঁহাদের সহিত তাহার দেহের মনের যে স্নেহপ্রীতির যোগ রহিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে সেবাশীল হইতে হইবে। আপনার কথা এবং মা বাপ ভাই বন্ধুর কথা ভাবিলেই মানুষের কর্ত্তব্য শেষ হইতে পারে না—মানুষ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দীনদুঃখীদের কথা, সমাজের কথা, দেশের কথা, তাঁহার চিন্তা করিতেই হইবে। এই বিচিত্র কর্ত্তব্য সাধনই মানুষের সত্য ধর্ম্ম। সর্ব্বোপরি যে দেবতার ইচ্ছায় আমরা এই স্নেহপ্রেম শোভাপূর্ণ সুন্দর ধরণীতে জন্মিয়াছি—তাঁহার প্রেম তাঁহার দয়ার কথা যদি আমরা ভুলিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা বুদ্ধিজীবি মনুষ্য নহি—নরদেহধারী পশু।

যে চেতনাবান্ প্রেমময় দেবতা এই বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাকে জানিবার জন্য আমরা ধর্ম্মশীল হইব, ধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচ্ছিন্ন হইব না; তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা সত্যশীল হইব, কদাচ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব না; এই প্রেমময় কল্যাণময় দেবতাকে বুঝিবার জন্য আমরা কল্যাণশীল হইব, কদাচ কল্যাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।

যাহা আজ ভাল এবং চিরকাল ভাল তাহাই কল্যাণ। যাহা আমার পক্ষে ভাল এবং অন্য সকলের পক্ষে ভাল তাহাই কল্যাণ। যাহাতে আমার একটু ভাল হয় কিন্তু অন্যের ক্ষতি হয় তাহা মূলে ভাল নহে। সুতরাং স্বার্থের পথে চলিলে মঙ্গল লাভ হইবে না, অসংযমের রাস্তা দিয়া চলিলে কল্যাণ হইবে না। আসল কথা আমাদের মনের উপর যাহাতে কোনো মলিনতা জমিতে না পারে সেই-জন্য সত্যের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা প্রত্যহ মনকে মাজিতে ঘষিতে হইবে। এই সাধনায় আনন্দ আছে, এবং এই সাধনারই পরিণামে ভূমানন্দ রহিয়াছেন সুতরাং আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে এই সত্য সাধনা গ্রহণ করিব।

আমাদের মন ভিতর হইতে বলিতেছে "আলো চাই, আনন্দ চাই" আর আমরা মনকে অন্ধকারের মধ্যে, নিরানন্দের মধ্যে চাপিয়া রাখিব? তাহাকে বাড়িতে দিব না? না, তা হইতেই পারে না; আমরা আলোর ও আনন্দের দেশে যাত্রা করিবই করিব।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

ভূপ—ঝাঁপতাল।

পরব্রহ্ম আদিকারণ নমোনমঃ
এক, অদ্বিতীয়, মহাজ্ঞান, পরিপূর্ণ।
তোমারি এক ইঙ্গিতে ধায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড
কোটি সূর্য্য তারা গ্রহ মহাশূন্যে ;
সব তোমারি লীলা, ধন্য তুমি ধন্য ॥

র্সা II র্সা -া । পা -া না । -ধা -া । -া -া র্রা I র্সা -া । পা -া না ।
প র ০ ব্র ০ হ্ম ০ ০ ০ ০ প র ০ ব্র ০ হ্ম

। ধা -পা । গা -া -পা I গা -রা । সা সা রা । গা -া । -া -া -া I
আ ০ দি ০ ০ কা ০ র ণ, ন মো ০ ০ ০ ০

॥
I -ধা -পা । -গা -রা -সরগা । রা -া । সা -া -া I ধা -া ।
০ ০ ০ ০ ০০০ ন ০ মঃ ০ ০ এ ০

। পা গা পা । ধা -র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্রা -া । র্সা ধপা ধা । গা -পা ।
ক, অ দ্বি তী ০ য়, ম হা জ্ঞা ০ ন, প০ রি পূ ০

। ধা -র্সা র্সা II
র্ণ ০ "প"

II পা -া । ধা পা পা । -ধা ধা । -র্সা র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা র্সা র্সা ।
তো ০ মা রি এ ক্ ই ০ ঙ্গি তে ধা য় অ খি ল

। র্সা -া । র্সা -া ধা I র্সা -া । র্রা র্সর্রা -র্গা । র্রা র্সা । র্রা -া -া I
ব্র ০ হ্মা ০ ণ্ড কো ০ টি, সূ০ ০ র্য্য, তা রা ০ ০

I র্সা র্সা । র্রা র্সা -নর্সা । ধা -পা । পর্সা -ধা -র্সর্সা I -র্রর্সর্রা -র্সা ।
গ্র হ ম হা ০ শূ ০ ন্যে ০ ০০ ০০০ ০

। -র্রর্রা -র্সা -ধা । -র্সনর্সা -ধা । -র্সর্সা -ধা -পা I -ধপধা -পা ।
০০ ০ ০ ০০০ ০ ০০ ০ ০ ০০০ ০

। -ধধা -পা -গা । -পক্ষপা -গা । -ধা পা পা I ধা পা । ধা পা -ধা ।
০০ ০ ০ ০০০ ০ ০০ স ব তো মা রি, লী ০

। র্সা -া । -া -া -া I পা -া । ধা গা পা । ধা -র্সা । র্সা -া র্সা II II
লা ০ ০ ০ ০ ধ ০ ন্য তু মি ধ ০ ন্য ০ "প"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষ।

যে মহাকালের প্রলয় পিণাক আদেশ রবে যুগে যুগে মন্বন্তরার আবির্ভাব হইয়া নূতন সৃজনের সূচনা হয়, তাহারি কাল বৈশাখী ঝড়ে বিগত বর্ষের জীর্ণ পর্ণ সকল চারিদিকে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আবার নব পল্লব-সম্ভারে প্রত্যেক তরু সুসজ্জিত। কলকাকলি গাহিয়া বিহগকুল নূতন কুলায় রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছে—শূন্য শাখা নব সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, ভগ্ন কুলায় নব রচিত হইয়া, আবার আনন্দ গানে মুখর। আমরাও পুনরায় গত বৎসরের দুঃখ, দৈন্য, নিরাশা, অভাব ভুলিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নূতন আশার আবাহন করিতেছি। ব্যর্থ বেদনার কাতর অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া, নবীন ঊষার তরুণালোকে সম্মুখেই ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেছি।

এই সংসারে শ্লথ জড়তার স্থান নাই, সকলে কাল প্রবাহে অবিরাম চালিত হইয়াই চলিয়াছে, নব রূপ নব সৃষ্টি, নবীন কার্য্যাবলী পুরাতনের স্থান অধিকার করিতেছে। জীর্ণ পত্র ঝরিয়া পড়িয়াও তাহার কার্য্যের গতি স্থগিত করিতে পারে নাই, ধূলিসাৎ হইয়াও সে নূতনের প্রাণসঞ্চার দান করিতেছে। জীর্ণতাই জীবন উৎসর্গ করিয়া নবীনতাকে সৃজন করে। অতীত বর্ত্তমানকে আমাদের দ্বারে আনিয়া দেয়, বর্ত্তমান ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতেই থাকে। মুকুল ঝরিয়া যায়, সুগন্ধে দিক্‌দিগন্তে আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করিয়া দেয়, “ক্ষণিক গেল, চিরদিন, দিনে দিনে পরিপুষ্ট ফলের মধ্যে, গন্ধ সৌন্দর্য্যে, স্বাদে পরিণতির অভিমুখে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের আশা চিরন্তনী হইয়াই আছে।” বিনাশ নাই, মৃত্যু নাই, জরার প্রভাব স্বল্প, আছে কেবল অবিনাশী জীবন, আর অনশ্বর আশা। তাহারি আশ্বাসে বিয়োগের অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া সম্মুখে যাত্রা করিতেই হয়। স্মৃতির গর্ভেই স্বপ্নের সূচনা; অন্ধকারই আলোককে ক্রোড়ে করিয়া আনে। প্রদোষ হইতে প্রত্যূষের অভিমুখে, শিশিরসিক্ত ছায়াচ্ছন্ন পথেই আমরা যাত্রা করি, বিহগ গীতি তখন শোনা যায় না, সহযাত্রীর পদশব্দও কাণে আসে না, মনে হয় বুঝি অন্ধকার পথে কেবলি একক অভিযান। কিন্তু যখন উদয়ের তীর্থপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হই, অজস্র কলসঙ্গীতে অসংখ্য যাত্রীর পদশব্দে চারিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অবারিত আলোকের প্লাবনে বিশ্বভুবনের বিচিত্র শ্রী চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া চলে, তখনি জানি সার্থক যাত্রা সার্থক উদ্যম, জয়যুক্ত জীবনের সমগ্র আগ্রহ।

কি গেল, কি যে পাইলাম না, ভ্রান্তিবশে কোন্ দুর্লভের দিকে দুর্ব্বল হস্ত বারম্বার প্রসারিত করিয়া, কেবলি ব্যথাই পাইলাম, সে কথা আজ ভুলিতে হইবে। শীতের মোহ নিদ্রা অতীত, বসন্তের বিলাস গত-প্রায়, সম্মুখে নিদাঘের তীব্র উজ্জ্বল দিন—তাহা স্বল্পায়ু নয়, সুদীর্ঘ অবসর বহন করিয়াই সে আসিয়াছে, মঙ্গল অনুষ্ঠানে, কল্যাণের অনুপ্রাণনায় তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দি, আমাদের নববর্ষের আবাহন সফল হউক।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চিন্তা লহরী।

১। নূতন।

আমি নূতন কোন্ কথা বলিব? নূতন বলিয়া কোন কিছুর কি অস্তিত্ব আছে? যবে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে, তখন অবধিই সকলই আছে। যাহা কিছু বলিবে, যাহা কিছু ভাবিবে, সৃষ্টিতে তাহা না থাকিলে তাহা তুমি বলিতেও পারিতে না, ভাবিতেও পারিতে না। তবে আমরা যাহাকে নূতন বলি, তাহার অর্থ এই যে তুমি যাহা বলিবার অবসর পাও নাই, আমার অবসর থাকাতে তোমারই কথা ব্যক্ত আকারে তোমার কাছে ধরিয়াছি। সেই প্রকার আমি যে কথা বলিবার অবসর পাই নাই, তোমার অবসর থাকাতে তুমি আমারই কথা ব্যক্ত আকারে আমার সম্মুখে ধরিলে; যে কথা তুমি আমাকে বলিলে সে কথা আমাতেও ছিল, তাহা না হইলে আমি তাহার ক অক্ষরও বুঝিতে পারিতাম না। যে কথা আমি তোমাকে বলিলাম, তাহা তোমার ভিতরেও ছিল। সুতরাং নূতন কিছু বলিলাম, নূতন কিছু করিলাম বলিয়া আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। ঈশ্বর তো নূতন নহেন। তিনি চিরপুরাতন। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিও চিরপুরাতন। সেই সৃষ্টিতে তাহা হইলে নূতন বলিয়া কিই বা থাকিতে পারে? নূতন যখন কোন কিছুই নাই, তখন আমিও নূতন কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা করিব না। তোমারই কথা তোমাকে শোনাইব—নূতন আবরণে আবৃত করিয়া পুরাতন কথা পুরাতন ভাব তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিব। তুমি কোনটী বা পরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিবে, কোনটীকে বা চিনিতে পারিবে

না। কিন্তু কাহাকেও অবহেলা করিয়া পদদলিত করিও না—কারণ আমার চিন্তাগুলির সকলই তোমার পরিচিত, ইহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

২। পুরাতন।

তবে সকলই কি পুরাতন? নূতন কি কিছুই নাই? নূতন যদি কিছুই নাই, তবে নূতনের কথা আমাদের মনে আসে কেন? ঈশ্বরই কি পুরাতন? তিনি তো নিত্য নূতন। তিনি নিত্য নূতন বলিয়াই প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ে নূতন ভাব জাগিয়া উঠে। তাই প্রতিদিন চন্দ্রোদয়ে হৃদয় নূতন ভাবে নাচিয়া উঠে। তাই প্রতিদিন তারকাখচিত অন্ধকার রাশির আবির্ভাবেও নূতন নূতন কবিতা প্রাণের ভিতর খেলিতে থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁহার সমান পুরাতন হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সৃষ্টির কার্য্য করিবার পথ যে আবার তাঁহারই মত নিত্য নূতন। কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র-সম্বলিত এই ব্রহ্মচক্র কখনো কি পুরাতন পথে চলিয়াছে যে তুমি বলিবে নূতন কিছুই নাই? নিত্য নূতন ভগবানের এমনই সৃষ্টিকৌশল যে এই এতবড় ব্রহ্মচক্র এই মুহূর্ত্তে যে পথে চলিয়াছে, আর কখনো সে পথে ফিরিয়া আসিবে না। যে দিন তুমি জানিতে পারিবে যে এই ব্রহ্মাণ্ড নিজের পুরাতন পথে ফিরিয়া চলিয়াছে, সেই দিন আমাকে বলিও যে জগতে নূতন কিছুই নাই, তখন সে কথা আমি ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। এই ব্রহ্মচক্র জীবজন্তু সকলকে লইয়াই যখন প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে তখন ইহা আর আশ্চর্য্য কি যে সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রোদয়ে দিনে নিশীথে প্রতিদিন আমরা নব নব ভাবে হৃদয় মন ভূষিত করি? আসল কথা এই যে নূতনও আছে পুরাতনও আছে—উভয়ে মেশামেশি করিয়া আছে—আমাদিগের তাহা বাছিয়া লইতে হইবে।

৩। কাজ।

সম্মুখে অসীম কাজ পড়ে আছে। কাজের অন্ত নেই। তুমি দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করে ভাবছ যে না জানি কত কাজই করলে। কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে সেটুকু কত অল্প কাজ। আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, কালের বিষয় ভেবে দেখ, তাহলেই জানতে পারবে যে কাজের সীমা নেই। কত কাজ করতে চাও, কর—সম্মুখে কাজের ক্ষেত্র ততই প্রসারিত ততই গভীর হয়ে পড়বে। ঈশ্বর যে সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে কাজে লেগে গেছেন, আজ পর্য্যন্ত কি তিনি তাহা শেষ করতে পেরেছেন? তিনিই যখন শেষ করতে পারেন নি, তখন আমাদের কাজের শেষ হোল ভাবা একটু হাস্যাস্পদ সন্দেহ নেই। আর একটী কথা এই যে আমরা যে কাজ করি সেটা আমরা করলুম বলে আমাদের জাঁক করবারও অবসর নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে, ভগবান যে সব কাজ করে গেছেন, যে সকল গ্রন্থ লিখে গেছেন, সেই সব কাজ নাড়াচাড়া এবং সেই সকল গ্রন্থের পাতা উল্টানো। কখনো বা আমরা সেই সকল কাজ গোছাইয়া করি, যেখানকার যে জিনিস তাহা দেখে শুনে আবার ঠিক করে রেখে দিই, আর কখনো বা ছোট ছেলের মত এজিনিস ভাঙ্গি ওজিনিস হারিয়ে ফেলি, এই বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ি, ও বইয়ের মলাটে কালির দাগ কাটি। অবশ্য ভগবান আমাদের যাঁর যার যথাযথ শাস্তি পুরস্কার দিয়ে আবার সেইগুলি ঠিক করে তাঁর মনোমত সাজাইয়া ফেলেন। প্রকৃতির কাজ আলোচনা করিলে এইটি শিখতে পারি যে আমাদের কোন কাজেই আমরা করলুম বলে জাঁক করতে নেই এবং কর্ত্তব্য কাজ করে যাওয়া উচিত। দুএকটি কাজ করেই হাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়। প্রতি মুহূর্ত্তেরই উপযুক্ত কর্ত্তব্য কাজ আছে এবং সেই মুহূর্ত্তেরই কাজ ভালরূপে সাধন করা উচিত। তাহলে বোধ হয় জগতে দুঃখশোকের অনেক লাঘব হয়।

৪। যুদ্ধ।

ইউরোপে মহা সমর চলছে। কত লক্ষ লক্ষ জীব এই সমরাগ্নিতে আপনাদিগকে ইচ্ছা করে আহুতি স্বরূপে দিচ্ছে, আবার কত লক্ষ লক্ষ জীব অনিচ্ছাসত্বেও বলপূর্ব্বক আহুতি প্রদত্ত হচ্ছে। এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ইউরোপ বার্দ্ধক্যের পথে চলেছে। ভারতবর্ষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরই বলতে গেলে বুড়া হয়ে গেল। মানুষের যৌবনেই অহঙ্কার বেড়ে ওঠে এবং তার ফলে মনে করে যে সমস্ত ধরাতল করতলগত। কিন্তু সেই ভাবটিকে কাজে আনতে গেলেই যুবাকে সকল রকমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। আমার মনে হয় যে এই যুদ্ধের পরেও কিছুকাল ইউরোপের যৌবনের ছায়া থাকবে, কিন্তু শীঘ্রই যে বার্দ্ধক্য আসবে তার সন্দেহ নাই। প্রকৃতিতেও দেখা যায় যে কলমের গাছ শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ফল দিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বুড়িয়ে যায়। পুরাণাদি পড়িয়া যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় যে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের মহাসমরের পর ভারতবর্ষ এই রকম একবার বুড়িয়ে গিয়ে ক্ষাত্রতেজের উপর ধিক্কার দিয়া ব্রহ্মতেজ অবলম্বন করিয়া বাহিরের কাজে কতকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের পর দ্বাপরের ভারতবর্ষ বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়ে বহির্ব্যাপারের প্রতি অনেকটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল। সেই বার্দ্ধক্যের ধাক্কা আজ পর্য্যন্ত চলছে। ভগবানের রাজ্যে চিরমরণ বলে তো কিছু নেই, তাই

এক একটি যুগের ভারতবর্ষ বার্দ্ধক্যে এসে যেই বাহিরের চোখে মরে যায়, অমনি ভিতর থেকে ব্রহ্মতেজের বল এসে তাকে নূতন জীবন দেয়। যতদিন সেই ব্রহ্মতেজ ধরে থাকে, ততদিন প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন বল সঞ্চয় করতে থাকে। এখন ব্রহ্মতেজের বলে উন্নত হতে হতেই ক্রমে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হতে থাকে—আবার তখনি নব-যৌবন প্রাপ্ত দেশ সাংসারিক উন্নতির কারণে গর্ব্বিত হয়ে ওঠে। গর্ব্বের ফলে পুনরায় ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র তেজের সংঘর্ষ আসে, আর মহাযুদ্ধ এসে পড়ে। মহাসংগ্রামের ফলে একেবারে কাবু হয়ে আবার ব্রহ্মতেজ অবলম্বন করতে ছুটে যায়। সেদিনকার কাগজে পড়ছিলুম যে একজন জর্ম্মান কর্ম্মচারী বলছেন যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ যে সময়ে একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে কিম্বা কতকটা টাকা নিয়ে মিটবে তা নয়। ইহা জীবনমরণের যুদ্ধ—পরস্পরের চেষ্টা এই যে বিপক্ষের সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ করা—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিপক্ষদলের শিল্প প্রভৃতি, আহার্য্য প্রভৃতি, সমূলে না বিনষ্ট হয় ততদিন অপর পক্ষ যুদ্ধ করতে ক্ষান্ত হবে না। হয়তো এই রকম মৃত্যুপণ যুদ্ধের ফলেই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হতে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল। আমার বোধ হচ্ছে যে ভগবানের ইচ্ছাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিরাপদ ছায়ায় বাস করে আমরা ব্রহ্মতেজ লাভ করবার অবসর পেয়েছি। তার ফলে এতদিন বাদে ভারতের নবযুগের নবযৌবনের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা যদি ক্ষাত্রবলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে ব্রহ্মতেজের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখি, তাহলে আমরা তারই বলে জগত জয় করতে পারব। যদি কেহ বলে যে ধর্ম্ম নিয়ে বসে থাকলে নিশ্চেষ্ট হতে হয় নিষ্কর্ম্মা হতে হয়,—তাহা মিথ্যা কথা। ধিক বলং ক্ষাত্র বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং॥

বড় হওয়া।

বড় হওয়া মুখের কথা নয়। বড় হতে গেলেই নীচু হতে হয়। ভগবান সব চেয়ে বড় বলে তিনি ধুলোর সঙ্গেও মিশে আছেন। সকলের গালাগাল খেতে হবে, সকলের লাতিঝাঁটা খেতে হবে, তবে বড় হতে পারবে। যে ধুলোতে ভগবান শুয়ে আছেন, সেই ধুলোর উপর আমরা কি রকম অত্যাচারই না করছি। আবার ধুলোকে আমরা খুব ছোট মনে করি, কিন্তু সেই ধুলোই এত বড় যে সেই ধুলো না থাকলে আমরা কিছুই দেখতে পেতুম না। আমারও তাই ইচ্ছা করে যে আমি ভগবানের মত সকল জিনিসে সকল ঘটনায় লুকিয়ে থাকি, কাজ করে যাই। কারো চোখে বা দেখা পড়লুম, কারো চোখে বা নাই পড়লুম। ইচ্ছা হয় যে সকলের পায়ের ধুলো হয়ে থেকে উপকার করে যাই, লোকে আমাকে আহ্বান করুক আর নাই করুক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন পম্পাই নগর।

প্রাচীন কালে পম্পাই নগর গ্রীকপ্রধান মিশ্র জাতির নিবাসভূমি ছিল। পরে রোমকগণ আসিয়া উহা অধিকার করে এবং ক্রমে সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য রোমকগণ আসিয়া উহাতে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে পম্পাই নগর বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হইয়া আপনার মস্তক উত্তোলন করে। খৃষ্টীয় ৬৩ সালে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে উহার অনেকগুলি অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। নগরটি আবার পুনর্গঠিত হইতে আরম্ভ হইল কিন্তু কয়েকটি সমুচ্চ অট্টালিকা ও ভিনস দেবীর (Venus) মন্দিরের গঠন কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়সের যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহার ফলে নগরটি একেবারে প্রোথিত হইয়া গেল। তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। নগরের উপরে প্রথমে ৮ ফুট পরিমাণ একটি গলিত-ধাতু প্রস্তর ও ভস্মের চাপ পড়িয়া গেল। ক্রমে সেই চাপের বেধ ২০ ফুট হইয়া দাঁড়াইল। বহু শতাব্দী পরে ১৭৭৮ সাল হইতে এই চাপ খননের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বলিতে গেলে ১৮৬১ সাল হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সুশৃঙ্খলে যথারীতিতে উক্ত খননের কার্য্য চলিতেছে।

ঘন আবরণের ভিতরে ছিল বলিয়া ভগ্নগৃহের অভ্যন্তরস্থ গৃহসামগ্রী একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সেই প্রাচীনকালের নিদর্শন যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়া স্থানান্তরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গৃহাভ্যন্তরের সাজসজ্জা বাহির হইয়া পড়িতেছে, পান-ভোজন পাত্র, স্নানাগার ভোজন-গৃহ বাহির হইতেছে। শোভনতম পিত্তল ও মৃন্ময় গৃহসামগ্রীগুলি উত্তোলিত হইতেছে। ১৫ হস্ত উচ্চ প্রাচীরগুলি দেখা দিতেছে। ঘরগুলি প্রায়ই একতালা। দোতালার ঘরগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল বলিয়া অগ্নিদাহে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। গৃহগুলি সম্পূর্ণ হিন্দু-ধরণের। উহা দুই তিন মহলে বিভক্ত। প্রতি মহলের ভিতরে একএকটি স্বতন্ত্র উঠান। একটি মহল আর একটি মহলের পশ্চাতে সন্নিবেশিত। পরস্পরের ভিতরে যাইবার পথ রহিয়াছে। গৃহের মেজেগুলিতে
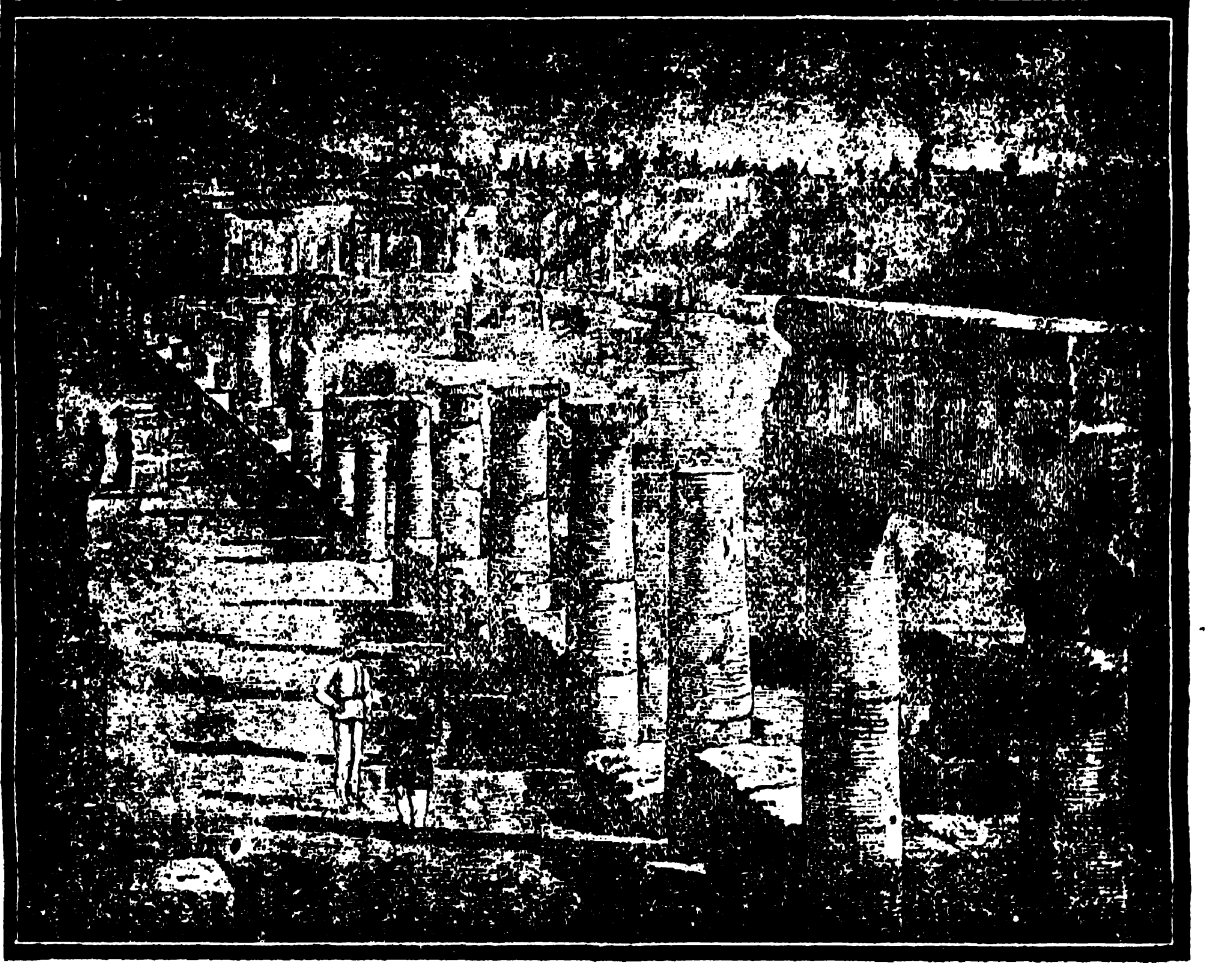
পম্পাই নগরে "প্রাচুর্য্যের রাস্তা।"

নানাবর্ণে রঞ্জিত টালি রহিয়াছে; উহাতে ঐতিহাসিক ও মৃগয়ার চিত্র অঙ্কিত। সর্ব্ব পশ্চাতে সন্নিবেশিত চত্বরে ফুলের এবং ফলের বাগানের নিদর্শন রহিয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পম্পাই নগরে "প্রাচুর্য্যের রাস্তা" নামক প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নগরে নবাবিষ্কৃত অত্যদ্ভুত কারুকার্য্য, উহার সুদীর্ঘ প্রাচীর গাত্রে অনুপম শিল্পচাতুরী ও খোদিত নির্ম্মিত ও অঙ্কিত মূর্ত্তি, অসংখ্য প্রস্রবণ সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সেই অতীত কালের শিক্ষা ও সভ্যতা বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

অধ্যাপক Antonio Sogliano যাঁহার নিয়ন্তৃত্বে খননের কার্য্য চলিতেছে, তিনি প্রত্নতত্বে অভিজ্ঞ, তিনি বলেন পম্পাই নগরের অধিবাসীবর্গ রাজপথে চলিতেছিল, তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আয়োজন করিতেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিসুবিয়স পর্ব্বত হইতে উৎগীরণ আরম্ভ হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নগরটি এককালে প্রোথিত হইয়া গেল। তিনি প্রাচীর গাত্রের অঙ্কন দেখিয়া বলেন যে সেই সময়কার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রণালী বিচিত্ররূপ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যেমন বিভিন্ন দলের লোকেরা সংবাদ পত্রে তাহাদের অনুমত ব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করে বা রাজপথের পার্শ্বস্থ ঘরের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নামের কাগজ মুদ্রিত করিয়া আঁটিয়া দেয়, পূর্ব্বে সেরূপ প্রথা ছিল না। সরকারি মিস্ত্রী আসিয়া প্রাচীরের গাত্র পরিষ্কৃত করিয়া যাইত। যে দল যাহার নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, সেই সেই দলের লোক সেই সেই ঈপ্সিত ব্যক্তির গুণাবলী সেই প্রাচীর গাত্রে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিত। এখনও তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে প্রাচীর-গাত্রে বিদ্যমান। সে সময়কার ভাষাও বেশ সতেজ ছিল। এই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন কার্য্যে যে স্ত্রীজাতিরও বিশেষ অধিকার ছিল, তাহা প্রাচীরের লেখা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজ্যের প্রধানতম নেতাগণ শাসন ও নির্ব্বাচন কার্য্যে স্ত্রীজাতির সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন।

আবিষ্কৃত একখানি ছবিতে দেখা যায় যে ধর্ম্মযাজক ও যাজিকাগণ "Cybele" দেবীর মূর্ত্তিকে সিংহাসনে চড়াইয়া ও তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেছে। অদূরে একটি ধূমায়মান আহুতি দিবার পাত্র রহিয়াছে; তাহার নিকটে ভিনস্ দেবী নিজ সৌন্দর্য্যে ও সুপবিচ্ছদে দণ্ডায়মান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ চিত্র অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ের চিত্রে চিত্রকরগণের প্রতিভা যে সুন্দররূপে ফুটিয়া পড়িত, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

খনন সূত্রে যে কিছু বিস্ময়কর পদার্থ বাহির হইয়া পড়িতেছে, তাহা সরকারী প্রহরীর দ্বারা সুরক্ষিত। বিদেশীয়গণ তৎসমস্ত ভাগ করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হন না। ইটালীয়গণ উহা আপনাদের মধ্যে এক চেটিয়া করিয়া রাখিতে চাহেন। খোদিত লিপি গুলি যদিও কাচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত, কিন্তু আরও বিশেষ সাবধানতার সহিত উহার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশগুলি রক্ষা করা আবশ্যক। খনন কার্য্যের ফলে ইতিপূর্ব্বে যে কিছু সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার রক্ষাকল্পে সেরূপ যত্ন হয় নাই বলিয়া অনেকগুলি মূল্যবান চিত্র ধূসরিত হইয়াছে এবং ফাটিয়া গিয়াছে। খননের কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে অনেকানেক পুরাতন ল্যাটিন হস্তলিপি বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে। পম্পাইএর অধিবাসীবর্গ চিত্রবিদ্যা লইয়া উন্মত্ত ছিল। বিশেষ সাবধানতার সহিত খনন করিলে সুন্দর সুন্দর চিত্র বাহির হইতে পারে।

অধ্যাপক এণ্টোনিও সাহেব বলেন, "আমার আমলে আমি বিশেষ যত্নের সহিত প্রত্যেক আবিষ্কৃত-পদার্থ রক্ষা করিতেছি। রোমানদিগের পূর্ব্ব আমলের এবং Samnitic স্যামিটিক সময়ের কয়েকটি সমাধি আবিষ্কার করিয়াছি।"

বিসুবিয়সের গলিত ধাতুর ভিতরে পড়িয়া কঠিন অদাহ্য পদার্থ গুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু জীব জন্তুর দেহ সেই গলিত ধাতুর ভিতরে ভস্মসাৎ হইয়া, অচিরে শীতলতা প্রাপ্ত সেই ধাতুপিণ্ডের ভিতরে যে গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ভিতরে (plaster of paris) প্যারিস প্লাষ্টার প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে; দ্রব-ধাতুতে দগ্ধ হইবার কালে তাহাদের যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্নও উহাতে সুব্যক্ত হইয়াছে।

মার্ব্বল, ধাতু ও অন্যান্য প্রস্তর নির্ম্মিত পদার্থগুলি বিনষ্ট হয় নাই। গৃহ গুলি যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ডে অধিক মসলার সাহায্যে গঠিত। ঘরের দেওয়ালের বাহিরের ও ভিতরের অংশ প্রায়ই বিবিধ সুন্দর চিত্রে চিত্রিত। তাহার অধিকাংশ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে সেই গৃহগুলির ভগ্ন ছাদ মেরামত করিয়া ও উদ্যানগুলিকে পূর্ব্বভাবে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বস্থানে রক্ষা করিবার কল্পনা হইতেছে।

কোন নগর বিনষ্ট হইলে তাহার ভগ্নগৃহের উপাদান লইয়া যেমন অদূরবর্ত্তী অন্য কোন নগরের পত্তন হয় এবং অর্থলোভী লোকেরা যেমন সেই প্রাচীন নগরের

গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া লুপ্ত-ধনের সন্ধান করে, প্রোথিত ছিল বলিয়া পম্পাই নগরকে সেইরূপ কোন বাহিরের অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। সমস্ত পম্পাই নগরকে ধাতু ও ভস্মের সমাধি হইতে বাহির করিতে পারিলে আমরা প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের একটী নগরের ছবি দেখিতে পাইব। বিনির্ম্মুক্ত পম্পাই নগর দেখিতে পাইলে আমরা রোমের সেই প্রাচীন গৌরবের আভাস পাইব। ইতিহাস আমাদিগকে রাজবংশের ও রাজার কার্য্যাবলীর পরিচয় প্রদান করে। কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রতিভা তাঁহাদের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রাচীন সময়ে সাধারণ লোকের গার্হস্থ্য জীবন যে কেমন করিয়া নির্ব্বাহ হইত, তাহাদের চিন্তা যে কোন্ পথে ধাবমান হইত, তাহা জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্যাকুলতা আইসে। ভবিষ্যতে এইরূপ খননের ফলে আমাদের সেই ব্যাকুলতা দূর হইবে; আমরা নূতন তত্ত্ব নূতন আলোক যে দেখিতে পাইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ"।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিত্র ও সুদীর্ঘ জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৪১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১॥ মাত্র। ২১০/২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ভবসিন্ধু বাবু এত দিন সঙ্গীত ও উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্মঠ জীবনের নূতন বিকাশ সন্দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকখানির আদ্যন্ত মধ্যে মহর্ষির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি মহর্ষিদেবকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাই পুস্তকখানি আমাদের এত ভাল লাগিল। মহর্ষিকে ঠিক বুঝিতে হইলে যে ধীরতা আধ্যাত্মিকতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা সম্বল করিয়া ভবসিন্ধু বাবু কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণা। মতভেদজনিত বিবাদ যখন বিপুল আকার ধারণ করে, সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ যখন অন্তরের স্থৈর্য্যকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, তখন ক্ষণকালের জন্য পরস্পরকে চিনিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলি, যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মান তাহা প্রদান করিতে আমরা কুণ্ঠিত হই। মহর্ষিদেব যে এতটা উদ্ভাবনী শক্তি লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনার অত্যুগ্র সাধনা দিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার বিশাল জ্ঞানের ছায়া দিয়া যে ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আপনার জীবনের সৌগন্ধে যে সকলকে সমাকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আপনার অসামান্য সত্যনিষ্ঠার প্রভাবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারের পথ সহজ ও সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন, ধনীর সন্তান হইয়াও অশেষ কষ্ট মস্তকে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে যে দেশবিদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, বৈরাগ্যভরে হিমাচলের শিখরদেশে বসিয়া কঠোর সাধনান্তে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে জ্ঞানময়ী ভাষায় আপ্ত বাক্যের ন্যায় ব্যাখ্যান উদ্গীরণ করিয়া যে প্রথম ব্রাহ্মসাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে অল্প লোকই তাহার সন্ধান রাখে।

বর্ত্তমান যুগ তাঁহার মত সংযমী পুরুষ লাভ করিয়া সত্যসত্যই ধন্য হইয়াছে। বাক্যে তাঁহার সংযম, ব্যবহারে তাঁহার সংযম, প্রচার ক্ষেত্রে তাঁহার সংযম, ভাষায় তাঁহার সংযম। একবার যিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাড়িতের বেগ সেই আগন্তুকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। সংস্কারের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কারের ভাব অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রকে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই। অলঙ্কারবাহুল্য বা ভাবের আধিক্য তাঁহার ভাষাকে আবিল করিয়া তুলিতে পারে নাই। মহর্ষির আত্মজীবনীর ভাষা বঙ্গসাহিত্যে নূতন যুগ আনয়ন করিয়া দিয়াছে। উক্ত আত্মজীবনীর শেষাংশে মহর্ষির সহিত কেশব বাবুর মিলনের চিত্র এবং তাঁহাকে আচার্য্য পদে নিয়োগের ছবি স্থান পাইয়াছে। মতদ্বৈধ জনিত বিচ্ছেদের কথা তুলিয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া মহর্ষি আত্মজীবনীর কলেবর বৃদ্ধির কোন চেষ্টা পান নাই। বিচারের ভার আমাদের উপরে ভাবীবংশীয়গণেরই উপরে রাখিয়া গিয়াছেন। এখানেও তাঁহার অতি আশ্চর্য্য সংযম। নিন্দা প্রশংসার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া তিনি কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানময়, প্রেমময় ও কর্ম্মময় তাঁহার জীবন ছিল। দানে সে জীবনের বিকাশ, বৈরাগ্যে সে জীবনের স্ফূর্ত্তি এবং সমাধিতে সে জীবনের পরিণতি। ভক্ত ও প্রণত শিষ্যের ন্যায় ভবসিন্ধু বাবু

মহর্ষিদেবের যথাযথ চিত্র সরল ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। মহর্ষির উদার হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্পর্শ করে নাই, এ কথা তিনি সাহসের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়াছি যে মহর্ষিদেবকে চিনিবার লোক অতি বিরল; অন্ততঃ তাঁহাকে প্রকৃতরূপে চিনিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভবসিন্ধু বাবু আমাদের সে সন্দেহ নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এ পুস্তকের প্রচারের কামনা করি।*

সাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা।

যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন অভিজ্ঞান-শকুন্তলার অসামান্য কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুরাণতন্ত্রের বহুলতা সন্দর্শন করিয়া এবং বেদ-উপনিষদের অসাধারণ গাম্ভীর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তাহাদের যুগনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে দেখিলেন যে দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে সাহায্য লাভের প্রত্যাশা বড় অল্প। যখনই তিনি কোন কাব্য-বিশারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,অমনই উত্তর পাইয়াছেন, কাব্যাদিগ্রন্থ সকলের অগ্রে বিরচিত। যখন কোন বৈয়াকরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ, তাহা না হইলে কাব্যাদি কিরূপে বিরচিত হইবে। যখন কোন পৌরাণিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন পুরাণেরত কথাই নাই, এত পূর্ব্বের যে সময়ে তন্ত্রাদির নামগন্ধও ছিল না। আবার যখন কোন বৈদিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উত্তর পাইয়াছেন যে বেদাদি হিমাচল সমান প্রাচীন। এইরূপে যিনি যে পন্থী, তিনি তাহারই প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে এইরূপ মতবিভিন্নতা সন্দর্শন করিয়া তবে তাঁহাকে স্বীয়যুক্তি বলে শাস্ত্ররাজির যুগনির্ণয় করিতে হইয়াছিল।

অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে এদেশে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকটা এইভাবের মত-বৈচিত্র্য ছিল। যদিও এক্ষণে অনেকটা তাহার তারতম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু সে ভাব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবার এখনও কালবিলম্ব। যাঁহারা বাল্যাবধি পাষাণ মূর্ত্তিতে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব দেখিতেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, তেত্রিশ কোটী দেবতা—অসংখ্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ, এ সাধনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যাঁহারা সর্ব্ববস্তুতে এক ব্রহ্মসত্তা চিন্তনে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেন, ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই যাঁহাদের নয়নগোচর হইত না, এই বিশ্বসংসার তাঁহাদের নিকটে ছায়ার মত নিতান্ত নশ্বর বলিয়া অনুভূত হইত; তাই তাঁহারা বলিতেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সমস্তই ব্রহ্ম, "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম। এইরূপে কেহ বা বহু ঈশ্বরবাদী, কেহ বা জগৎ-ব্রহ্মবাদী, কেহ বা অদ্বৈতবাদী, কেহ বা মায়াবাদী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেন।

সত্য মূলে এক, দুই নহে। দেশকাল পাত্র ভেদে সত্যের বিভিন্নমুখী স্ফুরণ হইতে পারে, সত্যের গাত্রে মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে, সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে পড়িয়া সত্য সংকীর্ণ আকার ধারণ করিতে পারে, এ সমস্তই সম্ভব, কিন্তু সত্যের সূক্ষ্মনাড়ী এই ভারতের সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে সঞ্চরণ করিতেছে, অদৃশ্যভাবে সর্ব্ববিধ মতামত ও সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠবংশ রূপে যে বিরাজ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবরণ-হীন সেই সত্যের প্রতি সকলের মনোযোগ সহজে নিপতিত হয় না বলিয়াই ধর্ম্মের নামে এত বিবাদ বিসম্বাদ জগতে স্থান পাইয়াছে। অবান্তর বিষয় লইয়া তর্ক তরঙ্গ বৃথা গণ্ডগোল রহিয়াছে বলিয়াই সেই অন্তর্নিহিত সত্য সহজে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না।

আমরা সামাজিক জীব। সম্প্রদায়ের বা দলের মধ্যগত হইয়া ধর্ম্মসাধন করা আমাদের পক্ষে যেমন হিতকর, যেরূপ সুবিধাজনক, নিজ সম্প্রদায়স্থ লোকের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম সাধনে যেরূপ বল পাই, তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সে আনন্দ সে আলোক সে বল লাভ করিতে পারি না। অচিরে হৃদয়ের মধ্যে শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সম্প্রদায়মাত্রেরই মহৎ দোষ এই, যে ইহা গণ্ডীর বাহিরে বিদ্যমান সত্যের প্রতি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিতে চায়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত সকলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে ইহাই বুঝেন, যে আমরা যাহা কিছু জানি বা বুঝি, তাহা হইতে অতিরিক্ত বুঝিবার বা জানিবার বড় আর কিছুই নাই। সম্প্রদায় মাত্রেরই রক্ষণশীলতা প্রশংসনীয় হইলেও বাহিরের সত্যের প্রতি রুদ্ধ-দৃষ্টি ইহার মহৎ দোষ। উহা যে অনেক সময়ে প্রকৃত সত্যভাবের বিকাশের বিরোধী

---

* স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবন বৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়" নামে একখানি পুস্তক মহর্ষির জীবদ্দশাতেই মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা আদি-ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য। উক্ত গ্রন্থে ঈশানবাবু সংক্ষেপে মহর্ষি চরিত্র বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন।

তাহা নহে, উহা নবনব সত্যের আগমন পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়।

আমাদিগের পরস্পরের প্রতি উদারভাবে অবলোকন করিতে হইবে, পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে; তাহা যদি না করি ধর্মরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে না। যখন আমরা শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে বসিয়াছি, তখন বিগত-বিবাদ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ধীরভাবে সত্যের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। দুইখানি বাষ্পরথ একই স্থান হইতে একই পথ ধরিয়া একই দিকে প্রথমে নিক্রান্ত হইল। ক্রমিকই অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমবক্র বিভিন্নপথে পরিচালিত হইয়া যখন একখানি বাষ্পরথ দূরে নীত হইল, তখন বুঝা গেল যে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। একই মূল ধরিয়া লইয়া সকল ধর্মের স্ফুরণ, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের মধ্যে এতই পার্থক্য আসিয়া দেখা দেয়, যে তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে না।

যাঁহারা জগৎব্রহ্মবাদ মায়াবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতের সিদ্ধান্ত দেখিয়া একেবারে মর্মাহত হইয়া পড়েন, উপাস্য উপাসকের ভেদ-রাহিত্যে মুহ্যমান হয়েন, তাঁহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ন্যায়দর্শনের ২য় অধ্যায়ের ৬৪ তম সূত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্থলে বলিতেছেন "যাষ্টিকাং ভোজয় অর্থাৎ যষ্টিকরা সহচরিতং ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি গম্যতে, তথৈব তৎব্রহ্মসহচরিতস্বমসীতিঅবগন্তব্যং, তথা অহং ব্রহ্মাস্মীত্যত্রাহং ব্রহ্মসহচরিতোবা ব্রহ্মস্থঅস্মাতি বিজ্ঞেয়োঽর্থঃ, অর্থাৎ "যাষ্টিককে ভোজন করাও" ইহার অর্থ যষ্টিধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও, বুঝিতে হইবে। অহং ব্রহ্মাস্মি ইহার অর্থে আমি ব্রহ্মের সহিত রহিয়াছি, আমি ব্রহ্মস্থ ইহা বুঝিতে হইবে। আমি ব্রহ্ম এ কথা বুঝিলে চলিবে না।

বেদের সময়ে প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরের সন্দর্শনলাভের চেষ্টা রহিয়াছে। উপনিষদের ভিতরে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভের উপদেশ রহিয়াছে। বেদান্তের ভিতরে যতই কেন জটিলতা থাকুক না, তাহার প্রাণের কথা এই যে ব্রহ্ম যে ভাবে সত্য, কি না অবিনশ্বর, বাহ্যজগৎ সে ভাবে সত্য নহে। বাহ্যজগৎ ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল। উহাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার জন্য এবং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য বেদান্তের মায়ার কল্পনা। সংসার মায়াময় নিতান্তই অনিত্য; সর্পেতে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, এই জগৎ সেইরূপ অবাস্তব কিন্তু সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে ইহাই বুঝাইবার জন্য বৈদান্তিকগণের নিদারুণ চেষ্টা। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদান্তিকগণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আহারে ব্যবহারে শয়নে উপবেশনে একদিনের জন্য বাহ্য জগৎকে মিথ্যা বা মায়াময় বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পান নাই।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলকামনার বহুলতা, ইহকালের দানধর্মব্রতাদির অব্যবহিতফলে পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের অতিলোভ যখন জ্ঞানোন্নত সাধকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতে গিয়া হার মানিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই অবসরে বৌদ্ধধর্ম বাসনা-নিবৃত্তির উপদেশ দিতে আবির্ভূত হইল। বৈদান্তিকগণের কর্মবিমুখতা যখন মনুষ্যকে নির্বীর্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যখন তাহা চরমে যাইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহারই বিরুদ্ধে গীতার ফলকামনারহিত কর্মবাদ চারিদিক হইতে বিঘোষিত হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যখনই প্রচলিত কর্মের একদিক নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া আইসে, নদীতে ভাসমান নৌকার মত একপেষিয়া হইয়া ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখনই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নূতনভাবের নূতন মতের সংযোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পবিত্রতা আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ প্রভৃতির নামান্তরই ধর্ম। এই পবিত্রতা আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের ভাব অল্পাধিক পরিমাণে সকল ধর্মেরই মধ্যে বিদ্যমান। প্রচলিত ধর্মের গাত্রে অজ্ঞানজাত কালিমা ধৌত করিতে হইবে, হৃদয়ের কোমল ভাবের উদ্বোধনে জ্ঞানের আলোকে উহা নিষ্কলঙ্ক বিকশিত পরিস্ফুট সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই সংস্কারের প্রয়োজন। প্রচলিত ধর্মকে বিনাশ না করিয়া সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তুলাই হইল আমাদের কার্য্য।

আমাদের উপরে পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব বহুশতাব্দী ধরিয়া যে কার্য্য করিতেছে, উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, ঈশ্বরকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তাঁহাকে আমাদের নিত্য সঙ্গী করিবার জন্য, সম্পদের সৌভাগ্য বিপদের কাতরতা তাঁহার চরণে নিবেদন করাইবার জন্য, প্রতিদিনের শাকান্ন তাঁহাকে অর্পণ করিয়া দেবপ্রসাদ রূপে তাহা ভোজন করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য, মূর্ত্ত্য দেবতার পূজা—সাকারবাদ এ দেশে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরকে সসীম করিয়া, তাঁহার প্রতি মানবোচিত পূজা অর্পণ করিতে গিয়া, পশুরক্তে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া, পুত্র কলত্র তাঁহাতে আরোপ করিতে যাইয়া আমরা তাঁহার দেবত্বকে এতই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি যে বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত সময়ে আমাদিগকে কষ্টসাধ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণ গৃহীত গ্রহণ করিবার

কি কিছুই নাই। এতই সামগ্রী রহিয়াছে যাহা অন্যত্র নিতান্ত বিরল।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে থাকিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড় কঠিন। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম লইয়া ধর্ম্মের কলেবর গঠিত। যে ধর্ম্মে এ তিনেরই সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, তাহাই সমুন্নত সাধক ও ভক্তের অবলম্বনীয় প্রকৃত ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এই তিনেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে জ্ঞানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে, কাহারও ভিতরে প্রেমের আধিক্য, কাহারও ভিতরে কর্ম্মের অর্থাৎ লোক হিতব্রতের আধিক্য আমরা সন্দর্শন করিতেছি। কেহ বা জ্ঞানের, কেহ বা সমাজ সংস্কারের পতাকা-বাহী হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও বিভিন্ন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোক আমরা মূলে এক। সাবধানে থাকিতে হইবে যাহাতে কর্ম্ম বিপুলভাব ধারণ করিয়া তাহার প্রবল তরঙ্গ ছুটাইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানকে প্লাবিত করিয়া না দেয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও তাহার প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা যেন আমারা সকল সময়ে স্মরণে রাখি। সত্যের জ্যোতি আসিয়া যাহাতে ইহাকে স্ফুটতর ও বিমলতর করিয়া তুলিতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্প্রদায় মাত্রেরই যাহা কিছু নিজস্ব কেবলমাত্র তাহা লইয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি বিমুখ হইয়া স্থিরভাবে থাকিলে চলিবে না। আধ্যাত্মিক সত্যের নব দিবালোকের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যমতাবলম্বী সম্প্রদায় সকলের সহিত কলহের সূত্র পাত করিলে সম্প্রদায়গত অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা ক্রমিকই বর্দ্ধিত হইয়া যায়, পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; সত্যের যে মূলসূত্র যাহা সকল ধর্ম্মের ভিতরে বিরাজমান, তাহার উপরে লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইবার আশা ক্রমিকই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা আমাদের কল্যাণ ভাবিয়া সর্ব্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আজি আমরা ঈশ্বরের একত্বের স্থলে বহুত্বের স্থাপনা করিব, ঈশ্বরের সামীপ্য সহজে বুঝিবার জন্য মৃৎপাষাণে অশরীরী ঈশ্বরের আবাহন করিয়া তাঁহাকে একস্থানস্থায়ী করিয়া তুলিব। তাঁহারা একথা একবারও মনে স্থান দেন নাই যে আমরা বলিয়া উঠিব যে ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নহেন, নিরাকারের আবার সাধনা কোথায়? নিখিল ভুবন ঈশ্বরের সত্বাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া এবং আপনাকে তাঁহাতে নিমজ্জিত দেখিয়া যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তাঁহারা মনেও ভাবেন নাই যে আমরা বলিতে থাকিব তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম, স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য নাই। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই তাঁহার পথের যাত্রী, সকল ধর্ম্মের গোড়ার কথা এক, বিকাশ বিভিন্ন দিকে, কোথাও বা সত্যের আভা যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়াছে, কোথাও বা তাহা ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে, ইহা বুঝিয়া সকলেরই সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে হইবে, সকলেরই মধ্যে সত্য পরিবেশন করিতে হইবে ইহাই আমাদের কার্য্য, ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

আত্মাবমাননা।

ঋষিরা বলে গেছেন "নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভি-রসমৃদ্ধিভিঃ—পূর্ব্বের সমৃদ্ধি লাভ কর নাই বলে আপনাকে অবজ্ঞা করবে না। আজ বৎসরের প্রথম ভাগে এই উপদেশ বড়ই উপযুক্ত। হতে পারে যে গত বৎসরে আমরা কোন ধনই সঞ্চিত করতে পারি নি, তার জন্য নিজেকে অবজ্ঞা করব কেন? আজ এই মুহূর্ত্তে দেখছি বুঝছি যে গত বৎসর কিছুই সঞ্চয় করতে পারি নাই—ভাল, এবৎসর এই মুহূর্ত্ত থেকে আবার ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করব। ধন বলতে যে কেবল সংসারের উপযোগী টাকাকড়ি বুঝতে হবে তা নয়। এই উপদেশ যেমন সংসারের টাকাকড়ি সঞ্চয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে, সেইরূপ ইহা মনের জ্ঞানধন সঞ্চয় এবং আত্মার ভক্তিধন সঞ্চয় সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযুজ্য।

আত্মাকে অবজ্ঞা করার অর্থ এই যে আমার নিজের দুরবস্থা দেখে দুঃখিত হওয়া। আমার টাকাকড়ি নেই, তাই লোকে আমাকে ভালবাসে না, আমাকে বুঝতে পারলে না, এই রকম ভেবে কাঁদতে বসার নাম আপনাকে অবজ্ঞা করা। আমার মনে হচ্ছে আমি মস্ত জ্ঞানী, মস্ত ধার্ম্মিক, অথচ দেখছি যে কেহই আমার দিকে দৃক্‌পাত করছে না, কেহ আমাকে জ্ঞানী বলে নিচ্ছে না, ধার্ম্মিক বলে চিনছে না। তখন আমার নিজের উপর ধিক্কার আসে, আর আমি কাঁদতে বসি।

আমি যখন আমার মূল্য কেহ বুঝতে পারলে না বলে কাঁদতে বসি, তখনি সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কারণও খুঁজতে থাকি। কারণ খুঁজে পেতে বড় বিলম্ব হয় না। আমি ঠিক ধরে নিই যে লোকেরা হিসাবে আমার মূল্য

বুঝতে চায় না। আমার মনে হয় যে আমার গুণসকল জেনে বাক্ত করলে পাছে লোকেরা আমার চেয়ে নীচে আছে দেখায় তাই তারা আমার গুণগান করতে চায় না আমি যখন আপনাকে ধিক্কার দিই তখন আসলে নিজেকে মস্ত বড় করে দেখি। নিজেকে সূর্য্যসম বৃহৎ ভেবে নিই, আর মনে মনে স্থির করি যে জগতের আর যত লোক আছে সকলেই গ্রহউপগ্রহের ন্যায় আমারই চারধারে ঘুরতে থাকবে, আমারই কথা, আমারই কার্য্য অনুসরণ করতে থাকবে। এটা তখন বুঝতে পারি নে যে আমি নিজে গর্ব্বের ফলে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছি।

আত্মধিক্কারের ফলে হয় এই যে, অজ্ঞাতসারে অন্য সকলের প্রতি একটা অন্যায় ঘৃণা এসে আমার হৃদয়কে অধিকার করে। যাদের সঙ্গে আমি মিশব, যেই দেখি যে তারা আমার ইচ্ছামত আমাকে সম্মান দিচ্ছে না, অমনি তাদের মতামতের উপর একটা উপেক্ষা আসে, ক্রমে তাদের উপর একটা করুণা আসে, আর ক্রমে ক্রমে তাদের উপর একটা মর্ম্মান্তিক ঘৃণা আসে। আর এই রকম ভাব যে আসে, তা এত ধীর পদক্ষেপে যে, অনেক সময়ে সেই সকল ভাবের উপস্থিতি বুঝতেই পারা যায় না। কিন্তু এটা স্থির যে এই সকল ভাবকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমে। এদের শিকড়জাল হৃদয়কে এমন জড়িয়ে ফেলে যে তা থেকে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে।

নিজেকে ধিক্কার দেবার পরিবর্ত্তে, অপরের উপর ঘৃণাবিষ ঢালবার পরিবর্ত্তে, জীবনসংগ্রামে যে সকল আঘাত পাব সেগুলিকে ভগবানের দান বলে, শিক্ষার উপকরণ বলে কি নিতে পারব না? আমাদের জীবন সীমাবদ্ধ জীবন। জীবনের প্রত্যেক বিষয়েই প্রত্যেক পদে সীমা। আর সেই সকল সীমা অতিক্রম করবার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়, সেই সংগ্রামই তো জীবন। এই পৃথিবীতে সংগ্রাম ব্যতীত কি এক পা-ও চলতে পারি? প্রতি মুহূর্ত্ত যখনি চলে যাচ্ছে, তখনি সেই মুহূর্ত্ত পরমুহূর্ত্তের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে যাচ্ছে। আর এই প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের যে সংগ্রাম তাকেই তো আমরা জীবন বলে উল্লেখ করি।

এই জীবন আমাদের একটি মহান অধিকার জীবন-সংগ্রামে প্রবিষ্ট হয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এবং আবশ্যক হলে সেই যুদ্ধে আঘাত পেয়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়া মানবজন্মের সার্থকতা এবং সুমহান অধিকার। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং—যুদ্ধে যিনি ভীত হন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হন না, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হন, তাঁর দ্বারা তিন লোক জিত হয়েছে। অন্যায়াচরণ নিবারণ করে ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলে। ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। ধর্ম্মযুদ্ধের ভাণ করে আত্মম্ভরিতাকে তৃপ্ত করতে যাবে না, কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীত ও পরাঙ্মুখ হবে না।

সংসারের মধ্যে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে যে কষ্ট পেতে হবে এটা তো স্বাভাবিক। আমি যে বেঁচে আছি, ঐ কষ্ট পাওয়াই তো তার প্রমাণ। যে মরে গেছে সে কি কষ্ট পায়? কষ্ট সহ্য করা জীবনেরই ধর্ম্ম। যে কেহ বাঁচতে চায় ও জগতে কাজ করে যেতে চায়, সেই বাঁচতে গেলে এবং কাজ করতে গেলে যে গুরুতর শিক্ষা পাই, কষ্ট পাওয়া সেই শিক্ষারই তো একটি অঙ্গ। বেঁচে থাকা, বাঁচতে পারাই যে জগতের একটা মহান কাজ।

এই শিক্ষার ভাব ছেড়ে দিয়ে মুহ্যমান হয়ে থাকা এবং মুহ্যমান হয়ে আছ এই কথা নিজের কাছে স্বীকার করা, এইটিইতো মহা পরাজয়। এ পরাজয় স্বীকার করব কেন? যতক্ষণ মাংসপেশীতে বল আছে, যতক্ষণ ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি থেকে জ্ঞান অর্জ্জনের ক্ষমতা আছে, যতক্ষণ সেই মহান পুরুষকে হৃদয়ের মধ্যে দেখবার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ আপনাকে ধিক্কার দেয় কেন? আমার নিজের পায়ের উপর কি দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই যে আমি পরাজয় স্বীকার করব, আর নিজেকে ধিক্কার দেব আর কাঁদতে থাকব?

মানুষের কাজই হচ্ছে বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করা, আপনার বলের উপর দাঁড়ানো, এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতার উপরে ওঠা। মানুষ যখন নিজের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করে, তখনই সে নিজেও বলিষ্ঠ হতে থাকে এবং তখন সমস্ত জগতই তার বলবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে। তুমি নিজে মুহ্যমান হয়ে থাক, আশ্চর্য্য এই যে তোমার চতুর্দ্দিকের প্রকৃতিকেও মুহ্যমান দেখবে এবং ক্রমে তোমার মোহ-ভাব বাড়বে বৈ কমবে না। আবার তুমি বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ হও, তোমার চতুর্দ্দিকের প্রকৃতিও হাসিমুখে তোমার বলসাধনে উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবে। তুমি ক্ষুদ্রতার মধ্যে বাস কর, যেখানকার যত ক্ষুদ্র ভাব সকলই খুঁজে খুঁজে তোমারই কাছে আসবার চেষ্টা করবে। তুমি ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে উপরে ওঠ, যেখানকার যত ভাল ভাব সমস্তই তোমারই সেবায় নিযুক্ত দেখতে পাবে।

আত্মাবমাননা, আপনাকে ধিক্কার দেওয়া, আপনার দীনতার জন্য দুঃখ করা একটী রোগ বিশেষ। কেবলই নিজের বিষয় ভাবলে এবং কাল্পনিক অপমান ও তাচ্ছিল্যের জন্য কেবলই হাহুতাশ করলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগের ফলে হয় এই যে, আমরা যদি কোন কার্য্যে বিফল হলুম, সেই বিফল

করবার দোষ দিই অন্যের স্কন্ধে। কিসে সেই কাজ সফল হতে পারে, সেই রকম উপায় অবলম্বন করবার চেয়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপানো খুবই সহজ। তাই বিফলকাম হলে আমাদের নিজেদের দোষের প্রতি দৃষ্টি-পাত করতে ইচ্ছা করিনে। তখন কেবল মনে করে দুঃখে মুহ্যমান হই যে আমাকে কেহই চিনলে না, এবং যাকে কাছে পাই তারই একরত্তি সহানুভূতি পাবার আশায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে অন্যের দোষে বিফল হয়েছি।

কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে এই অবস্থায় মানুষের কাছে সত্যিকার সহানুভূতি পাবার আশা বৃথা। তুমি যার কাছে কাঁদবে, সে অবশ্য মুখে তোমার সঙ্গে দুচার কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করবে, কিন্তু মনে মনে তারা তোমার দুঃখে কষ্ট অনুভব করবে না। তার প্রমাণ এই যে তুমি যদি কয়েকবার তোমার দুঃখ কাহিনী কারো কাছে বলতে থাক, তাহলে তোমার বন্ধু শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে উঠবে। সংসারে প্রত্যেকের এত কাজ পড়ে আছে যে কেহই নিজের নিজের কাজ জীবনে শেষ করে উঠ্‌তে পারে না; তার উপর আবার বন্ধুবান্ধবের কাল্পনিক দুঃখ কাহিনী শুনতে গেলে জীবনের কোন কাজই করে ওঠা যায় না।

নিজের দীনতার জন্য নিজেকে অবজ্ঞা কোরো না। অন্যের ঘাড়ে কখনো দোষ চাপাতে ইচ্ছা কোরো না। নিজের অদৃষ্ট মন্দ বলে মুহ্যমান হয়ো না। বাক্যকে সংযত করবে, চক্ষুকে উন্মুক্ত রাখবে এবং নিজের মাথা তুলে চলবে। পৃথিবী থেকে সর্ব্ববিধ দারিদ্র্যদুঃখ দূর করা আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য জানবে। যদি তোমার উপর কেহ কোনপ্রকার অন্যায় করে থাকে, তবে ভগবানের মঙ্গলবিধানে যথাসময়ে তার প্রতিবিধান হবেই হবে। এই পৃথিবীতে, এটা স্থির জেনো যে আমাদের যার যা প্রাপ্য তা আমাদের পেতেই হবে এবং আমাদের যা দেয় তা দিতেই হবে। জীবন সংগ্রামে যে আঘাত পাবে তা বুক পেতে গ্রহণ কোরো, সেই আঘাতের জন্য কেঁদো না—তোমার বক্ষস্থল দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এইটুকু স্থির জেনে কাজ করতে থেকো যে সংসারের পরপারে—যেখানে যাবার জন্য আমরা অবিশ্রামে চলেছি—সেই সংসারের পরপারে কেবলি শান্তি পাবে; সেখানে বিঘ্নবিপত্তি কিছুই নেই; সেখানে কোলাহল নেই, সংগ্রাম নেই। এখানে ঈশ্বর সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি হতে রক্ষা করে আমাদিগকে যে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাতেই আমরা ধন্য হয়েছি। তুমি নিজেকে প্রতারিত কোরো না, কেহই তোমাকে প্রপ্রবঞ্চনা করবে না। সংসারে তোমার উপযুক্ত বিস্তর কাজ পড়ে আছে—উত্থান কর, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। নিজের দীনতা প্রচার করতে যেয়ো না। ভগবানের উপর কর্ম্মফল সংন্যস্ত করে প্রশস্ত হৃদয় লয়ে কর্ম্ম কর এবং আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ। নিজের সম্মান তোমার নিজের হাতে। এই ভাবে কাজ করলে ঈশ্বরের অপরিমেয় বল তোমার সহায় হবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথঠাকুর।

স্বাস্থ্যোন্নতি।*

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম্, এ, এম্, ডি, লিখিত—

(বৈশাখ মাসের স্বাস্থ্যসমাচার হইতে উদ্ধৃত।)

আমাদের দেশের লোক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যে এত উদাসীন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বাস্থ্য-তত্ত্বে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্য ভঙ্গের অনেক কারণ আছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞানার্জ্জনের কোন কথাই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্তপুরুষগণকেও কোন দিন স্বাস্থ্যতত্ত্বের এক বর্ণও শিখিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের দেশীয় লোকেরা কতক শাস্ত্রীয় অনুশাসনে কতক অভ্যাস বশতঃ অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক সময় আমরা অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করি। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে সজীব করিয়া তুলিতে পারে না। কাজেই যখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমরা তাহা বুঝিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। আমাদের পুরাতন দেশ ও পুরাতন জাতি এখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যহ অগ্রসর হইতেছে। কি নিয়মে আমরা এই সকল বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি, তাহা না জানিলে আমরা কিছুতেই এ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে পারিব না।

---

* বঙ্গীয়-হিতসাধন মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে (১০ই চৈত্র ১৩২১) পঠিত।

নানা কারণে ভারতবাসীর স্বাস্থ্য যেরূপ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাতে এরূপ প্রবন্ধ সকল যে বর্ত্তমান কালের বিশেষ উপযোগী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান কালের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমরা ইহাতে উদ্ধৃত করিলাম। তঃ সঃ।

বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ৪৫৩২৯২৪৭। ১৯১৩ সালে তন্মধ্যে ১৩৪৯৭৭৯, জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যেক হাজারে মৃত্যু সংখ্যা ৩০। জন্মের সংখ্যা গত বৎসর ১৫২৯৯২১ অর্থাৎ হাজারে ৩৩·৭৮। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা ১৯৮০৫৩ অধিক।

শিশুদের মধ্যে ৩২০, ৬৬২টীর অর্থাৎ যত শিশু জন্মায় তাহাদের শতকরা ২০.৯৫টীর মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক শিশুর মৃত্যু অতি অল্প দেশেই আছে।

উপরিউক্ত মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ৯৬৫,৫৪৬টী মৃত্যুর কারণ জ্বররোগ। (২১.৩০ হাজার করা) অর্থাৎ সমস্ত মৃত্যু সংখ্যার প্রায় শতকরা ৭২টীর কারণ জ্বররোগ। ইহাদের মধ্যে ২৫,৬৬৭টী সহরে বাকী ৯৩৩,৫২৪টী পল্লীগ্রামে।

৩৩,১৯৫টী মৃত্যুর কারণ উদরাময় ও অতিসার ১২০৬৩টীর কারণ শ্বাসযন্ত্রের রোগ। এই জাতীয় রোগের সংখ্যা সহরে বেশী।

৭৮৪৯৪টীর মৃত্যুর কারণ কলেরা।

এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগে ৯,০৬২ ও প্লেগরোগে ৯৮৪টীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ কলেরা, জ্বর বসন্ত, প্লেগ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—

এদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই রোগের বীজাণু comma bacillus (Koch)। আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগীর মল মিশ্রিত থাকিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। Koch প্রথমে বেলেঘাটার একটি পুষ্করিণীর জলে এই বীজাণু প্রাপ্ত হন। কোন কলেরাগ্রস্ত রোগীর মল দ্বারা দূষিত কাপড় ঐ পুষ্করিণীতে ধোয়া হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরে এক রেজিমেণ্টের ফিল্টারের বালি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বালি নদীতল হইতে আনাইয়া দেওয়া হয়। ঐ বালি কলেরা মল দ্বারা দূষিত ছিল। ঐ রেজিমেণ্টে অনেকের কলেরা হয়। সকলেই জানেন বড় বড় মেলার স্থানে অনেকের কলেরা হয়। পূর্ব্বে সেখানে কলেরা বীজ থাকে না। কোন যাত্রী এই রোগ বহন করিয়া এই সকল স্থানে যায়। মাছি ইহার আর একটী বাহক। তাহারা যে কেবল পায়ে করিয়া এই বীজাণু মল হইতে লোকের আহার্য্য দ্রব্যে বহন করে তাহা নহে। তাহাদের নিজের মলেও এই বীজাণু অনেক পাওয়া যায়।

কোন সহরে জলের কল নূতন খোলা হইলে অনেক দিন সেখানে কলেরা থাকে না। কলের জল, কলেরা রোগের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থাই কলেরা রোগ নিবারণের প্রধান উপায়। এতদ্ভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য এবং দুগ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ফুটাইয়া আহার করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্রই করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের প্রায় ৯৬৫০০০ লোক প্রতি বৎসর জ্বর রোগে মারা যায়। ইহাদের মধ্যে (৪৮০০০০) অধিকাংশই (অন্ততঃ অর্দ্ধেকের কারণ) ম্যালেরিয়া জ্বর। অন্ততঃ পক্ষে ১০ জনের এই রোগ হইলে একজন মারা যায় সুতরাং প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অর্থাৎ এই দেশের প্রায় প্রত্যেক ৯ জনের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত। যদি আমেরিকানদিগের ন্যায় আমাদের সকল বিষয়ে হিসাব ঠিক থাকিত তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম যে এই রোগে প্রতি বৎসর আমাদের কত লোকসান।

এই সকল মৃত্যুতে লোকের কষ্ট ত আছেই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানব জীবনের একটা আর্থিক মূল্য এখন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারিত করেন। কোন ব্যক্তির উপার্জ্জন ক্ষমতা কত এবং তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কত দিন, এই দুইটি অঙ্ক লইয়া ঐ ব্যক্তির জীবনের আর্থিক মূল্য স্থির করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মিঃ ফার (Farr) হিসাব করিয়াছিলেন যে একটী নবজাত কৃষকসন্তানের জীবনের মূল্য ৫ পাউণ্ড। আমেরিকার ফিষার (Fisher) যুক্ত রাজ্যের অধিবাসীদিগের জীবনের মূল্য গড়ে ৫৮০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। নিকলসন্ ইংলণ্ডের এক একটী লোকের জীবনের মূল্য স্বদেশের পক্ষে ১০০০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আমরা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও মাতৃভূমির পক্ষে এক এক জনের জীবনের মূল্য গড়ে উহার ৩০ ভাগের একভাগ ধরিয়া লইতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।

ম্যালেরিয়াতে বৎসর বৎসর যে ৪৮০০০০ মারা যায় তাহাতে আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতে গণনা করা যাইতে পারে। একটি জীবনের মূল্য ৫০০ টাকা হইলে ৪৮০০০০এর অর্দ্ধেক ২৪০০০০ উপার্জ্জনক্ষম লোকের জীবনের মূল্য ১২০০০০০০০ বার কোটী টাকা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগ আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিতেছে।

এই রোগের কারণ যে কি তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এক রোগী হইতে এই বীজ অন্য রোগীতে সংক্রামিত হয়, কোন কোন জাতীয় মশা এই সংক্রমণে সাহায্য করে। ইহার কারণ কেবল যে ঐ সকল মশা তাহা মনে করিলে চলিবে না, যে কোন অবস্থা উহাদের দ্বারা এই সংক্রমণের সাহায্য করে সে সকলই ইহার

গৌণ কারণ। ছোট ছোট পুরাতন অপরিষ্কার পুষ্করিণী ডোবা, খানা বিল, নদীর কোল, পুরাতন নদীর স্রোত-হীন অবশিষ্ট ভাগ, পুরাতন পাতকুয়া এমন কি গামলার পচা জল ও ফুলগাছের টব, গোষ্পদের জল এই সকল মশার ডিম পাড়িবার স্থান, আর বন জঙ্গল বা কোন অন্ধকারময় স্থান ইহাদের বাসস্থান। আমাদের পল্লী-গ্রামের এক একটী গোয়াল ঘরে শত শত ম্যালেরিয়ার বাহন মশা পাওয়া যায়। তার পর আবার আমাদের এই উর্ব্বরা জমিতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত ভাল না থাকায় বন জঙ্গল খুব সহজেই বাড়িয়া যায় আর ছোট ডোবা, খানা, শীঘ্র শুকায় না।

আবদ্ধ জল, বন, জঙ্গল, ম্যালেরিয়াকে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ প্রত্যেক বাটীর নিকটে নানা প্রকার ময়লা ম্যালেরিয়ার সাহায্য করে।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালা যায় সেইরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এক রোগী হইতে, মশা ম্যালেরিয়া বীজ অন্য রোগীর শরীরে বপন করে মাত্র। ইহা ত আর কোথাও জন্মে না, আর মশা নিজেও কিছু ইহা প্রস্তুত করে না। সুতরাং পূর্ব্বকার এক রোগীই ভবিষ্যতের অপর রোগীর রোগের কারণ।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয়।

১। যাহাতে লোকের বসত বাটীর সন্নিকটে অর্থাৎ ১০০ গজের মধ্যে ম্যালেরিয়া বাহক মশা ডিম পাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সকল বাটীর নিকট যে সকল ছোট ছোট ডোবা, খানা, গর্ত্ত, পানা পুষ্করিণী, পুরাতন পাতকুয়া প্রভৃতি থাকে, তাহাতে একটু জল জমিয়া থাকিলেই মশার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়। এজন্য এইগুলি সব ভরাট করিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

২। বাটীর নিকটে যে সকল ঝোপ জঙ্গল থাকে তাহা মশাদের আশ্রয় স্থান। ইহারা কোন প্রকার একটু থাকিবার স্থান পাইলেই সেখানে আশ্রয় লয়। এজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা আবশ্যক। জঙ্গল থাকিলে জমীর জল নিকাশ কখনও ভালরূপ হয় না।

৩। জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত। অনেক স্থানেই পল্লীগ্রামের নিকটস্থ খাল, নদী, মজিয়া যায়, এবং অনেক স্থানেই জল আবদ্ধ হয়। নদী নালা খালের উপর দিয়া অপ্রশস্তভাবে রেলওয়ে রাস্তা বা অন্য কোন রাস্তা নির্ম্মিত হইলে জল আবদ্ধ হয়।

৪। ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগুলিকে কুইনাইন সেবন করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদের শরীর হইতেই বীজ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। তাহা-দের শরীরেই এই বীজ যদি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। এ বিষয়ে কুইনাইন আমাদের প্রধান অস্ত্র। উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইলে ম্যালেরিয়া দমন সুনিশ্চিত।

পল্লীগ্রামের পক্ষে যেমন ম্যালেরিয়া, সহরে তেমনি যক্ষ্মারোগ। নানা কারণে এই রোগ দিন দিন আমাদের ভিতর বদ্ধমূল হইতেছে। এই সহরে বৎসর বৎসর প্রায় ২৩ শত লোক এই কারণে মারা যায়। একটী কথা এই যে এই রোগ নির্ধন মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র পরিবারের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানা প্রকার কারণ একত্র হইয়া এই কুফল আসিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক সামাজিক, এবং কতক আর্থিক। নানা কারণে পল্লীগ্রাম হইতে অগণ্য লোক কলিকাতায় আসিতেছে। যৎসামান্য আয়ে এখানে খুব কষ্টে বহুলোক পরিপূর্ণ ছোট ছোট অন্ধকারময় অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে হয়। এক অন্নের অভাব, তাহার উপর আবার পরিষ্কার বাতাসটুকু নাই। প্রথমেই দেখা যায় স্বার্থত্যাগ ও ধৈর্য্যের প্রতিমা স্বরূপিণী আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ রোগ বড়ই বৈষম্যবাদী; ধনী ও দরিদ্র রোগীর প্রতি ইহার প্রকোপের বিশেষ তারতম্য আছে। যদি এই সমিতি চেষ্টা করিয়া আমাদের বঙ্গসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগের এই রোগ নিবারণের কিছু সদুপায়ও করিতে পারেন তবে ইহার জন্ম সফল হইবে। কিন্তু এই প্রশ্ন কিছু জগতের সম্মুখে নূতন নহে। প্রত্যেক বড় বড় সহরেই এই প্রশ্ন আছে। লণ্ডন, পারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন এ সকল সহরে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা কতই কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে গত ২ বৎসর হইতেও এই রোগ নিবারণের জন্য সমবেত চেষ্টা হইতেছে। আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। ইহাতে অর্থের আবশ্যক আছে সত্য; কিন্তু সমবেত উদ্যম ও চেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস মিলিত হইলে আর্থিক অভাব কোথায় চলিয়া যাইবে তাহা কে জানে।

আধুনিক বিজ্ঞান সঙ্গত উপায়ে উপযুক্ত লোকের সমবেত চেষ্টাদ্বারা স্বাস্থ্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে প্যানেমা নগর ও প্যানেমা যোজকের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই নগর প্যানেমা খালের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকের মোহানার নিকট অবস্থিত। লোক সংখ্যা প্রায় ৩৭০০০। ১৯০৪ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই নগর পীত জ্বরের (yellow fever) মহামারি দ্বারা প্রপীড়িত হয় কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সেই মহামারিই এই নগরের শেষ মহামারি। আমেরিকানেরা এই নগরের ভার

লইবার পর ১ বৎসরের মধ্যে এই রোগ সমূলে এই সহর হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন। এখন এই সহরের অবস্থা এত ভাল যে এ রোগ এখানে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গত ৯ বৎসরের মধ্যে এক জনও এই রোগে বিনষ্ট হয় নাই। পীতজ্বর stegomyia fasciata নামক একপ্রকার মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই সহরে যাহারা উক্ত সময়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল; অথবা যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হইত তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিয়া মশার অগম্য গৃহ মধ্যে রাখা হইত। যে সকল ঘরে পূর্ব্বে এই সকল রোগী অথবা সন্দেহিত ব্যক্তি থাকিত সে সকল ঘরে মশা বিনাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ধূম ও ঔষধ বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া হইত। আর এই জাতীয় মশককে তাহাদের জন্মস্থানে মারিবার জন্য উপযুক্তরূপ সেনানী সকল নিযুক্ত করা হইত। এই সময় এই নগরের প্রত্যেক ঘরের ছাদের বৃষ্টির জল খোলা নর্দ্দামা দিয়া কতকগুলি পিপাতে ধরা হইত। ইহাই এই নগরের ব্যবহার্য্য জল ছিল। কোন প্রকার জল নিকাশের নর্দ্দামা বা পয়ঃপ্রণালী ছিল না। রাস্তা কাঁচা, সুতরাং বর্ষাকালে উহা কর্দ্দমে ভরিয়া যাইত। এই রাস্তারই ছোট ছোট গর্ত্তে এই মশা ডিম পাড়িত। আমেরিকানরা প্রথমেই কলের জল ও ডেনের পায়খানা ও পাকা ভূ-নিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করে। পরে প্রত্যেক রাস্তা পাকা করে ও তাহাতে ড্রেন বসায় এবং যত সম্ভব ছাদের খোলা নল এবং উহার জল ধরিবার পিপা দূর করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধি বদ্ধ করে। তাহাতে প্রথমে এই স্থানের লোকের মধ্যে একটু অসন্তোষ জন্মিলেও পরে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক বাটীর নিচের তালা সিমেন্ট দ্বারা ঢাকিতে হইতেছে ইহাতে ইন্দুরের বাস একবারে অসম্ভব হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে কিছু অর্থব্যয় হইয়াছে (lb455000) সত্য কিন্তু এখন ঐ সহরে আর প্লেগ, টাইফয়েড জ্বর, অতিসার, ম্যালেরিয়া, পীত জ্বর প্রভৃতি কোন জ্বরই নাই। এই ত গেল প্যানেমা নগরের কথা।

প্যানেমার যে নূতন খাল প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে একত্র করিয়াছে ঐ খাল নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে একটী ফরাসি কোম্পানী গঠিত হয়। কিন্তু তাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়াই তাহাদের অন্যতম প্রতিবন্ধক। এই স্থানটি ভয়ানক প্রবল ম্যালেরিয়ার বাসভূমি এজন্য এখানকার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপায় মশক বিনাশ। খালের দুইধারে অগণ্য জলাশয়ই ম্যালেরিয়া বাহক এনোফিলিসের জন্মস্থান। দুইটি উপায়ে এই জলাগুলিকে ভরাট করা হইয়াছে। খালের মাটি রাশি রাশি রেলগাড়িতে আনিয়া এই সকলের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, আর খালের তলদেশ আরও গভীর করিবার জন্য তথা হইতে কর্দ্দম ও বালি মিশ্রিত গাঢ় ঘোলা জল বা তরল কর্দ্দম পম্পদ্বারা শোষিত করিয়া এমন কি ১ মাইল পর্য্যন্ত দূরে নলের ভিতর দিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় জলার উপর স্থানে স্থানে অনেক মাটির রাশি এমন কি বড় বড় গাছের গলা পর্য্যন্ত এইরূপে মাটি জমান হইয়াছে। বালবোয়া নামক একটী নূতন সহর এইরূপ ভরাট জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে স্থানের মধ্যস্থল দিয়া প্যানেমা খালটি গিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ মাইল এবং প্রসার ১০ মাইল। এই পাঁচ শত বর্গমাইল স্থানে প্রায় ৫০,০০০ শ্রমজীবী ও তাহাদের স্বকীয়বর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিত। ইহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করাই প্রধান প্রশ্ন। ইহাদের জন্য প্রায় ৪০টী পল্লী গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানে জল বায়ু, আতপ ও বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ (100 in) সবই এনোফিলিসের বংশবৃদ্ধির সুবিধাজনক। এদেশে চারিমাস কাল বৃষ্টি হয় না কিন্তু তখনও খানা গর্ত্ত ডোবায় এত জল থাকে যে তাহাতে মশক সহজেই ডিম পাড়িতে পারে। অধিকন্তু এই সব শ্রমজীবীরা দলে দলে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে।

১৯০৫ হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২,৫০,০০০ লোক এই স্থানে অস্থায়ীভাবে বাস করিয়াছে। এজন্য স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্যও কিঞ্চিৎ অধিক দুরূহ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছিল:—

১। বসত বাটির ১০০ গজের মধ্যে এনোফিলিসের ডিম পাড়িবার স্থান সকল একেবারে নষ্ট করা হইয়াছিল।

২। উক্ত সীমার মধ্যে পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত মশকের সমস্ত আশ্রয়স্থান নষ্ট করা হইয়াছিল।

৩। সকল বাড়ীর দরজা জানালা তামার জাল দ্বারা মশকের অগম্য করা হইয়াছিল।

৪। যেথানে জল নিকাশ দ্বারা ডিম পাড়িবার স্থানগুলিকে নষ্ট করিতে পারা যায় নাই সেখানে কেরোসিন তৈল বা অন্য কোন ডিম্বনাশক বিষ ব্যবহার করা হইয়াছিল।

এই ৫০০ বর্গমাইল স্থানকে ১৭টি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির ভার এক এক জন পরিদর্শকের

অধীনে রাখা হয়। এই ব্যক্তি নিজ বিভাগের ড্রেণ ভরাট, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি সব কাজের জন্য দায়ী এবং সকল ঘরের জানালা দরজায় তারের জাল দিতে বাধ্য। প্রতি সপ্তাহে প্রধান আফিসে এই সকল বিভাগের রিপোর্ট আসে। যদি রোগীর সংখ্যা শতকরা ১½% অধিক হয় তাহা হইলেই কোথাও কোন ত্রুটি হইয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় এবং কর্ম্মচারিদিগকে এই কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দেওয়া হয়। এবং আবশ্যক মত স্থানে যেখানে এনোফিলিসের ডিম পাড়িবার স্থান বলিয়া সন্দেহ হয় সেখানে নূতন নূতন ড্রেণ বসান হয়। জল নিকাশের সুবন্দোবস্তই এই রোগ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া যথাসম্ভব ড্রেণ গুলি পরিষ্কার রাখা হয়, এবং আবশ্যক মত তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত মশক তাড়াইবার জন্য প্রত্যেক বসত বাটীর ১০০ গজের মধ্যে যত বন জঙ্গল থাকে তাহা পরিষ্কার করা হয়। এতদ্ব্যতীত জানালা দরজা সব তারের জাল দিয়া বন্ধ করা হয়। প্রত্যেক কার্য্য কার্য্যাধ্যক্ষের চক্ষুর সম্মুখে হওয়া চাই। তিনি এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

রোগ প্রতিষেধক রূপে কুইনাইন মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এজন্য কাহাকেও বাধ্য করা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় নূতন বসতিতে ১ম সপ্তাহে শতকরা ২৫ জনের ম্যালেরিয়া হয়, কিন্তু একমাস কি দুই মাস পরে যখন ড্রেণ গুলি সব প্রস্তুত হয় এবং বনগুলি সব পরিষ্কার হইয়া যায়, তখন রোগীর হার শতকরা ১ জন মাত্র থাকে।

প্যানামাতে উপরিউক্ত রূপ ম্যালেরিয়া নিবারক উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যে সুফল হইয়াছে তাহা কর্ণেল Gorgas এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

১৯০৪ সালে যখন যুক্তরাজ্য প্যানেমার ভার গ্রহণ করেন, ঐ স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। ৪০০ বৎসর ধরিয়া এই যোজকটীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া মনে করা হইত এবং ঐ স্থানের মৃত্যু সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। প্যানেমায় পূর্ব্বতন রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে ১০০০ নিগ্রোকে আফ্রিকা হইতে আনান হয়। ৬ মাসের মধ্যেই তাহারা সকলে মরিয়া যায়। অন্য আর একবার ১০০০ চীনাকে ঐ উদ্দেশ্যেই আনান হয়। তাহারাও ৬ মাসের মধ্যে সকলে মরিয়া যায়। এজন্য একটি ষ্টেশনের নাম মেটাচিন।

ফরাসী কোম্পানীর অধীনে ১৮৮১—৮৯ সালে মোট ২২,১৪৯ কুলির অর্থাৎ ১০০০ করা বার্ষিক ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। যুক্তরাজ্যের হাতে ভার পড়িলে পর প্রথম প্রথম প্রত্যেক হাজারে বার্ষিক ৪০ জন মারা যাইত কিন্তু এক্ষণে ৭৫০ জন মাত্র। কেবল ম্যালেরিয়া আক্রমণের সংখ্যা হাজার করা ৮২১ হইতে এক্ষণে ৮৭ হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার দ্বারা ১০০০ করা ৮২ জন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৪৫, ১৯০৮এ ২৮ জন, ১৯০৯এ ২২ জন, ১৯১০এ ১৯ জন, ১৯১১ তে ১৯ জন, ১৯১২ তে ১১ জন, ১৯১৩ তে ৮ জন মাত্র আক্রান্ত হইয়াছিল।

পীত জ্বর একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত একটিও রোগী পাওয়া যায় নাই। ইহাতে খরচ যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। অন্ততঃ মার্কিন দেশের পক্ষে সে খরচ কিছুই নহে। এই খালের নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত মোট বার্ষিক ৭৩০০০ ডলার।

Col. Gorgas এক স্থলে লিখিয়াছেন—"ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বুঝিবেন যে এই খালদ্বারা কেবল যে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা হইল এবং একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা নহে। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রমাণ হইল যে বিষুব রেখার নিকটস্থ অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানও উপযুক্ত উপায়ে মানুষের সমবেত চেষ্টায় এমন স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে যে সেখানে যে কোন স্থান হইতে ইউরোপীয়গণ যাইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারেন।

প্যানেমাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে উপায় গুলি অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি Rossএর নির্দ্দিষ্ট পুরাতন উপায়। কিন্তু এইগুলি অবলম্বন করিতে যে উদ্যম, যে ভবিষ্যৎদৃষ্টি, যে যত্ন, যে সাবধানতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যে মনোযোগ এবং প্রত্যেক "খুটিনাটি" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিবার যে সুবন্দোবস্ত তাহা আমাদের কেন সমস্ত জগতের শিক্ষার বিষয়।

ইটালিতে পূর্ব্বে অনেক স্থান ম্যালেরিয়ার বাসভূমি ছিল কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যে যে উপায়ে উহা কমিয়াছে তাহা ১৯০১ সালের ঐ দেশীয় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় আইন হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে সকল সরকারী ও সাধারণ আফিস, সকল রেলওয়ের বাড়ী, এবং সকল সরকারি কনট্রাক্টরের আফিস সমূহের দরজা জানালায় জুন হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জাল দিতে হইবে যাহাতে ঐ সকল স্থানে মশা প্রবেশ করিতে না পারে। বেসরকারি কারখানার অধিকারীরা ঐরূপে জাল দিয়া তাঁহাদের বাড়ী রক্ষা করিলে তাঁহারা Malaria fund হইতে ১০০০ ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইবেন। যতদূর সম্ভব ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের বাটির জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিবেন এবং কোন মতেই ছোট ছোট গর্ত্ত

বা ডোবার জল জমিতে দিবেন না। রাস্তা এবং খালের কণ্ট্রাক্টরগণকে এমন করিয়া মাটি কাটিতে হইবে যে, জল জমিতে না পারে এমন গর্ত্ত কোথাও না থাকিয়া যায়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ যদি কণ্ট্রাক্টরদিগের দোষ দেখিয়া উপেক্ষা করেন তবে তাঁহারা নিজেই দণ্ড পাইবেন।

পূর্ত্তবিভাগের কণ্ট্রাক্টরদিগকে স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে এই সর্ত্তে হুকুম লইয়া কাজ করিতে হইবে যে রাস্তা বা খাল প্রস্তুত করিতে যে মাটির আবশ্যক হইবে, স্বাস্থ্য-বিভাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেই তাহা লইতে হইবে এবং এজন্য যে সকল খানা খন্দ হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভরাট করিয়া দিতে হইবে। যাহারা এরূপ ভাবে ধানের চাষ করিতে পারিবেন, যে তজ্জন্য কোথাও জল জমিবে না, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এতদ্ভিন্ন সরকারি বেসরকারি সকল মনিবই নিজ নিজ অধীনস্থ সকল লোককেই কুইনাইন দিবেন। প্রত্যেক ম্যালেরিয়াক্রান্ত বিভাগে দুই মাইলের মধ্যে কুইনাইনের দোকান থাকা চাই।

এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান Surgeon Genl, Sir Pardey Lukis এ বিষয়ে সদুৎসাহে ও মহোদ্যমে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে ইংলণ্ডে একবার কলেরা রোগে প্রায় ৩৫০০০ লোক মারা যায়। সেই সময় হইতেই ইংরাজেরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল্য বুঝিয়াছেন, আমাদের প্লেগের মহামারিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বৎসরে জল নিকাশের জন্য পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপালিটিগুলি বৎসর বৎসর ৩৪। ৩৫ লক্ষ টাকা কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খরচ করেন। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য আছে। কিন্তু আমাদের ভার আমরা নিজে বহন করিতে চেষ্টা না করিলে কেহই আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না। আজ আমাদের ভাবিবার বিষয় বেশী নাই করিবার অনেক আছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করা চাই, বসত বাটীর নিকটস্থ (১০০ গজের মধ্যে) ডোবা, খানা, ভরাট করা চাই,—ছোট ছোট পগার খাল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া, জল নিকাশের সুবিধা করিয়া দেওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন যে সকল ভাই, ভগ্নীরা রোগগ্রস্ত হইবে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য কুইনাইন সেবন করান চাই। কলেরা নিবারণের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে পরিষ্কার পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা চাই এবং আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে মক্ষিকা স্পর্শে দূষিত না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। সহরে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য ধনহীন ভ্রাতা, ভগ্নীদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার মাছ ও পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা চাই। বসন্ত ও প্লেগ নিবারণের জন্যও উপযুক্ত টীকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা চাই।

সর্ব্বোপরি এই সকল উদ্দেশ্যের সফলতা সমাজের লোকের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেবা সমিতি প্রতিজ্ঞা করুণ যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানের প্রচার তাহাদের জীবনের ব্রত হইবে। একদিনে কিছু হইবে না, কিন্তু সমবেত হইয়া বদ্ধপরিকর হইয়া আমরা কাজ আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই বিধাতার কৃপায় সফল হইব।

কর্ত্তব্যের ভার কখনও মানবের শক্তি অপেক্ষা অধিক হয় না। সেবা ব্রতের শক্তির সীমা নাই। একবার ভারতের সেই অতীতের আত্মোৎসর্গময়ী শক্তির আরাধনা করিয়া, সকলে আপনাকে ভুলিয়া, সকলে একত্র হইয়া সমবেত সামর্থ্যকে পরসেবায় নিযুক্ত করিলে সব বাধা দূর হইয়া যাইবে। আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তব রাজ্যের মধ্যে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে। প্রতিকূল ঘটনার খরস্রোত পদ্মাও তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না।

আয় ব্যয়।

চৈত্র মাস, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৫

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১১৬৯ ৫৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৪৫৯।/৬
সমষ্টি	...	১৬২৮।৶০
ব্যয়	...	১০২৯॥৶/৬
স্থিত	...	৫৯৮॥৵৬

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
দুই কেতা গভর্ণমেণ্ট কাগজ

৪০০৲

সেভিংস ব্যাঙ্ক—

৪৯/০

নগদ ১৪৯॥/৬

৫৯৮॥৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫৫৫৵৯

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং
এজেণ্ট মহাশয়

২০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীকালীমোহন বসু

১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীবিপীনবেহারী দে

৶০

গচ্ছিত আদায়।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় ৩৪৩।৯

হাওলাত আদায়।

১০॥০

৫৫৫৵৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২॥৶/০
পুস্তকালয়	...	২৬।৩
যন্ত্রালয়	...	৫৭৪৸৵৬
সমষ্টি	...	১১৬৯ ৫৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৩৶/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪১৪৸৩
পুস্তকালয়	...	৮৪॥৶/৯
যন্ত্রালয়	...	১৯৬।৵০
সমষ্টি	...	১০২৯॥৶/৬

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান শক হইতে পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকরূপে এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সম্পাদকরূপে পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিলেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ,
৪ঠা বৈশাখ, ১৮৩৭ শক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক-বর্গের মধ্যে "মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং" সম্বন্ধে যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পদক" পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এবং প্রবন্ধটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে আমার নামে ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো—কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়গণ প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ,
৪ঠা বৈশাখ, ১৮৩৭ শক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তাঁরি গুণগান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১

সবে মিলে আজি একপ্রাণ হয়ে
করহ সবলে তাঁরি গুণগান।
কোটী কোটী তারা চন্দ্র সূর্য্য সবে
আমাদের গানে কর যোগদান॥

২

আকাশের মত সুরে সুরে সুরে
উঠুক গভীর হৃদয়ের তান।
কোথা হে জলধি কোথা হে ধরণি
থেকো না নীরব—গাও খুলে প্রাণ॥

৩

কোথা অভ্রভেদী হিমালয় তুমি
দাঁড়ায়ে উন্নত আসনের পরে—
সুগম্ভীর স্বরে গাও তুমি গান—
হউক ধ্বনিত শতেক কন্দরে॥

৪

কোথারে জ্বলন্ত তুমি দাবানল
দীপ্তশিরা সদা যে কর প্রার্থনা,
কোটী কণ্ঠে গাও দেবনর সাথে—
পাবে সবে তাঁর আশীর্ব্বাদ কণা॥

সন্ধ্যায় উদ্বোধন।

নিস্তব্ধ হইয়া ব্রহ্মধ্যানে বসিয়া শোন—সেই প্রেমময় প্রিয়তম আমাদিগকে তাঁহার সুমধুর আহ্বানে আহ্বান করিতেছেন। এই আহ্বান শুনিয়া কে আর সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাহে? প্রাণের প্রাণ এখন আমাদের সহিত কথা কহিতেছেন—আমাদের আর অন্য কথা কহিবার অবসর নাই। প্রাণের অন্তরে চাহিয়া তাঁহাকেই দেখ—প্রাণ শীতল হউক। আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে গেলেও যেন সেই ভাবকে পরিত্যাগ না করি। যেখানেই যাই না কেন, যে অবস্থাতেই পড়ি না কেন, সেই প্রাণের প্রাণকে অতিক্রম করিয়া যেন কোন কথা না বলি, কোন ভাব পোষণ না করি। এই ভাবে চলিতে পারিলেই আমাদের সমুদয় বিঘ্ন চলিয়া যাইবে। সেই অভয়দাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে কোন বিঘ্নই ভয় দেখাইতে পারিবে না। এই তত্ত্ব হৃদ্গত করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কলিকাতা নগরীতে এক মহান্ মন্ত্র প্রচার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এস আমরা সকলেও সেই মন্ত্রই হৃদয়ে ধারণ করি—ওঁকারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং।

আনন্দ কথা।*

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিস)

স্বর্গের বাতায়ন মাঝে মাঝে প্রশস্তরূপে উন্মুক্ত হয়, বুঝিবা মর্ত্ত্যের লোকদের সেই দিব্যধামের আভাস দিবার জন্য। সৌন্দর্য্য ও সুখের চরম আকাঙ্ক্ষা যেখানে মিটে, তাহাকে আমরা স্বর্গ বলিয়া থাকি। নিখুঁত সৌন্দর্য্য ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের আদর্শভেদে স্বর্গের ছবি আমরা বিভিন্ন প্রকারে আঁকিয়া থাকি। পরলোক কিরূপ, তাহা জানি না, আনন্দময়ী মা তাঁহার অমৃতময় নিকেতনে লইয়া কত সুখ দিবেন তাহা বলিতে পারি না। এখানে—এই ইহলোকেই যাহা পাইতেছি, তাহার আদর আমরা কয়জনে করিয়া থাকি? সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আমরা বাস করি; সুখ ও আনন্দের অবধি এখানে নাই। আমাদের সুন্দর দেবতা স্নেহভরে বলিতেছেন "দেখ এত সৌন্দর্য্য—এত সম্পত্তি—এত আনন্দ চারিদিকে ছড়াইয়াছি—এ সব তোমারি; প্রিয় সন্তান, তুমি সুখী হও"। কিন্তু আমরা কয়জন তাহা শুনি—কয়জন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে জানি বা কয়জন যথার্থ সুখী? সুখের অন্বেষণে আমরা সদাই এত ব্যস্ত যে আর সুখ সম্ভোগ করিবার অবসর পাই না। আমরা বড় অকৃতজ্ঞ। যাহা অনায়াস-লব্ধ, না চাহিয়াই যাহা পাওয়া যায়—তাহা জীবনের সহিত অভিন্ন ভাবে জড়িত হইলেও তাহার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের অভ্যাস নাই। প্রাচীন রোমীয় পণ্ডিতপ্রবর সেনেকা বলিয়াছেন—'যদি কেহ তোমাকে এক খণ্ড ভূমি দান করে তুমি তাহা বিশেষ অনুগ্রহ ভাবিবে—অথচ এই ধন ধান্যে ভরা বসুন্ধরার কথা ভাবিয়া থাক কি? যদি কেহ তোমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করে, তুমি তাহাকে পরম সুহৃদ ভাবিবে—কিন্তু স্মরণ রাখ কি যে, করুণাময় বিধাতা তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারে কত অতুল সম্পত্তি তোমার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন? যদি কেহ তোমাকে বিচিত্র কারুখচিত হর্ম্ম্য প্রদান করে—তুমি সে অনুগ্রহ লাভে আনন্দে গলিয়া যাইবে। অথচ চাহিয়া দেখ, অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত চন্দ্রাতপতলে তোমার আবাস ভূমি—এই ধরিত্রী শোভা সৌন্দর্য্যে অনুপমা। সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া যে দিবাকর তোমার প্রাসাদকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে, উহার তুলনা কি মিলে? কেন ভুলিয়া যাও যে কে তোমাকে পলে পলে নিশ্বাসবায়ু যোগাইতেছেন, কে তোমার ধমনীতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছেন, কে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার জল তোমার মুখে ধরিতেছেন? অমর লেখক রস্কিন এক স্থলে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মপ্রচারকেরা অনেকেই আমাদের নিকট ভগবানের কৃপার পরিচয় দিবার সময়, যে সকল ব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার মহিমার পরিচয় পাইয়া থাকি, তাহাদের কথাই ভুলিয়া যান। তাঁহারা নিভৃত নিলয়ে স্রষ্টার আরাধনা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু কেন তাঁহারা বলেন না, যাও, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে যাও, ভগবানকে দেখিতে পাইবে? তাঁহারা স্বার্থত্যাগের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু অসংখ্য কর্ত্তব্যরাশির মধ্যে প্রফুল্লচিত্ততার আবশ্যকতা দেখাইয়া দেন না কেন? বাস্তবিক সুখ ও আনন্দের কারণ জগতের চারিদিকে এত রহিয়াছে যে কাহারও নিরানন্দ থাকিবার অধিকার নাই। আমাদের দেবতার ভাণ্ডার অক্ষয়, এখানে সৌন্দর্য্যের লীলা এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, আমরা প্রত্যেকেই রাজার সন্তানের মত আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু আজ সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে তাহার কথা ভাবিতেও প্রাণ আতঙ্কে অধীর হয়। বীণাযন্ত্র ছাড়িয়া বাণীপুত্রগণ করাল অস্ত্র ধরিয়াছেন,—ললিতকলা শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়ান জাতিরা পরস্পরের আমূল সংহারে বদ্ধপরিকর; বিগ্রহের সহস্রমুণ্ড দানবকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার অতর্পণীয় শোণিতপিপাসা জাগাইয়া শান্তি সুখ ও আনন্দকে অশেষ লাঞ্ছনা দিয়া মর্ত্ত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত। ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন! বিশ্ববিলোড়নকারী এ ঝটিকার অবসানে আবার আকাশ জুড়িয়া শান্তির ইন্দ্রধনু আনিয়া দাও।

প্রকৃতির স্পর্শে সমগ্র জগত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হয়। প্রকৃতির সখিত্বে যাঁহারা অনুগৃহীত, নিসর্গের শোভানুভাবকতায় যাঁহারা ধনী তাঁহারা সমস্ত জগৎকে প্রেমের চক্ষে দেখেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কি বস্তু তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝানো অসম্ভব, বাস্তবিক অনেকেই সৌন্দর্য্যের দ্বার দিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন। সে হৃদয় বড়ই দীন যাহাতে সৌন্দর্য্য বোধ নাই। সে কি দুর্ভাগ্য যাহার হৃদয়কে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মোটেই স্পর্শ করিতে না পারে। নবোদিত সূর্য্যের কিরণমালা বা বিদায়োন্মুখ রবির বিষাদমাখা রূপের ছটা, উষার হাসিমুখ বা গোধূলির ম্লান মাধুরী, নিবাতনিশ্চল সাগরের শান্তিময়ী গাম্ভীর্য্য বা ঝটিকাহত প্রলয়পয়োধির উচ্ছ্বাস, কুসুমের হাসিরাশি, কিম্বা পাখীর সুস্বরলহরী, এ সকলই তাহার পক্ষে বৃথা হয়; স্বর্গ মর্ত্ত্যের সকল সৌন্দর্য্য সে হৃদয়ের পাশ দিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়, সে গৃহের অর্গল [illegible] এমন দারিদ্র্য যার হৃদয়ে, সে যথার্থই কৃপার পাত্র। শুষ্ক

* নববর্ষ উপলক্ষে 'আনন্দ সভা'য় পঠিত।

হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান দুর্দ্দশার কথা এই যে, অহা ক্রমশঃ গুরুতর হইতে থাকে, অথচ সে হৃদয়ের অধিকারী এই পাষাণ প্রকৃতির কথা বুঝিতে পারে না।

প্রকৃতি পাঠে হৃদয় সরস হয়। প্রকৃতিকে প্রেম করিতে জানিলে প্রচুর প্রতিদান মিলে। যে দিকে চাও, প্রকৃতি হাঁসিমুখে অঙ্গুলীনির্দ্দেশে আনন্দ আরাম ও শান্তির রাজ্যই দেখাইয়া দিবে। বসন্তের সুন্দর প্রভাতে, জগতের দিকে প্রীতিচক্ষে চাহিয়া দেখ—সব মধুময়। রবির কিরণ আকাশ ভাসাইয়া পৃথিবীতে নামিয়াছে ও তাহার স্পর্শে সকল জীবজন্তু নব জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, শিশির বিন্দু এখনও মুক্তাবিন্দুর ন্যায় দূর্ব্বাদলে শোভা পাইতেছে, প্রভাতবাতে হেলিয়া দুলিয়া ফুলেরা নাচিতেছে। পরাগ-রেণু-রঞ্জিত ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিতেছে। আর ঐ শোন মোহন মৃদু তানে বনের পাখী স্বরসুধা ঢালিয়া দিতেছে। যথার্থই প্রাণে আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। আহা দেখ প্রকৃতির সুন্দর দেবতা—জীবের আনন্দ দেখিয়া হাসিতেছেন। জয় প্রেমময় মহেশের জয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার সহিত জীবন, চেতনা, কিম্বা গতি, অন্ততঃ পরিবর্ত্তনশীলতা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। চেতনাহীন, স্থির অপরিবর্ত্তনশীল জড় পদার্থে সৌন্দর্য্যের সম্যক প্রকাশ হইতে পারে না। আকাশে যদি বর্ণবৈচিত্র্য না থাকিত তাহাতে যদি চিরপরিবর্ত্তনশীল মেঘের ছায়া অঙ্কিত না হইত, যদি কেবলই অজস্র প্রসারিত নীলাকাশ চক্ষের সম্মুখে থাকিত তবে তাহার সৌন্দর্য্যের মূল্য থাকিত না। দেখ হিমাচলের পাষাণ বক্ষ ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী ছুটিতেছে, বিচিত্র উদ্ভিদ রাশি ও নানা জীবজন্তুতে ইহাকে সজীবতাময় করিয়াছে, মেঘেরা অঞ্চল দিয়া গিরিবরকে নানা পরিচ্ছদে সাজাইতেছে, তাই উহার এত সৌন্দর্য্য। অরুণোদয় ও সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধ জ্যোতি না থাকিলে, কেবল মধ্যাহ্নভাস্করের আদর থাকিত না। শশিকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি না থাকিলে চন্দ্রকে এত সুন্দর মনে হইত কি না সন্দেহ। ইংরাজীতে যাহাকে expression বা ভাব বলে—যাহা না থাকিলে মুখের সৌন্দর্য্য একেবারে নিষ্প্রভ হয়—তাহা সজীবতা-প্রকাশক। পাষাণপ্রতিমা সুঠাম গঠনে নিখুঁত হইলেও সজীবতা-প্রকাশক ভাবের অভাবে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে না।

শব্দে যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় তাহাকে সঙ্গীত বলা হইয়াছে। ললিত কলার মধ্যে সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। হৃদয়ের অশেষবিধ ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় সঙ্গীতের মত আর কিছু নাই। মৃদঙ্গের তালে কাহার না হৃদয় মাতিয়া উঠে? বীণা-ঝঙ্কারে কোন হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে? মধুর মুরলী ধ্বনি—সুরব সারঙ্গের রাগিণী—এস্রাজের মৃদুল সঙ্গীত—অর্গ্যানের গম্ভীর বাণী—মানবকণ্ঠের সুস্বর লহরী কাহার প্রাণ না কাড়িয়া লয়? ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সাহায্যে সঙ্গীতজ্ঞ হৃদয়ের শোক দুঃখ, আশা ও উৎসাহ, আনন্দ ও অনুরাগ সকল ভাবই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। পাষাণ হৃদয় গলাইতে সঙ্গীতের মত আর কিছুই নাই। করুণভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় সঙ্গীত অতুলনীয়। বাস্তবিকই সঙ্গীত সুধার তরঙ্গে ভাসাইয়া আমাদের মনকে অতীন্দ্রিয় জগতে লইয়া যায়। দেবার্চ্চনার সর্ব্বপ্রধান আয়োজন সঙ্গীত। শুভক্ষণে এই আনন্দ সভার প্রতিষ্ঠাত্রী ইহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায় স্বরূপ 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ'কে ইঁহার সহকারিণী করিয়াছেন।

শোভা ও সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই এ জগতে—অতুল সৌন্দর্য্যের রাজ্য হইতে দুই একটী কণার আভাস মাত্র এখানে দিলাম। সুখ ও আনন্দের কারণ চারিদিকে এত রহিয়াছে যে আমাদের সর্ব্বদাই হাসিমুখে থাকা উচিত। যে দিন প্রাণ ভরিয়া হাসিতে না পারি, সে দিনটি বৃথায় গেল, ভাবা উচিত। কিন্তু সৌভাগ্য ও সুখ নিত্য সহচর নহে। এত আনন্দের কারণ থাকিতেও আমরা সুখী নই কেন? সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের বড় বেশী। তাহাকে ধরিবার জন্য সকল কাজ ফেলিয়া আমরা ছুটি—তাই সে মরীচিকার মত ছুটিয়া ছুটিয়া পলায়, আর আনন্দের রাজ্যে থাকিয়া আমরা নিরানন্দ মুখে বেড়াই। শোকের কশাঘাতে, রোগের যন্ত্রণায়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে, কুসংস্কারের নিষ্ঠুর আধিপত্যে আমাদের হাসি বিদায় লয়। জীবন কি সত্য সত্যই বিষাদময়? অনেক সময় যাহাকে আমরা দুর্ঘটনা বলি, তাহা কেবল সুখের রূপান্তর মাত্র। কোন্ চিত্রকর তাঁহার ছবি হইতে কালো রেখাগুলি মুছিয়া ফেলিতে চাহেন? প্রকৃতির সুন্দর ছবি হতে ছায়ার দাগগুলি মুছিয়া দেখ—সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কি না? আমরা যাহাকে শোকের দাগ বলি—তাও ভগবানের প্রেমের বিধান। তাহা না থাকিলে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মূল্য কমিয়া যায়। দূরবীক্ষণের কাচ আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া গগনবিহারী গ্রহনক্ষত্রের ছবি চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয়—শোকের অশ্রু এক বিন্দু চক্ষের কোলে দেখা দিলে তাহার ভিতর দিয়া কত সৌন্দর্য্যের রাজ্য, কত নীহারিকার ছবি দেখা যায়। হৃদয়ের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে দাও, দেখিবে—সেথায় স্বর্গের ছবি প্রতিভাত হইবেই।

প্রেমময় বিধাতা প্রকৃতির সুন্দর দেবতা স্বয়ং প্রাণে প্রাণে এই আশা ও আনন্দের বারতা শুনাইতেছেন—মর্ত্ত্যের সুখ—জীবনের নির্দ্দোষ খুঁটিনাটি উপেক্ষা করিতে হইবে না। সংসারের মাঝে আনন্দ প্রেম ও সৌন্দর্য্য দিয়া দেবমন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। জীবনপথে যাহা কিছু প্রাণে সুন্দর ও সাধুভাব জাগাইয়া দেয়, তাহাই পুণ্য সাধনের অনুকূল জানিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে; ইহাই মুক্তির প্রশস্ত পথ। জীবনের ছোট বড় সকল কর্ত্তব্য সাধনে বিধাতার ইচ্ছা পালন করাই ধর্ম্ম। দৈনন্দিন জীবনের সকল ব্যাপারে—সেই সত্যং শিবং সুন্দরংকে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন।

গৃহী যখন পরিবার প্রতিপালনে সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন—আত্মসুখ ভুলিয়া গিয়া অকাতরে কঠোর কর্ত্তব্যভার বহন করেন—তখন ভগবানেরই পুণ্যরাজ্যের বিস্তার হয়। জনহিতৈষী যখন দশের জন্য খাটিতে থাকেন, সর্ব্বস্ব দিয়া পরের অশ্রু মুছাইয়া দেন, সেই বিশ্বপ্রেমের ছবিতে মঙ্গলস্বরূপের পরিচয় যে না পায়, সে কোথাও ভগবানকে দেখিতে পাইবে না। রমণী যখন গৃহের প্রত্যেক কার্য্যে নীরব মাধুরী ঢালিয়া দেন, পরার্থে আপনাকে একেবারে বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান, সেবাব্রতে বক্ষ চিরিয়া হৃদয়ের রক্ত দিতে কুণ্ঠিত হন না, সে পুণ্যময় দৃশ্যে স্বর্গের ছবি প্রতিফলিত যে না দেখে সে কৃপার পাত্র।

আজ নববর্ষে নিরাশা ও বিষাদরঞ্জিত পুরাণো পাতা উল্টাইয়া ফেলি। জীবনের নূতন খাতায় নূতন অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় জমা লিখি—প্রেমময় বিধাতার অযাচিত দান—অক্ষয় আনন্দ—অম্লান সৌন্দর্য্য—অপার করুণা। এই অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া আর কৃপণতা করিব না—অকাতরে বিলাইব। মর্ত্ত্যের পথে একবার মাত্র যাইব, এ পথে যাহার প্রাণে যতটুকু সুখ দিতে পারি দিব। পুণ্যসঞ্চয়ের এমন সুযোগ আর মিলিবে না। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আমাদের সহায় হউন।

অঙ্গ-দেশ।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল। নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলক ও মুদ্রার সাহায্যে সেই ঐতিহাসিক যুগের অতীতকালের ইতিহাস সঙ্কলন বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের প্রভূত গবেষণা ও অধ্যবসায়ের মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব। ভাগ্যবশে এ দেশের কয়েকজন মনীষী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বাধীন ভাবে স্বীয় মতামত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষের গৌরবময় প্রাচীন অজ্ঞাত পুরাবৃত্ত অন্ধকারবির্নির্ম্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আজ আমরা অঙ্গদেশ লইয়া আলোচনা করিব।

অথর্ব্বসংহিতায় অঙ্গ ও মগধ প্রদেশের অধিবাসিবর্গের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সংহিতা রচনার সময় অঙ্গ ও মগধ ভারতের পূর্ব্ব সীমা ছিল। উহার অধিবাসীগণ ঐ সময়ে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে পরিদৃষ্ট হইত।

রামায়ণে কথিত আছে যে মদন এক সময়ে মহাদেবের ক্রোধভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মদন যে স্থানে পলায়ন করিয়া আপনার অঙ্গকে বিসর্জ্জন করিয়া দেন, তাহাই অঙ্গ-দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে। সরযু যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়, সেই স্থানেই মহাদেবের আশ্রম ছিল। মহাদেব কারণ নামক স্থানে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া তাঁহার তৃতীয় চক্ষুর তেজে মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। উক্ত কারণ নামক স্থান বক্সারের অপর পারে গঙ্গার উপর অবস্থিত। বক্সার বিশ্বামিত্রের আশ্রম বলিয়া খ্যাত। কারণে কামেশ্বরনাথ নামক মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে বজাতির বংশজাত পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্রের উল্লেখ আছে। তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র। তাঁহারা নিজ নিজ নাম অনুসারে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হিওএন-সিয়াং যখন চম্পায় (অর্থাৎ অঙ্গদেশের রাজধানীতে) আসেন, তখন তিনি ঐ পৌরাণিক মতই কতকটা সমর্থন করিয়া বলেন, কে একটি দেবীর চারিটি পুত্র জন্মে। তাহারা চারি জনে জম্বুদ্বীপ আপনাদের মধ্যে চারি অংশে বিভাগ করিয়া লয়। তিনি ইহাও বলেন চম্পা উহার একটির রাজধানী ছিল এবং উহা জম্বুদ্বীপের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

ভাগলপুর মুঙ্গের এবং সাঁওতাল পরগণার কতকটা লইয়া অঙ্গদেশ। কেহ বা বলেন যে বীরভূম, মুরশিদাবাদ মানভূম অঙ্গ-দেশের অন্তর্ভূত ছিল। তন্ত্রের মতে বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ। কিন্তু শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ মতে চম্পাই অঙ্গদেশের প্রধান নগর এবং উক্ত চম্পা নগর বৈদ্যনাথ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। অধিকন্তু অঙ্গ যে উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত

* এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্রে বিগত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল দের লিখিত অঙ্গ-দেশের প্রাচীন কাহিনী বাহির হইয়াছে। আমরা তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম।

বিস্তৃত ছিল, অন্যত্র তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রামায়ণের মতে রোমপাদ নামে অঙ্গদেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের সমসাময়িক। অনাবৃষ্টি বশতঃ দেশের ভীষণ অকল্যাণ উপস্থিত হইলে রোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে একটি যজ্ঞ করিয়া দেশকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করেন। এই রোমপাদ রাজা অঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অঙ্গ হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ।

মহাভারত অনুসারে অঙ্গদেশ হস্তিনাপুরের কুরুরাজবংশের অধীনস্থ করদরাজ্য মাত্র ছিল; এবং দুর্য্যোধনের সময়ে কর্ণই উহার রাজা ছিলেন। কিন্তু এই কর্ণ অধিরাজের পালিত-পুত্র। এই অধিরাজ কৌরবগণের সারথী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে ভীম মগধ জয় করিয়া অঙ্গরাজ কর্ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঠিক ঐ সময়ে জৈনগণের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বলিতে কি নৈতিক দুর্গতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কদাচার দূর করিবার জন্য এবং ব্যক্তিগত সাধন, সংযম, জীবে দয়া এবং উচ্চতম চিন্তা ও আলোচনার ভাব প্রবর্ত্তন জন্য ঐ সময়ে ঐরূপ মহাত্মাগণের আবির্ভাব নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়া চিন্তা ও সাধনার ভাব যে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তীর্থঙ্কর ও তথাগত (বুদ্ধদেব) একই সময়ের লোক। (মহাবীর) তীর্থঙ্কর বুদ্ধদেব অপেক্ষা ১৮ বৎসর বড় ছিলেন। মহাবীর খৃঃ পূঃ ৫৬৯ অব্দে ৭২ বৎসর বয়সে এবং বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষ যে ১৬টী প্রদেশে এক সময়ে বিভক্ত ছিল, অঙ্গদেশ তাহার মধ্যে অন্যতম। ঐ যোলটী প্রদেশের নাম অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, ভজ্জি, মল্ল, চেটি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার ও কাম্বোজ।

খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষে দধিবাহন নামে অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যা চন্দনা (চন্দ্র বালা) জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং পরে তিনি ছত্রিশ হাজার সন্ন্যাসিনীর অধিনেত্রী হইয়া দাঁড়ান। কৌশাম্বীর রাজা শতানীক ঐ সময়ে চম্পা আক্রমণ করেন। চন্দনা দস্যুহস্তে নিপতিত হইলেও আমৃত্যু আপনার ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। ঐ সময়ে মগধ সামান্য প্রদেশ মাত্র ছিল বটে কিন্তু উহা ক্রমে মস্তকোত্তলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অঙ্গের রাজা বৃহবর্ম্মণ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। অঙ্গের পরবর্ত্তী রাজা ব্রহ্মদত্ত মগধের রাজা ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন বটে কিন্তু তাঁহার পুত্র বিম্বিসার ব্রহ্মদত্তকে রণে পরাস্ত করিয়া চম্পা অধিকার করেন, এবং পিতার মৃত্যু অন্তে মগধের রাজধানী রাজগৃহে আনিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা হইলেও অঙ্গদেশের সহিত মগধদেশ একেবারে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতার জীবদ্দশায় অঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ে বৈশালী, বিদেহ অর্থাৎ ত্রিহুতের রাজধানী ছিল। অজাতশত্রুর পুত্র অঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অজাতশত্রুর মৃত্যু অন্তে তাঁহার পুত্র পাটলীপুত্রে (পাটনায়) রাজধানী লইয়া যান। ঐ সময় হইতেই পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী হইয়া দাঁড়ায়।

মহাবীর কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিদেহ মগধ ও অঙ্গদেশের উপরে তাঁহার শক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। বিম্বিসার মহাবীরের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবীরের মতাবলম্বীগণ নির্গ্রন্থী বলিয়া বিদিত। অজাতশত্রু তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। মহাবীর চম্পাদেশে উপর্য্যুপরি তিনটি বর্ষাকাল ধরিয়া পর্য্যুসন ব্রত অবলম্বন করেন এবং অঙ্গদেশের অন্তর্গত ভদ্রিকা নামক স্থানে দুইটি বর্ষাকাল ধরিয়া উক্ত ব্রত পালন করেন। পর্য্যুসন ব্রত অর্থে বর্ষায় নির্জ্জনবাস। বুদ্ধদেবও ঐ দুই স্থানে আসিয়া সকলকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৈশালী, রাজগৃহ ও চম্পাতে মহাবীরের ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ঐ সকল স্থানে পরে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিম্বিসার পরে নিজে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। অজাতশত্রুও বৌদ্ধ হইয়া যান এইরূপ কথিত আছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে (৩২১—২৯৭ খৃঃপূঃ) চন্দ্রগুপ্ত আবির্ভূত হইয়া সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ জয় করেন। কোশল, কাশী, অঙ্গ, মগধ তাঁহার রাজ্যের পরিধির অন্তর্গত হইয়া পড়ে। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজা অশোক (২৭৩—২৩১ খৃঃ পূঃ) এই সমুদয় ভূভাগকে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া উহাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করেন। উক্ত চারিটি প্রদেশের রাজধানীর নাম তাক্ষিলা, উজ্জয়িনী, তোসালি ও সুবর্ণগিরি। পূর্ব্ববর্ত্তী তোসালি প্রদেশ কটকের অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের সান্নিধ্যে ছিল। ঐখানে অশোক বিহার নির্ম্মাণ করেন। অশোকের মৃত্যুর পরে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উক্ত রাজ্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে এবং মগধ, চম্পা ও কোশলের পূর্ব্ব অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অশোকের মৃত্যুর পরে তিনটি শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশই বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু অশোকের পৌত্র সম্প্রীতি (পুরাণে সম্ভবতঃ যিনি দশরথ বলিয়া খ্যাত) জৈন

ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উৎসাহদাতা হইয়া দাঁড়ান। প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত মহাযান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকরূপে আবির্ভূত হয়েন। এই সময়ে কণিষ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের তৃতীয় বিরাট অধিবেশন আহুত হইয়াছিল। অঙ্গ বঙ্গ ও মগধের লোকসমূহ এই সময় হইতে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া উঠে এবং তন্ত্রকথিত নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি এ দেশে স্থান পাইতে আরম্ভ করে।

তৃতীয় শতাব্দীতে শকগণ অঙ্গ দেশ জয় করে। রুদ্র-দমন শকগণের অধিনায়ক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত জয় করিলেও তিনি যে শকগণকে অঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) চতুর্থ শতাব্দীর শেষে সত্যসেনার পুত্র ২য় রুদ্রসেনকে পরাস্ত করিয়া সুরাষ্ট্র ও মালওয়া প্রদেশকে মগধ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং শকগণকে জয় করিয়া অঙ্গদেশ অধিকার করেন। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ গুপ্তরাজগণের অধীনে ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে ফা হিয়াণ (Fa Hian) ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে আসেন; এবং ৪০৫ হইতে ৪১৫ শক পর্য্যন্ত মগধের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। (Hiuen Tsiang) হিউয়েন সিয়াং যিনি সপ্তম শতাব্দীতে আসেন, তিনি ঐ স্থানকে চেন্‌পু (চম্পা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বানভট্ট যিনি সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন, তিনি উহার রাজাকে চম্পারাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোগিনী তন্ত্রে অঙ্গের কথার উল্লেখ আছে।

ভাগলপুরের সান্নিধ্যে চম্পা নগরের কর্ণগড় (রাজা কর্ণের দুর্গ) এবং মুঙ্গেরের করণ-চৌড়া এবং সুলতান গঞ্জের পশ্চিমে উচ্চভূমি যাহা কর্ণগড় বলিয়া বিদিত, তাহা কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণের বা উক্ত রাজ্যের রাজার পুত্র যিনি অঙ্গদেশ শাসন করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারই নাম খ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত কর্ণ রাজবংশে যে সাতজন রাজা রাজত্ব করেন, তাঁহারা সকলেই কর্ণ বলিয়া অভিহিত হইতেন। উক্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুলকেশীর পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মন অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ অধিকার করেন। সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এবং কণোজের হর্ষবর্দ্ধন যিনি ২য় শিলাদিত্য বলিয়া খ্যাত, তিনি অঙ্গ ও মগধ জয় করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষে নেপাল-রাজ ২য় জয়দেব অঙ্গদেশ জয় করেন এবং বঙ্গদেশও আক্রমণ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে গোপাল মগধ অধিকার করেন। এবং উড্ডণ্ডপুরে (বিহারে) নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় পাটলীপুত্র ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত একটি তাম্রফলক হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গোপালের পৌত্র দেবপাল দেব এই স্থানেই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অঙ্গদেশ পালবংশীয় রাজগণের রাজ্যভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ঐ ভাবে চলিতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অঙ্গদেশকে অন্যান্য অত্যাচারী রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন অঙ্গ ও গৌড় দেশ জয় করেন এবং তিনি বা তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন অঙ্গদেশকে তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। অনর্ঘ-রাঘব-গ্রন্থ-প্রণেতা মুরারি-পণ্ডিত যিনি এই সময়ে আবির্ভূত হয়েন, তিনি বলেন চম্পা গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। কিন্তু অন্যত্র এই কথার প্রতিধ্বনি মিলে না। দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য হইতে অঙ্গ আক্রমণের কথার পরিচয় তাম্রফলকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপে অঙ্গদেশ নানা আক্রমণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে পরে উহা মুসলমানের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলীন হইয়া আসিতেছিল। পালরাজাগণ বৌদ্ধ ছিলেন বটে কিন্তু সেনবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। লক্ষণ সেন বঙ্গের শেষ রাজা। বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বিজিত পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল। কিন্তু ডাক্তার Buchanan সাহেব বলেন পালবংশের শেষ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মুসলমানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও সৈন্যসামন্ত লইয়া পুরীতে চলিয়া যান; কিন্তু কনিংহাম সাহেব বলেন যে কিউলের নিকট জয়নগরে চলিয়া যান এবং বক্তিয়ার খিলিজির সেনানী নুর কর্ত্তৃক পরাভূত হন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ের যথাযথ বর্ণনা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রার্থনা।

(শ্রীমতী মীরা রায় চৌধুরী)

বিশ্বেশ্বর!

চিত্তেতে স্থিরতা দাও প্রাণেতে ভকতি;
সংসারের কোলাহলে
তব শুভ্র পদতলে
চির যুক্ত যেন থাকে এ চঞ্চল মতি।

সারাক্ষণ সব কাজে
তুমি লক্ষ্য মনোমাঝে
অত্যুজ্জ্বল থেকো যেন জ্যোতি বিকাশিয়া।
স্নেহের মূরতি তব
হয়ে চির অভিনব
আমার সকল দুখ দিউক নাশিয়া।
কুমতি কুবৃত্তি যত
হোক চির অস্তমিত—
তুমি আপনার ধন বুঝে যেন চলি ;

শত শত প্রলোভনে
তোমারি অভয় দানে
অটল থাকি গো যেন কভু নাহি টলি।
নূতন বরষে আজ
এ প্রার্থনা বিশ্বরাজ
অসার পার্থিবে মন মিশিয়া না যায় ;
জীবন্ত জাগ্রত হয়ে
চির স্নেহ ক্ষমা দিয়ে
অবোধ সন্তানে প্রভু রেখো তব পায়।

নূতন গান ও স্বরলিপি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মিশ্র-কামোদ—আড়া চৌতাল।

করুণাময়, দীন-বৎসল, দীন হীনে দেও দরশন।
কাটি যাবে সব মোহ-বন্ধন, ঘুচিবে মরম-ক্রন্দন,
আনন্দে পূর্ণ হইবে হৃদি মন।
অমৃত-বাণী শুনি' তব, দূর হবে দুরিত-দুর্দ্দিন,
মন প্রাণ হবে চরণে লীন, জ্ঞান-নেত্র যাবে খুলিয়া।
দিশি দিশি দিশি অম্বরে, অন্তরে,
ঝঙ্কারি' উঠিবে শুধু ওঙ্কার,
আত্মাতে আত্মা হইবে নিমগন ॥

II পা পা। পা -া মা পা। ধা -র্সা -ধা পা। মা -গমা রা সা I
ক রু ণা ॰ ম য় দী ॰ ॰ ন ব ॰ৎ স ল

I মা -গমা। রা মা -গমা রা। সা -ন্‌া সা রা। সন্‌া সা -া -া I
দী ॰॰ ন, হী ॰॰ নে দে ও, দ র শ॰ ন ॰ ॰

I পা -া। পা -া পা মা। পা ধা ণা র্সা। ণা -ধণা পা পা I
কা ॰ টি ॰ যা বে স ব, মো হ ব ॰॰ ন্ধ ন

I ণা -ধণা। পা -া পা -া। মা -গা মা পা। মা -গমা রা রা I
ঘু ॰॰ চি ॰ বে ॰ ম ॰ র ম ক্র ॰॰ ন্দ ন

I মা -গমা। -রা -মা -গমা -রা। -রা -মা -পা -ণা। -পা -ণা -র্সা -র্রা I
আ আ॰ আ, আ আ॰ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

I র্সর্রর্সা -না। র্সা ধণা -পা পমা। পা মা -গা মা। রা সা রা রা II
ন॰॰ ॰ ন্দে, পূ ॰ র্ণ॰ হ ই ॰ বে হৃ দি, ম ন

II মা ণা। ধা -ধণা ধা ণা। ধা -ণা -ধা -ণা। -ধা না র্সা র্সা I
অ মৃ ত ॰॰ বা ণী শু ॰ ॰ ॰ ॰ নি, ত ব

I র্রা -র্জ্জর্রা। র্সা র্রা -র্জ্জর্রা র্সা। ণা ধা ণা -র্সা। ণা -ধণা পা পা I
দু ॰॰ র, হ ॰॰ বে ত্রি ত ॰ দু ॰॰ র্দ্দি ন

I মা -া। পা ণা -ধা ধণধা। পা ধা ণা র্সা। ণা -ধণা পা পা I
ম ॰ ন, প্রা ॰ ণ॰॰ হ বে, চ র ণে ॰॰ লী ন

I মা -া। পা ণা -ধণা পা। পণা মা পা পা। র্সা -া -নর্সা -া I
জ্ঞা ॰ ন, নে ॰॰ ত্র যা বে, খু লি য়া ॰ ॰ ॰

I ণা ধা। ণা র্সা র্সা র্সা। ণা -ধা ণা র্সা। ণা -ধণা পা পা I
দি শি দি শি, দি শি অ ॰ ম্ব রে অ ॰॰ ম্ব রে

I পা র্সা। না র্সা র্সা র্সা। মা মা মা -গা। -মগা রা -া -া I
ঝ ঙ্কা রি', উ ঠি বে শু ধু, ও ॰ ॰॰ ঙ্কা ॰ র্

I মা -গমা। -রা -মা -গমা -রা। -রা -মা -পা -ণা। -পা -ণা -র্সা -র্রা I
আ আ॰ আ আ আ॰ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

I র্সর্রর্সা -না। র্সা ধণা -পা পমা। পা মা -গা মা। রা সা রা রা II II
আ॰॰ ॰ তে, আ ॰ আ॰ হ ই ॰ বে নি ম গ ন

শিক্ষাসমস্যা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ছেলেদের যে কি রকম শিক্ষা দেওয়া হবে, তা নিয়ে আজকাল অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলছে। প্রত্যেক পিতামাতা যে নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের কি ভাবে শিক্ষা দেবেন, সেটা প্রত্যেক পিতামাতার নিজের নিজের বিবেচনার কথা। সেই কারণে আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কোন কিছু বলব না। নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার কর্ত্তব্য ছেড়ে দিলেও এই বিষয়ে প্রত্যেক সমাজের একটী কর্ত্তব্য আছে। একটী লোক বা একটী বংশ নিয়ে তো আর সমাজ তৈরি হয় নি। কতকগুলি লোক বা বংশ নিয়ে একটী সমাজ গঠিত হয়। এক একটী সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের কতকগুলি কাজ মিলিত ভাবে করা উচিত—না করলে প্রকৃত সমাজরক্ষা হতে পারে না। যে সকল কাজ সমাজের এই রকম মিলিত ভাবে করা উচিত, সেই সকল কাজ সম্বন্ধে সমাজভুক্ত যে সকল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি বিশেষরূপে আলোচনা করেছেন বা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষ অভিজ্ঞ, তাঁদের মতামত প্রকাশ করে সমাজকে জানানো কর্ত্তব্য এবং সমাজেরও সেই সকল মতামত আলোচনা করে দেখা উচিত যে সেইগুলির মধ্যে কতটুকু সমাজে চালানো যেতে পারে। সমাজভুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা সমাজের এই রকম কার্য্যসমূহের অন্যতম।

প্রত্যেক উন্নত সমাজই স্বীকার করতে বাধ্য যে সমাজভুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করা উচিত। সমাজে যদি অশিক্ষিত লোকের প্রাধান্য হয় তাহলে সে সমাজের মঙ্গল নাই, কারণ অশিক্ষিত লোকেরা সমাজের কল্যাণচিন্তা দ্বারা আপনাদিগকে সংযত করতে অসমর্থ হয়ে কেবল স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হবে। অগত্যা তার ফলে সমাজের মিলিত ভাবে উন্নতি হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক সমাজও আত্মরক্ষার জন্য চায় যে সমাজের অর্থাৎ মিলিত ভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের উন্নতি হোক। উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর প্রত্যেক সমাজই আত্মরক্ষার জন্য চায় যে সেই সমাজ অর্থাৎ সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করুক। এখন, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে সমাজের প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটী শিক্ষক নিযুক্ত করা অসম্ভব। তাই সমাজ অনেকগুলি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল কলেজ পাঠশালা প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যালয় খোলবার ব্যবস্থা করে। সেই কারণে শিক্ষা-সমস্যা বিষয়ে আন্দোলন উঠলেই সমাজনেতা ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান এই প্রশ্ন আলোচিত হয় যে বিদ্যালয়ে কি রকম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

এইখানেই কিন্তু নানা মতভেদ নানা তর্কবিতর্ক এসে সময়ে সময়ে সমাজকে নিতান্তই বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত করে তোলে। পিতামাতা যখন আপনার আপনার ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেন, তার উপর অপরের বেশী কিছু জোর খাটে না, বেশী কিছু বলবার অধিকার থাকে না। কিন্তু সমাজ যে একটী বংশের দ্বারা গঠিত নয় সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সমাজ কোনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গেলেই কয়েকজন সমাজনেতার মিলিত হয়ে সেটা করতে হয়। তোমার একলার কথা তো সমস্ত সমাজ শুনবে না। সমাজের মধ্যে সকল বিষয়ে সকলের তো আর একমত হয় না। কোন বিষয়ে হয় তো দশজনের একমত হোল, অপর দশ জনের হয় তো সে বিষয়ে বিভিন্ন মত হোল। একমতাবলম্বী লোকেরা আপনাদিগকে একটী সম্প্রদায়ে বেঁধে ফেলে। এই রকমে প্রত্যেক সমাজে নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় এবং সাধারণত প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাপন নেতার মতানুসরণ করে চলে থাকে। সমাজ কোন কাজ করতে গেলে কাজেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা মিলিত হয়ে কাজ না করলে সে কাজে সমাজের কৃতকার্য্য হবার আশা কম। সামাজিক শিক্ষাসমস্যার আলোচনাতে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ একত্র হন, তখন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে চান। দুই জনের অভিজ্ঞতা কখনই এক হয় না, কাজেই শিক্ষাসমস্যার আলোচনায় মতদ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। আলোচনাতে মতদ্বন্দ্বের অবসর থাকলেও এমন কতকগুলি সাধারণ ভূমি আছে, যার উপর দাঁড়িয়ে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের নেতারাই মিলতে পারেন। মেলবার এই রকম কতকগুলি সাধারণ ভূমি না থাকলে সমাজ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে মিলিত ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। আমরাও অন্তত একটী প্রধান সাধারণ ভূমি অবলম্বন করে শিক্ষাসমস্যার সমাধান বিষয়ক আলোচনায় অবতীর্ণ হব। এই সাধারণ ভূমি হচ্ছে ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি।

বিদ্যালয়ে কি রকম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য এই প্রশ্নটি বড়ই গুরুতর, এই কথা শুনে শুনে আমাদেরও সত্যই মনে হয় যে প্রশ্নটি অত্যন্ত কঠিন, অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হবে না। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? ভাল করে আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে প্রশ্নটীকে আমরা যত কঠিন বলে মনে করি, সেটা আসলে তত কঠিন নয়। সাধারণ ভূমির

উপর দাঁড়ালে প্রশ্নটার উত্তর খুবই সহজ হয়ে পড়ে। সেই উত্তরটি এই যে, যে শিক্ষা-প্রণালীর ফলে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি যথাসামঞ্জস্য সাধিত হয় সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট। কেবল যদি আমরা এই লক্ষ্য রেখে কাজ করতে পারতুম, তাহলে শিক্ষাবিষয়ক কোন সমস্যার বোধ হয় উৎপত্তিই হোত না। যখন কোন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হলে তার অবান্তর ফল কি হবে সেই বিষয়ে আমাদের অধিকতর দৃষ্টি পড়ে তখনই শিক্ষাবিষয়ক নানা কঠিন সমস্যার উদ্ভব হতে দেখা যায়। হয়তো কোন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হলে রাজনৈতিক বিভ্রাট ঘটতে পারে দেখা গেল, তখন সেই শিক্ষা প্রণালীর ফলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির শত সম্ভাবনা থাকলেও তাহা বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা উচিত কি না এই একটি মহাসমস্যা আমাদের বিমল দৃষ্টিকে বিভীষিকার অন্ধকারে আবৃত করে রাখে, আমাদের মূল লক্ষ্যকে দেখতে দেয় না। কোন শিক্ষা-প্রণালীর ফলে বা এমন হতে পারে যে সমাজের কোন সম্প্রদায় যে সকল মতামত আচার ব্যবহার সযত্নে আঁকড়ে ধরে আছে, সেই সকল মতামত আচার ব্যবহারের উপর বৈপ্লবিক আঘাত লাগবার সম্ভাবনা এসে পড়ে, তখন সেই প্রণালী বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা কতদূর সঙ্গত তাহা স্থির করতে যাওয়া একটা মহাসমস্যা হয়ে পড়ে, সেই সমস্যার মীমাংসার গোলযোগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিরূপ মূল লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলি। অথচ সমাজে থাকতে গেলে, রাজার রাজ্যে থাকতে গেলে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি অবান্তর বিষয়েরও প্রতি দৃষ্টি না রাখাও অসম্ভব। আমরা কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ ভূমি ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকেই আমাদের শিক্ষাসমস্যার সমাধান বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রস্থলে বরণ করব এবং সেই লক্ষ্যেরই প্রতি আমাদের মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অর্থে আমরা সামঞ্জস্যের সহিত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ধরছি, তা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলে এসেছি। শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, এ কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করলে, কি রকম শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করলে যে সেই উন্নতি সহজে সাধিত হবে তাই নিয়ে যত তর্ক, যত মারামারি, যত কথা-কাটাকাটি। আমরাও এই বিষয়ের আলোচনাক্ষেত্রে নেমেছি বটে, কিন্তু আমরা বৃথা তর্ক, বৃথা কথাকাটাকাটির ভিতর যাব না। আমরা দেখতে পাই যে ভগবান প্রকৃতির সর্ব্বত্র একই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন, কেবল বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা রূপভেদে প্রকাশ পায় মাত্র। আকর্ষণ শক্তি বলে একটি পদার্থকে ভগবান জগতে পাঠিয়েছেন; সেই শক্তি জড়, চেতন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তির মূলভাব ঠিক বজায় থাকে। আর একটি নিয়ম দেখি যে তেজ দগ্ধ করে। অগ্নির তেজ একভাবে দগ্ধ করে; জ্বরের তেজ একভাবে দগ্ধ করে; মনের তেজ একভাবে দগ্ধ করে এবং অধ্যাত্মতেজ আর একভাবে দগ্ধ করে। কিন্তু তেজ যে দগ্ধ করে, সেটা কি জড়, কি চেতন, সকল পদার্থে সকল অবস্থাতেই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যদি কোন জিনিসকে আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করি তবে প্রকৃতিতে যে অবস্থায় যে ভাবে আকর্ষণশক্তি কার্য্য করে, সেই অবস্থায় সেই ভাবে আকর্ষণ করলেই কাজটা সহজ ও সুনিষ্পন্ন হবে। যদি আমরা কোন কিছু দগ্ধ করতে চাই, তাহলে প্রকৃতিতে যে অবস্থায় যে ভাবে তেজ দাহকার্য্য করে, সেইরূপ অবস্থায় সেই প্রণালী অবলম্বন করে দাহকার্য্যে প্রবৃত্ত হলে কাজটি সুসম্পন্ন হয়। সেইরকম ভগবান প্রকৃতিতে একটি শিক্ষাপ্রণালীরও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেই প্রণালী বিভিন্ন জীবজন্তুতে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে পরিব্যক্ত হয়। আমরাও যদি ছেলেদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে চাই তবে সেই প্রকৃতি-ব্যক্ত শিক্ষাপ্রণালীরই মূলভাবকে অনুসরণ করতে হবে—মূলভাবকে বজায় রেখে অবান্তর বিষয়ে অবস্থাভেদে সেই প্রণালীর রূপভেদ আনয়ন করলে কোনই ক্ষতি হবে না।

এখন দেখা যাক যে প্রকৃতি থেকে শিক্ষাপ্রণালীর কি মূলভাব প্রাপ্ত হই। শৈশব অবস্থায় জীবজন্তু মাত্রকেই প্রকৃতি শারীরিক অঙ্গচালনাতেই সব চেয়ে বেশী নিযুক্ত রাখে। এইটীই হোল প্রকৃতিব্যক্ত শৈশবশিক্ষার মূলভাব। মানবসন্তানও এই মূলভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। শৈশবাবস্থায় অন্যান্য জীবজন্তুর শাবকের ন্যায় মানবশিশুরও শরীরে প্রকৃতি এতটা অতিরিক্ত বল ও শক্তি নিহিত করে রাখে যে তাকে বাধ্য হয়ে অঙ্গচালনা প্রভৃতি শারীরিক উন্নতিসাধক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হয়—অঙ্গচালনা প্রভৃতির অভাব হলে শিশুর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রকৃতিব্যক্ত শিক্ষাপ্রণালীর এই মূলভাবটী ভাল করে হৃদয়ে উপলব্ধি করলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের বিদ্যালয়সমূহেও শিক্ষার প্রথম সোপান এরূপ হওয়া উচিত যে সেই শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে ছাত্রদের যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গচালনা করতে হয়, বসে বসে একরাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ বা ইংরাজী ব্যাকরণ, ভূগোল বা ইতিহাস প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করতে না হয়। এমন কি আমাদের মনে হয় যে ছোট ছোট ছেলেদের বসিয়ে [illegible] কথ

মুখস্থ করতে বা সারাক্ষণ লিখতে দেওয়াও উচিত নয়। আমরা কি কেহ ভাল করে ভেবে দেখেছি যে ছেলেদের শৈশব থেকেই পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় দাঁড়াবার জন্য তাদের লেখাপড়াকে মুখস্থ বিদ্যার মধ্যেই আবদ্ধ রেখে এবং তাহাদিগকেও এই রকম মুখস্থ বিদ্যার জোরে প্রথম দ্বিতীয় দাঁড়াবার জন্য উৎসাহ দিয়ে তাদের কি রকম গুরুতর অনিষ্ট সাধন করছি? একথা কে অস্বীকার করবে যে ছেলেরা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স থেকে স্কুলের নির্দ্দিষ্ট অথচ নিজেদের মানসিক ক্ষমতার অতিরিক্ত একরাশ পাঠ্যপুস্তক কণ্ঠস্থ করতে গিয়ে শারীরিক স্বাস্থ্যজনিত সুখ একেবারে ভুলে যাচ্ছে? এই রকম শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশের ছেলেরা কেবল নিজেদের জীবনভোর দুর্ব্বল শরীর এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বল মন ও আত্মা বহন করে না। তারা ভবিষ্যৎবংশীয়দের জন্য নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা উত্তরাধিকার স্বরূপে রেখে যায়। আমাদের দেশের ছেলেরা যে বংশপরম্পরায় দুর্ব্বল হয়ে জন্মগ্রহণ করে, বর্ত্তমান ভ্রান্ত শিক্ষাপ্রণালী যে তজ্জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী নহে, সে কথা কে সাহস করে বলতে পারে? ভাল কাজে, যে সকল কার্য্যে স্বার্থত্যাগ দরকার, উৎসাহ দরকার, প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার, সেই সকল কাজে আমাদের দেশের ছেলেরা যে এগোতে সাহস করে না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বর্ত্তমান প্রচলিত বিকৃত শিক্ষাপ্রণালী।

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেছি যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রথম সোপানে আমরা অঙ্গচালনার আধিক্য থাকা দেখতে চাই। এই মূলভাব রেখে তোমরা কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীই প্রবর্ত্তিত কর আর জাপানী প্রণালীই প্রবর্ত্তিত কর, তাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই—যথোপযুক্ত অঙ্গচালনার ব্যবস্থা থাকলেই হোল।

শৈশব শিক্ষায় অঙ্গচালনার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী বলে এমন যেন কেহ না মনে করেন যে শৈশবে আমরা ছেলেদের মানসিক জ্ঞানার্জ্জনের অথবা আধ্যাত্মতত্ত্ব হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাতে নিষেধ করছি। পশুপক্ষীর শাবকগণ দেখেছি যে জন্ম অবধি বুঝতে শেখে যে কে তাদের মা বাপ, কেমন করে চাইলে তারা খেতে পাবে। মানবশিশুও দেখি যে জন্ম অবধি, বিশেষত যখন থেকে চোখ খুলে এই বিশ্বজগতের আশ্চর্য্য কারখানা দেখতে সমর্থ হয় তখন অবধি, স্বভাবতই জ্ঞান অর্জ্জন করতে শেখে। শৈশবকালে শিশুরা যেমন একদিকে পরিশ্রম করে সুখ পায় আরাম পায় বলে শারীরিক অঙ্গচালনা করে, তেমনি তারা পৃথিবীর জিনিস দেখে শুনে সুখ পায় বলে মানসিক বৃত্তিসমূহেরও পরিচালনা করতে শেখে। শিশুদের অনুসন্ধিৎসা ও সকল বিষয়ে দৃষ্টি যে কি রকম শীঘ্র শীঘ্র প্রসারিত হয়, তাহা কে না লক্ষ্য করেছে? আমরা দেখেছি যে একটি তিন বৎসরের শিশু তাহার ছোট ভাইকে আদর করতে গিয়ে দৈবাৎ লাগিয়ে দেওয়াতে তার বাপ তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন এটি সেই শিশু লক্ষ্য করেছিল এবং বাপ যে সেটা অন্যায় করেছিলেন তাও সে বুঝেছিল, আর সেই ভাবটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। আমাদের মতে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষার প্রথম সোপানে শারীরিক উন্নতির দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্ত মানসিক ও অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করিতে হবে। কিন্তু বসে বসে একরাশ পুস্তক কণ্ঠস্থ করালেই যে সেই ব্যবস্থা হয় না সেটা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। শিশুরা অনুসন্ধিৎসার ফলে এটা কি ওটা কি এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতিকে উত্যক্ত করে তোলে। অনেকে এতে বিরক্ত হয়, কিন্তু বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এইরকম জিজ্ঞাসা ও তার সদুত্তর প্রাপ্তি দ্বারাই শিশুদের জ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়। শিশুদিগকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এবং হাতেহেতেড়ে কাজের দ্বারা জ্ঞানদান করতে হয়। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী এই পথ অবলম্বন করে বলে আমরা শিশুদের জন্য সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করবার পক্ষপাতী।

শৈশবকালে শিশুদের শিক্ষাতে অঙ্গচালনাকে মুখ্য লক্ষ্য রেখে যেমন উপযুক্ত পরিমাণে মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা রাখা উচিত, তেমনি উপযুক্ত পরিমাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভেরও ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই সময়ে আমরা কোনপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠনা বা ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া সমর্থন করি না। শিক্ষার প্রথমাবস্থায় গীতা প্রভৃতি মুখস্থ করালে বা একরাশ উপদেশ শোনাতে থাকলে ছেলেদের "হঁচোড়ে পেকে" যাবার সম্ভাবনা। ছেলেদের মস্তিষ্ককে অতটা কিলিয়ে পাকাতে গেলে ধর্ম্মের উপরেই তাদের একটা বিতৃষ্ণা আসবার খুব বেশী সম্ভাবনা। তাই বলে এটা মনে করা ভুল যে শিশুদের মনে ধর্ম্মের মূলভাব, মহানের দিকে দৃষ্টি, আসে না অথবা তাদের মনে ধর্ম্মের মূলভাব জাগানো যায় না। সম্প্রতি আমরা পুরীধামে কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে উপরোক্ত তিন বৎসর বয়স্ক শিশু ছিল। তাকে যখন সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া হোল, সে অনেকক্ষণ ধরে ঢেউয়ের খেলা দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলে যে "এত জল কে ঠেলছে?" আমরা তার উত্তরে বল্লুম যে "এই আকাশে যে ঈশ্বর আছেন, তিনি ঐ দূর থেকে জল ঠেলে দিচ্ছেন।" উত্তরটা যে খুব সঙ্গত অথবা শিশুর বুঝবার উপযোগী হয়েছিল এমন কথা আমি বলছিনে

এই দৃষ্টান্তটী আমি কেবল এইটী দেখাবার জন্য বল্লুম যে অতটুকু শিশুরও মনে ধর্ম্মভাবের মূল জাগ্রত হয় এবং সেই জাগ্রত ধর্ম্মভাবকে তাদের প্রশ্নের সদুত্তর দান প্রভৃতি নানা উপায়ে ক্রমশ পরিস্ফুট করে তুলতে হয়।

আমাদের দেশে ছেলেদের শিক্ষাসম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবাদ বাক্য চলে আসছে—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥" সন্তানকে পাঁচ বৎসর লালনপালন করবে, তার পর দশ বৎসর তাড়না করবে; পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়স্ক হলে তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা বুঝতে পারি। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের লালন পালন করবে অর্থাৎ তাদের শরীর গঠনের দিকেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অবশ্য এক আধটু মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের যে ব্যবস্থা করবে না তা নয়, কারণ সেটাও যে লালনপালনেরই একটা অঙ্গ।

শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহা আয়ত্ত করতে গেলে ছাত্রদিগকে বাধ্য হয়ে ঘরের বাহিরে যেতে হবে, খোলা হাওয়াতে বেড়াতেই হবে। আমাদের মতে এই দ্বিতীয় সোপানে ছাত্রদিগকে প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের এমন অংশ সকল শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলি ঘরে বসে "বি-এল-এ ব্লে"র মত মুখস্থ করতে না হয়। পশুশালায় নিয়ে গিয়ে প্রাণীতত্ত্ব শেখাতে হয়, বোটানিকেল গার্ডেন বা অন্য কোন বড় বাগানে নিয়ে গিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব শেখাতে হয়, জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম শেখাতে হয়। এই ভাবে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করলে কেবল যে ছেলেদের খোলা হাওয়াতে বেড়াবার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তা নয়, তার সঙ্গে ছেলেরা নিজেদের চোখ কান মন খোলা রেখে চলতে শিখবে এবং অনেক প্রাকৃতিকতত্ত্ব নিজেরা আবিষ্কার ও আয়ত্ত করতে পারবে। এই সময়েই ছেলেরা ভবিষ্যতে যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ছুতোরগিরি প্রভৃতি নানাবিধ হাতেহেতেড়ে কাজও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিক্ষার প্রথম সোপানের নাম যেমন আমরা শৈশবশিক্ষা দিয়েছি, তেমনি এই দ্বিতীয় সোপানের নাম আমরা বাল্যশিক্ষা দিতে পারি। বাল্যশিক্ষাতেও শৈশবশিক্ষার ন্যায় প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত শারীরিক উন্নতিসাধনে, অথচ এই সময়েই বিশেষ ভাবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ভিত গাঁথা আবশ্যক। এখন অবধি ছেলেদের কেবলমাত্র দুএকটা প্রশ্ন ও তার উত্তর দানের উপর তাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নির্ভর করলে চলবে না—বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক উন্নতিবিধায়ক বিষয় সকল নিয়মিত রূপে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সময়েই আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য তার মূল ধর্ম্মশিক্ষার সুনিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করে এসেছি যে বাল্যশিক্ষাতে বিজ্ঞানসমূহের এমন অংশগুলি শেখাতে হবে যেগুলি ছেলেদের ঘরের বাহিরে গিয়ে আয়ত্ত করতে হবে। সেই রকম ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়েও আমরা এইটুকু ইঙ্গিত করতে পারি যে বাল্যশিক্ষাতে যেটুকু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে তাতে নীতির উপদেশই বেশী থাকা আবশ্যক। এই সময়ে যেমন ছেলেরা স্বভাবতই শারীরিক ব্যায়াম আদি করে শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করতে চায়, তেমনি এই সময়েই তাদের মন চটপট ফুটে উঠতে চায়। আর, এই সময়েই পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে তারা বুঝতে পারে যে সুনীতি ও সদ্ভাবই পরিণামে সুফলপ্রদ। এই সময়েই তারা শিখতে থাকে যে নিজের স্বার্থই জগতের সবটা নয়।

বাল্যশিক্ষাতে নানাবিধ বিজ্ঞান শেখাবার কথা আমরা উপরে বলে এসেছি। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এটা কি কম দুঃখের কথা যে সেই দেশের শিক্ষিত লোকেরা কৃষির ক অক্ষর জানবেন না? ভারতের বিদ্যালয় সমূহে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হলে কতদিকে যে ভাল হবার সম্ভাবনা তা বলা যায় না। সহরের বদ্ধ বাতাসের পরিবর্ত্তে পল্লীগ্রামের মুক্ত বায়ু সেবনের ফলে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হবে, শারীরিক উন্নতি হবে; তখন আর কথায় কথায় ছেলেদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত দেখতে হবে না। তাতে দেশের আর্থিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" ব্যবসায়বাণিজ্যে পূর্ণ লক্ষ্মী বাস করেন এবং কৃষিকর্ম্মে তার অর্দ্ধেক ফল। বর্ত্তমানে কৃষকেরা ধনবান নয়, এই কথা বলে কৃষিশিক্ষা পরিত্যাগের কল্পনা করলে চলবে না। কৃষকেরা যে কেন ধনবান হয় না, সে বিষয় আলোচনা করবার বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপযুক্ত স্থান নয়। তবে আমাদের অভিজ্ঞতাতে যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে আলস্য এবং শিক্ষার অভাবই কৃষকদের ধনাভাবের দুইটি সর্ব্বপ্রধান কারণ। আর তারপর, দেশের সকল ছেলেমেয়ে যদি কৃষিবিষয়ে শিক্ষা পায় এবং কৃষি শিক্ষাতে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করা গৌরবের বিষয় মনে করে, তাহলে একটি মহান মঙ্গল সাধিত হয়—কৃষিকর্ম্মের উপর নীচকার্য্য বলে ভারতের শিক্ষিত লোকদের যে একটা

ঘৃণা এসে পড়েছে সেটা চলে যায়। বর্ত্তমানে এদেশে একটি সাধারণ ভ্রম দাঁড়িয়ে গেছে যে লেখাপড়া ভাল করে শেখবার প্রধান ফল হচ্ছে যারই অধীনে হোক একটি মোটা মাইনের চাকরী পাওয়া। কৃষিকর্ম্ম সকল বিদ্যালয়ে শেখানো হলে এবং কৃষিশিক্ষা যে মন্দ নয় বরঞ্চ খুবই ভাল এই ভাবটা দেশের সকলের মনে বদ্ধমূল হলে কেরাণীগিরির উপর স্বদেশবাসীর লোলুপ দৃষ্টি চলে যাবে এই আশা সুদূরপরাহত বলে বোধ হয় না। কৃষিশিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি কথা উঠতে পারে যে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব এবং চিকিৎসকেরও অত্যন্ত অভাব। এর উত্তরে আমরা বলতে চাই যে ছেলেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষিত হলে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকতে পারবে না বলেই আশা করা যায়। এখন শিক্ষিত পল্লীবাসীরা চাকরীর জন্য সহরে এসে বাস করেন এবং কাজেই নিজেদের গ্রামসমূহের প্রতি মনোযোগ করবার অবসর পান না; জলাশয়গুলি ক্রমশ ভরাট হয়ে আসে এবং গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরে যায়। তখন কাজেই গ্রামগুলি রোগের আশ্রয়স্থান হয়ে পড়ে। আমরা কিন্তু বলতে চাই যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষিত হলে ছেলেরা স্বভাবতই নিজেদের গ্রামসমূহকে পরিষ্কৃত রাখবে—না রেখে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া, তারা গোজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হবে। গোজাতির উন্নতি হলে ভবিষ্যৎবংশীয়েরা খাঁটি দুধ ঘি খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠবে। এই সব কথা ভাবলেও শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে। যদি পল্লীগ্রামগুলি লোকে ভরে যায়, তাহলে চিকিৎসকেরও অভাব হবে না—পল্লীগ্রামে লোক থাকে না, কাজেই সেখানে চিকিৎসা করলে অন্ন জুটবে না বলেই কোন ভাল চিকিৎসক পল্লীগ্রামে বাস করতে চান না।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা ছেলেদের লালনপালনের বা শৈশব শিক্ষার কাল বলে নির্দ্দেশ করে এসেছি। ছয় বৎসর থেকে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের মতে বাল্যশিক্ষার কাল। প্রবাদবাক্যে আছে যে এই সময়টা ছেলেদের তাড়না করবে। এর অর্থ এ নয় যে শৈশবের পর দশ দশটি বৎসর ছেলেদের কথায় কথায় কেবলই প্রহার দেবে। এর অর্থ হচ্ছে যে বাল্যশিক্ষার দশটা বৎসর ছেলেদের খুব নিয়মে রাখবে। এই সময়েই ছেলেদের চরিত্র গঠন হতে আরম্ভ হয়। সেইজন্য এই সময় ছেলেদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। খেলা বল, ব্যায়াম বল, লেখাপড়া বল, আর তাদের মনের ভাব বল, সকলই সুনিয়মিত করে দিতে হয়, সুপথে পরিচালিত করে দিতে হয়। বাল্যশিক্ষার কালের মধ্যে ছেলেদের একবার discipline এর মধ্যে ফেলতে পারলে, নিয়মবশ ও চরিত্রশীল করে তুলতে পারলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

শৈশবশিক্ষায় সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত ছেলেদের শরীর গঠনে, একথা আমরা বলে এসেছি। তেমনি এ-ও বলে এসেছি যে বাল্যশিক্ষায় সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত ছেলেদের শারীরিক উন্নতিসাধনে অর্থাৎ তাদের শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করবার বিষয়ে। বাল্যশিক্ষার কালে প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত যে কিসে ছেলেরা শরীরকে সুগঠিত করে পরবর্ত্তী বয়সে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য শারীরিক বল ও তেজ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রাখতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গেলে বিদ্যালয়সমূহে ব্যায়াম এবং যে সকল ক্রীড়াতে যথেষ্ট অঙ্গচালনা আবশ্যক হয় সেই সকল ক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কেবল প্রবর্ত্তিত হলেই চলবে না। সেগুলিকে স্বেচ্ছাকর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দিষ্ট করতে হবে এবং অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে এগুলিকেও নিয়মের অধীনে আনতে হবে।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "ভারতের শিক্ষাসমস্যা" গ্রন্থে বলেছেন যে ব্যায়ামশিক্ষাকে অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ধরা উচিত নয়, কারন "করতে বাধ্য এই ভাব থাকলে ব্যায়ামশিক্ষাতে যে সুখটুকু পাওয়া যায় সেই সুখটুকুর সম্পর্ক থাকবে না এবং তাহলেই সেই ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্যলাভের আশা থাকবে না।" গুরুদাস বাবুর মত প্রবীণ ও শিক্ষাবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের এই মত হলেও আমরা এতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিনে। গুরুদাস বাবুর মত আংশিক সত্য হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের কথার সত্যাসত্য বিচারের জন্য আমরা আবার সেই প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী অনুধাবন করতে সকলকে অনুরোধ করি। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে। পাখীরা শাবকদিগকে ঠুকরে ঠুকরে বাসা থেকে বের করে দিয়ে উড়তে শেখায় কেন? প্রথম প্রথম তো শাবকদের তাতে অল্পবিস্তর কষ্ট হয়, কিন্তু সেই কষ্টরূপ লোকসানের চেয়ে ভবিষ্যতে দৈহিক বললাভ প্রভৃতি লাভের পরিমাণ বেশী হবে বলেইতো বাপ মা সেইরকম ঠুকরে তাদের বের করে দেয়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারী পশুরা শাবকদিগকে অল্পবিস্তর নখদন্তের আঘাত করে শিকার করতে শেখায়, এ বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। শাবকদের তাতে অল্পবিস্তর লাগে বটে, কিন্তু পরিণামে তাতে তাদের ভালই হয়। তেমনি ব্যায়াম করতে বাধ্য

করলে ছাত্রদের প্রথম প্রথম এক আধটু কষ্ট হলেও তাদের শরীরে বল আসবেই; তারপর যখন তারা ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি বুঝতে পারবে, তখন তারা আপনারাই আনন্দসহকারে ব্যায়াম শিক্ষাতে অগ্রসর হবে। কোন্ রোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক তিক্ত ঔষধ সেবন করতে চায়? কিন্তু রোগের সময় রোগীর অনিচ্ছাতেও ঔষধ সেবন করালে তার ফলতো হয়। সেই রকম অনিচ্ছাতেও ছাত্রদিগকে ব্যায়াম করালে উপকার যে হবে সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ মনে নেই। গুরুদাস বাবু নিজেও তাঁর গ্রন্থের একস্থলে শিক্ষামাত্রেরই উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—"শিক্ষকের স্থির ও সংযত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ছাত্রের অসংযত ও অস্থির ইচ্ছাশক্তিকে পরিণামে স্বেচ্ছায় সংযত ও নিয়মিত করতে শেখানোই প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ছাত্রদের উপর একটু বেশীরকম কড়াকড় করতে হয়, কিন্তু ছাত্রদের তাতে কষ্ট হবে বলে সেই কড়াকড়ের ভাব ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।" সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ব্যায়ামশিক্ষাকে ছাত্রদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ধরবার বিরুদ্ধে গুরুদাস বাবুর গ্রন্থে উপরোক্ত ব্যতীত আর কোন সবল যুক্তি দেখতে পাই নি। আমরা ব্যায়ামশিক্ষার পক্ষে এত কথা বলে এলুম বলে যেন কেহ এমন মনে না করেন যে আমরা ছাত্রদিগকে কুস্তিগির অথবা জিমন্যাষ্টিকের ওস্তাদ তৈরি করে তুলতে চাই—শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করবার জন্য যতটুকু ব্যায়ামশিক্ষা দরকার, আমরা সেইটুকু ব্যায়ামশিক্ষাকেই অবশ্যকর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং নিয়মের অধীন করতে চাই। আমরা যে ব্যায়ামশিক্ষাকে শাসন ও নিয়মের অধীন করতে চাই, তাতে কেহ যেন এমনও না বোঝেন কেবলই তাড়না করে ছাত্রদিগকে ব্যায়াম করাতে হবে—অল্প স্বল্প তাড়নাও চাই এবং তারই সঙ্গে পারিতোষিক প্রদান, উৎসাহদান প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ উপায়ও অবলম্বন করতে হবে।

আমরা ছেলেদের শিক্ষাকে চার সোপানে বিভক্ত করে দেখতে চাই—শৈশবশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, যৌবনশিক্ষা এবং প্রৌঢ়শিক্ষা। এইগুলির মধ্যে ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানের বিষয় সবিস্তার আলোচনা করে এসেছি। এইবারে তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানের বিষয় আলোচনা করব। প্রথম সোপানের জন্য পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দেশ করেছি এবং দ্বিতীয় সোপানের জন্য ছয় বৎসর বয়স থেকে পনেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কালনির্দ্দেশ করেছি। তৃতীয় সোপানের জন্য বয়স-সীমা আমাদের মতে ষোল থেকে একুশ বৎসর হওয়া উচিত। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদবাক্যে ষোল বৎসর বয়স অবধি পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করবার উপদেশ পাই। পুত্রের তো মিত্র হবার উপযুক্ত হওয়া চাই, তবেই না পিতা তাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করে তার সঙ্গে সকল বিষয়ে পরামর্শ করতে পারেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানের শিক্ষার ফলে সন্তানের শরীর যথোপযুক্তরূপে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে তৈরি হয়েছে এবং চরিত্রও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এখন, তৃতীয় সোপানের যৌবনশিক্ষার ফলে তার এতটা মানসিক উন্নতি সাধন করতে হবে যে সে সংসারের নানাবিধ বিষয়ে পিতাকে পরামর্শদান ও অন্যান্য উপায়ে সহায়তা করতে পারে। যৌবনশিক্ষার এমনটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পুত্র ক্রমশ পিতার পদ উপযুক্তরূপে অধিকার করতে পারে, সংসার ভাল করে পালন করতে পারে—সংসারে ঢুকে কথায় কথায় না হটতে হয়। ভালরকম সংসারপালনের উপযুক্ত শিক্ষা আমাদের বিশ্বাস পাঁচ ছয় বৎসরের কমে হতে পারে না। এদিকে বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অনুসারে সাবালক হবার ঊর্দ্ধতম সীমা হোল একুশ বৎসর। তাই আমাদের প্রবাদবাক্যের উপদিষ্ট পুত্রকে মিত্রবৎ গ্রহণের নিম্নতম বয়স ও সাবালক হবার ঊর্দ্ধতম বয়স, উভয়কে মিলিয়ে যৌবনশিক্ষার জন্য ষোলবৎসর থেকে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বয়স-সীমা নির্দ্দিষ্ট করতে চেয়েছি, সেটা বোধ হয় অসঙ্গত হয় নি। এই যৌবনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে বিদ্যালয়ে মানসিক উন্নতি বিধায়ক শিক্ষার শেষ হবে। শিক্ষার তৃতীয় সোপান বা যৌবনশিক্ষার মূলমন্ত্র হবে মানসিক উন্নতি।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে কি রকম শিক্ষাতে সবচেয়ে বেশী মানসিক উন্নতি হয়। আমাদের মতে মানসিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায় গণিত, উচ্চ বিজ্ঞান প্রভৃতি। গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি ছাত্রদের মনকে স্থির, ধীর ও সুগঠিত করে। গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছাত্রের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়, সকল বিষয়েই যুক্তিযুক্ততা দেখতে চায়, সকল বিষয়ের মধ্যে যথাযথ অনুপাত উপলব্ধি করতে পারে এবং সকল বিষয়ের গোড়ায় গিয়ে মূল ধরতে চায়। এই সময়ে কেবলই যে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে এমন কথা আমরা বলিনে। বিদ্যার দুইটী বাহু দুইদিকে সুবিস্তৃত—একটী সাহিত্যমূলক এবং দ্বিতীয়টী গণিতমূলক। যৌবনশিক্ষার কালে বিদ্যার এই দুই বিভাগই ভাল করে শেখানো উচিত। এই সময়েই এমন সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যেগুলির জন্য বেশী বাহিরে বাহিরে ঘুরতে হবে না, যেগুলি ঘরে বসে কণ্ঠস্থ করা যেতে পারে। ব্যাকরণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় কণ্ঠস্থ করতে

হবে সেগুলি এই সময়েই প্রবর্ত্তিত করলে ভাল হয়।

আমাদের মতে যৌবনশিক্ষাতে সাহিত্যমূলক অন্য যাই কেন শেখানো হোক না, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। সাহিত্য-মূলক শিক্ষা তবু ঘরে বসে নিজে পড়াশুনো করলে আয়ত্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু গণিতাদি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী শিক্ষকের সাহায্য চাই। এ ছাড়া, বাল্যশিক্ষাতে কৃষিকর্ম প্রভৃতি যে সকল বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা গেছে, গণিতমূলক বিদ্যাসমূহ সেই সকল বিষয়ের উন্নতিসাধনেও যথেষ্ট সহায়তা করবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার ফলে যখন আমাদের দেশের ছেলেরা নানাবিধ জিনিস তৈরি করতে শিখবে এবং চারদিকে জিনিস তৈরি করবার কারখানা খুলতে থাকবে, তখন একদিকে কৃষিকর্ম প্রভৃতি দ্বারা যেমন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে, তেমনি কৃষি প্রভৃতির সহায়তা পেয়ে দেশের বাণিজ্যও উন্নতিলাভ করে ভারতলক্ষ্মীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে। ভারতবাসীরা যদি সত্যিসত্যি বিজ্ঞান আয়ত্ত করে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার প্রতি বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োগ করে, তবে কার সাধ্য যে জগতের জীবনসংগ্রামে ভারতবাসীকে হটাতে পারে? সোনার ভারতে কৃষিবিদ্যাতে সুশিক্ষিত লোকদের কাছে সুজাত পাট প্রভৃতি কাঁচা জিনিস পাব, আর সেই সব কাঁচা জিনিস কারখানায় পাঠিয়ে অল্প খরচে "পাকামালে" পরিণত করাতে পারব। এই কারণেই সুদূরদর্শী রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্য-মূলক শিক্ষা হৃদয়কে প্রশস্ত করবার পক্ষে খুব বেশী রকমের সহায় হলেও আমরাও দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ছেলেদের দৈহিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ে যৌবনশিক্ষাতে গণিতমূলক শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের অত্যন্ত পক্ষপাতী।

শিক্ষার তৃতীয় সোপানে মানসিক উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখলেও ছাত্রদিগকে শারীরিক উন্নতিসাধক ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রভৃতি থেকে নিরস্ত হতে দেওয়া উচিত নয়। যৌবনশিক্ষার কালের পরই বলতে গেলে ছাত্রদের আর ছাত্ররূপে থাকলে চলবে না—তাদের নিজের নিজের সমাজের অংশরূপে থেকে সামাজিক হিসাবে চলতে হবে। সেই কারণে বাল্যশিক্ষাকালের উপযুক্ত ব্যায়ামাদি না করলেও তাদের নানাবিধ ক্রীড়া করতে শিক্ষা করা উচিত। এইরূপ ক্রীড়া প্রভৃতির ফলে যে কতদূর উপকার হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলুম, তখন ছাত্রগণের মধ্যে এই রকম ক্রীড়ার অভাব অত্যন্ত অনুভব করতুম। ছেলেরা সমস্তক্ষণ, যতক্ষণ পারত, স্কুলের পড়া মুখস্থ করত, আর বাকী সময় ইয়ারকি প্রভৃতি অন্যায় আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করত। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস এলিয়ট মহোদয় যখন মার্কস স্কোয়ার খোলা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে ছেলেদের মন নানাবিধ স্বাস্থ্যকর খেলার দিকে আকৃষ্ট করলেন, তখন অল্পদিনের ভিতরেই তার সুফল প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। এই যৌবনশিক্ষার সময়েই আমাদের মতে ছাত্রদের আত্মরক্ষার উপযোগী ব্যায়ামাদিও শিক্ষা করা উচিত। এই ভারতবর্ষে ত্রিশকোটী লোকের বাস এবং এই ত্রিশকোটী লোক পরস্পরের উপর অত্যাচার জুলুম করতে ইচ্ছা করলে গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী রকম চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করলেও তার প্রতিবিধান করতে পারেন কি না সন্দেহ করি। এতে আমরা গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারিনে—যাদের শাসন করতে হবে তাদের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবিধানের অভাব অবশ্যম্ভাবী। যৌবনশিক্ষার কালে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হবে বলেই আমরা ছাত্রদের আত্মরক্ষার উপযোগী ব্যায়ামশিক্ষার পক্ষপাতী। প্রত্যেক যুবা যদি আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তাহলে পরস্পরের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা স্বভাবতই কমে যাবে, এটা বলা বাহুল্যমাত্র।

যৌবনশিক্ষা মানসিক উন্নতিকে মূলমন্ত্রস্বরূপে ধরে থাকলেও একদিকে যেমন শারীরিক উন্নতিবিধায়ক ব্যায়ামাদি পরিত্যাগ করতে পারে না, তেমনি এই সময়েই দর্শনশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি পড়িয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে ধর্ম্মশিক্ষার ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। গণিতমূলক বিজ্ঞান বহির্জগতে ভগবানের লীলা দেখায়, কিন্তু সেই লীলাকে ভগবানের লীলা বলে বোঝানো আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করানো দর্শনশাস্ত্রের কাজ। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার ফলে জাগতিক ঘটনাসমূহে ঈশ্বরের হাত উপলব্ধি করলে আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যের ন্যায় বিজ্ঞান আলোচনা করলেও হৃদয় প্রশস্ত হয় কিন্তু দর্শন আলোচনা করলে হৃদয়ে গভীরতা আসে। প্রকৃত মানুষ হতে ইচ্ছা করলে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই ভালরূপ অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে হয়। যৌবন-শিক্ষার কালই এই দুইটী মহান বিষয় আয়ত্ত করবার উপযুক্ত সময়। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠনার প্রতি ঝোঁক দিতে বলেছি, কারণ তাতে শিক্ষকের প্রয়োজন বেশী। তাই বলে যে বিদ্যালয়ে দর্শন পড়ানো হবে না এমন কথা বলিনে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগও হৃদয়কে

নানাভাবে ভূষিত করে। সেই সকল বিভাগও আরম্ভ করবার এই তো সময়। সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারা যায় যে বিদ্যালয়ে যতটুকু না পড়ালে ছাত্রেরা কোন বিষয়ে ভাল করে এগোতে পারবে না, সেইটুকুই বিদ্যালয়ে পড়ানো উচিত—তারপর ছাত্রদিগকে home studyর জন্য ছেড়ে দিতে হয়।

এইবারে আমরা শিক্ষার চতুর্থ-সোপান প্রৌঢ়শিক্ষাতে এসে পড়েছি। প্রৌঢ়শিক্ষার কেন্দ্র হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি। আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল হচ্ছে ধর্ম্মশিক্ষা। সুতরাং প্রৌঢ়শিক্ষার কেন্দ্র হোল ধর্ম্মশিক্ষা। আমরা বাইশ বৎসর থেকে চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই প্রৌঢ়শিক্ষার কাল নির্দ্দেশ করেছি। এই শিক্ষাকে আমরা কতকটা post graduate course এর মত করতে চাই। শাস্ত্রে বিবাহ করে সংসারী হবার জন্য চব্বিশ বৎসর নিম্নতম বয়স নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। আমরা চাই যে সংসারের রণক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগেই ধর্ম্মের তত্ত্বে ছাত্রেরা ভালরূপে প্রবেশ করুক, যাতে জীবনসংগ্রামে ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত না হয়। এখন অবধি শারীরিক ব্যায়াম বা মানসিক জ্ঞানার্জ্জন সকলকেই বিশেষভাবে ধর্ম্মের অনুগত করে নিতে হবে। এখন আর বাল্যকালের বা যৌবনকালের হুড়োহুড়ি ও ঠেলাঠেলি করে ব্যায়ামশিক্ষা প্রভৃতি করা খুব সঙ্গত বলে মনে করিনে, কারণ তাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। শরীর রক্ষার জন্য ঠিক যতটুকু ব্যায়াম দরকার খেলা দরকার, মনে বেশ করে বুঝে ঠিক ততটুকুই করা ভাল। আর বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি যে কোন বিষয় অধ্যয়ন বা আলোচনা করব, সকলই ধর্ম্মানুগত করে নিতে হবে, সকলেতেই ঈশ্বরকে অনুভব করতে হবে, তাঁর লীলা বুঝতে হবে।

কেহ কেহ ধর্ম্মশিক্ষা থেকে নীতিশিক্ষাকে পৃথক ভাবে রেখে পৃথক ভাবে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করাতে চান। গুরুকল্প গুরুদাস বাবুও তাঁর "ভারতের শিক্ষা-সমস্যা" গ্রন্থে পৃথক ভাবে নীতিশিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্যদেশীয় এবং তাঁরা ধর্ম্ম ও নীতিকে পৃথক ভাবে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁরা প্রজাসাধারণের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাব দেখাতে বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে কোনপ্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করতে ইচ্ছুক নহেন। ভারতবাসী আমরা—হিন্দু আমরা এতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। গবর্ণমেণ্ট—গবর্ণমেণ্ট কেন, ইংরাজ প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতিমাত্রেই ধর্ম্মকে কতকটা সাম্প্রদায়িকতার চক্ষে দেখেন। আমরা যখন ধর্ম্মশিক্ষার কথা বলি, তখন বিশাল ও উদার অর্থেই ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করি। আমাদের শাস্ত্রেও প্রধানত এই ভাবেই ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা আমাদের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মভিত্তী দেখতে চাই। আমরা বুঝতেই পারিনে যে নীতিকে কেমন করে ধর্ম্ম থেকে পৃথক ভাবে দেখা যেতে পারে। পাশ্চাত্যদের ধর্ম্ম হোল কতকগুলি অনুষ্ঠানবিশিষ্ট religion নামক বস্তুবিশেষ। আমাদের ধর্ম্ম হোল যাহা কিছু আমাদিগকে ধরে রাখে অর্থাৎ সুপথে পরিচালিত করে। আমাদের ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ হোল নীতি, কিন্তু সেই নীতি ধর্ম্ম থেকে পৃথক নয়। নীতির কথা বলতে গেলেই নীতির মূল এক নিয়ন্তা পুরুষের কথাও বলতেই হবে—দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নীতির কথা পৃথক ভাবে বল্লে একই নীতি যে সকলের প্রতি প্রযুজ্য এ কথা সকলে স্বীকার করবে কেন? তোমার পক্ষে যেটা সুনীতি, আমার পক্ষে সেটা সুনীতি না-ও হতে পারে। কিন্তু যদি এটা স্থির জানি যে সুনীতিমাত্রই একই মূল প্রস্রবণ থেকে নেমে এসেছে, তবেই আমরা জোর করে বলতে পারি যে সুনীতিগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে প্রযুক্ত হলেও সেগুলি সকল অবস্থাতেই সুনীতি এবং সকলেরই শিরোধার্য্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আমরা মারামারি করতে চাইনে। আমরা কেবল বলতে চাই যে ধর্ম্মশিক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে নীতিশিক্ষা যে কেমন করে হতে পারে আমরা তা বুঝতেই পারিনে এবং ধর্ম্ম থেকে পৃথক করে নীতিশিক্ষা দেবারও আমরা পক্ষপাতী নহি।

নীতিশিক্ষা বল্লে আমরা কি বুঝি একবার দেখা যাক। নীতিতত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে যে তার মূলতত্ত্ব হচ্ছে মানবে প্রীতি ও সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাব। এখন প্রশ্ন এই যে আমরা মানবে প্রীতি করব কেন, প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাবই বা রাখতে যাব কেন? আমার যদি একজনকে মেরে ক্ষণিক সুখ হয় তবে সুখটুকু ছেড়ে দেব কেন? মদ্যপান প্রভৃতি অত্যাচার অনাচার করে আমি যদি ক্ষণিক আরাম পাই, তবে সে আরামটুকু ভোগ করা ছেড়ে দেব কেন? এর উত্তরে এই এসে পড়ে যে একই ভগবান আমাদের সকলের পিতা, তিনিই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা। আমরা সকলে সেই একই পিতার সন্তান বলেই আমাদের পরস্পরকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য এবং সেই কারণেই ক্ষণিক সুখের লোভে প্রকৃতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মসমূহের বিপরীতে গেলে আমাদের শাস্তি পেতে হয়। সকল নীতির মূলে যখন সেই একই পরমাত্মা, তখন বলা বাহুল্য যে নীতিশিক্ষার মূলে ধর্ম্মশিক্ষা নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্মশিক্ষার ভিতরেই ব্রহ্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সকলই অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্মশিক্ষার

সহচররূপে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

বর্ত্তমানে ছাত্রদের মধ্যে যে একটা অশান্তি ও বিপ্লব-পক্ষপাতী ভাব জেগে উঠেছে তাহা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমরা এই বিষয়ে ভাল করে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়িয়েছি যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই তার প্রধান কারণ। বিদ্যালয়ে তো শুষ্ক ও নীরস নীতির যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়, তবু সে নীতি ছাত্রদের অন্তর স্পর্শ করছে না কেন? আর, হিন্দুরাজত্বের কালে নীতি তো পৃথক ভাবে শেখানো হোত বলে ইতিহাসে দেখতে পাইনে, কিন্তু তখন যে শিক্ষা দেওয়া হোত, তার ফল ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত দেখি যে কেহ মিথ্যা কথা বলত না, গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি অব্যাহত ছিল, ঘরে কথায় কথায় তালাচাবি লাগানো দরকার হোত না। সম্প্রদায় বিশেষের ভিতর থেকে একটা কথা উঠেছে যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা গবর্ণমেণ্টের ভুল হয়েছে—কারণ সেইটিই নাকি ছাত্রদের দুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবের মূল। একথা যাঁরা বলেন বা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হৃদয় যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং তাঁদের মত যে একটা গুরুতর ভুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আমাদের স্থির ধারণা এই যে, যে সময়ে গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য প্রণালীর শিক্ষা ভারতে প্রবর্ত্তিত করেছিলেন সে সময়ে সে রকম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হলে দেশের মধ্যে কেবলমাত্র অজ্ঞতার ফলে গোঁয়ারতমী, অরাজকতা ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বৈপ্লবিক ভাব সমূহ এত শীঘ্র বদ্ধমূল হোত এবং এতদূর বিস্তৃত হোত যে, তখন সে ভাবকে গবর্ণমেণ্ট সামলাতে পারতেন কিনা সন্দেহ, কারণ বলতে গেলে সে সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সবেমাত্র প্রোথিত হবার সূত্রপাত হচ্ছিল।

গবর্ণমেণ্ট যদি একথা বলেন যে ভারতবর্ষে এত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে যে তাঁরা কোন্ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন তা ঠিক করতে পারেন না, তাহা সমীচীন নয়। যে মহোদয় এক সময়ে অনেক বৎসর ধরে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, এবং যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরের পদে অনেক বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত কথায় একটি অতীব যুক্তিযুক্ত ও সারগর্ভ উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে ভারতের "এই সকল সাম্প্রদায়িক মতের বিভিন্নতার মধ্যে দুইটি বিষয়ে সকল সম্প্রদায় একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায় এবং সকল জাতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে। সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে এই ঐকমত্য থাকাতেই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব।" পশ্চিমাঞ্চলে রমণীরত্ন শ্রীমতী আনি বেসান্ত কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে ধর্ম্মশিক্ষার যে ব্যবস্থা করেছেন এবং সুদূর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যতম অগ্রণী শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় অল্পদিন হোল যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই সকলেতেই আমরা গুরুদাস বাবুর কথারই সম্পূর্ণ সার পাই। আমাদের মোট কথা এই যে, যে উপায়ে হোক, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করতেই হবে। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আমাদের ছেলেগুলো যে আত্মহত্যার পথে, ধ্বংসমুখে চলেছে। আর আজকাল ভারতবর্ষে ধর্ম্মের যে রকম একটা হাওয়া চলেছে, তাতে চেষ্টা করলে বিদ্যালয়-পাঠ্য নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থেরও অসদ্ভাব হবে বলে বোধ হয় না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত এতদূর পর্য্যন্ত আমরা সেই বিষয়েরই আলোচনা করে এসেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কার হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত, কার উপর শিক্ষা নিয়মিত করবার অধিকার দেওয়া হবে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট দেশের সুশাসনের উপায় অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন—তার নাম ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন কমিটি। উক্ত কমিটির শিক্ষা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট পড়ে আমরা যতদূর বুঝেছি, তাতে বোধ হয় যে গবর্ণমেণ্ট বলতে গেলে এদেশের শিক্ষা নিয়মিত করবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে রাখতে চান। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাব্যবস্থা নিজের হাতে রাখলে সম্পূর্ণ ভুল করবেন, এদেশবাসীদিগকে প্রকৃত পথে চালিত করবার ঠিক পথ কিছুতেই খুঁজে পাবেন না। তাঁরা রাজনীতির চক্ষে শিক্ষাকে দেখতে গিয়ে এবং তারই উপযোগী নানা বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে কখনই প্রকৃত সত্য কথার সন্ধান পাবেন না। আমরা যতদূর জানি তাতে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট কমিশনের দ্বারা বা অন্য যে কোন প্রত্যক্ষ উপায়ে আমাদের দেশের কথা যখন অনুসন্ধান করতে যান, তখন তাঁরা অধিকাংশ স্থলেই খাঁটি সত্য কথা শুনতে পান না, আমাদের প্রাণের কথা, ভিতরের কথা শোনবার সম্পূর্ণ সুবিধা পান না। গবর্ণমেণ্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেশের কথার সন্ধান দিতে যান, আমাদের বিশ্বাস যে তাঁরা যতই কেন চেষ্টা করুন না, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মনস্তুষ্টি সাধনার্থে তাঁদেরই মতের পরিপোষক কথাগুলি বলে আসেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে

আমরা উপরোক্ত কমিটিরই কথা উল্লেখ করব। কমিটি তো শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকগুলি লোকের সাক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু সাক্ষীদের মধ্যে কাহাকেও তো এমন কথা বলতে দেখলুম না যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে ছেলেদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাব এসেছে, অথচ আমাদের দেশের লোক যখনই আপনাদের মধ্যে ছেলেদের বৈপ্লবিক ভাবের বিষয় আলোচনা করেন, তখনই তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে এরূপভাবের অন্যতর প্রধান কারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত কথা শুনতে না পেয়ে উপর উপর শাসনের দ্বারা দেশের বৈপ্লবিক ভাবকে যতই দমন করতে চেষ্টা করছেন, প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের ফলে সেটা ততই জোরে ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে। গবর্ণমেণ্টের উপর থেকে এইরূপ প্রতিবিধান চেষ্টা আকর্ষক যন্ত্রের কাজ করে দেশের বৈপ্লবিকভাব দিন দিন অধিকতর বলের সঙ্গে টেনে বের করছে। আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে গবর্ণমেণ্ট যদি এই বৈপ্লবিকভাবের মূলে গিয়ে না ধরেন এবং বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে কিছুতেই তাঁরা দেশের অরাজকতা বন্ধ করতে কৃতকার্য্য হতে পারবেন না। গবর্ণমেণ্টের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনের ভার থাকলে তাঁদের দৃষ্টি রাজনীতিভ্রষ্ট না হয়ে যেতে পারে না। সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে ইচ্ছা করলে আমাদের মতে শিক্ষাব্যবস্থার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভার সভ্যেরা তাঁদের সভার অধিবেশনে দেশের কথা বেশ স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে পারবেন। আর, তার উপর, সেই সকল সভ্যদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশীয় সমাজের নেতা, সুতরাং আশা করা যায় যে তাঁরা স্বদেশের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা করলে যথার্থ উপকার হবে সেটা তাঁরা যে বেশ জানেন। বিশ্ববিদ্যালয় যখন শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও নিয়মিত করবার জন্যই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তার সভ্যগণ সকলেই যখন শিক্ষাবিভাগেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তখন কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সেটা কেড়ে নেওয়া হবে তার কোনই কারণ দেখা যায় না। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি নে যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অনিষ্টকর অথবা বিপ্লবসাধক শিক্ষাপ্রণালী বিনাবাধায় প্রবর্ত্তিত করবার অধিকার পাবে। আমাদের বোধ হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত ভারটা রেখে গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে সেই ব্যবস্থার মধ্যে দেশের অনিষ্টকর বা বিপ্লবসাধক অংশগুলি বন্ধ করবার ভারটুকু রেখে দিলেই যথেষ্ট হয়। তাহলে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়বহুল একটা শিক্ষাবিভাগ রাখবার প্রয়োজন থাকবে না, মুদ্রাযন্ত্রের censor এর ন্যায় একটী কর্ম্মচারী থাকলেই যথেষ্ট হয়। শিক্ষাবিভাগের উপর যে টাকা খরচ হয়, সে টাকা শিক্ষাবিস্তারে নিয়োগ করলে দেশের কত উপকার হয়।

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত যা কিছু বলে এলুম, তার অনেক অংশই theoretical বা পুঁথিগত হয়েছে—এটা করলে ভাল হয়, এটা করা উচিত ইত্যাদি। কেবল মাত্র জানলেই হবে না যে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করলে ভাল হয়, ওরকম প্রণালীর ফলে মন্দ হয়। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধায়ক শিক্ষাকে ছেলেদের জীবনে আনাতে গেলে তাকে আচারগত করতে হবে। শুভদায়ক শিক্ষাপ্রণালীকে জেনে সেটা অবলম্বন না করলে, আমাদের প্রতিদিনের আচার ব্যবহারে তাকে প্রকাশ করতে না পারলে তাহা আমাদের কোন কাজেই এল না। আমাদের মনুপ্রমুখ শাস্ত্রকার সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা তাঁদের উপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর প্রথমেই আচার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি বয়সে ও অভিজ্ঞতায় যতই অগ্রসর হচ্ছি মনুপ্রোক্ত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি আমার অনুরাগ ততই বাড়ছে। বর্ত্তমান কালে মনুর শিক্ষাব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতে আমরা বলি নে। আমরা বলি যে সেই শিক্ষাব্যবস্থার মূলতত্ত্ব অনুসরণ করে শিক্ষাপ্রণালী গড়া উচিত। ঋষিরা তাঁদের শিক্ষাপ্রণালীর মূলে যে আচারপদ্ধতির ব্যবস্থা করেছেন তার মূলমন্ত্র হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হলে বীর্য্যলাভ হয়। এই বীর্য্য অর্থে মুখ্যত শারীরিক বীর্য্য হলেও মানসিক বীর্য্যও বাদ যায় না। শরীরের ও মনের বীর্য্য থাকলে বিলাসিতার দিকে মন যায় না, মনের স্থৈর্য্য আসে এবং সেই একাগ্রতার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সহজ হয়, জগতের সকলই মিষ্ট বোধ হয়। শরীর ও মনে বল থাকলে বায়ুশান্তির জন্য একটাকা হতে ছয় টাকা মূল্যে ষড়্গুণ বা সহস্রগুণ বলিজারিত বিশুদ্ধ স্বর্ণপ্রস্তুত মকরধ্বজ বৎসরাধিক কাল ধরে সেবন করতে হয় না। শরীর দুর্ব্বল হলেই প্রাণরক্ষার জন্য যতরকম দুর্মূল্য ঔষধ ও পথ্য আবশ্যক হয়। তার ফলে আমাদের অভাব বেড়ে যায়। তখন অভাব পূর্ণ না হলেই গুরুজনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি, রাজভক্তি কোথায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুসন্ধান করলে স্তম্ভিত হতে হবে যে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে শতকরা নিরনব্বই জন রোগে কষ্ট পাচ্ছে। ভীষণ ভীষণ রোগ—যেগুলি পূর্ব্বে চিকিৎসাশাস্ত্রে লেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই সকল রোগের

চিহ্ন আজ প্রায় সকলেরই মুখে দৃষ্ট হয়। সংবাদ পত্রে এই সকল ভীষণ রোগের এবং সেই সকল রোগের ততোধিক ভীষণ ঔষধবিষয়ক বিজ্ঞাপনের বাহুল্যই আমাদের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করবে। ছাত্রদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলে ঋষিদের পদানুসরণ করে যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, সেই সকল উপায় সম্বন্ধে দুএকটী ইঙ্গিত মাত্র করব। মদের দোকান এবং বারবনিতাদের আড্ডা ভদ্র পল্লী থেকে সুদূরে স্থানান্তরিত করা উচিত। সংবাদ পত্রে সাময়িক নানাবিধ পাপাচারের বর্ণনা বন্ধ করা উচিত, অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করা উচিত, টিকটিকি গল্প সমূলে বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত। তুমি তো চাওনা যে তোমার ছেলে অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেখুক, ডিটেক্‌টিব গল্প পড়ে বদমায়েষ হয়ে উঠুক। এই বিষয়ে একদিকে সমাজকে মিলিতভাবে অগ্রসর হতে হবে, অপরদিকে গবর্ণমেণ্টকে খোলা মনে সমাজকে সাহায্য করতে হবে। তবেই সমাজের এবং রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হবে। আসুন সকলে মিলিত হয়ে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ছেলেদের আচরণীয় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করে দিই এবং তার পর সেই ভিত্তির উপর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুতকরণে উদ্যোগী হই।

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত বলে এসেছি। এই বারে আর একটী কথা বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য। অনেকগুলি প্রদেশ এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন লিখন-প্রণালী। ভাষা ও লিখনপ্রণালীর মধ্যে এই রকম বিভিন্নতা থাকলে পরস্পরের মধ্যে মনের ভাবপ্রকাশে বড়ই বাধা জন্মে। জানি নে, রাজনীতিদৃষ্টিতে এরকম বিভিন্নতা রাখা আবশ্যক কি না। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে সমগ্র ভারতের ভাষা ও লেখবার অক্ষর এক হলে যেমন দেশেরও উপকার, তেমনি রাজার রাজত্বেরও পক্ষে মঙ্গলজনক। মনে কর ভারতের এক প্রান্তে বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল, সমগ্র দেশের আপামর সাধারণের ভাষা ও লেখা এক হলে সমস্ত ভারতবর্ষ একহৃদয়ে মিলিতভাবে সেই বৈপ্লবিক ভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এখানে সম্ভাবের উত্তেজক বক্তৃতা হোল, প্রবন্ধ বেরোল, সমস্ত ভারতের সংবাদপত্র প্রভৃতি তাহা প্রকাশ করে এই মহান্ সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ভারতের এক বর্ণমালার উপকারিতা উপলব্ধি করে দেবনাগরকে এদেশের সাধারণ অক্ষরে দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য ও কার্য্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও আমরা যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে বলতে চাই যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যসাধনকল্পে যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন সেই উপায় বড় সুবিধাজনক হয়নি। আমাদের মতে ভারতের অন্তর্গত যে সকল প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা বা বর্ণমালা প্রচলিত আছে, সেই সকল বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অগ্রণীদিগকে একটী সভায় আহ্বান করে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করে একটী কমিটি গঠন করলে ভাল হয়। সেই কমিটির দেশ ও জাতি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করে দেখা উচিত যে কোন্ ভাষা সমগ্র দেশে প্রচলিত হবার উপযোগী এবং কোন্ বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংগঠিত। সেই কমিটির বিচারফল সমুদয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সবিস্তার আলোচিত হওয়া উচিত। তার পর সমগ্র ভারতের সাহিত্যিকগণের একটী সাধারণ সভায় সেই সকল সমালোচনার দৃষ্টিতে কমিটির বিচারফলগুলি আলোচিত হয়ে যাহা স্থির হবে তাহাই অবনত মস্তকে সমগ্র ভারতবর্ষকে শিরোধার্য্য করে লওয়া উচিত। এইরূপ উপায়ে যে দিন সমস্ত ভারতের জন্য এক ভাষা ও এক বর্ণমালা স্বীকৃত হবে সে দিন কি শুভ দিন, কি আনন্দের দিন! সেই দিন আমরা সকলে বর্ত্তমানের উপর দাঁড়িয়ে একদিকে ঋষি-প্রমুখ ভারতের পুরাতন অধিবাসীদিগকে, অপর দিকে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় স্বদেশবাসীদিগকে এক আশ্চর্য্য প্রেমসূত্রে বেঁধে ত্রিশকোটী মানবের সমবেত কণ্ঠে সিংহ-নাদে মিলনের মহামন্ত্র উচ্চারণ করে কৃতার্থ হব এবং ভারতের অধিষ্ঠাত্রী পরমদেবতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণিপাত করব।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বং সংজানানা উপাসতে॥

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

প্রতিভা—চৈত্র ১৩২১—এই পত্রিকা ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত। আমাদের মনে হয় যে, সাহিত্যপরিষদের যতগুলি শাখা আছে, প্রত্যেক শাখা হইতেই এক একখানি মুখপত্র প্রকাশ করা উচিত। সেই সকল পত্রিকার আকার "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' আকার হইলেই ভাল হয়। প্রতিভার বর্ত্তমান সংখ্যা প্রবন্ধগৌরবে স্বীয় সুনাম রক্ষা করিয়াছে। শ্রীমহিম চন্দ্র নন্দী ঢাকাজিলার উত্তর পশ্চিমাংশে প্রচলিত লক্ষ্মী-নারায়ণের ব্রত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ব্রতকথায় আমরা এদেশের পূর্ব্বকালে প্রচলিত আচার ব্যবহারের

কতকটা আভাস পাই। শ্রীশিবায়ণ সেন লক্ষ্মীচরিত্রও উল্লেখ যোগ্য। এটি ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি পুঁথির আলোচনা। প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখক যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের বড়ই মিষ্ট বোধ হইল বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"লক্ষ্মী হিন্দু জাতির সুখ সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এজন্য লক্ষ্মীর রূপকল্পনায় ঐশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। তিনি গজশুণ্ডধৃত হেমকুম্ভনিঃসৃত স্নিগ্ধ সলিলস্নাতা; সুপ্রফুল্ল কমল সকল তাঁহার হস্তে শোভা পায়; বহুমূল্য রত্ন সকল তাঁহারই অধিকারে—তদ্ধেতু ঐশ্বর্য্যবান মানব সতত কমলার কৃপা ভিখারী। বঙ্গসমাজে ঐশ্বর্য্যবান লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও বাঙ্গালীর চির অশান্তিময় জীবন মরুপথে একটি সুখশীতল পান্থশালা আছে। সেই পান্থশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মঙ্গল হস্তের স্পর্শে বাঙ্গালী জীবন-সংগ্রামের সমস্ত আঘাতের কথা বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব শান্তিসাগরে ডুবিয়া যায়। বঙ্গবাসী বিশ্ব খুঁজিয়া এ শান্তির উপমা পায় না। এত প্রেম—এত ভালবাসা—এত আত্মদান বাঙ্গালার কুটীরবাসিনী জননীগণ ব্যতীত আর কার হৃদয়ে সম্ভবে! এজন্যই বাঙ্গালী গৃহশান্তিবিধায়িনী জননীগণকে ভক্তির চক্ষে দর্শন করেন। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রান্তদেহে গৃহপ্রত্যাগত বাঙ্গালী শ্রমজীবী যখন দেখে তাহার জন্য সুখাদ্য অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া এক দেবী পথ-পানে চাহিয়া আছেন, তখন তাহার সমস্ত অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়। রোগশয্যাশায়ী বাঙ্গাল যখন দেখেন, তাঁহার পার্শ্বস্থিতা এক দয়াময়ী দেবী অনন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, দৃষ্টিতে অনন্ত কল্যাণ-কামনার ভাব ব্যক্ত—দারিদ্র্যের ঘোর নিষ্পেষণে আত্মহারা বাঙ্গালী যখন বুঝেন তাঁহার দুঃখের সমভাগী বর্ত্তমান আছে, তখন বাঙ্গালী সর্ব্বমঙ্গলা জননীজাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার মস্তক নত করেন।

বঙ্গদেশে তথা ভারতে নারী জাতির প্রতি যত সম্মান জগতের আর কোথাও তেমন নাই। ভারতবাসী সেবাধর্ম্ম ভালবাসেন ও স্ত্রীজাতির সম্মান জানেন এজন্য ভারত-সন্তান সতী জননীগণের পবিত্র নাম স্মরণান্তর প্রভাতে শয্যাত্যাগ করেন। বঙ্গদেশে একশ্রেণীর লোক আছে তাহারা অতীতকাল হইতে দ্বারে দ্বারে স্ত্রীজাতির চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। এই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া মহিলাগণ তাঁহাদের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লন। তাহারা যখন সুর তুলিয়া গান করিতে আরম্ভ করে, কুলবালাগণ হস্তের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তখন বাঁশরীতানমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই গান "লক্ষ্মীচরিত্র গান" নামে খ্যাত কখন কখন বৃদ্ধা পিতামহী নাতিনীদিগকে লইয়া সন্ধ্যায় সকালে এই গানের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

ব্রহ্মবিদ্যা—চৈত্র ১৩২১—ইহাতে আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সকল প্রবন্ধই দার্শনিকভাবে গুরুগম্ভীর। কিন্তু দুঃখের বিষয় আটটি প্রবন্ধের মধ্যে সাতটি পূর্ব্বের অনুবৃত্তি। "চিত্তাশক্তি ও তাহার সংযম ও সাধনা" একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। হীরেন্দ্র বাবুর "উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্বের" নবম অধ্যায় চলিতেছে। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। "প্রাণের কথা" বাস্তবিকই প্রাণের কথা।

হিন্দু পত্রিকা— চৈত্র ১৩২১—এই পত্রিকাতে অথর্ব্ববেদ সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। নারীচর্য্যা প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২১।

একমেবাদ্বিতীয়ং
উনবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৬।
৮৬৩ সংখ্যা
১৮৩১ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
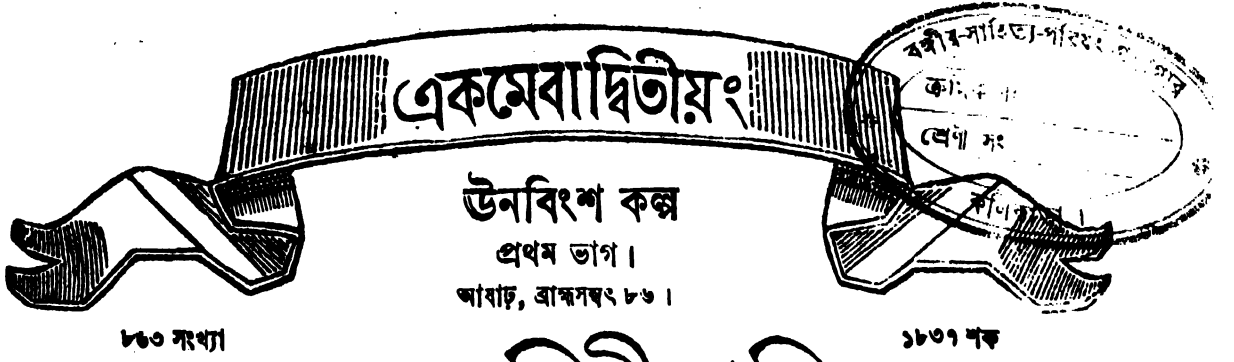
উদ্বোধন।

যে অমৃত পুরুষ আমাদের সঙ্গে নিয়তই রহিয়াছেন, এস আজ এই মাসের প্রথম দিনে আমরা তাঁহাকেই হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করি। আমরা এখনও কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আছি? এস, আমরা জীবন্তরূপে অনুভব করি যে তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের রক্ষাকবচস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমাদের কিসের ভয়? যাঁহা হইতে প্রাণ পাইয়াছি, তাঁহারই কার্য্যে যদি প্রাণ যায়, তবে সে প্রাণ তাঁহারই কার্য্যে যাক, সে তো সুখের কথা। কত দেশে কত লোকে রাজার জন্য অনায়াসে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, আর আমরা কেন প্রাণ-দাতা পরমেশ্বরের কার্য্যে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিব না? পরমেশ্বর আমাদের প্রাণদাতা ও রক্ষাকবচ, এস, সেই কথা আমরা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ-রূপে উপলব্ধি করি। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর যে আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাঁহাকে প্রাণে ধারণ করিলেই আমরা জানিতে পারিব যে যাঁহা হইতে আমরা প্রাণমনধন সমুদয় লাভ করিয়াছি, সেই মহান্ পরমেশ্বর "ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং" তাঁহার কাছে থাকিলে কোন কিছুতেই ভয় নাই। তাঁহাকে জানিয়া, আইস, আমরা নির্ভীক হই এবং তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, সেই অমৃত পুরুষের সহবাস লাভ করিয়া মৃত্যুর অতীত হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

সত্যসুন্দর।

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

আমাদের একটী নব যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগটী ধর্ম্মের যুগ। ধর্ম্মের যুগে ধর্ম্মের ভাব প্রাণকে অধিকার করে। ধর্ম্মের ভাব মনে আসিলে ভাল বুদ্ধির উদয় হয়, জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তখন ভালমন্দ বিচারের শক্তি আসে, আর তদনুসারে কর্ম্ম করিতে তৎ-পরতা জন্মে। মনে মন্দ ভাব আসিলে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে; বুদ্ধিবিবেচনা ঠিক থাকে না। তখন জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়া দেয় এবং ন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায় করিতে মানুষকে বাধ্য করে।

এই ধর্ম্মভাবের মূল পরম পিতা পরমেশ্বর। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া বিশ্বরূপে তাঁহার সত্যসুন্দর মঙ্গল ভাব দেখাইতেছেন। তাঁহার জগতসৃষ্টিতে কত না লীলা কত না ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্রতায়, সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাঁর সত্যসুন্দর ভাব কেমন সুন্দর প্রকাশ পায়। প্রকৃতি তাঁরই সৌন্দর্য্যে ঢলঢল, তাঁরই ভাবে গদগদ। চেতন অচেতন সকল পদার্থ নিজ

নিজ ভাষায় সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে তাঁহার নাম প্রচার করিয়া তাঁহার স্তুতিগান করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছে, নমস্কার করিতেছে। তাঁহার ভাবে সকলেই ভাবুক।

ভগবানের সত্যসুন্দররূপ হৃদয়ে অনুভূত হইলে নিজের অস্তিত্ব থাকে না; তাঁহার ভাবে ভাবুক হইলে তাঁহাতে একেবারে মিশিয়া যাইতে হয়। তখন তাঁহার বাণীতে শ্রবণ ভরিয়া যায়; তাঁহার রসাস্বাদনে অন্তরাত্মার পরিতৃপ্তি হয়। তখন সকল অবস্থাতেই সন্তোষ জন্মে এবং সকল বস্তুতে তাঁহা-'রই স্পর্শ অনুভূত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে নিজের নিজত্ব থাকিতে পারে না। সকল শক্তিই তাঁরই সেবার জন্য, তাঁর প্রতি একান্ত ভালবাসা দেখাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারা যায়। তখন তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হইয়া উঠেন এবং আমাদের অন্তরে নবশক্তির উদয় হয়।

সেই সত্যসুন্দর পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি প্রেমেতে সত্যেতে সত্যস্বরূপ হইয়া স্বপ্রকাশ হয়েন। সেই পরমেশ্বর ব্যতীত আমাদের মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। তিনিই মূলাধার, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই আমাদের একমাত্র সম্বল, তিনিই আমাদের সব। তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিজেকে জগতের মঙ্গলের জন্য দান করিয়াছেন। তিনিই দাতাকর্ণ, দয়ার সাগর দয়াময়।

একবার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখ, হৃদয়-মন্দিরে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাঁহার আকর্ষণে তাঁহার সহিত আমরা কেমন যুক্ত হইয়া পড়ি। তাঁহার তেজে আমাদের সকল শক্তি সকল তেজ প্রকাশ পায়। আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই সন্তান। আমরা যদি সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হই তবে তিনি কত না আনন্দিত হয়েন। জগতের সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে, এস, আম-রাও তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

আমাদের মনকে সুন্দর না করিলে সুন্দরের সুন্দর তাঁহাকে কি প্রকারে দেখিতে পাইব? সেই অন্তর্যামীর বিশুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলে অন্তঃ-করণকে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে হইবে। ঊষার আগমনে যেমন সূর্য্যের আলোক পাইয়া জীবজন্তুগণ জাগিয়া উঠে, প্রাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানময় জ্যোতিকে পাইলে অন্তরের সকল অন্ধ-কারই ঘুচিয়া যায়। সেই অনাদি অসীম জ্ঞানেরই ইঙ্গিতে এই জগতসংসারের লীলা চলিতেছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ ক্ষুদ্রভাবে পূর্ণ হইয়া যেন নিভিয়া না যায়। আমরা যেন তাঁহার আলোক আত্মাতে নিয়ত জ্বালাইয়া রাখিয়া আত্মাকে সর্ব্বদাই সজীব রাখি। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সাধনার দ্বারা আমরা যেন আপনাদিগকে তাঁহারই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। প্রতি-দিন প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার পূজা করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া জীবনের প্রত্যেক কাজ করিতে হইবে। তাঁহাকে যখন আমাদের জ্ঞানে, ধ্যানে ও কর্ম্মে প্রত্যক্ষ করিব, তখন তাঁহাকে "আমার" বলিয়া অপূর্ব্ব আনন্দসাগরে অবগাহন করিব। তখন কি আরাম, কি আনন্দ, কি শান্তি।

হে সত্যসুন্দর মহান পুরুষ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে, আমার ভাষায়, সুরে, গানে, স্তবে, আমার যাহা কিছু আছে সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হও। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাও। সংসারজালে তুমি আমাকে আবদ্ধ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া আমার মুক্তি কোথায়? তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। পিতঃ আমি আমার জ্ঞানে, ধ্যানে ও কর্ম্মে তোমাকে দেখিতে চাই। তুমি আমার গানে, আমার সুরে, আমার প্রত্যেক কার্য্যে তোমার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ কর। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তুমি অবতীর্ণ হও, যাহাতে তোমার মহান শক্তিতে শক্তিমান হই, আর তোমার ইচ্ছাতে আমার ইচ্ছা মিলিত করিয়া দিই। এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর থাকি।

হে জ্ঞানস্বরূপ! আমাকে তোমার জ্ঞানের অধিকারী কর। তোমার প্রেমে আমার হৃদয় ভরিয়া দাও; তোমার সঞ্জীবনীমন্ত্রে আমাকে সজীব কর। আমি জ্ঞানহীন, আমার প্রতি দয়া কর, তোমার জ্ঞানের কণামাত্র পাইলে আমার কোনই অভাব থাকিবে না। হে পিতঃ, আমার আত্মাকে এমন জ্ঞানে পূর্ণ কর, যাহার তেজে পাপরাশি

ভস্মীভূত হইয়া যায়। হে সুন্দর! তোমার প্রেম-ময় মূর্ত্তি যেন নিত্যই আমার অন্তরে দেখিতে পাই। আমি তোমারই সন্তান, তোমারই পবিত্র ভাবে আমার আত্মাকে পূর্ণ কর, আমাকে তোমার পবিত্র নামের অধিকারী কর। আমাকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা এবং প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখ।

হে পিতঃ! যে সংসারবন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইয়া আছি, সেই সংসারকারাগার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া চল। তুমি আমার জ্ঞান, তুমিই আমার শক্তি। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লও। তোমার একটিমাত্র নিঃশ্বাস আমার সকল পাপ বিদূরিত করুক। তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া যেন পুণ্য কর্ম্মে ব্রতী হই। তোমারই স্তুতিগান করিয়া আমি যেন ধন্য হই। তোমার দয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করিও না। তুমিই একমাত্র নিরাশার আশা, তুমিই একমাত্র আমার ভরসা। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলিয়া যেন তোমার কৃপাদৃষ্টির বাহিরে না পড়ি। তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে দিবানিশি প্রতিষ্ঠিত থেকো। হে জাগ্রত দেবতা, তোমারই উদ্দেশে আমরা সকলে চলিয়াছি, তোমাকে খুঁজিতে গিয়া যেন পথ না হারাই। তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃতভবনে লইয়া যাইবার পথপ্রদর্শক হও।

হে দেব! আমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার হৃদয়ে তুমি তোমার পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হও। তোমার জ্যোতির প্রভাবে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। আমার হৃদয়কে তোমার সৌরভে আমোদিত কর। তোমার সৌন্দর্য্যে আমার মন প্রাণ নিত্যই ডুবিয়া থাকুক। হে অভয়দাতা, তুমি আমাকে অভয়দান কর। তোমাকে দান করিয়া আমার শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ কর। আমার সকল পাপতাপ সকল মলিনতা দূর হৌক। তোমাকে না পেলে আমার মন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি ছাড়া আমার সেই ব্যাকুলতা আর কে দূর করিবে? তুমি একটিবার আমার নয়নের সম্মুখে এস, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। এই আশীর্ব্বাদ দাও যেন তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে ডুবিয়া না যাই, তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যেন এক-পদও অগ্রসর না হই।

হে নাথ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও যে বাঁচিতে চাই না। যে ফুল দিয়া লোকে তোমায় পূজা করে, তুমি আমাকে সেই ফুল কর, আমি সর্ব্বদাই তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব। আমিও আজ হৃদয়থাল ভরিয়া ভক্তিপুষ্প তোমাকে দিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তুমি আমার প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমারই পূজার জন্য আমার হৃদয়মন্দিরকে সুন্দররূপে সাজাইয়াছি, তুমি সেখানে এসে আমার পূজা গ্রহণ কর। হে ভগবান তুমি আমার হৃদয়কে জ্ঞানে প্রেমে ভক্তিতে উজ্জ্বল কর। আমি তোমার ধ্যানে তোমার ভাবে ডুবিয়া গিয়া জীবনকে সার্থক করি। তোমাকে নমস্কার।

কষায়।

(শ্রীজলধর সেন)

নিম্নে আমি যে বিষয়ের আলোচনা করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া পাছে যদি কেহ মনে করেন যে আমি উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই জন্য আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি নিম্নে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে সমস্তই আমার শেখা কথা, অভিজ্ঞতা-লব্ধ কথা নহে। কাঙ্গাল হরিনাথের নিকট তাঁহার সাধনলব্ধ যে সকল তত্ত্বকথা আমি শুনিয়াছি, এবং তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদে' যে সকল কথা তিনি বহুদিন পূর্ব্বে অতি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, আমি তাহারই সার সংগ্রহ করিয়াছি, অথবা তাহাই আবৃত্তি করিয়াছি। তাঁহার সেই সকল অমূল্য উপদেশ যাহাতে সকলের অধিগম্য হয়, তাহারই জন্য আমার এই প্রয়াস। তিনি 'কষায়' সম্বন্ধে যে উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

উপাসনার সময় মদমত্ত মাতঙ্গ, বায়ুতাড়িত দীপশিখা ও জলাশয়ের ন্যায় মন একবার এদিক, একবার ওদিক গতায়াত করে, চঞ্চল হয়; যাহা কিছু কখন ভাবি নাই ও স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, মনের মধ্যে এরূপ কত কি উপস্থিত হয়। মন ভগবানের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে সংসারের চিন্তা করে, কিছুতেই স্থির হয় না।

সাধক ভাবেন, তিনি ভগবানেরই চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন সাংসারিক কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতেছে, হঠাৎ কে যেন তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দেয়। তখন সাধক চকিত, লজ্জিত ও ব্যাকুলিত হইয়া সেই চিন্তা দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা করেন; ভাবেন সে সকল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আবার দেখেন, অন্য এক চিন্তা তাঁহার মনের সহচরী হইয়া খেলা করিতেছে। তরঙ্গপতিত নৌকারোহী যেমন মনে করে, সম্মুখে এই যে তরঙ্গ আসিতেছে এইটী চলিয়া গেলেই আর কোন তরঙ্গ আসিবে না, আপচ্ছান্তি হইবে; কিন্তু সে তরঙ্গটী যাইতে না যাইতেই অপর একটী আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধকও এই প্রকার চিন্তাতরঙ্গে পতিত হইয়া চিত্ততরী স্থির রাখিতে পারেন না। পণ্ডিতগণ ইহাকেই কষায় বলিয়াছেন। যতদিন এই কষায় সাধকের হৃদয়স্থান পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহার চিত্ত স্থির হয় না বরং বর্ষাকালে তরঙ্গিত নদনদীর জলের ন্যায় ঘোলা হইয়া থাকে। ঘোলা জলে যেমন মুখ দেখা যায় না, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়েও ভগবানের আবির্ভাব প্রকাশ পায় না। মেঘরাশি যেমন সূর্য্য তারকা চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে ঢাকিয়া রাখে, তদ্রূপ কষায়ও ভগবানকে প্রকাশ হইতে দেয় না। ঘোরতর মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ঘোর কষায়িত চিত্তেও ভগবানের কিঞ্চিদাভাস প্রকাশ হইয়া থাকে। মেঘাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুৎ প্রকাশে পথিক যেমন গন্তব্য পথ দেখিয়া গমন করেন, তদ্রূপ সাধকগণও ঘোর কষায়িত চিত্তে ভগবানের আভাসমাত্র লক্ষ্য করিয়া সাধনবর্ত্মে অগ্রসর হইয়া থাকেন। মেঘাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকার রাত্রিতে যিনি পরিবারবেষ্টিত হইয়া অট্টালিকায় বসিয়া আছেন, বিদ্যুতালোক যেমন তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে, বরং বিরক্তির কারণ কিন্তু যিনি পথে চলিতেছেন, তাঁহার পক্ষে তাহা পরম বস্তু ও পথপ্রদর্শক পরমসহায়স্বরূপ; তদ্রূপ যিনি মায়ামোহে বেষ্টিত সংসারাট্টালিকায় বসিয়া আছেন, ঘোরতর কষায়ের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে; বরং বিরক্তির কারণ। যিনি সাধনপথে চলিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এই আভাস পরম পদার্থ ও পরম সহায়স্বরূপ। সাধক ইচ্ছা করিলেই যে এই কষায় দূর হয় তাহা নহে; কষায় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে বিস্তর খাটিতে হয়। এই সময়ে ভগবানের নামকীর্ত্তন ও জপের বিশেষ প্রয়োজন। কষায়যুক্ত চিত্ত, আর নানাপ্রকার দাগধরা মলিন বস্ত্র উভয়েরই প্রকৃতি এক প্রকার। রজক যেমন নানা উপকরণে মলিন বস্ত্র সিক্ত ও সিদ্ধ করিয়া ক্রমাগত পাটে আছড়াইয়া নির্ম্মল জলে ধুইয়া পরিষ্কার করে, তদ্রূপ সাধকও শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপকরণে কষায়িত চিত্তকে সিক্ত ও অনুরাগাগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, নামজপরূপ রসনাপাটে আছড়াইয়া এবং ভক্তিজলে ধুইয়া পরিষ্কার করেন। তাঁহার চিত্ত যতই পবিত্র হইতে থাকে, তাহাতে ভগবানের আভাসও ততই উজ্জ্বল বোধ হয়। জলাশয়ের তরঙ্গায়িত জল স্থির ও থিতাইয়া নির্ম্মল হইলে তাহাতে যেমন স্বভাবতই মুখদর্শন হইয়া থাকে, মুখদর্শনের নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে হয় না এবং কোনপ্রকার উপদেশের আবশ্যক করে না, তদ্রূপ কষায়চিত্ত স্থির ও নির্ম্মল হইলে ভগবানের আভাস তাহাতে আপনা আপনিই পতিত হয়, তন্নিমিত্ত আর সাধন করিতে হয় না এবং উপদেশ শ্রবণেরও প্রয়োজন থাকে না। মেঘান্তে সূর্য্যকিরণ যেমন আপনি জগৎকে আলোকিত করিতে থাকে, তদ্রূপ কষায় দূর হইলে, সাধকের হৃদয়মন্দিরও ভগবচ্চন্দ্রের জ্যোতিতে আপনিই আলোকিত হইয়া উঠে। এই আলোক যে কি সুন্দর, কি সুশীতল তাহা যিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই, বাহিরের আলোক দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া শতবৎসর উপদেশ দান করিলেও, তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না। বাস্তবিক, চিত্তক্ষেত্রে ভগবানের প্রকাশ অনির্ব্বচনীয়; এই প্রকাশের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ করিতে বাক্য পরাস্ত হয়। সাধক নিরুপায় হইয়া বাহিরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও জ্যোতিঃ প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া সেই অনুপম রূপ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। বাস্তবিক ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা সে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের কিছুই প্রকাশ হয় না। বরং মাধুর্য্যের বিকৃতি হইয়া যায়! যখন সেই প্রেমপূর্ণ অলৌকিক শীতল জ্যোতিঃ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নির জ্যোতির মধ্যে প্রকাশ পায়, তখনই তাহাদিগের সৌন্দর্য্যে সাধকের হৃদয় মোহিত হয়। যখন সেই জ্যোতির আভাস ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডলে প্রতিভাত না হয়, তখন সাধক ঐ সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে জ্যোতিঃশূন্য দেখিয়া থাকেন; ঐ সকল শোভা সৌন্দর্য্যের আধারকে শোভা ও সৌন্দর্য্যশূন্য বোধ করেন। জ্বরদাহ প্রভৃতি যেমন শারীরিক ব্যাধি, কষায় তদ্রূপ মানবের চিত্তরোগ। শরীর যত দুর্ব্বল হয়, শারীরিক রোগ যেমন ততই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে, তদ্রূপ আত্মার দুর্ব্বলতা হেতু কষায়ব্যাধিও অনিবার হইয়া থাকে। যে শরীর একেবারে অসাড় ও অপদার্থ হইয়াছে, সে শরীরে যেমন জ্বরদাহ প্রভৃতি কোন প্রকার রোগের অনুভব ও তজ্জন্য যন্ত্রণা বোধ হয় না, তদ্রূপ যে আত্মা অত্যাচার করিয়া একেবারে অসাড় ও অপদার্থ হইয়াছে, সেই আত্মাও কষায়ব্যাধি অনুভব ও তজ্জন্য যন্ত্রণা বোধ করে না। শারীরিক ধাতুর বিকৃতি হইয়া ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে, অথচ শরীরী তাহা অনুভব

করিতে পারিতেছে না, ব্যাধির যন্ত্রণা বোধ করিতেছে না, চিকিৎসকগণ এরূপ শরীরকে যেমন ব্যাধিশূন্য মনে করেন না, অপিচ সেই ব্যাধি দুঃসাধ্য ও সঙ্কট মনে করিয়া রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন; তদ্রূপ কষায়-রোগগ্রস্ত আত্মাও সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া আচার্য্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। শারীরিক রোগের উপদ্রব ও যন্ত্রণাই যেমন চিকিৎসককে আহ্বান ও রোগের চিকিৎসা করিবার হেতু, তদ্রূপ আত্মার কষায় রোগের যন্ত্রণাও ভগবৎ-জিজ্ঞাসু হইবার কারণ। রোগ জন্মিয়াছে, অথচ তাহার অনুভব ও যন্ত্রণা নাই, এরূপ ব্যক্তি যেমন চিকিৎসককে আহ্বান করিয়া রোগ নির্ণয় এবং ঔষধ সেবন করে না, তদ্রূপ কষায়গ্রস্ত আত্মাও আচার্য্যের নিকটেও যায় না, এবং পাপ দূর করিবার চেষ্টাও করে না। চিকিৎসকগণ যেমন শারীরিক রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ভগবদ্ভক্ত আচার্য্যগণও সেইরূপ কষায় রোগের চিকিৎসা ও ঔষধাদির বিধান করিয়া দেন। ভগবানের নাম কষায় রোগের ঔষধ; জপের নিয়মই ঔষধসেবনবিধি। সময়নিরূপণ অনুপান ও কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে গমন পথ্যাদি এবং ভগবান চিকিৎসক। তিনি আত্মার কষায় ব্যাধি দূর করেন বলিয়া ভক্ত তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ রাখিয়াছেন।

শরীরের শিরা যেমন শারীরিক রোগযন্ত্রণা অনুভব করিবার হেতু, তদ্রূপ অনুতাপ আত্মার কষায়রোগ অনুভব ও তজ্জন্য যন্ত্রণাবোধের কারণ। কোন কারণে শারীরিক শিরার চৈতন্য শক্তির উত্তেজনা না থাকিলে যেমন শারীরিক কষ্ট বোধ হয় না, সেইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ প্রভৃতি পাপকার্য্যের নিয়তানুষ্ঠানে অনুতাপের উত্তেজনা না থাকিলে লোকে পাপকার্য্য করিয়াও তজ্জন্য কষ্টানুভব করে না। সুচিকিৎসায় শারীরিক শিরার পুনরায় উত্তেজনা হইলে রোগী যেমন পীড়া জন্য কষ্ট অনুভব করে, সেইরূপ আচার্য্যের উপদেশে অনুতাপের উত্তেজনা হইলে, তখন পাপী দুষ্কর্ম জন্য কষ্টানুভব করিয়া থাকে এবং ফিরিয়া ভগবানের শান্তিপথে গমন করিলে কষায় ব্যাধি যে কি ভয়ানক তাহাও বুঝিতে পারে। অন্যথা শারীরিক শিরা ও অনুতাপের উত্তেজনাশূন্য ব্যক্তিগণ যেমন শারীরিক ও আত্মিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিগণেরও কষায় ব্যাধির কষ্টানুভব হয় না। মৎস্যগণ বড়শীর রস গিলিয়া এবং কণ্টকবিদ্ধ হইয়া স্খলিত হইলেও পুনরায় রস গিলিয়া থাকে; এই নিমিত্ত কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, তাহাদের মনঃ অর্থাৎ কষ্ট অনুভবের শিরা নাই। সেইরূপ যাহারা একবার পাপকার্য্য ও তজ্জন্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াও পুনরায় সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, মৎস্যের ন্যায় তাহাদিগের কষ্টানুভবকারিণী শিরার অভাব না হউক, কিন্তু শিরা ও অনুতাপের উত্তেজনা যে থাকে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

অঙ্গ-দেশ (২)।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে ষোলটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, আমরা গতবারের পত্রিকাতে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। একভাবে বলিতে গেলে উহা ভৌগোলিক বিভাগ নহে। যে সকল বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে বাস করিত, সেই সকল জাতির প্রতির দৃষ্টি রাখিয়া ঐ ষোলটি প্রদেশের কল্পনা হইয়াছিল। ঐ ষোলটি প্রদেশ কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল, নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

১। অঙ্গদেশ।—অঙ্গগণ মগধের পূর্ব্বদিকে বাস করিত, এবং চম্পা তাহাদের প্রধান নগর ছিল। উক্ত চম্পা নগর ভাগলপুরের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। অঙ্গদেশের প্রকৃত চতুঃসীমা বর্ত্তমানে নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

২। মগধ।—বিহার লইয়া মগধ। উত্তরে গঙ্গা, পূর্ব্বে চম্পা নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পশ্চিমে শোণ নদী; মগধ ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। উহার পরিধি ২৩০০ মাইল এবং উহার গ্রাম সংখ্যা প্রায় আশি হাজার ছিল বলিয়া কথিত আছে।

৩। কাশী।—বারাণসীর আশপাশ লইয়া কাশী। বুদ্ধদেবের সময়ে ইহার রাজনৈতিক অবস্থা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। কোশল ও মগধ উভয়েই কাশী অধিকার করিবার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইত। পরে কাশী কোশলের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। জাতক-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশীর পরিধি দুই হাজার মাইল ছিল।

৪। কোশল।—শ্রাবস্তি বা সাবত্তি উহার রাজধানী ছিল। উহা নেপালের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হয়। উক্ত সাবত্তি নগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুর হইতে ৭০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। কোশল দেশ বারাণসী ও সাকেত প্রদেশকে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। কোশলের দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্ব্বে গণ্ডক এবং উত্তরে পর্ব্বত। কোশল অচিরে সমুন্নত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে মগধের সহিত কোশলের বিবাদ চলিতেছিল। কোশল ও মগধ উভয়েই ভারতে সর্ব্বোচ্চ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কোশলের রাজা বঙ্ক, দেবসেনা, কংস, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনেকবার কাশী আক্রমণ করিয়াছিলেন। কংস "কাশী-বিজয়ী" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

৫। ভজ্জি।—ভজ্জি দেশে আটটি বিভিন্ন শক্তি বা দল ছিল। তাহাদের মধ্যে বিদেহস্বরন সর্ব্বপ্রধান। বিদেহ খুব পুরাতন সময়ের। বুদ্ধের সময় বিদেহ প্রজাতন্ত্রে শাসিত হইত এবং ইহার পরিমাণ প্রায় ২৩০০ মাইল ছিল। উহার প্রধান নগর মিথিলা—বৈশালী হইতে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে জনক ঐস্থানে রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান জনকপুর রাজর্ষি জনকের নাম অদ্যাপি কীর্ত্তন করিতেছে।

৬। মল্ল।—শাক্য ভূমির পূর্ব্বে এবং ভজ্জিদেশের উত্তরে পর্ব্বতগাত্রে এই স্থান সংস্থিত ছিল। কাহারও মতে শাক্যভূমির দক্ষিণে এবং ভজ্জির পূর্ব্বে মল্ল-দেশ অবস্থিত ছিল।

৭। চেটি। নেপাল লইয়াই চেটি প্রদেশ। পরে কুশম্বীর পূর্ব্বে এবং উহার নিকটে চেটিয়গণ থাকিতেন।

৮। বংশ। অবন্তী দেশের উত্তরে এবং যমুনার উপকূল ভাগে বংশ দেশ অবস্থিত ছিল।

৯। কুরু। দিল্লীর সান্নিধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে কুরুগণের রাজধানী ছিল। কুরুর পূর্ব্বে পঞ্চাল দেশ এবং মৎস্য দেশ উহার দক্ষিণে। কুরুদেশের পরিধি দুই হাজার মাইল ছিল। বুদ্ধের সময়ে কুরুদেশের সেরূপ প্রাধান্য ছিল না।

১০। পঞ্চাল। কম্পিল্ল ও কণোজ উহার রাজধানী ছিল। উহা কুরুদেশের পূর্ব্বে ও (হিমালয়) পর্ব্বত ও গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পঞ্চাল আবার দুইটি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল।

১১। মৎস্য। উহা কুরুর দক্ষিণে এবং যমুনার পশ্চিমে। যমুনা নদী মৎস্য দেশকে দক্ষিণ পঞ্চাল হইতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

১২। সুরসেন। মথুরা উহার রাজধানী ছিল। উহা মৎস্য দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং যমুনার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

১৩। অশ্মক। বুদ্ধের সময়ে গোদাবরী তীরে অশ্মকগণ বাস করিত। পোটালি বা পোতান তাহাদের রাজধানী ছিল। অঙ্গের সঙ্গে যেমন প্রায়ই মগধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অবন্তীর সহিত সেইরূপ অশ্মক প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। অবন্তীর উত্তর পশ্চিমে সম্ভবতঃ তাহারা প্রথমে বাস করিত, পরে গোদাবরীর দিকে তাহারা বাস করিতে আরম্ভ করে।

১৪। অবন্তী। উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। চন্দ-পজ্জোত উহার রাজা ছিলেন। পজ্জোত শব্দের অর্থ ভীষণ। দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার নাম অবন্তী ছিল; পরে উহার নাম মালব হইয়া দাঁড়ায়।

১৫। গান্ধার। উহার বর্ত্তমান নাম কান্দাহার। পূর্ব্ব-আফগানস্থান ও সম্ভবতঃ পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম লইয়া গান্ধার রাজ্য। তক্ষশীলা উহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়ে উহার রাজা পুক্কুসাতি। তিনি মগধের রাজা বিন্দুসারের নিকট দূতসহ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৬। কাম্বোজ। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ লইয়া কাম্বোজ। দ্বারকা উহার রাজধানী ছিল।

উপরে যে কয়েকটি প্রদেশের উল্লেখ রহিয়াছে তাহার ভিতরে সিবি, মদ্দ, সোভির বা বিরাট দেশের নামগন্ধ নাই। সম্ভবতঃ এই প্রদেশ-বিভাগ অতি পূর্ব্ব আমলের, এমন কি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অতিপূর্ব্বের। ঐ তালিকার ভিতরে উড়িষ্যার বা গঙ্গার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী বঙ্গদেশের বা দাক্ষিণাত্যের বা সিংহল দেশের কোন উল্লেখ নাই। দুই একখানি পুরাতন গ্রন্থে দক্ষিণা—পথের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত ঠিক অনুসূচিত হয় না, গোদাবরী নদীর উপকূলভাগমাত্র বুঝায়।

আর্য্যগণ যে কেবলমাত্র গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপকূল ধরিয়া ভারতে ক্রমিকই বসতি করিতে আরম্ভ করে, তাহা নহে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি সিন্ধু-নদ ধরিয়া কচ্ছ উপসাগরের পাশ দিয়া অবন্তী পর্য্যন্ত আপনাদের উপনিবেশ সংস্থাপন করে; আর একটি দল কাশ্মীর হইতে হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগ ধরিয়া কোশল রাজ্যের ভিতর দিয়া শাক্য-ভূমিতে আসিয়া পৌঁছায় ও ক্রমে ত্রিহুত হইয়া মগধে ও অঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যে কয়েকটি প্রধান নগর বা রাজধানীর উল্লেখ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

১। অযোধ্যা।—উহা সরযু নদীতটে অবস্থিত এবং কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। রামায়ণ-গ্রন্থকার উহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে উহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের সময়ে উহা প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছিল।

২। বারাণসী।—বরুণা ও অসী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম বারাণসী।

৩। চম্পা। চম্পা নদীর উপরে অবস্থিত ছিল এবং উহা অঙ্গদেশের রাজধানী। কনিংহাম সাহেবের মতে চাপা ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্ব্বে। অধুনা ঐ নামে পরিচিত গ্রাম পাওয়া যায়। চম্পা নগর, রাণী গগ্‌রা কর্ত্তৃক খাত প্রকাণ্ড সরোবরের জন্য বিখ্যাত ছিল। উক্ত সরোবরের তীরে অসংখ্য চম্পক বৃক্ষ ছিল।

৪। কম্পিল। উহা উত্তর পঞ্চালের রাজধানী

এবং উহা গঙ্গার উত্তর কূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু উহার প্রকৃত স্থান আজও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

৫। কুসুম্বী। বংশের রাজধানী কুসুম্বী—যমুনা নদীর উপকূলে এবং বারাণসী হইতে ২৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

৬। মথুরা।—সুরসেনের রাজধানী মথুরা বা মধুরা যমুনা নদীর উপরে সংস্থিত ছিল।

৭। মিথিলা।—বিদেহর রাজধানী মিথিলা জনক ও মখাদেবের রাজধানী ছিল। উহা বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত।

৮। রাজগৃহ।—রাজগৃহ বা রাজগভ মগধের রাজধানী ছিল। ঐ নামে দুইটি নগর অভিহিত হইত। উহার মধ্যে পার্ব্বত্য স্থানে সংস্থিত গিরিব্রজ বিশেষ পুরাতন এবং উহা মহাগোবিন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থিত রাজগৃহ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিম্বিসার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। গিরিব্রজ ও রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ আজও পরিলক্ষিত হয়।

৯। রোরুক।—রোরুক অথবা রোরুভ সোভিরের রাজধানী ছিল। সোভিরের বর্ত্তমান নাম সুরাট। ঐ স্থান হইতে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। ভারতের সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে, এমন কি মগধ হইতে ঐ স্থানে বাণিজ্যের দ্রব্যসম্ভার আসিত। রোরুকের স্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; সম্ভবতঃ উহা কচ্ছ-উপসাগরের কূলে সংস্থিত ছিল।

১০। সগল। সগল মদ্র দেশের রাজধানী ছিল। নিশ্চয়রূপে এখনও উহার স্থাননির্দ্দেশ হয় নাই। কেহ বা বলেন উহা পঞ্জাবের অন্তর্গত সিয়ালকোট।

১১। সাকেত।—অযোধ্যার মধ্যগত উনাউ জেলার অন্তর্গত সুজানকোটই সাকেতের স্থান। ইহা কোশলের একটি প্রধান নগর ছিল এবং এক সময়ে উহা রাজধানী হইয়া উঠে। সাকেত ও অযোধ্যা একই নগর নহে। কেন না বুদ্ধের সময়ে উহারা বিভিন্ন স্থান বলিয়া অভিহিত হইত।

১২। শ্রাবস্তি।—উত্তরকোশলের রাজধানী শ্রাবস্তি বা সাবত্তি। উহার প্রকৃত স্থান ঠিক নিরূপিত হয় নাই।

১৩। উজ্জয়িনী।—অবন্তীর প্রধান নগর উজ্জয়িনী। এইখানে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই মহেন্দ্রই ভবিষ্যতে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৪। বৈশালি। উহা বর্ত্তমান ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল কিন্তু, কোথায় তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই।

উপরে যাহা লিপিবদ্ধ হইল তাহা Rhys Davis' Buddhist India হইতে সংগৃহীত। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির জরনালের ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ যে চম্পার বর্ত্তমান নাম চম্পানগর, উহা ভাগলপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভারতবর্ষের প্রধানতম যে ছয়টি নগর ছিল তাহার মধ্যে চম্পা অন্যতম। আর পাঁচটির নাম রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, সাকেত, কুসুম্বী ও বারাণসী। চম্পা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চম্পা হইতে বণিকগণ তরণীযোগে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করিত। বলিতে গেলে চম্পা নগর পূর্ব্ব ভারতের রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা জৈন দিগের নিকট পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য হইত। দ্বাদশ তীর্থঙ্কর ঐখানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধগণও চম্পা সরোবরের তীরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান চম্পা নগরের তীরে একটি শুষ্কপ্রায় সরোবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই সেই প্রাচীন চম্পা সরোবর, অনেক এইরূপে অনুমান করেন। মহাভারতে চম্পার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে উহা হিন্দুগণের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। ষষ্ঠ শতাব্দীতেও চম্পা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। হিউয়েন সিয়াং যিনি সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন, তিনিও বলেন চম্পার পরিধি ৮ মাইল ছিল। তিনি চম্পার ২০টী দেবমন্দির ও ২০০ ধর্ম্ম-যাজক এবং ভগ্নপ্রায় অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে এই চম্পা নগরে চাঁদ সওদাগরের বাসস্থান ছিল। মনসার ভাসানে চাঁদ সওদাগরের পুত্র নকিন্দর ও বেহুলার আখ্যায়িকা এইখান হইতে সমুদ্ভূত। সর্পদষ্ট নকিন্দরের দেহ বেহুলার সহিত যেখানে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা বেহুলার ঘাট বলিয়া অভিহিত। যেখানে চন্দন নদী গঙ্গায় মিলিয়াছে ঐ স্থানকেই বেহুলার ঘাট বলে। বেহুলার নামে এখনও প্রতিভাদ্রে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। গঙ্গা নদী এক্ষণে উক্ত নগর হইতে এক মাইল উত্তরে সরিয়া গিয়াছে। চাঁদ সওদাগরের নিবাসভূমি বলিয়া বর্দ্ধমান জেলার ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত দুইটী স্থান দাবী করিয়া থাকে। এই চম্পা নগরে হস্ত্যায়ুর্ব্বেধ-প্রণেতা পালকাপ্য মুনি, এবং কয়েকটি জৈন গ্রন্থ প্রণেতা০ জন্ম গ্রহণ করেন।

চম্পার পরেই অঙ্গদেশের অন্তর্গত মুঙ্গেরের স্থান। ইহা মহাভারতোক্ত মোদাগিরি, ভীম যাহা জয় করেন। মৌৎগল্য বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন, তিনি ঐখানে অবস্থিতি করিতেন। কষ্ট-হারিণী ঘাটের সম্মুখে একটি উচ্চ স্থানে মৌৎগল্য ঋষি বাস করিতেন। উক্ত স্থান এক্ষণে নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বুকানন সাহেব বলেন মুঙ্গের তাঁহার আশ্রম ছিল। দেবপালের যে একটি তাম্র-ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ স্থানকে

মোদ্‌গাগিরি বলা হইয়াছে। জনশ্রুতি বলে যে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া নিজ পাপ ক্ষয়ার্থ কষ্টহারিণী ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। কেন না রাবণ রাক্ষস হইলেও ব্রাহ্মণ এবং তিনি ঋষি পুলস্তের পুত্র। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলিয়াছি যে মুঙ্গের কর্ণ-রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত।

ভাগলপুরের ১৫ মাইল পশ্চিমে সুলতানগঞ্জের সান্নিধ্যে প্রবাহিতা গঙ্গার মধ্যস্থলে একটি সমুচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। উহারই চূড়ায় গৈবীনাথ নামে মহাদেবের সুবিখ্যাত মন্দির আছে। ঐ পর্ব্বতের চারিপার্শ্ব দিয়া গঙ্গাস্রোত সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত পর্ব্বতের নাম জন্‌গির। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে উহা জহ্নুগিরি। ঐখানে জহ্নুঋষির আশ্রম ছিল। সম্ভবতঃ ঐ পর্ব্বত বা পাথর নদীর তটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ পর্ব্বত গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে তাহা গুপ্ত-অক্ষরের। ঐ পর্ব্বতের গাত্রে নদী-স্রোত প্রত্যাহত হইয়া উত্তরবাহিনী হইয়াছে। কবির হস্তে পড়িয়া বোধ হয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যে জহ্নুঋষি এখানে গঙ্গাস্রোত পান করিয়া ফেলেন এবং পরে স্তব-স্তুতিতে প্রীত হইয়া জানুদেশ দিয়া (অর্থাৎ পর্ব্বতের মধ্য-ভাগের নিম্নদেশ দিয়া) তাহা আবার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে গঙ্গোত্রীর নিকটে এবং গৌড়ের নিকটেও জহ্নুঋষি কর্ত্তৃক গঙ্গাস্রোত পানের কথা প্রচলিত আছে।

ভাগলপুরের ২৩ মাইল পূর্ব্বে কালিপাহাড়ে দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ তীর্থ এবং মান্দার পর্ব্বতের (মধুসূদন) বিষ্ণুমূর্ত্তি অঙ্গদেশেরই ভিতরে। উক্ত মান্দার পর্ব্বত ভাগলপুরের ৩০ মাইল দক্ষিণে।

পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা পরাক্রান্ত অধিপতি। তাঁহারা রাজ্যে শান্তিস্থাপন করেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহাদের সময়ে নলান্দা বিক্রম-শীলা, জগদ্দল (বারেন্দ্র ভূমে) বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষ লাভ করে। নলান্দা রাজগৃহের নিকট, বিক্রমশীলা বর্ত্তমান পাথর-ঘাটার সান্নিধ্যে ও কাহালগাঁর ৬ মাইল উত্তরে এবং জগদ্দল গৌড়ের অন্তর্ভুত ছিল। পাল রাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম তন্ত্রের অভিমুখীন হইয়া পড়িয়াছিল।

জীবন-সঙ্গীত।

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

প্রতিদিনের সন্ধ্যায় আমাদের জীবনপুস্তকের এক একটি পত্র নিঃশেষ হইয়া যায়। রাত্রির অবসানে নবদিবা-লোকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন পত্র আমাদিগকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া বসিতে হয়। এই যে এক একটি দিন চলিয়া যাইতেছে, নূতন পত্রাঙ্ক লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের ভাবিবার চিন্তিবার কি কিছুই নাই? অসাড়ে নিঃশব্দে এমন করিয়াই কি আমরা জীবনের পত্রগুলি উল্টাইয়া যাইব? আমাদের জীবনপদ্মের পাপড়িগুলি প্রতিদিনের রবিকিরণে কতটুকু উদ্ভাসিত হইল, তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখিব না? বৃক্ষলতা প্রতিদিনের প্রাভাতিক আলোক লাভ করিয়া এক একটি করিয়া পত্রের অঙ্কুর ছাড়িতেছে, ক্রমে তাহা হইতে সম্পূর্ণ পত্রের উন্মেষ হই-তেছে, শাখা প্রশাখায় ফলফুলে তাহারা সুশোভন হইয়া দাঁড়াইতেছে—আমাদের জীবন কি এই ভাবে বিকা-শিত হইবে না?

আমাদের জীবনের সহিত সঙ্গীতের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রতি সঙ্গীতে আমাদিগকে আস্থায়ী হইতে অন্তরায় যাইতে হইলে একবার সমে আসিয়া থামিতে হয়। সঙ্গী-তের এই এক একটি বিভাগের ন্যায় আমাদের জীবনেরও এক একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ আছে। সঙ্গীতশিক্ষার্থী তাহার গুরুর সমক্ষে রাগিণীর যে কেবলমাত্র এক এক বিভাগের পরীক্ষা দেন তা নয়; ঐ এক একটি বিভাগের মধ্যে সা রে গা মা বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত হইতেছে কি না, তাহারও প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গাহিতে হয়। আর অভিজ্ঞ গুরু, সুর রাগিণী ও তালের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে থাকেন। আমরাও প্রতিদিনের জীবন-সন্ধ্যায় এক একটি করিয়া সুর ফুটাইয়া তুলিতেছি এবং প্রতি সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে বা বর্ষান্তে এক একটি সমে আসিয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, কোথায় গান ঠিক হইয়াছে, কোথায় হয় নাই, কোথায় তাল কাটিয়াছে, কোথায় রাগি-ণীর সুর একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমরা রাগিণীও জানি, তালমানও কতকটা বুঝি। সে সংস্কার ভগবান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু গান করিতে গিয়া সকলই হারাইয়া ফেলি এবং সকলই বেসুর ও বেতালা হইয়া যায়। নিত্য স্বরসাধন করা চাই; নিত্য সাধনার অভাবে রাগিণীর বিশুদ্ধতা ঠিক দাঁড়াইতেছে না, সকলই কাটিয়া যাইতেছে। এ কথা যথেষ্ট শোনা আছে যে সঙ্গীত সাধনায় কত লোক সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

কণ্ঠসঙ্গীত অপেক্ষা যন্ত্রে রাগরাগিণীর সুর বড়ই সুন্দরভাবে দেখান যাইতে পারে। সেই যন্ত্রসঙ্গীতের আদর্শে সুগায়ক আপনার কণ্ঠসাধন করেন। উহা

কঠিন হইলেও উহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তারের যন্ত্র ভাল করিয়া বাঁধিলে তাহার ভিতর হইতে সুমিষ্ট শব্দ বাহির করা যাইতে পারে। আমাদের মনঃপ্রাণহৃদয়কে সেই যন্ত্রের ন্যায় এক সুরে বাঁধিয়া তাহার ভিতর হইতে বিশ্ববিমোহন ঝঙ্কার বাহির করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদিগকে কলাবিদ নারদ ঋষি হইতে হইবে; বিশ্বভুবনেশ্বরের রাজ-সভায় যে আমাদিগের সকলকে গাহিতে হইবে, বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিতে হইবে, একথা যেন আমাদের মনে থাকে।

আমাদের সাধনের তিনটি ভাগ, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি। সঙ্গীতেও তেমনি উদারা, মুদারা ও তারা। এ তিনটি গ্রাম না থাকিলে গান গাওয়া সম্ভবপর হইত না। ঐ যে তারা গ্রাম দেখিতেছ, সুর যে খুব উচ্চে উঠিতেছে, উহাই জ্ঞানের সাধনা। মুদারা গ্রাম যে দেখিতেছ, উহা ভক্তির সাধনা। উদারা গ্রাম যে দেখিতেছ, উহা কর্ম্মের সাধনা। সঙ্গীতেই বল, আর জীবনের প্রাত্যহিক সাধনাতেই বল, এ তিনটি গ্রামের সাধনা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন সুরের যথাযথ মিশ্রণের নামই রাগিণী। এই মিশ্রণে যতই কুশলতা দেখাইবে, রাগিণী ততই হৃদয়গ্রাহী হইয়া দাঁড়াইবে। ইউরোপে কর্ম্মের খুব প্রসার। ইউরোপে অন্যবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান খুব বিকাশ লাভ করিলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সুর যেখানে বড় বাজে না। ভক্তির সুরও সেখানে স্থান পায় না।

জ্ঞানের সুর তারা গ্রামের বলিয়া অন্য গ্রামের সুরগুলির উপর তাহা ছাপাইয়া যায়। ভক্তির সুর মুদারা গ্রামের বলিয়া কর্ম্মকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা বলিলে কি হইবে? এই তিন গ্রামের সুর না মিলিত হইলে সঙ্গীত ও রাগ রাগিণী যে অসম্ভব। ভক্তি ও কর্ম্মবিবর্জ্জিত জ্ঞান যে অনেক সময়ে শুষ্কতা আনিয়া দেয়, সেইজন্যই আমাদের প্রার্থনা এই যে অসতো মা সৎগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। অসৎ হইতে সতে যাইতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্ধকার হইতে বা স্বার্থ হইতে আলোকে যাইতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং মৃত্যু যাইতে অমৃতে যাইতে হইলে ভক্তি আবশ্যক। এই তিনের সাধনে সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্দার মত আমাদের জীবনের পাপড়িগুলি শতদলে একটি একটি করিয়া খুলিয়া যায় এবং জীবন সার্থক হইয়া উঠে। সমে আসিবার সময় অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস ও আবেগ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

আমরা চাই বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ রাগিণীর সাধনা। আকাশে গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্রের ভিতরে সঙ্গীতের ছন্দ রহিয়াছে। সেই ছন্দে আমাদের জীবনসঙ্গীত মিলিত হউক; জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনটি গ্রামের বিভিন্ন সুর এই ক্ষুদ্র জীবন-বীণায় রাগিণীর মূর্ত্তিতে অবিরাম বাজিতে থাকুক ইহাই আমাদের কামনা।

যশোবন্ত সিংহের পত্র।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।)

ভারতের দুই বাদসাহ আকবর ও আওরঙ্গজেব। ইঁহাদের উভয়ের ভাবের তারতম্য এবং হিন্দুরাজা যশোবন্ত সিংহের মহাপ্রাণতা প্রদর্শনের জন্য আমরা এই পত্রখানি প্রকাশিত করিলাম।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আওরঙ্গজেব ভারতে জিজিয়া-কর নামে মাথাগুন্তি কর স্থাপন করেন। কেবলমাত্র হিন্দু অধিবাসীর জন্য উক্ত কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাঁহারা অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী তাঁহাদিগকে বার্ষিক ১৩॥• টাকা, যাঁহারা মধ্যবিত্ত তাঁহাদিগকে ৬॥• এবং দরিদ্রগণকে ৩॥• টাকা কর দিতে হইত। স্ত্রীলোকেরা জিজিয়া-কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিলেই হিন্দু যুবকগণ এই কর দিতে বাধ্য। এই কর সংস্থাপন সম্বন্ধে বাদসাহ আওরঙ্গজেবের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। নানা কারণে সমুদ্ভূত যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ রাজকোষ পূর্ণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকারান্তরে হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বলা বাহুল্য অপমান ও নির্য্যাতন ভয়ে অনেক দরিদ্র হিন্দু এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। রাজা যশোবন্ত সিংহ এই জিজিয়া করের বিরুদ্ধে বাদসাহ আওরঙ্গজেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ওজস্বিতাপূর্ণ। উক্ত পত্রের মর্ম্ম এই—

"চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় চির দীপ্তিশীল সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বদান্য সম্রাটের অসীম গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক। আমি আপনার চির হিতাকাঙ্ক্ষী। যদিও বর্ত্তমানে আপনার সন্নিধান হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি আপনার রাজকীয় আদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ নহি। আমার জীবনের সমস্ত কামনা, সমুদয় চেষ্টা ভারতের রাজন্যবর্গ, অমাত্যগণ, মির্জ্জা সমূহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিনিচয়ের শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধনে নিয়োজিত। রুম, শান্ ও অন্যান্য দেশীয় লোক এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত লোকের কল্যাণ সাধনে আমি চিরকালই চেষ্টা পাইয়াছি। আমার অন্তরের ভাব আপনি সমস্তই জানেন। আমার সম্বন্ধে সন্দেহ আপনার পোষণ করিবার কিছুই নাই। আমি অনেক দিন ধরিয়া আপনার সেবা করিয়া

* Archaeological Survey of India. 1910—11.

আসিয়াছি ; এক্ষণে আপনার সদয় বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া আমি একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উহার সহিত জনসাধারণের ও প্রত্যেকের কল্যাণ জড়িত রহিয়াছে।

আমি জানি আমাকে দমন করিবার জন্য আপনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন, অথচ আমি আপনার হিতার্থী। দেখিতেছি আপনি শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য নূতন কর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

আপনি স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে আপনার পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট আকবর, যাঁহার সিংহাসন এক্ষণে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সমদর্শী হইয়া নিরাপদে ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সুখ শান্তি বিধান করিতেন। খৃষ্ট, মুসা, ডেভিড, মহম্মদ, ইহাঁদের অনুবর্ত্তীগণের উপর তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। বিশ্বের উপাদান পঞ্চভূতসমষ্টি যে অনন্তকাল হইতে নাই, এইরূপ বিশ্বাসধারী ব্রাহ্মণেরা অথবা আকস্মিকতার ফলে এই জগতের উৎপত্তি এইরূপ বিশ্বাসধারী ঢেরিয়গণ, (Dharians) সকলেই তাঁহার নিকট হইতে সমান কৃপা লাভ করিত। তাহারা তাঁহার ব্যবহারে এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা তাঁহাকে (আকবরকে) "জগৎ-গুরু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর যিনি এক্ষণে স্বর্গে বাস করিতেছেন, তিনিও বাইশ বৎসর ধরিয়া সকলকে সমান ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। অনুরক্ত লোকসকলকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া এবং হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরিয়া তিনি দেশ বিদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। সাজাহান বত্রিশ বৎসর কাল সদয় শাসনে অনন্ত কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্য ও সমদৃষ্টি ছিল বলিয়াই তাঁহারা রাজ্য লাভ ও সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। আর আপনার রাজত্বকালে অনেকেই আপনার প্রতি বিমুখ। আপনার নির্যাতন দোষে কত প্রদেশ আপনার সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। আপনার প্রজাবর্গ পদদলিত হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশ নিরন্ন হইয়া যাইতেছে। কতলোক দেশত্যাগী হইতেছে, কত না উপদ্রবের সৃষ্টি হইতেছে। যখন রাজার এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন অমাত্যবর্গের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া দেখুন। আজকাল সৈনিকগণ বিরক্ত, ব্যবসায়ী বিপর্য্যস্ত, মুসলমানগণ অসহিষ্ণু, হিন্দুগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। জনসাধারণ দিনান্তে একবারমাত্র অন্নাভাবে কাতর হইয়া ক্রোধে নৈরাশ্যে শিরে করাঘাত করিতেছে। রাজার গৌরব আর কিরূপে রক্ষা পাইবে? রাজা এক্ষণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের নিকট হইতেও কর আদায়ে প্রবৃত্ত। রাজ্যের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তে এই কথাই ধ্বনিত হইতেছে যে, সম্রাট অসূয়াপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণ, যোগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কঠোর ভাবে কর আদায় করিতেছেন। টাইমুর বংশের গৌরবকে উপেক্ষা করিয়া আপনি নির্দ্দোষের প্রতি এইরূপ আচরণ করিতেছেন। আপনি যে পুস্তককে পবিত্রতম বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহারই ভিতরে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সকল জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল মুসলমান জাতির ঈশ্বর নহেন; জড়োপাসক ও মুসলমান তাঁহার পক্ষে সমান। বর্ণের পার্থক্য তাঁহা হইতেই ঘটিয়াছে। তিনি সকলেরই স্রষ্টা। আপনাদের মসজিদে তাঁহারই নামে প্রার্থনাধ্বনি সমুত্থিত হয়। প্রতিমার মন্দিরে ঘণ্টারবে তাঁহারই পূজা সাধিত হয়। অপরের ধর্ম্ম ও অপরের প্রতি নিন্দাবাদ, তাঁহারই বিধানকে খর্ব্বীকৃত করে। আমরা যখন কোন অঙ্কিত ছবি মুছিয়া ফেলি, আমরা তাহা দ্বারা চিত্রকরেরই বিরক্তি উৎপাদন করি। কবিও তাই বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের কার্য্যের দোষোদ্ঘাটনে অগ্রসর হইও না বা তাহার নিন্দাবাদ করিও না।

আপনি যে কেবলমাত্র হিন্দুগণের নিকট কর চাহিতেছেন, ইহা ন্যায়ের বিরোধী। ইহা শাসনশৃঙ্খলার প্রতিকূল ব্যবস্থা। ইহাতে রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে। আপনি হিন্দুদেশের শাসনপদ্ধতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছেন। আপনি যদি সত্যসত্যই প্রতিনিবৃত্ত হইতে না চান, তবে ন্যায়ের অনুরোধে (জয় সিংহের পুত্র) রাজ-সিংহের নিকট সর্ব্বাগ্রে উক্ত কর আদায় করুন। তাহার পরে আপনার অনুগ্রহভাজনগণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করুন। শক্তিহীন পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণের নিকট উহা আদায় করিবার জন্য আপনি আপনার শক্তিকে নিয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। আপনার অমাত্যবর্গ আপনাকে ন্যায়োচিত ও রাজসম্মানোচিত কার্য্যে পরামর্শদানে কেন যে বিমুখ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি।"

ভগবদ্গীতার উপদেশ মালা।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আদর্শজ্ঞানী (স্থিতপ্রজ্ঞ)

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ
বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।
তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

২অঃ—৫৪—৫৮, ৬০, ৬১, ৬৭, ৬৮।

স্থির বুদ্ধির লক্ষণ।

স্থিরবুদ্ধি সমাধিস্থ, কি তার লক্ষণ?
তাহার ভাষণ কিবা, আসন গমন?
সকল কামনা, বিষয় বাসনা;
ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে রহে তুষ্ট মনে,
স্থিরবুদ্ধি সিদ্ধ মুনি।
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট, নহে সুখে হৃষ্ট
স্পৃহাশূন্য নিরাময়,
কামনাবিহীন ভয়ক্রোধহীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয়।
স্নেহশূন্য ভবে, আত্ম পরে সবে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ,
নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ।
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
ইন্দ্রিয়-বিষয় হতে
ইন্দ্রিয়ে তেমনি প্রাজ্ঞ জন।
বিচক্ষণ পুরুষ প্রবর
যতই করুক না যতন
প্রমাথী যে ইন্দ্রিয় নিকর
সবলে হরিয়া লয় মন।
ইন্দ্রিয়সংযমী ধীর
আমাপরে একান্ত নির্ভর
সর্ব্বেন্দ্রিয়বশী বীর
স্থিরবুদ্ধি ধন্য সেই নর।
মন যদি ছুটে চলে
ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান
বায়ু যথা তরণী ডুবায়॥
করি তাই মহাবাহু
ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রাণপণ
বাসনাত্যেয়াগী যেই,
স্থিরবুদ্ধি জেন সেই জন॥

যোগী।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা।
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্তইত্যুচ্যতে তদা॥

৬অঃ ১৬—১৮

অত্যাহার অথবা একান্ত উপোষণ,
অতিনিদ্রা তেমনি বিনিদ্র জাগরণ
অতিশয় যাহা কিছু গর্হিত সকল,
অত্যাচারে হয় রুদ্ধ যোগের অর্গল।
নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার
নিদ্রা জাগরণে যেই সদা মিতাচার
সর্ব্ব কর্ম্ম চেষ্টা যাঁর নিত্য নিয়মিত
দুঃখহারী যোগ তাঁর হয় সুনিশ্চিত।
সতত সংযত চিত্ত আত্মাশ্রিত যাঁর,
সর্ব্ব কর্ম্মে স্পৃহাশূন্য—যোগী নাম তাঁর।

আদর্শ যোগী।

তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মান স্তন্নিষ্ঠা স্তৎপরায়ণাঃ
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ।
বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধি রসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখ মক্ষয় মশ্নুতে॥

৫অঃ ১৭-২১

ভগবৎ তত্ত্বে জ্ঞান বিকাশিত,
হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি সুধামৃত,
তাঁর চিরাশ্রিত দাস,
জ্ঞান জলধি জল ধৌত কলুষমল
পায় পরাগতি শান্তি সুনিশ্চল,
জনম-বন্ধ হয় নাশ।
ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতি, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি
গাভী করী কুকুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্ব ঠাঁই ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব এক প্রাণ।
হেন সাম্যময় চিতে, জেন, পার্থ সর্ব্ব রীতে
এখানেই হয় স্বর্গ জিত ;
নিষ্পাপ পুণ্য নিধান, ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র সমান,
ব্রহ্মভাবে হন অবস্থিত।
প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট,
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ, নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতে রতি
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত।
ইন্দ্রিয় বিষয় রাগে, বিরাগ সতত জাগে
আপনার সদানন্দময়,
ব্রহ্মযোগে হয়ে যুক্ত, সংসার বন্ধন মুক্ত
ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়।

সিদ্ধযোগী।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যংসমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥

১৮ অঃ ৫১—৫৪

হয়ে শুদ্ধমতি, হৃদি ধরি ধৃতি,
সুসংযত শ্রদ্ধাবান,
শব্দাদি বিষয় ত্যজি বিষময়,
রাগদ্বেষ অভিমান,
বিজন বিহারী শুদ্ধ মিতাহারী
সদানন্দ নিরাময়,
লভয়ে আরোগ্য বিষয় বৈরাগ্য
নিয়ত করি আশ্রয়।
দর্প অহঙ্কার কামক্রোধ আর
পরিহরি পরিজন,
নির্ম্মম নিষ্কাম, শান্তি অবিরাম
ধ্যান যোগে নিমগন,
ধীর ব্রহ্মবিৎ হয়ে সমাহিত
ব্রহ্মে করি অবস্থান
এড়ায়ে মরণ সংসার বন্ধন
ভবসিন্ধু ত'রে যান।
সুপ্রসন্ন আত্মা যাঁর ব্রহ্মেতে মগন
সর্ব্বভূতে করে যেই সম দরশন,
গিয়াছে যা' তার তরে নাহি রহে ক্ষোভ
বিষয় লাভের আশে নাহি ধরে লোভ,
আমাপরে হৃদি ধরে অচলা ভকতি,
সেই পরাভক্তি যোগে লভয়ে মুকতি।

যোগীশ্রেষ্ঠ।

খৃষ্টের উপদেশ :—

ধর্ম্মের দুই প্রধান অনুশাসন

(১) ঈশ্বরে প্রীতি

(২) মানুষে মৈত্রী

1 Love the Lord thy God with all thy heart.

2 Love thy neighbour as thyself.

গীতাও প্রকারান্তরে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

৬ অ—৩২, ৪৪

আত্মবৎ সকল জীবে
সুখ দুঃখ যে করে বিচার,
সেই তো পরম যোগী
হে অর্জ্জুন কহিলাম সার।
যোগিজনগণ মাঝে
সেই জন যোগীর প্রধান
মদ্গত অন্তর আত্মা
আমায় যে ভজে শ্রদ্ধাবান।

নিস্ত্রৈগুণ্য।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান।

২ অ—৪৫

ত্রিগুণমণ্ডিত যত বেদের বিষয়,
ছেদহ ত্রিগুণপাশ.তুমি ধনঞ্জয় ;
দ্বন্দ্বহীন নিত্য সত্ত্বে কর অবস্থান
যোগক্ষেম বিরহিত হও আত্মবান ॥

নিস্ত্রৈগুণ্য কে ?

কৈর্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে
গুণাবর্ত্তন্তে ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতিনেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃসমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
সগুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

১৪ অঃ ২১—২৬

কি তার লক্ষণ বল
ত্রিগুণ-গুণ লঙ্ঘনে যে হয় সক্ষম ?
বল প্রভু, কি আচারে,
কি উপায়ে গুণত্রয় করে অতিক্রম ?
প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ পাণ্ডুর নন্দন,
এ সকল গুণকার্য্য করেছি বর্ণন,
জ্ঞান বা প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয়
বিরাগ বিদ্বেষ যার কভু নাহি হয়,
নিবৃত্ত হইল যদি উহারা নিঃশেষ
সুখ-আশে নাহি করে আকাঙ্ক্ষার লেশ ;
গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত,
উদাসীন সুখে দুঃখে—নহে বিচলিত,
সুখ দুঃখ শিলাখণ্ড কাঞ্চন পাষাণ,
স্তুতি নিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,
ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রুমিত্র পক্ষে
মান অপমান তুল্য যাহার সমক্ষে,
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন,
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সে জন।
অনন্যভকতি যোগে যে জন সেবে আমায়
হয়ে সর্ব্বগুণাতীত ব্রহ্মভাব সেই পায় ॥

ভক্তের আদর্শ।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।

১২ অঃ—১৩ ও ২০

নাহি দ্বেষ কোন জনে, বাঁধে সবে মৈত্রী গুণে
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ।
নির্ম্মম নিরহঙ্কার সুখ দুঃখ সম যার
শত্রুতেও যেই ক্ষমাবান।
কহিনু যে ধর্ম্মামৃত সদা তাহে অনুরক্ত
উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,
শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান আমার ভগত প্রাণ
সব হতে মম প্রিয়তম।

গীতাসার।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাংনমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।

১৮ অঃ ৬৫—৬৬

আমাতেই প্রাণমন সকলি সঁপিয়া,
ভক্ত মম হও তুমি, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
ভজ মোরে নিরন্তর, কর নমস্কার
আমাকে পাইয়া হবে ভবসিন্ধু পার।
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিনু এখন,
তোমারে যে ভালবাসি, দিতেছি বচন।
তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর
লহ এক আমারি শরণ,
হরিব সকল পাপ-ভার
করিও না শোক অকারণ।

হ্যালীর ধূমকেতু।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(একটী ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত)

বর্ত্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কলডীয়দিগের (Chaldeans) মধ্যে ধূমকেতুদের গ্রহ-প্রকৃতির বিষয় জানা ছিল। ইহা ব্যতীত পণ্ডিতপ্রবর সেনেকা তাঁহার সময়ের জ্যোতির্বেত্তাদিগকে ধূমকেতুদের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার উপলক্ষে তাহাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যায় যে সার আইজাক নিউটনই সর্ব্বপ্রথমে ধূমকেতুর আবির্ভাব-কালের যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এই তত্ত্বটিকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম হইতেই তিনি গ্রহগণের অণ্ডাকৃতি

কক্ষের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে সেই ধূমকেতুও সূর্য্যের আকর্ষণ মানিয়া এক অণ্ডাকৃতি কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিল। এডমণ্ড হ্যালী নিউটনের একজন ভক্ত ছাত্র। তিনি অনেকগুলি ধূমকেতুর কক্ষ আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিবরণ সংগ্রহের কালেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে যে তিনটি ধূমকেতুর আবির্ভাবের বিবরণ তিনি পাইয়াছিলেন, সেই তিনটি বিবরণ তিনটি বিভিন্ন ধূমকেতু সম্বন্ধীয় নহে, কিন্তু তিনটি বিবরণই একই ধূমকেতু বিষয়ক। তিনি সেই সকল বিবরণ অবলম্বনে গণনা করিয়া বলিলেন যে সেই একই ধূমকেতু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আবির্ভূত হইবে। ধূমকেতুটি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরাবির্ভূত হইয়া তাঁহার গণনার যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিল। সেই অবধি উক্ত ধূমকেতুটি হ্যালীর ধূমকেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

যদিও হ্যালীর উক্ত ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের কালবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এই সম্বন্ধে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কারণ তাঁহার সময়ে ধূমকেতু বিষয়ক জ্ঞান খুবই শৈশবাবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। আর, আজই কি সেই জ্ঞান শেষ পরিণতিতে আসিয়াছে? তবে, এখন ধূমকেতুবিজ্ঞান যতটুকু উচ্চে উঠিয়াছে, তাহাতে এইটুকু বলা যায় যে হ্যালীর সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিল না। হ্যালীর মতে উক্ত ধূমকেতুর আবির্ভাবদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তীকাল অন্যান্য সকল ধূমকেতুর কক্ষ প্রদক্ষিণ কালঅপেক্ষা সংক্ষিপ্ততম। ইহা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া এখন জানা গিয়াছে। এ ভয়ঙ্কর ধূমকেতু, যাহা সুস্পষ্টরূপে না হইলেও দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র বিনা দৃষ্টিগোচর হয়, আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি তিন ও এক তৃতীয় (৩⅓) বৎসরে স্বীয় কক্ষস্থিত সূর্য্যের নিকটতম বিন্দুতে উপস্থিত হয়। হ্যালী আরও একটি সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে যেমন তাঁহার ধূমকেতুটি গগন প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় কক্ষস্থিত সূর্য্যের নিকটতম বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেইরূপ অন্যান্য ধূমকেতুগুলিও যথাসময়ে স্বীয় স্বীয় কক্ষস্থিত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বিন্দুতে আসিয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমানে একপ্রকার সর্ব্ববা সম্মত হইয়াছে যে একটি ধূমকেতু সময়ে সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিলেও আকাশের অনন্তগভীরে চলিয়া গিয়া অ[illegible]ও ফিরিয়া আসিতে পারে। যতদূর পর্য্যবেক্ষণকা[illegible]া বলিতে পারেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে অ[illegible] ধূমকেতু দু'একবার মানবদৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হই[illegible] আর ফিরিয়া আসে নাই। হইতে পারে যে তাহারা অণ্ডাকৃতি কক্ষে পরিভ্রমণ না করিয়া ক্ষেপণীবৃত্তের (Parabolic curve) অনাবদ্ধ পথে চলিয়াছে। আর, জ্যোতির্বেত্তাগণ ইহাও সন্দেহ করেন যে সেগুলি মধ্যপথে খণ্ডাকারে পরিণত হইয়া উল্কাবৃষ্টির জন্মদান করিয়াছে। অন্তত একটি ধূমকেতুর ইতিহাসে এইরূপ ঘটনার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আবার ১৮০৫ এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল। বায়েলা নামক একটি অষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রমাণ করিলেন যে উপরোক্ত তিনটি বৎসরে একই ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আরও দুইবার ইহা ফিরিয়া আসিয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে মূলধূমকেতু হইতে একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু বাহির হইয়া পড়িল। আরও কিছুকাল পরে দেখা গেল যে একটি জ্বলজলে সুতা ঐ মূল এবং ক্ষুদ্র উভয় ধূমকেতুকে সংযুক্ত করিয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বায়েলার ধূমকেতুকে আর একবার ঠিক নিজের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি বাচ্ছা ধূমকেতুসহ গগনে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল। তিন সপ্তাহ এইভাবে দৃষ্টিগোচর হইবার পর চিরজন্মের মত উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু উহা পুনরায় ফিরিয়া আসিলে যে কক্ষ বিরচিত হইত বলিয়া জানা ছিল, সেই কক্ষপথে উল্কাবৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতেই জ্যোতির্বেত্তাগণ অনুমান করেন যে উক্ত ধূমকেতু বিখণ্ডিত হইয়া উল্কাবৃষ্টির জন্মদান করিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেকগুলি ধূমকেতু এত দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল যে তাহাদের কক্ষপথ ও তাহাদের ফিরিয়া আসিবার কাল গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আর দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় নাই এবং ইতিহাসও তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারে না।

একটি ধূমকেতু কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থলে পুনরাবির্ভূত হইবে তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা অতি সূক্ষ্মগণনার কার্য্য। ধূমকেতুর গতির এত অল্প অংশ মানবের দৃষ্টির সম্মুখে আসে যে, মানুষ যে তাহার কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, ইহাতেই বিজ্ঞানের জয়জয়কার। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হ্যালীর ধূমকেতু সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণের ফলে গ্রীণউইচ মানমন্দিরে শ্রীযুক্ত কাউয়েল ও শ্রীযুক্ত ক্রমেলিন মহোদয় দ্বয় তাহার পুনরাবির্ভাবের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, উক্ত ধূমকেতু ঠিক সেই স্থানেই পুনরাবির্ভূত হইয়াছিল। ১৮৩৫ বৎসরে উহা মোটে দুইশত সাতাশি দিনের জন্য—অর্থাৎ উহার কক্ষ প্রদক্ষিণের কিঞ্চিদধিক একশতাংশ কালের জন্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

হ্যালীর ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের স্থান নির্দ্দিষ্ট

করিতে গেলে তাহার গতিবেগ জানিতে হইবে এবং তাহার পরিভ্রমণ কালে অন্যান্য গ্রহাদি কত বলে তাহাকে আকর্ষণ করে তাহাও স্থির করিতে হয়। বৃহস্পতি এবং শনি, এই দুইটী বৃহৎ গ্রহদ্বয় পরস্পরের আকর্ষণের ফলে সময়ের হিসাবে বেশী নড়চড় করিতে পারে না—সেই নড়চড় খুব সামান্য বটে, তবু সেটা বেশ জানা যায়। তাহারা পরস্পরের যতনা নিকটে আসে, ধূমকেতুটী তদপেক্ষা তাহাদের অনেক নিকটস্থ হয়। আর, সেই সুদূর আকাশের মধ্যস্থলে ধূমকেতুর গতিবেগের সামান্য পরিবর্ত্তন তাহার পুনরাবির্ভাব কালের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। এই কারণেই এই ধূমকেতুর কক্ষ পরিভ্রমণ কাল চুয়াত্তর হইতে উনআশি বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ গ্রহগণের সবল ও অভাবনীয় আকর্ষণের ফলে অনেক ধূমকেতু গণনানির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন কক্ষ বিরচিত করে।

হ্যালীর ধূমকেতু এরূপ আকর্ষণের হস্তে আজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই বলিয়া অনুমান হইতেছে। বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদ্যা জ্যোতিষের অনেক তত্ত্ব সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই—হ্যালীর ধূমকেতুও জ্যোতিষের সেইরূপ একটী অনির্ণীত রহস্য। ইহা একটী উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়, কিন্তু এই আলোকের মূল কারণ আজও অনাবিষ্কৃত। বর্ণবীক্ষণের দ্বারা দেখা যায় যে ধূমকেতুর আলোকের সহিত সূর্য্যালোকের কোনই সম্বন্ধ নাই, অথচ polariscope দ্বারা জানা যায় যে ধূমকেতুর আলোক প্রতিফলিত আলোক, সম্ভবত ধূমকেতুর আলোকের কতক অংশ উহার নিজের এবং অপরাংশ সূর্য্য হইতে ধার করা। কিন্তু যদি বা তাহাই হয়, তাহা হইলেও আলোকের সেই দুই অংশ যে কিরূপ অনুপাতে সংমিশ্রিত তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত।

ধূমকেতুটীর মস্তকে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। ইহার ভিতরে অতি ভয়াবহ আলোড়ন সংঘটিত হয় এবং ইহা হইতে অনন্ত দ্রব্যরাশির নীলস্রোত অগ্ন্যুৎপাতজনিত বলের সহিত চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই মস্তক হইতেই সূর্য্যের বিপরীত দিকে এক পুচ্ছ বিনির্গত হয় এবং তাহা ছাড়া বুরুশ ও শৃঙ্গাকৃত অগ্নিস্রোতও বাহির হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার পুচ্ছ সময়ে সময়ে দেখা যায় না, আবার কিছু পরে অগ্নিস্রোত অভিব্যক্ত হইতেছে দেখা যায়।

ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার বিষয়ে সকলেরই কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। পুরাকালের লোকেরা এইরূপ কৌতূহলপরবশ হইয়া ধূমকেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ইহাদিগকে বহিরাকৃতি অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী প্রধান শ্রেণী উল্লিখিত হইল—(১) মশাল, (২) শ্মশ্রু, (৩) অসি, (৪) পিপা, (৫) পুচ্ছ, (৬) বল্লম, (৭) চক্র, এবং (৮) অশ্বপুচ্ছ।

বহু পুরাকাল অবধি কেবল আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেই ধূমকেতুর সঙ্গে অমঙ্গল আবির্ভাবের বিশেষ সংযোগ আছে বলিয়া একটী সংস্কার আছে। ইংলণ্ডে ম্যাথিউ নামক একটী সন্ন্যাসী ধূমকেতু "ভবিষ্যৎ ধ্বংশের সর্ব্বদা অগ্রগামী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঔবলিন লিখিয়াছেন "ধূমকেতু সকল ঈশ্বরের জানানী, তাহারা তাঁহার ক্রোধের দূতস্বরূপ"। ধূমকেতুর উদয়ে যে অমঙ্গলের আবির্ভাব হয় এই কুসংস্কার দুর্ভাগ্যক্রমে হ্যালীর ধূমকেতু উদয়ের আনুষঙ্গিক কতকগুলি ঘটনা দ্বারা পরিপুষ্টই হইয়াছিল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন তাহার ফলে ইংলণ্ডের রাজত্ব স্যাক্সনদিগের হস্ত হইতে নরম্যানদিগের হস্তে গিয়াছিল বলিয়া তদানীন্তন জ্যোতিষীগণ স্থির করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস সুপ্রসিদ্ধ বেয়ো টেপেষ্ট্রীতে অঙ্কিত চিত্র হইতে সুন্দর উপলব্ধ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ১১ অব্দে এগ্রিপ্পার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৫ খৃষ্টাব্দে জেরুজলেমের উপরে ইহা দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে জেরুজালেম পতনের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। ২১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ম্যাক্রিনসের মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল। ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই এট্টিলার মৃত্যু ঘটে। এইরূপ ইহা যতবার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, প্রায় তত বারই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ কাকতালীয় ঘটনা সমাবেশের ফলে জনসাধারণ ধূমকেতুর সঙ্গে অমঙ্গলের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসিয়াছে এবং কাজেই ধূমকেতুর উদয়ে অমঙ্গলের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

হ্যালীর ধূমকেতুর যে যে বৎসর আবির্ভাবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

খৃঃ পূঃ ২৪০, ১৬৩, ৮৭, ১২ এবং খৃষ্টাব্দ ৬৫, ১৪১, ২১৮, ২৯৫, ৩৭৩, ৪৫১, ৫৩০, ৬০৭, ৬৮৪, ৭৬০, ৮৩৭, ৯১২, ৯৮৯, ১০৬৬, ১১৪৫, ১২২৩, ১৩০১, ১৩৭৮, ১৪৫৬, ১৫৩১, ১৬০৭, ১৬৮২, ১৭৫৮, ১৮৩৫ এবং ১৯০৯। ১৮৩৫ অব্দে ধূমকেতুটী পূর্ব্ববর্ত্তী সকল বারের চেয়ে স্বল্পতম সময়ে স্বীয় কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অদৃশ্য হইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় রশ্মিলিখন যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শেষ বারে ৭৩ বৎসর ৪ মাসের জন্য

ধূমকেতুটী অদৃশ্য হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বরে ইহা সূর্য্যের নিকটতম বিন্দুতে আসিয়া ক্রমেই দূরবর্ত্তী পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৩৬ অব্দে বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষ, ১৮৩৯ অব্দে শনিগ্রহের, ১৮৪৫ অব্দে উরেনস গ্রহের এবং ১৮৫৬ অব্দের শেষ ভাগে নেপচুনগ্রহের কক্ষ পার হইয়া গিয়াছিল। ইহার গতিবেগের ক্রমিক হ্রাস উপরোক্ত আবির্ভাব বৎসর হইতে সুন্দর বুঝা যাইবে। ধূমকেতুটী ১৮৭৩ অব্দে সূর্য্য হইতে দূরতম বিন্দুতে পৌঁছিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে চলিয়াছিল। ১৮৮৯ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা নেপচুনগ্রহের কক্ষ, ১৯০২ অব্দে উরেনসগ্রহের, পাঁচ বৎসর পরে শনিগ্রহের এবং ১৯০৯ অব্দে বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষ পুনরায় পার হইয়া কয়েক মাস পরেই গ্রীনউইচের পর্য্যবেক্ষণশালাতে রশ্মিলিখন যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ধূমকেতুটী বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

হ্যালীর ধূমকেতু যখন ১৮৩৫ অব্দে উদিত হইয়াছিল, তখনও বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯০৮ অব্দে এই বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মোরহাউস নামক ধূমকেতুর পুচ্ছের বাষ্পে বিষাক্ত cyanogen এর অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন যে হ্যালীর ধূমকেতুরও বাষ্পে উক্ত বিষাক্ত পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব। থাকিলেও তাহা খুব পাতলাভাবে আছে—এত পাতলা যে ধূমকেতুটী পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষে আসিলেও পৃথিবীর অনিষ্টের সম্ভাবনা খুবই কম। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত ডোনাটির ধূমকেতু উজ্জ্বলতায় অনেক ধূমকেতুকে পরাস্ত করিয়াছিল। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেই ধূমকেতুর আয়তন সূর্য্যের আয়তন অপেক্ষা পাঁচশত গুণ বেশী, কিন্তু তাহার পরমাণুসমষ্টি পৃথিবীর পরমাণুসমষ্টির একটী ভগ্নাংশ মাত্র।

হ্যালীর ধূমকেতু ১৯০৯ অব্দের ২০ শে এপ্রিল তারিখে সূর্য্যের নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছিয়া দৈনিক ত্রিশ হইতে চল্লিশ লক্ষ মাইল বেগে সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ২০ শে এবং ২১ শে মে ইহা পৃথিবীর নিকটতম হইয়াছিল। তখনও উভয়ের ব্যবধান ছিল ১৪০ হইতে ১৫০ লক্ষ মাইল।

রবীন্দ্রনাথ।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার নাইট উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চ্চায় তিনি এই যে উপাধি লাভ করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ বলি কেন সমগ্র ভারতবর্ষ আজ গৌরবান্বিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সমর সজ্জার দারুণ কোলাহলের ভিতরে থাকিয়া ইংরাজজাতির অন্যদিকে চিন্তাকে প্রবাহিত করিয়া দিবার অবসর অতি অল্প। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ প্রতিকুল অবস্থার ভিতরেও রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সমাদর লাভ করিতেছে। Ernest Rhys সাহেব ম্যাকমিলন কোম্পানির কার্য্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনী বাহির করিয়াছেন। বিলাতের Nation পত্র রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কাব্যে ও রচনায় শান্তি ও সামঞ্জস্যের যে মন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও উপলব্ধি করা শান্তির অবস্থায়ও ইউরোপের পক্ষে সুকঠিন। প্রকৃষ্টরূপে উহার অনুভব করিবার শক্তি একমাত্র ভারতের পবিত্র নদীকূলবাসী ও হিমাচলশৃঙ্গবাসী ঋষি ও সন্ন্যাসীগণেরই আছে। গাঢ় ধূমাচ্ছন্ন কলকারখানা পরিবৃত নগরের উচ্চাভিলাষী ব্যস্তসমস্ত বিষয়ী বা ঈর্ষ্যাকলুষিত জাত্যভিমানী সাহেবগণের মধ্যে সে বোধশক্তি নিতান্তই অল্প। রবীন্দ্রবাবু বৈরাগ্যের গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার অন্তর্দেশ উক্ত বর্ণে রঞ্জিত। তিনি আপনাকে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া না ফেলিয়া জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছেন। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় তাঁহার কর্ম্মঠ জীবনের পরিচয় দিতেছে।
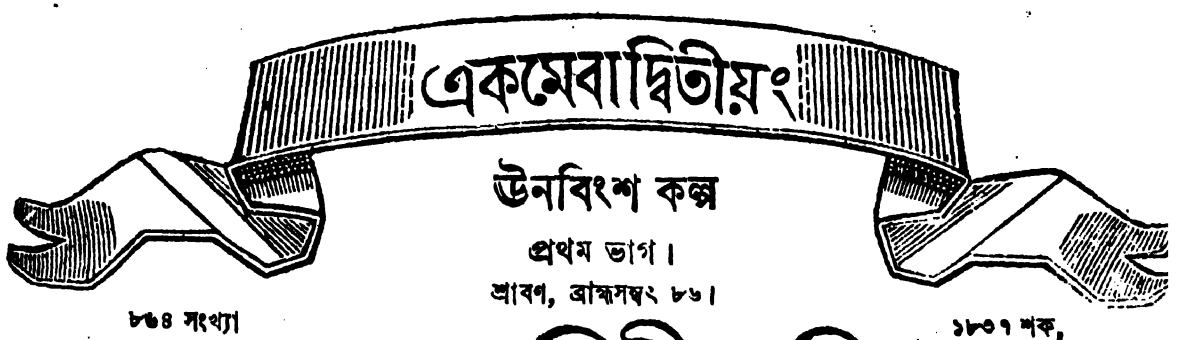
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

প্রেমমুখ দেখরে তাঁহার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রেমমুখ দেখরে তাঁহার। কবির হৃদয় থেকে কি সুন্দর কথা বাহির হইয়াছে। তাঁর প্রেমমুখ জগতের সর্ব্বত্র সন্দর্শন কর। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনায় তাঁর প্রেমমুখ দেখ। ঊষার প্রারম্ভে যখন প্রভাততপন বিমল হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে নিদ্রিত জীবজন্তুর প্রাণে জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়, তখন সেই সূর্য্যকে আমাদের কত না ভাল লাগে। এই সূর্য্য তো প্রতিদিনই এই রকম নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া উদিত হয়, আবার মধ্যাহ্ন গগনে রুদ্রদেবের ন্যায় জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে সময়ে সময়ে তাহার কঠোর উত্তাপে দগ্ধ করিয়া দেয়, তথাপি আমরা সেইপ্রভাত তপনকে ভালবাসতে ছাড়ি না; তথাপি আমরা প্রতিদিন প্রাণের ভিতর থেকে আগমনী গীত গাহিয়া সেই সূর্য্যদেবকে স্বীয় প্রেমমুখ দেখাইবার জন্য আহ্বান করি। চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, চন্দ্রসূর্য্যের অন্তরে থাকিয়া যিনি চন্দ্রসূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহাকে জানে না, তাঁহার প্রেমমুখ দেখিবার জন্য আমাদের প্রাণ কি ব্যাকুল হইবে না? একবার সেই সূর্য্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, সেখানে সেই সূর্য্যের অন্তরাত্মারই প্রেমমুখের প্রকাশ নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

তাঁহার প্রেমমুখের প্রকাশ কোথায় নাই? তাঁহার প্রেমমুখ যে সকল স্থানেই জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের উপরে যাও, সেখানেও যেমন তাঁহার আশ্চর্য্য প্রকাশ, সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া দেখ, সেখানেও তাঁহার তেমনই জ্বলন্ত বিকাশ। এই সকল পর্ব্বত সমূহে সেই বিশ্বরাজার প্রজাদিগকে যুগযুগান্তর ধরিয়া যোগাইবার উপযুক্ত জলরাশি যে কি আশ্চর্য্য উপায়ে সঞ্চিত থাকে, তাহা যিনিই স্থিরচিত্তে আলোচনা করিবেন, তিনিই সেই স্নেহময়ী মাতার স্নেহহস্ত উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আবার যখন ভাবিয়া দেখি যে এই অতলস্পর্শ সাগরও কি আশ্চর্য্য উপায়ে কোটী কোটী জীবজন্তুর আবাসভূমি হইয়াছে, তখন তাঁহার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই।

কেবল বাহিরে বাহিরে দেখিব কেন? আমরা যদি প্রত্যেকে ভাবিয়া দেখি যে নিজের নিজের শরীর কি আশ্চর্য্য উপায়ে পরিপুষ্ট হইতেছে, আমাদের মন ও আত্মা কি আশ্চর্য্য উপায়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতেছে, তাহা হইলে সেই ভগবানকে কি একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে না? তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে কি একবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শান্তি লাভের ইচ্ছা হয় না? সেই পরম স্নেহময়ী মাতার স্নেহভাব একবার ভাল রূপে উপলব্ধি কর, তাঁহার সেই আশ্চর্য্য প্রেমমুখ একবার ভাল করিয়া দেখ, তোমাদের সকল দুঃখ

সকল শোক দূর হইয়া যাইবে, প্রাণমন শান্ত হইবে, আত্মা সুশীতল হইবে।

ব্রহ্মের সহিত মানবের সম্বন্ধ।*

(শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক)

ব্রহ্ম বড়—অতি বড়—তাঁর চেয়ে আর বড় হতে পারে না। এত বড় যে তাঁর শেষ নাই—সীমা নাই—তিনি অনন্ত।

তিনি দেশে অনন্ত। এই যে আকাশ আমাদিগকে ঘিরে রয়েচে, ইহার আদি নাই অন্ত নাই। এই অনন্ত আকাশে অনন্ত সৌরজগৎ, তাহাতে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র রয়েচে। এত দূরে আছে যে, তাহাদের আলোক বিদ্যুৎগতির ন্যায় দ্রুত হলেও, অদ্যাপি পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই! ইহা বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। ইহার বিষয় ভেবে হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতের শেষ বয়সে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এই সমুদয় লোক-মণ্ডলে অনন্ত সৃষ্টি। সেই সমস্ত ব্যাপ্ত করে তাতে ওতপ্রোত হয়ে ব্রহ্ম রয়েচেন। তাঁরও আরম্ভ নাই—শেষ নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী।

তিনি শক্তিতে অনন্ত। ওঃ কি শক্তি! ঝঞ্ঝাপাতে, ভূমি-কম্পে, আগ্নেয়-গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে এবং বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় সেই অনন্ত শক্তির একটু আভাস মাত্র পাই। প্রত্যেক সৌর-জগতের কেন্দ্র একটি করিয়া সূর্য্য। তাকে বেষ্টন করে গ্রহ উপগ্রহ রয়েচে; আর সূর্য্য সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করচে আর তাহারা সোজা চ'লে যে'তে চাচ্চে। কাজে কাজেই তাহাদিগকে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে এই আকর্ষণ (centripetal) ও বিকর্ষণ (centrifugal) শক্তি সেই ব্রহ্ম-শক্তির কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র।

তিনি জ্ঞানে অনন্ত। তাঁর জ্ঞানেরও সীমা নাই—শেষ নাই। সকল জ্ঞানের উৎস ও মূল আকর তাঁর ঐ জ্ঞান। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অপরিমেয় জ্ঞানের পরিচয় দিচ্চে। কত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা কত কাল ধরে ঐ জ্ঞানের অনুসন্ধান করচেন, কিন্তু সমুদ্রতীরের বালুকণাও আহরণ করতে পারেন নাই। সেই জ্ঞানের জ্যোতি সব আলোকময় করে রেখেচে।

তিনি মঙ্গলভাবে অনন্ত—তিনি মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল তাঁর ইচ্ছা, মঙ্গল তাঁর কার্য্য, মঙ্গল তাঁর সঙ্কল্প এবং মঙ্গল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর রাজ্যে অমঙ্গল আসতে পারে না। তাঁর হাত দিয়ে অমঙ্গল ঘটনা ঘটতে পারে না। তিনি পুণ্যময় শুদ্ধ ও পবিত্র।

তিনি কালে অনন্ত। সুদূর ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁকে ধরতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম করে রয়েচেন। তাঁর আদি নাই—শেষ নাই। তিনি অনাদ্যনন্ত।

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী হয়ে, প্রত্যেক নরনারীর অন্তর বাহ্য পূর্ণ করে রয়েচেন। তিনি আমাদের সকলের প্রাণের প্রাণ হয়ে রয়েচেন। তিনি সমস্ত জীবের প্রাণাধার—মূল প্রাণ। তা না হলে আর সব কিছুই থাকত না—তাবৎ জগতের অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং তাঁকে দেখার জন্য দূরদেশে যাবার প্রয়োজন হয় না—কঠোর হঠযোগের প্রয়োজন হয় না। চক্ষু মেলিলে জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে, প্রাণী রাজ্যের প্রাণ রূপে এবং চক্ষু মুদিলে আত্মার অন্তরাত্মা রূপে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। এত নিকট আর কেহ নহে। অনন্ত তাঁর ক্রোড়। যত অমর আত্মা আমাদের পূর্ব্বে এসেছেন ও পরে আসবেন, সকলেই সেই অনন্ত ক্রোড়ে বসে আছেন ও থাকবেন। সেই একই কোল, যাবতীয় আত্মার মিলন স্থান।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান হলে আমাদের কি লাভ হত, যদি তিনি বিধাতা—কর্ত্তা না হতেন? তিনি আমাদের অন্তরে শুধু বিরাজমান নহেন, বিধাতা হয়ে প্রতিজনের জীবনের যাবতীয় ব্যাপার বিধান করচেন। আমাদিগকে ইহলোকে আনিবার আগে আমাদের জন্য সকলই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন; আবার ইহলোকে এনে সমস্ত যোগাচ্চেন এবং যত দিন রাখবেন ততদিন সব দেবেন। তিনি গড়চেন, তিনি ভাঙচেন, তিনি দিচ্চেন তিনি নিচ্চেন এবং পাঠাচ্চেন ও ডেকে নিচ্চেন। একি নিগূঢ় সম্বন্ধ!

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে (১৩২২ সাল, ৯ই আষাঢ়) প্রপঠিত।

তিনি অনন্তজ্ঞান হয়ে সর্ব্বজ্ঞ হয়ে রয়েচেন। তাঁর কাছে ভূতকাল ভবিষ্যৎকাল নাই। তাঁর চক্ষে ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সব সমান। তাঁর কাছে সকলই বর্ত্তমান কাল। সুতরাং তিনি সব দেখচেন—সব শুনচেন—সব জানচেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি আমাদের প্রতি জনের দীনতা, হীনতা, মলিনতা, দুর্ব্বলতা, কপটতা ও অসহায়তা দেখচেন। তাঁর কাছে কিছুই লুকাবার উপায় নাই। Deqincy রচিত Flight of the Tartars নামে একটি প্রবন্ধ বাল্যকালে পড়েছিলাম। তাতারেরা পালাচ্চে—মরুভূমির উপর দিয়া—গহন কাননের ভিতর দিয়া পালাচ্চে, আর তাদের পিছনে পিছনে একটা বৃহৎ হাত তাদের ধরতে যাচ্চে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মে ও মানুষে এই কল্পনা সত্য হয়েচে। আমরা যত গোপনে—যত নির্জ্জনে পাপ করি না কেন, ঐ হাতের ন্যায় ব্রহ্মের বিশ্বতশ্চক্ষু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেচে। আমরা মনে মনে পাপ চিন্তা করি, সেখানেও ঐ চক্ষু। ব্রহ্ম অন্তরে বর্ত্তমান থেকে সব দেখচেন—সব জানচেন, ইহা যদি আমরা দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করি—যেমন তেমন বিশ্বাস নয়—জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি বিশ্বাস করি, পাপ করা, পাপ চিন্তা করা মানুষের পক্ষে এক-প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। চরিত্র গঠন ও রক্ষা পক্ষে এই সাধনা নিতান্ত উপযোগী। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ হয়ে রয়েচেন ও সব দেখচেন, এই সত্য যদি মনে জেগে থাকে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি বিষয় কার্য্যে, কি বিচারাসনে, যখন যে কার্য্য করি না কেন, সত্য পথ হতে বিচ্যুত হবার ভয় থাকে না। সেই জন্য ধার্ম্মিকেরা বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার আগে তাঁকে স্মরণ করেন।

ব্রহ্মের অসীম জ্ঞানের সহিত মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান যৎকালে মিশে যায়—যখন সাধক নিজ জ্ঞানচক্ষে সেই জ্ঞান-স্বরূপকে অন্তরে দেখেন, তখনই তিনি যোগানন্দ ও ব্রহ্মের পবিত্র সহবাস জনিত সুখ সম্ভোগ করেন। এ কেমন গভীর সম্বন্ধ!

ব্রহ্ম অনন্তমঙ্গল—তিনি কল্যাণ-স্বরূপ। যে ঘটনায় আমরা অমঙ্গল দেখি, ব্রহ্মচক্ষে তাহা মঙ্গলকর। আমাদের স্থূল দৃষ্টি ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি একদেশ ও এককালদর্শী। অসীম বিশ্ব জুড়ে তাঁর দৃষ্টি দেখচে। তিনি অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ দেখে যে ব্যবস্থা করেচেন, আমাদের এতটুকু জ্ঞান, এতটুকু বুদ্ধি তার কি বুঝিবে? তাঁর কার্য্যের দোষ গুণ বুঝতে যাওয়া, বামন মানুষের গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধার পরিচায়ক মাত্র। যে মানুষ এক কণা বালুকার তথ্য—সামান্য একটা ঘাসের পাপড়ির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম—যে মানুষ (অন্যের কথা দূরে থাকুক) আপন পরিণীতা পত্নীর মনের কথা—আপনার প্রিয়তম বন্ধুর মনের ভাব জানিতে অসমর্থ, সে কি না বিচারাসনে বসে সেই অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্তমঙ্গল মহাপুরুষকে আসামীর কাটগড়ায় দাঁড় করিয়ে, তাঁর কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করতে যায়!! এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ হতে পারে না। আমাদের সতত সাবধান থাকা উচিত যেন এ প্রকার হাস্যাস্পদ কার্য্য না করি। ইহার তুলনায় শিশুর চাঁদ ধরতে যাওয়া শোভা পেতে পারে—বিশাল সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া তাহার তরঙ্গমালা গুণিতে যাওয়া বরং সম্ভবপর হতে পারে, ঝড়ের পিঠে চড়ে আকাশের নক্ষত্র তারা ছিঁড়িতে যাওয়া পাগলের কাজ মনে না হতে পারে।

দার্শনিক পণ্ডিত Diderot এবং Millএর কি দর্প, যে লিখে গেলেন "Either God is not wholly omnipotent or He is not wholly good," এ কথা সত্য হলে মানুষ আর দাঁড়ায় কোথায়? এ কথা প্রকৃত হলে দীনহীন কাঙ্গাল রোগযন্ত্রণায় অস্থির রোগী, শোকসন্তপ্তা জননী, অথবা সাধ্বী ভার্য্যা কোথায় সান্ত্বনা পাবে? স্বচক্ষে দেখিতেছি দুঃখী দরিদ্রেরা কষ্ট ভোগ করছে আর বলছে "দয়াল হরি পার কর," মহাব্যাধিগ্রস্ত কাতরস্বরে বলছে "দয়াময় যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর," যুবতী বিধবা হয়ে বলছে "দয়াময় একি করলে?" বাস্তবিক তিনি দয়াময়, মঙ্গলময় না হলে, দেশ জুড়ে আবহমানকাল ধরে, মানুষ এমন বলবে কেন? সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুসজ্জনেরা ওকথায় সাক্ষ্য দিবেন কেন? দয়াময়

কি মধুর নাম! এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল কি মধুর নাম," উন্মত্ত হয়ে এই গান মানুষ নাচিতে নাচিতে গাহিবে কেন? দুঃখী দরিদ্র যখন "দয়াময়ী মা" বলে—পাপী তাপী যখন "দুর্গতিনাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী মা" বলে ডাকে, সে কত আরাম পায়। দু একজন তার্কিকের কথায়, অসহায় মানুষ কি ভুলতে পারে? কথায় ভুলবে, না "দয়াল" বলে ডেকে সান্ত্বনা পেয়ে, শিব-স্বরূপ—কল্যাণ-স্বরূপ বলে বিশ্বাস করবে? ব্রহ্ম কি শিশু শিক্ষায়" বর্ণিত দুরন্ত বালক যে, খুঁজে খুঁজে পাখীর ছানা এনে, তার ডানা কেটে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়ান ও বেচারির ছটফটানি দেখে আহ্লাদে হাত তালি দিয়া হি হি করে হাসেন? এমন নিষ্ঠুরকে কি কেহ কখন পূজা করতে ও দয়াময় বলে ডাকতে পারে? ঠিক খুঁজে খুঁজে বাহির করাই বটে। যেখানে একজনের উপর অনেকগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করেছে—বিধবার আশা-যষ্টি-স্বরূপ যেখানে একমাত্র পুত্র রয়েচে, বেচে বেচে তাহাকেই তুলে লন। তবে কি তিনি ঐ নিষ্ঠুর বালকের ন্যায় তাঁরই সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে কষ্ট দিয়ে, আনন্দ ভোগ করেন? একি ভয়ানক কথা! তা নয়—তা হতেই পারে না। তাহলে সব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যায়—সকল আশা, সব দাঁড়াবার জায়গা, সব সান্ত্বনার ভূমি চলে যায়। মানুষ কখনই ব্রহ্মকে নির্দ্দয় রাক্ষস বলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হবে, এই সর্ব্বশাস্ত্রের ও সকল সাধুজনদিগের উপদেশ। ঋষি Parnell বলেছেন "And when you can't unriddle, learn to trust (God); ভগবানের বিধানে দোষাধোপ না করে—তাঁর কার্য্যের বিচার না করে; তাঁর চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করাই মানুষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সরলভাবে বলতে হবে "Father Thy will be done on earth as it is in heaven."

আমরা মনে করি, ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করে ও নিয়ম বেঁধে দিয়ে নিজে দূরে থাকেন, ইহার সহিত তাঁর আর কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছা ভিন্ন কোন কাজ চলে না। এই সৃষ্টিতে তাঁর ইচ্ছাস্রোত চলেছে। সেই স্রোত যখনই বন্ধ হবে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজা কোন আইন চালাতে ইচ্ছা করলে, আইনটা শুধু বিধিবদ্ধ করলে হয় না। তাহা বলবৎ রাখার ইচ্ছায় লঙ্ঘনকারীকে দণ্ড দিতে হয়। তাহা রহিত করবার ইচ্ছা যখন করেন, তখনই বন্ধ হয়। সৌর-জগতের গ্রহগণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি লাভ করে অনবরত ঘুরচে; তাহাতেও তাঁর ইচ্ছা বর্ত্তমান। সেই ইচ্ছার যেই বিরাম হবে, তাহারাও থেমে পড়বে। ব্রহ্ম আমাদের মধ্যে থাকিয়া কেবলই কার্য্য করছেন—বিশ্রাম নাই।

আর এক কথা। আমরা একেবারেই কিছু বুঝিতে পারি না, তা নয়। আমাদের জ্ঞান সসীম হলেও বুঝিবার শক্তি কতকটা আছে। সেই জ্ঞানালোকে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ভেসে যায় বানে গ্রাম মাঠ, আর পরিষ্কার হয় পল্লীর খানা ডোবার পচা জল; এবং তিন বৎসরের ফসল এক বৎসরে পাওয়া যায়। পুড়ে যায় আগুনে সহর, আর দুর্গন্ধপূর্ণ স্থান সকল নির্ম্মল হয়ে যায়। দুঃখে কষ্টে গরিবের চক্ষে জল পড়ে, আর মানুষের প্রাণে দয়া ও সেবাবৃত্তি জেগে উঠে; হয়ে পড়ে চারিদিকে দাতব্য চিকিৎসালয়—ছুটে যায় নর নারী দেশ দেশান্তরে সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য। ইউরোপের তুমুল সমরে লক্ষ লক্ষ লোক মরচে—সুন্দর সুন্দর নগর ছারখার হয়ে যাচ্চে—চাষ আবাদ কল কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। ইহার ভিতরেও ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। গর্ব্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব হচ্চে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে, উলুখাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে দেখে, শ্রমজীবিরা বলচে "ভাষা প্রভেদ হলে কি হয়, আমরাত সেই এক ব্রহ্মের সন্তান, আমরা কেন আপনা আপনি মারামারি কাটাকাটি করে মরি? জয় পরাজয় যাহার হউক না কেন, আমাদিগকে সেই খেটে খেতে হবে। আমরা যুদ্ধ করব না"। ভবিষ্যতে এরূপ যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা খুব কম হবে; অন্ততঃ কিছু কাল বন্ধ থাকবে। এক দেশের প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেশান্তরে যাচ্ছিল, এখন বন্ধ হওয়ায় লোকের চক্ষু ফুটিয়ে

দিচ্ছে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কত দোষ তাহা বুঝে সেই সকল দ্রব্য নিজেদের দেশে করবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েচে। সুবৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ সমুদায়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হবার ও ঐ সকল দেশে নূতন নূতন রাজনৈতিক অধিকার পাবার সূচনা দেখা যাচ্চে। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক জগতে সেই বিধাতার হাত যেমন দেখা যায়, ইতিহাসেও সেই হাত তেমনি কার্য্য করচে। আমরা যতই কেন প্রার্থনা করি না, যত দিন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ না হবে, তত দিন এ সমরানল নিববে না।

এই সৃষ্টিকে অনিত্য করে মঙ্গলময় আমাদের কত শিক্ষা দিচ্ছেন। সুন্দর ফুল সন্ধ্যায় ফোটে, প্রাতে শুখাইয়া পড়ে যায়। মানুষ শৈশব হতে কত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, শেষে বৃদ্ধ হয়ে মরে যায়। অকালেও কত লোক চলে যাচ্চে। তিনি আমাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাচ্ছেন আর বলছেন "এ সব অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আস্থা ও প্রীতি স্থাপন করিও না, করিলে তাদের বিয়োগে শোক পেতে হবে। নিত্য অক্ষয় বস্তু আমি, আমাকে প্রীতি কর, আমাতে প্রাণ মন ঢালিয়া দাও, বিচ্ছেদ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না"। যেখানে শিক্ষা, সেই খানেই পরীক্ষা। শিক্ষা কতদূর হল, তার পরীক্ষা চাই। প্রিয়-জন বিয়োগে অবিশ্বাসী ব্রহ্মের হাত দেখতে পান না। বিশ্বাসী বুঝেন যে অনিত্য বস্তুতে তাঁর মায়া মমতা কতটা আছে, কতটা গেছে, তারই পরীক্ষায় পড়েছেন। কত প্রলোভন আমাদিগকে কত বিভীষিকা দেখাচ্ছে। বিশ্বাসী ঐ সকলে ব্রহ্মের অভিপ্রায় বুঝে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর নিকট ধর্ম্মবল প্রার্থনা করেন। জয় পরাজয়ে পরীক্ষা হয়। আবার কতক দার্শনিক এই সকল দেখে শুনে ও ভেবে আর এক সীমায় গিয়া বল্লেন, এ সব মায়া মাত্র—এ জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। তাঁরা সংসার ছেড়ে—সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে বেড়ান। ঐ কথা ও আচরণ ঠিক নয়। জগতের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহা অপূর্ণ ও অস্থায়ী। একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণ সত্য, আর সকল আপেক্ষিক সত্য; একেবারে মিথ্যাও নহে মায়াও নহে। পৃথিবীতে থাকতে হবে ভেসে ভেসে। এতে ডুবতে হবে না। শরীরটাকে বাহিরে রেখে মধুপাত্র হতে মধু খেতে হবে। তাতে পড়িলেই মরণ নিশ্চয়। অনাসক্ত হয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে।

ব্রহ্ম কালে অনন্ত। তিনি অমৃত পুরুষ। মানুষ অমৃতের সন্তান, মানুষও অমর। তাহার অনন্ত জীবন। সেই অনন্ত জীবন আমাদের সম্মুখে। এখানকার দুচারি দিনের সুখ দুঃখ জ্ঞানীরা—সাধকেরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন না। তাঁরা বলেন "কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে"। দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে সুখ দুঃখ জরা মৃত্যু ও শোক সন্তাপ হতে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঐ সব হতে মুক্ত হতে হলে বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথে চলতে হবে।

আহা অনন্তের কি মহিমা! তাঁর কেহ স্রষ্টা নাই—কোন অধিপতি নাই। তিনি স্বয়ম্ভূ—সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজমান। কেন তিনি অনন্ত হলেন? ইহার কারণও আমরা কতকটা বুঝতে পারি। তিনি সসীম হলে তাঁকে কে গ্রাহ্য করত? অনন্ত অসীম হয়েও দার্শনিকের হাতে নিস্তার নাই, সসীম হলে তো মানুষ তাঁকে ধরে ফেলত—একেবারে জেনে ফেলত। তাঁকে পাবার জন্য কে আর তপস্যা করত? অনন্ত হয়ে কেমন মজা করেছেন। তাঁকে ধরবার জন্য—জানবার জন্য যোগীরা সাধনা করছেন, আর তিনি আরও দূরে যাচ্ছেন। অনন্ত না হলে মানুষ তাঁকে জেনে ফেলত; তারপর মানুষ অনন্ত জীবন নিয়ে কি করত? মানুষ অনন্তকাল ধরে তাঁর দিকে ছুটবে। ক্রমশঃ তাঁর নিকটস্থ হবে, কিন্তু একেবারে পৌঁছিলে তো অনন্তপথের যাত্রীর সব পথ ফুরাইয়া যাবে। ধরা দিয়াও একেবারে ধরা দিবেন না। একি তাঁর অপার মহিমা। যোগীরাই এর মর্ম্ম বুঝেন—আমরা কি বুঝিব!

হে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম! তোমার দয়া, তোমার প্রেম, তোমার স্নেহ সবই অপার। তদ্দারা আমাদিগকে সতত রক্ষা কর। তোমার উপর আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় কর, নির্ভরকে ঘন কর,

প্রেমকে নিত্য নূতন কর, ভক্তিকে প্রগাঢ় কর এবং কৃতজ্ঞতার উৎস খুলে দাও। এই উৎসবক্ষেত্রে করযোড়ে, অবনত মস্তকে তোমার নিকট আমাদের এই ভিক্ষা। আশা পূর্ণ কর, রিক্তহস্তে যেন ফিরে যেতে না হয়।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

নূতন বারতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাগরের ভাঙ্গা তরঙ্গের মত
ভাবনার মাঝে অবিশ্রান্ত শত,
স্বরগ হইতে বারতা নূতন
ঢালগো হৃদয়ে নূতন কিরণ।

সন্দেহ আঁধার ভয় দুঃখ শোক
ঘুচে যাক পেয়ে বিমল আলোক;
নয়ন মোদের চলুক ফিরিয়া
মহাজ্যোতি পানে— পূর্ণ হোক হিয়া।

নদী যথা নেমে উচ্চাসন হতে
নবপ্রাণ দেয় জীবজন্তু শতে,
জাগে তারি যথা কোমল পরশে
শুষ্ক লতাপাতা নূতন হরষে,
নূতন কিরণে সেই মত তুমি
দাওগো জাগায়ে মম চিত্তভূমি॥

মহাপুরুষ ও স্বাধীনতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঈশ্বর স্বাধীন—পূর্ণ স্বাধীন, তাই তিনি মহান বৈ পুরুষঃ। সেইরূপ যে মানব যতটুকু স্বাধীন, তিনিও ততটুকু মহাপুরুষ এবং সেই অনুপাতে জনসাধারণের পূজা আকর্ষণ করেন। স্বাধীন না হইলে কেহই মহাপুরুষ হইতে পারে না—স্বাধীনতাই মহাপুরুষত্বের কেন্দ্র। স্বাধীনতার অর্থ নিজের অধীনতা বা আত্মনির্ভর। প্রকৃত স্বাধীন পুরুষ নিজের শুভবুদ্ধি অনুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে অগ্রসর হয়েন। এবং সেই অনুষ্ঠানের জন্য প্রশংসা লাভ বা তাহার সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি অপর পাঁচজনের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে অগ্রসর হয়েন না, কারণ বাহিরের পাঁচজনের ভাল মন্দ বিচারের উপর তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে নির্ভর করেন না। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেহ কি দেখিয়াছেন যে যাঁহার স্বাধীনতা নাই, যাঁহার আত্মনির্ভর নাই, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া প্রকৃত সম্মান লাভ করিয়াছেন? জানি না কতদূর সত্যমিথ্যা, প্রবাদ আছে যে অযোধ্যার নবাব, যাঁহাকে বহুকাল মুচিখোলার প্রবাসে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, নিজের জুতাযোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিবার লোক পান নাই বলিয়া বন্দী হইয়াছিলেন। ঘটনাটী সত্য হইলে তাঁহার বন্দী হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। স্বাধীনতাকে, আত্মনির্ভরকে এতদূর জলাঞ্জলি দেওয়া অত্যন্ত ঘৃণার কথা। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কি এই ধ্বনি উঠে না যে, যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরকে এতদূর জলাঞ্জলি দেয়, সে ব্যক্তি কোটী কোটী মুদ্রার অধিপতি হইলেও অতীব কৃপাপাত্র? এরূপ জীবনে জগত উন্নতির পথে অতি অল্পই অগ্রসর হয়।

আত্মনির্ভর যাঁহার সম্বল, স্বাধীনতা যাঁহার প্রাণ, তাঁহার এক কপর্দক না থাকিলেও তিনি মহাপুরুষ। যিনি পরপ্রত্যাশী নহেন, তাঁহার কিসের অভাব? যিনি আত্মনির্ভরকে জীবনের নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহার কিসের অভাব? বিশ্বজগত তাঁহার করতলন্যস্ত—বিশ্বজগত তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হইবে। বিষয়টা এতই গভীর যে ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়া অপরের হৃদগত করানো অসম্ভব। যিনি আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন পুরুষ, তিনিই অবগত আছেন যে বিশ্বজগত তাঁহার কিরূপ আয়ত্ত। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী, মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধু যোগী পুরুষের চরণে আমরা যে অগণিত মুদ্রা ঢালিয়া দিতে উদ্যত, তাহার প্রকৃত কারণ কি? তাহার প্রকৃত কারণ এই যে তাঁহারা আমাদের টাকার প্রত্যাশী নহেন, কারণ তাঁহারা স্বাধীন জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহাদের আত্মনির্ভর আমাদের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক, তাই আমরা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

আত্মনির্ভর যাঁহার সম্বল, স্বাধীনতা যাঁহার প্রাণ, তিনি তোমার আমার কথার উপরে ক্ষতিলাভ গণনা করেন না। তিনি তোমার আমার ভয়ে সত্য বলিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। সংসারের ভয়ে তিনি মিথ্যা বলিতে অগ্রসর হয়েন না। তিনি তোমার আমার হিসাবে লাভ লোকসান গণনা করিয়া কি জগতের হিতসাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন? স্বাধীন মানবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ নির্ভীকতা। তিনি যখন কাহারও নিকট কোন প্রত্যাশা রাখেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে কে ভয় আনয়ন করিতে পারে? তাঁহাকে আপনার সুবিশাল সুদৃঢ় বক্ষস্থলে বিপদ অশনির সমুদয় বেগ সহ্য করিতে হইলেও

তিনি নির্ভীকভাবে সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, জগতের হিতসাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন না, অত্যাচারের দমনকার্য্যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন না। তাঁহার এক এক বীর পদভরে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠে।

স্বাধীন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিতে পারেন না, ইচ্ছাপূর্ব্বক অমঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল পথে চলিতে পারেন না। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিলেই বুঝা গেল যে তিনি আর স্বাধীন নহেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকারের স্বার্থের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অমঙ্গলসাধনে উদ্যত হইলে বুঝা গেল যে তিনি আত্মনির্ভর পরিত্যাগ করিয়া অপরের অমঙ্গলকে নিজের স্বার্থসাধনের উপায় করিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি অত্যাচার দমনে বিরত থাকিলে বুঝিব যে তিনি নিজের স্বাধীনতা অপেক্ষা ক্ষণিক পার্থিব সুখকে অধিক করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন—পার্থিব ক্ষণিক সুখের নিকট নিজের স্বাধীনতাকে বলিদান করিয়াছেন। এই কারণেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, যে ব্যক্তি যতটা স্বাধীন, যতটা আত্মনির্ভরশীল, যতটা নিজের সুখবিলাসের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনিই ততটা মহাপুরুষ এবং তিনিই ততটা আমাদের পূজা আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

মহাপুরুষের স্বভাব এই যে তিনি নিজে যেমন স্বাধীন জীবন্মুক্ত পুরুষ, সেইরূপ তিনি অপরকেও স্বাধীনতা বিতরণ পূর্ব্বক জীবন্মুক্তির পথে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। লৌহ যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে আসিয়া চুম্বক হইয়া যায়, সেইরূপ ভাগ্যবান পুরুষ স্বাধীন মহাপুরুষের সহিত অবস্থানে নিজের অবস্থা অনুসারে ও ধারণাশক্তির অনুপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া মহাপুরুষের পদে আরোহণ করিবার অধিকারী হইতে থাকেন। স্বাধীন মহাপুরুষ জর্জ ওয়াসিংটনের সংস্পর্শলাভে আমেরিকার সমগ্র যুক্তরাজ্য চিরকালের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিল। এক মার্টিন লুথারের স্বাধীনতার বলে সমগ্র ইউরোপের দেহ হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল খসিয়া গেল। এক বুদ্ধদেবের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে সময়ে ভারত স্বাধীনতার এক দিব্য ক্রীড়াভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বাধীন জীবন্মুক্ত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে তাঁহারই মুখনিঃসৃত গীতা অবলম্বনে আজ সমস্ত সুসভ্য জগত মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথে দ্রুতপদে অগ্রসর।

শক্তিসমূহকে সংহত না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবন্মুক্তি লাভের উপদেশ দিবার কালে বলিয়াছেন যে কূর্ম্ম যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংহরণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে সংহরণ করিয়া আপনার অন্তরে নিমগ্ন রাখিতে হইবে। এই উপদেশ এত ঠিক যে যিনি কিয়ৎকালের জন্যও এই উপদেশ অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার যথার্থ্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। যিনি এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য না করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহার ফল বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। মেঘমালায় তড়িৎ যখন সংহত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা বজ্রাঘাতে সমুদয় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার বল ধারণ করে—তাহার তীব্র তেজের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। বজ্রের তেজ যিনি জানেন তিনিই জানেন, যিনি জানেন না তাঁহাকে বোঝানো অসম্ভব। সংহত তেজের আর একটি দৃষ্টান্ত অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহা সংহত বায়ু। এই যে মলয়বায়ু সেবন করিয়া আরাম উপভোগ করি, এই মলয়বায়ুর প্রভঞ্জনমূর্ত্তি দেখিয়াই তো মুখের বাক্য সরে না, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসে। আবার যখন সেই বায়ুকে সংহত করা যায়, তখন তাহার কি ভীষণ তেজ। যে সকল ধাতু বজ্রের আঘাতেও ভস্ম করা যায় না, সেই সকল ধাতু এই সংহত বায়ুর সাহায্যে অনায়াসে দগ্ধীভূত হইয়া যায়। আমরা যাহাকে জড় বলি, সেই জড় রাজ্যেই যখন সংহত তেজের এইরূপ ক্ষমতা, তখন তদপেক্ষা অনেক বেশী সংহত মানসিক ও আধ্যাত্মিক তেজকে যদি আরও সংহত করা যায়, তবে সেই সংহত তেজের ক্ষমতা যে আশ্চর্য্যজনক হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সেই সংহত তেজের বলে সেই যে সভ্যতার প্রভাতগগনে বৈদিক ঋষিরা জ্ঞানবীজ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানখণ্ডসমূহ জগতের মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে নানাবিধ তরঙ্গ উঠাইয়া চলিয়াছে। সেই বৈদিক ঋষিদের হৃদয়ের স্বাধীনতা সমগ্র জগত বেষ্টন করত পুনরায় এই ভারতের উপকূলে লাগিয়া এখানে পুনরায় স্বাধীনতার নূতন তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিয়াছে।

স্বাধীনতার অর্থে নিজের অধীনতা ও আত্মনির্ভর হইলেও স্বেচ্ছাচারিতা নহে, কথায় কথায় বিপ্লবের সূচনা করা নহে। প্রকৃত স্বাধীনতার পরিণামে জগতের মঙ্গলসাধনে মতি হইবে, সত্যসাধনে রতি হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইতে হইবে। স্বাধীন ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারেন না, অত্যাচার অন্যায় অধর্ম্ম প্রভৃতির প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যে ব্যক্তির শক্তি অসংহত সে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মিথ্যাশক্তি, যদি ইহা একটা শক্তিনামের উপযুক্ত হয়, কখনও সংহত হইতে পারে না। শূন্যকে যতই সংহত করিবে তাহা শূন্যই থাকিবে—শূন্য কখনও সংহত হইতে পারে না। মিথ্যা শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে—মিথ্যার যে অস্তিত্বই

নাই, সুতরাং মিথ্যাও সংহত হইবার অধিকারই রাখে না। এই মিথ্যা হইতে যত কিছু অত্যাচার, যত কিছু অনাচার এবং যত কিছু অধর্ম্ম সকলেরই উৎপত্তি। এই কারণে তৈল যেমন জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ স্বাধীনতা মিথ্যাভিত্তি অধর্ম্মের সহিত কখনই মিশ্রিত হয় না। বলিতে কি, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেই, মিথ্যার নিকটে মস্তক অবনত হইলেই রুদ্রদেব এক হস্তে উদ্যত বজ্র, অপর হস্তে অভয়বর লইয়া অধর্ম্মকে বিদূরিত করত ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সংসারে অবতীর্ণ হয়েন। এই সত্য যেমন প্রত্যেক মানবের জীবনে পরীক্ষিত, তেমনি মানবসমাজেরও জীবনে ইহা পরীক্ষিত।

মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ, অবতারের আবির্ভাব যেমন ব্যক্তিবিশেষের, সেইরূপ সমাজেরও জীবনের লক্ষণ। যখন সলের (Saul) আত্মাতে ভগবানের তেজ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সাধু পলরূপে প্রস্তুত করিলেন, তখন সেই আত্মাতে যে জীবন ছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যখন বাল্মীকির আত্মাতে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঋষিতে পরিণত করিলেন, তখন সেই বাল্মীকির আত্মা যে জীবনময় ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সেইরূপ যে সমাজে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ কখনই মৃত ছিল না। যে সমাজে ঋষিরা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সমাজ নিশ্চয়ই জীবনে ঢলঢল করিতেছিল। আর বাস্তবিক, সেই প্রাণময় ভগবান যে ব্যক্তি বা সমাজের প্রাণ আন্দোলিত করিতে আসেন, সেই ব্যক্তি বা সমাজ কি কখনও মৃত থাকিতে পারে? আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবনে সেই প্রাণময়ের আন্দোলন অনুভব করি বটে, কিন্তু যখন সমাজে তাঁহার স্নেহময় আবির্ভাব হয়, তখন যুগপৎ শতসহস্র লোক বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া উঠে। যে সমাজে ভগবানের আবির্ভাব হয়, সেই সমাজের সকলেই অল্পবিস্তর তাঁহার স্পর্শলাভে নিজের নিজের অন্তরাত্মার অবস্থাবিশেষে ও ধারণাশক্তির অনুপাতে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিবার অধিকারী হয়েন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরের আসন হইবার যোগ্যতম, ঈশ্বর সেই আসনেই প্রকৃষ্টরূপে উপবিষ্ট হইয়া জনসাধারণকে আহ্বান করেন; তখন স্বভাবতই সেই ব্যক্তি বিশেষভাবে মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া জনসাধারণে গৃহীত হয়েন এবং সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে অধর্ম্মের পরাভব পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্কারের জন্যই সংসারে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। এ পর্য্যন্ত জগতে যত বিপ্লব এবং তৎসঙ্গে মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মের সংস্থাপনই সেই সকলের মূলে। মনুষ্যসমাজে যতকিছু ভাল পদার্থ আছে, এক ধর্ম্মের সহিত সকলেরই সুদৃঢ় সম্বন্ধ। ধর্ম্মই সকল মঙ্গলের কারণ এবং সকল সৌন্দর্য্যের নিদান। সংক্ষেপে যাহা কিছু পৃথিবীতে ভাল আছে, ধর্ম্ম সকলের সারভাগ। তাই অধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের পরাভবে লোকের মনে এত আঘাত লাগে। তাই কাহারও ধর্ম্মের উপর আঘাত করিলে তাহা তাহার নিতান্ত অসহ্য হয়, মর্ম্মঘাতী হইয়া উঠে—জীবন থাকিতে এইজন্য লোকে ধর্ম্মরক্ষা করিতে কাতর হয় না। ধর্ম্মবিষয়ে পরাধীনতা আসিলে জানা গেল যে সর্ব্ববিষয়ে পরাধীনতা আসিয়াছে—স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র নাই। কোন্ ব্যক্তি জীবন থাকিতে নিজের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা নীরবে বিসর্জ্জন দিতে পারে? অন্নবস্ত্রের পরাধীনতা তবু সহ্য হয়; অর্থের পরাধীনতা তবু সহ্য হয়; শরীরের পরাধীনতাও শতবার সহ্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে পরাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন একেবারে অসহ্য। আত্মার স্বাধীনতা, ধর্ম্মের জয় আমাদের এত প্রিয় বলিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই সমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, বিপ্লব উপস্থিত হয়। ভারতবাসী আমরা সর্ব্ববিষয়ে এত যে পরাধীন ও দীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি, আমরাও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপের নামে শিহরিয়া উঠি।

ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ হয় বলিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে, যে কোন দেশে ও যে কোন কালে যে কোন মহাপুরুষ উদিত হইয়াছেন অথবা হইবেন, সকলেই ধর্ম্মের অত্যুচ্চ আসনে অধিরূঢ়। আত্মার তিন মহাশক্তি আছে—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। তন্মধ্যে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ়তম যোগসাধনের একমাত্র সূত্র। যখন জ্ঞান ও কর্ম্ম অবলম্বনে আত্মা বিশুদ্ধ হয়, তখন আত্মা ঈশ্বরের অসীম করুণা ও স্নেহ আত্মগতরূপে উপলব্ধি করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে, তখন তাহার অন্তরে মহামিলনের মহাবাণী অহর্নিশি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন তাহার সকল বন্ধন খসিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে আত্মার প্রধান সম্পর্ক জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত। এই দুইটীই মনুষ্যকে অর্জ্জন করিতে হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই যে জগতে যে সকল মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানবীর এবং কতকগুলি কর্ম্মবীর; আমরা জ্ঞান ও কর্ম্মকে পৃথক করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই, যে ধর্ম্মের প্রশাসনে পৃথিবী বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেই একই ধর্ম্মের এপিঠ ও ওপিঠ। জ্ঞান ধর্ম্মতত্ত্বকে

বিবৃত করিয়া দেয়, কর্ম্ম সেই সকল তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত করে। একটীকে ছাড়িয়া অপরটী দাঁড়াইতে পারে না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কর্ম্ম চাই এবং কর্ম্মকে সার্থক করিবার জন্য তাহাকে জ্ঞানের সহিত সঙ্গত করা কর্ত্তব্য।

ভারতের ইতিহাসে যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে দেখি যে এখানে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্ম লইয়াই যত কিছু সংস্কার, যত কিছু সংগ্রাম ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্মে জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ভারতের আর্য্যগণ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, অন্য কোন জাতি কখনও ততদূর বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় সেই কারণে ভারতে কি জ্ঞানবীর, কি কর্ম্মবীর, কিছুরই অভাব ঘটে নাই। এই ভারতেই বৈদিক ঋষিরা সমুত্থিত হইয়াছিলেন। এই ভারতেই জ্ঞানবীর কপিল ও পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই ভারতেই জ্ঞানবীর বশিষ্ঠ এবং কর্ম্মবীর বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এই ভারতেই জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যভূমি দুই অবতারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ। এই ভারতেই জ্ঞানবীর বুদ্ধদেব এবং কর্ম্মবীর অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ভারতেই জ্ঞানবীর গুরুনানক এবং কর্ম্মবীর গুরুগোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। আবার, যে যুগে আমরা বসবাস করিতেছি, সেই যুগের প্রারম্ভে যখন অধর্ম্মের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ধর্ম্মের পরাজয় সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বিষম সন্ধিক্ষণে, নূতন রাজ্যের, নূতন ভাবের, সম্পূর্ণ নূতন জাতির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতে দয়াময় পরমেশ্বর প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় দুই মহাপুরুষকে—জ্ঞানবীর রাজা রামমোহন রায় এবং কর্ম্মবীর দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ভারতের ভবিষ্যৎ পথ দেখাইয়া দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই দুই অবতার জন্মগ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান যুগে কে যে ভারতকে রক্ষা করিত তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান যুগে ভারতের এই দুই রক্ষাকর্ত্তা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। ঐ দুই নির্ভীক স্পষ্টবাদী মহাত্মা বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতের ইতিহাসে উন্নতি বোধ করি অন্ততঃ শতবর্ষ পশ্চাতে পড়িয়া যাইত। এই দুই মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে ভগবান আমাদের এই দরিদ্র বঙ্গদেশকে তাঁহার সুশীতল ছায়া হইতে বিদূরিত করিয়া দেন নাই; এই দেশের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ক স্বাধীনতা এখনও সম্পূর্ণ অপহৃত হয় নাই।

মৃত্যুর পরে। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের মনে পড়ে, আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি বিষয়ে বড়ই সঙ্কীর্ণ মত পোষণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি নেতার সহিত আলোচনায় তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে ডার্বিন প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মে আঘাত পড়ে; মৃত্যুর পরে পরলোকগত আত্মার ভৌতিক অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মে আঘাত পড়ে। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উদারতম বীজের উপরে দণ্ডায়মান আছে, তাহাতে মানবের জ্ঞানরাজ্য যে ভাবেই প্রসারিত হউক না কেন এবং যে কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হউক না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে না। যে কোন তত্ত্ব পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপুষ্টই হইবে। সেই সত্যকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনায়াসেই এই বিশ্বরাজ্যকে প্রশাসিত করিবার জন্য ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত নিয়মরাজির অন্যতম বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। যদি কোন সর্ব্বস্বীকৃত নিয়মের মধ্যে পরে কোন ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তাহাতেই বা কি? আমরা জানিব যে কোন বিশেষ বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের নিয়ম ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যে কি প্রকারে আঘাত লাগিতে পারে, তাহা আমরা এখনও হৃদ্গত করিতে পারি নাই। আমরা অভিব্যক্তিবাদ, আত্মার পরলোকে ভৌতিক অবস্থার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়কে বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে চাই—বিজ্ঞানের প্রমাণে যদি ঐ সকল বিষয় দাঁড়ায় আমারা স্বীকার করিব, বিজ্ঞানের প্রমাণে যদি সেগুলি না দাঁড়ায় তাহলে অস্বীকার করিব, এইমাত্র। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সার্ব্বভৌমিক উদারতম বীজভিত্তির উপর প্রথিত, সেই বীজের একটী কণামাত্রও বিচলিত হইবে না। তবে এটা অবশ্য মনে হয় যে যদি পরলোকে আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব কোনরূপ প্রমাণে স্থিরসিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে সর্ব্বধর্ম্ম প্রচারিত সৎকর্ম্মের ফলে সদ্গতিলাভ এবং অসৎকর্ম্মের ফলে অধোগতি প্রাপ্তি প্রভৃতি নীতিগুলি বিশেষ ভাবে সমর্থন লাভ করিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিলেই যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে আঘাত পড়ে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এতই মূলহীন পদার্থ হয়, তবে আমরা শতবার বলিব যে সে প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মে আমাদের

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

প্রয়োজন নাই। আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেরূপ সারহীন ভিত্তির উপরে গ্রথিত নহে, প্রত্যুত তাহার ভিত্তি যে অটল ও চিরসত্য বীজের উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই ভিত্তিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কৃত সত্যরূপ যতই মসলা লাগানো হইবে সেই ভিত্তি ততই দৃঢ় হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অটুট চিরসত্য ভাব ততই অনন্ত স্বর্ণাক্ষরে পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে। আমরা সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আজ এই প্রেততত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি। পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা লেখকের নিকট প্রেরণ করিলে লেখক অত্যন্ত উপকৃত বোধ করিবেন। লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রেততত্ত্বের সত্যাসত্যতা অপক্ষপাতে আলোচিত হউক।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্নটী এই—এক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিল; তাহার আত্মা (যাহার বলে সে ইহলোকে নানা কর্ম্মসাধন করিত) অন্য কোন লোকে ব্যক্তিগত হিসাবে বেঁচে থাকে কি না, যে পৃথিবী সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সেই পৃথিবীর ঘটনা সকল জানিতে পারে কি না এবং এই মর্ত্ত্যলোকে যে সকল আত্মীয়স্বজনকে ভাল বাসিত, সেই সকল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব কি না। অনেকের কাছে এটা বড়ই হাস্যকর প্রশ্ন, আবার অপর অনেকের কাছে বিষয়টী তর্কের অতীত ও অত্যন্ত গভীর। কিন্তু সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌ এবং সার অলিবার লজের মত বড় বড় বৈজ্ঞানিক যখন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে শরীরের মৃত্যুতেই মনুষ্যের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব শেষ হয় না, তখন আমরা এ কথা বলিতে পারি যে প্রেততত্ত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। মানুষ মৃত্যুর পরেও যে বাঁচিয়া থাকিবে, এটা যখন্ সর্ব্বসাধারণে নিতান্ত ঠিক বলিয়া প্রাণের ভিতরে ধরিতে পারিবে, তখন মানবের কর্ম্মভূমিতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে না কি?

আমরা আবহমান কাল প্রচার করিয়া আসিয়াছি যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গলের ভিতর হইতেও মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জড়বাদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এ কথা সকলেই জানেন। বলিতে গেলে, জনসাধারণ স্পর্শযোগ্য প্রমাণের অতিরিক্ত কোন প্রমাণকে আমলই দিতে চাহিতেন না। এখন অধ্যাত্মবাদীও সেই সূত্র অনুসরণ করিয়া স্থির করিলেন যে কেবল মাত্র তাঁহার কোন তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই হইবে না, সেই বিশ্বাস যে যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণের অনুগত তাহা অন্য পাঁচজনকে বুঝাইতে হবে। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে সেটা কতদূর পারি? যুক্তি দ্বারা এবং প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনে প্রেতগণের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাসকে কতটুকু দাঁড় করাইতে পারি?

প্রথমত আমরা দেখি যে আদিম জাতিমাত্রেই প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসের নাম পিতৃপূজাই দিই বা অন্য যে কোন নাম দিই, বিজ্ঞান এইটুকু বলিয়া দেয় যে, যেদিন থেকে মানুষ নিম্নজীব হইতে পৃথক হইয়া পড়িল, সেই দিন থেকেই মানুষে এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। কোন না কোন আকারে পরলোকের অস্তিত্বে এবং মৃত্যুর পরে সেই পরলোকে নিজের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস করিয়াছে দেখা যায়। এটা একেবারেই চিন্তারও অগোচর যে মানুষ, বিশেষত আদিম মনুষ্য, এই বিশ্বাসটীকে নিজের মন থেকে গড়িয়া বাহির করিয়াছে। এই বিশ্বাসের পশ্চাতে একটা সত্যভিত্তি না থাকিলে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ইহা স্বত-উদ্ভূত হইতে পারে না। সত্যের উপর যাহা দাঁড়াইয়া নাই, এমন কোন ভাব মানুষ কোন যুক্তিবলেই সৃষ্টি করিতে পারে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে পরলোকের অস্তিত্বে এবং পরলোকে প্রেতের অস্তিত্বে সার্ব্বভৌমিক স্বীকৃতির পশ্চাতে একটা সত্য আছে। এক কথায়, পরলোক বলে একটা কিছু আছে। কেবল তাই নয়। প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হই যে, এ রকম সার্ব্বভৌমিক বিশ্বাসের উৎপত্তির স্থান আমাদের অন্তর্নিহিত সহজ জ্ঞান। প্রাণীজগতের যেটুকু আমরা জানি, তাহাতে দেখিতে পাই যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীগণের মূল সহজ জ্ঞান (instinct) সেই শ্রেণীর মঙ্গলকারণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি যে পরলোকে বিশ্বাসও মানবজাতির মঙ্গলজনক—ইহা মানবজাতির পক্ষে অপরিহার্য্য। যদি এই বিশ্বাস কেবল একটা অন্ধ বিশ্বাসমাত্র হইত, তাহা হইলে এটা মানবের পক্ষে অপরিহার্য্য ও কল্যাণদায়ক হইতে পারিত না। কাজেই আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে পরলোকে বিশ্বাসের একটা সত্যভিত্তি আছে।

যদি পরলোক বলিয়া কোন কিছু না থাকে, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? পরলোক না থাকিলেই মৃত্যুর পরে আত্মার ধ্বংস বা বিনাশ মানিতে হয়। এই দুইটীর মধ্যে মধ্যপথ কোন কিছু নাই। মৃত্যুর পরে হয় আমরা বাঁচিয়া থাকি অথবা বাঁচিয়া থাকি না। যদি বাঁচিয়া না থাকি, তাহা হইলে বলিতে হয় যে আমাদের

ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য সম্বন্ধে যেটুকু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে বিশ্বরাজ্যের কুত্রাপি ধ্বংস বলিয়া কিছু নেই। জড়-পদার্থই বল, আর শক্তিই বল, কিছুই বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহাদের আকার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি বিনষ্ট হইতে পারে না। এমন কি, আমরা মরিয়া গেলেও আমাদের শরীর পচিয়া গেলেও তাহার একটী পরমাণুও বিনষ্ট হয় না, পরমাণুগুলি কেবল নূতন আকারে সংহত হইয়া নূতন প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য করিতে থাকে মাত্র। যখন জড় শরীরেরই বিনাশ হয় না, তখন আত্মারও বিনাশ নাই একথা সাহসের সঙ্গে বলিতে পারি।

যুক্তিবলে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও, এমন অনেক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা-যোগ্য প্রমাণ চাহেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এরকম প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যে সকল প্রমাণ পাওয়া যাইত, সেগুলি মনের ভ্রান্তি বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু "লণ্ডন সাইকিক্যাল রিসার্চ্চ সোসাইটী"র এবং ওয়ালেস, পেজেট, ব্যারেট, ক্রুক্স্, লজ, লম্বোজো, রিষে, ফ্ল্যামেরিয়, জোলনার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের ধীর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে, এটা এক রকম স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে যে অধ্যাত্মরাজ্য সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাযোগ্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। নবতর মনো-বিজ্ঞান সেই সকল ঘটনা অবহেলা না করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথাশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহে।

এইরূপে বিভক্ত করিতে গিয়া মনোবিজ্ঞান মহাবিধায় পড়িয়া যায়। মৃত্যোন্মুখ ব্যক্তির ছায়াভাস এবং মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার আবির্ভাব, এই দুইটীর মধ্যে বিভাগের রেখা টানিতে গিয়া মনোবিজ্ঞান মহাসমস্যায় পড়িয়া যায়—এই দুইটীর পরস্পরের মধ্যে এতদূর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

মৃত্যোন্মুখ ব্যক্তির ছায়াভাস সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকেই উল্লেখ করিতে পারেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুনিয়াছি আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুই তিনবার এইরূপ ছায়াভাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় একবার দার্জ্জিলিঙে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। পথি-মধ্যে এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে, যামিনী বাবু তাঁহার কামরা হইতে নামিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন তাঁহার প্রতিবেশী এক ইংরাজ বন্ধু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই বন্ধুটীর সে সময়ে সেই ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না বলিয়া যামিনী বাবু তাঁহার উপস্থিতিতে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সেখানে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধুটী কিন্তু সেই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যামিনী বাবু তৎপরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে সেই দেখা দিবার কালে কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুটীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। আর একবার আমাদের একটী আত্মীয়া প্রাণত্যাগের সময়ে তাঁহার দূরদেশবাসী পিতার নিকটে দেখা দিয়াছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট শুনিয়াছিলাম যে একদিন তিনি পথে আসিতে আসিতে তাঁহার প্রতিবেশী একটি স্ত্রীলোকের ছায়াভাস দেখিয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধানে তিনি জানিলেন যে সেই সময়ে স্ত্রীলোকটি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সোসাইটির কাগজ পত্রে এবং ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক ঘটনার কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মৃত্যোন্মুখদিগের এইরূপ ছায়াভাস, দূরানুভূতি এবং তজ্জাতীয় ঘটনা সকল হইতে তাহাদের কারণ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি অনুমানমূলক মত উঠিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মতই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে মানবপ্রকৃতিতে এমন একটা কিছু আছে, সাধারণে আত্মা বলিয়া যাহা বুঝে সেই রকম এমন একটা কিছু আছে, যেটা সচরাচর বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা অগ্রাহ্য—বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত। এটা একটা মস্ত কথা যে আজকাল বিজ্ঞান স্বীকার করে যে আমাদের প্রকৃতিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত এমন একটী অংশ আছে, যাহা অপরের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও তাহাদের মনের উপর কার্য্য করিতে সক্ষম। আমাদের এই অংশটুকুকে ভয়াবহ সঙ্কটকালে, বিশেষত প্রাণবায়ুর বহির্গমন মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কর্ম্মশীল হইতে দেখা যায়। এইরূপ সঙ্কটমুহূর্ত্তের কালে শরীরের এবং আমা-দের সহজ চৈতন্যের বিশেষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, মনস্তত্ত্ববিৎ-দিগের উল্লিখিত সেই অন্তর্নিহিত সম্বিৎ (Subliminal consciousness) বিশেষভাবে জাগ্রত ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া উঠে। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনেই হয় না যে আমাদের শ্রেষ্ঠতম অংশ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে। বরঞ্চ এটা কি মনে হয় না যে শরীরের সুস্থাবস্থা অপেক্ষা মৃত্যোন্মুখ অবস্থায় ইহা অধিকতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে এবং নিজের ছায়াভাস প্রকাশ করিতে পারে?

মৃত্যোন্মুখী অবস্থায় এইরূপ ছায়াভাসেরই যে কেবল অকাট্য সাক্ষ্য আমরা পাইয়াছি তাহা নহে। মৃত্যুর পরে

প্রেতাত্মার আবির্ভাবেরও অনেক অগণনীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে—সেই সকল প্রমাণ সূক্ষ্ম পরীক্ষার কষ্টিপাথরে সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

মায়ার্স বলেন যে "আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইতেছি যে মৃত্যুন্মুখী অবস্থায় প্রকাশিত ছায়াভাস হইতে মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখা মৃত ব্যক্তির পরলোকগত আত্মার অখণ্ডিত কার্য্যকারিতার ফলে ঘটিয়া থাকে, কেবল দ্রষ্টার অন্তর্নিবিষ্ট স্মৃতির উপর তাহা নির্ভর করে না।"

নূতন মনোবিজ্ঞান এই সকল ঘটনার সংঘটন স্বীকার করে, কিন্তু সেগুলির উৎপত্তির কারণ এইরূপে বুঝাইতে চাহে যে "প্রাণবায়ুর বহির্গমনমুহূর্ত্তে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দূরানুভূতিমূলক এক সংস্কার আসিয়া আঘাত করে; সেই সংস্কারের ছাপ সংস্কারগৃহীতার মনে ঘুমন্তভাবে থাকে; তারপর কিয়ৎকাল ব্যবধানের পর তাহা জাগ্রত স্বপ্ন বা স্বপ্ন বা অন্য কোন আকারের চৈতন্যে প্রকাশ পায়।"

এই অনুমানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অনেকগুলিই বোঝানো যাইতে পারে, কিন্তু সকলগুলি নহে। দুই শ্রেণীর ঘটনা তো এই অনুমানের সাহায্যে কিছুতেই বোঝানো যায় না। (১) মৃতব্যক্তির জীবিত অবস্থায় যে সকল ঘটনা তাহার জানা সম্ভব ছিল না, ছায়াভাস যখন সেই সকল ঘটনা সম্বন্ধে নির্ভুল সত্যকথা বলিয়া দেয়; এবং (২) যখন ভূতুড়ে বাড়ী প্রভৃতি একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মুখে একই ছায়াভাস প্রকাশ পায়? শেষোক্ত ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে জাত ব্যক্তিগণ যখন একই ছায়াভাস দেখিতে পায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সাহায্যে কি প্রকারে বোঝানো যাইতে পারে। কিম্বা যাহারা মৃত ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে এবং সেই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালেও যাহাদের একই ভূতুড়ে বাড়ীতে অবস্থান বিষয়ে কোনই অভিপ্রায় ছিল না, এরকম বহুসংখ্যক লোকের সম্মুখে যখন একই ছায়াভাস উপস্থিত হয়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সাহায্যে বোঝানো যায় বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ অনেক পরীক্ষাসিদ্ধ ও প্রামাণ্য ঘটনা শ্রীযুক্ত এফ্, ডব্লিউ, এইচ, মায়ার্স (F. W, H. Myers) সাহেবের "Human Personality" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল ঘটনা মৃত্যুর পরেও যে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকে এই অনুমান ব্যতীত অন্য কোন অনুমানের দ্বারা বোঝানো যাইতে পারে না। মিসেস্ স্টোরী নামক একটী স্ত্রীলোকের তাঁহার যমক ভ্রাতার মৃত্যু বিষয়ক যে আশ্চর্য্য ঘটনা জানা সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রসিদ্ধ সংশয়বাদীদিগেরও কর্ত্তৃক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা পরলোকে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনরূপে বোঝানো যায় না।

পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে কি না এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইতেছে এবং তথাকার জ্ঞানী লোকেরা দেহাতিরিক্ত দেহীর অস্তিত্বরূপ সিদ্ধান্তের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত ভারতবর্ষে, ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানীজনেরা দেহীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতের সকল শাস্ত্রের সার গীতাতে স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ কথায় উক্ত হইয়াছে যে দেহী দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণবস্ত্র স্বরূপ এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদেহ ধারণ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করে। সেই দেহী আত্মা অবধ্য অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য—এক কথায়, অনিত্য দেহের মধ্যে নিত্য দেহী বিদ্যমান থাকে। ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে ভারতের আবিষ্কৃত সত্য আজ সমগ্র জগত জয় করিতে বহির্গত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ভারতবর্ষে বর্ণমালা অর্থাৎ লিখন পদ্ধতি কোন্ সময়ে প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রভূত গবেষণা রহিয়াছে। তাঁহারা ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু আইনের সারাংশের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। Charles Wilkins সাহেব হেষ্টিংসের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ভগবৎগীতার অনুবাদ ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। উঁহারই দুই বৎসর পরে তৎকর্ত্তৃক হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। Sir William Jones এগার বৎসর মাত্র এদেশে ছিলেন। তিনি এদেশের সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করেন ও ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে (Asiatic Societiy of Bengal) এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন; ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন; মনুসংহিতার এবং ঋতুসংহারের অনুবাদ বাহির করেন। কোলব্রুক সাহেব (১৭৬৫—১৮৩৭) অনেক পুস্তকের প্রকাশক। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন সাহেবও

(১৭৬৫—১৮২৪) সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮০২ সালে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি নেপোলিয়নের আদেশে অন্যান্য ইংরাজের সহিত ফ্রান্স দেশে কারারুদ্ধ হয়েন। কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিত এই সময়ে তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পান। জার্ম্মাণ কবি ফ্রেডরিক শ্লেগেল (Schlegel) সাহেব তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইহার ফলে উক্ত শ্লেগেল সাহেব "On the language and wisdom of the Indians" পুস্তক বাহির করিতে সক্ষম হন। এই পুস্তক বাহির হইবার পরে ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। গ্রীক লাটিন পার্শী ও জার্ম্মাণ ভাষার মধ্যে যে একটি ঐক্য রহিয়াছে, তাহা দর্শাইবার জন্য Bopp সাহেব তাঁহার মূল্যবান পুস্তক ১৮১৬ সালে বাহির করেন। উহার পর হইতেই সংস্কৃতের উপরে জার্ম্মাণ জাতির সমধিক অনুরাগ পড়িয়া গিয়াছে।

১৮০৫ সালে কোলব্রুক সাহেব বেদ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক বাহির করেন। ১৮৩৮ সালে (Rosen) রোজেন ঋগ্বেদের প্রথম অংশ প্রকাশ করেন এবং রথ (১৮২১-৯৫) সাহেব ১৮৪৬ সালে "বৈদিক সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস" (On the literature and history of the Veda) প্রকাশ করেন। ইহার পরের অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। বিয়েনার প্রফেসার বুলার সাহেব সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন করিয়া যে ধীরে ধীরে জগতে বিকাশ লাভ করিয়াছে, আমরা তাহার আমূল ইতিহাস পাইব। ম্যাক্সমূলার সাহেব এই ভাষার গবেষণায় আপনার দেহপাত করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষ কত বৈদিশিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কিন্তু ভারতের প্রাচীনের সহিত নবীনের সম্বন্ধ-সূত্র অদ্যাপিও অবিচ্ছিন্ন। ভারতে প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া এই সংস্কৃত ভাষায়, এমনকি অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত, পণ্ডিতগণের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে; বর্ত্তমান সময়েও প্রাচীন সংস্কৃত পুথি দৃষ্টে অসংখ্য পুঁথি হস্তাক্ষরে লিখিত হইতেছে; লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ এখনও বৈদিক মন্ত্র সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া তারস্বরে তাহার আবৃত্তি করিতেছে; এখনও হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি চলিতেছে; এখনও কোন কোন স্থানে কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নির উৎপাদনক্রিয়া চলিতেছে; এখনও বিবাহ প্রায় একই মন্ত্রে একই ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে;—ইহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হইয়া যাইতে হয়।

বৈদিকযুগ বলিতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০ সাল পর্য্যন্ত বুঝায়। ঐ বৈদিক যুগের প্রথমাংশে যে সমস্ত অপূর্ব্বভাবপূর্ণ কবিতা রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান পঞ্জাবের অন্তর্ভূত সিন্ধুনদ-ধৌত প্রদেশে এবং শেষাংশের রচনা যাহার অধিকাংশ গদ্যাকারে, তৎসমস্তই গাঙ্গেয়-প্রদেশে হইয়াছিল। আর্য্যসভ্যতা ক্রমশই হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভবিষ্যতে উহা ভারতের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বৈদিক যুগ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার কাল। পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ব্যবহার-বিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে আর্য্যগণ যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন দেখা যায়, গ্রীকগণও তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কেবল ইতিহাস লিখনেই ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ। উহার অভাবে এমন কি মহাকবি কালিদাসের যুগও অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। ইতিহাস না লিখিবার দুইটি কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ আর্য্যেরা, গ্রীক্ পার্শী ও রোমকদিগের ন্যায় কোন বৈদেশিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই এবং তাঁহারা যেন রাজনৈতিক গৌরব লাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার যাহা কিছু সমস্তই অসার ও ক্ষণ-বিধ্বংসী এই ধারণা প্রাচীন আর্য্যগণের এমনই অস্থিমজ্জাগত ছিল, যে তাঁহারা ইতিহাস লিখনের আবশ্যকতা মনে আদৌ স্থান দেন নাই। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ হইতে কোন কোন ঘটনার অব্দ নির্ণয় হইতে পারে; তৎপূর্ব্ব সময়ের অব্দ নির্ণয় অসম্ভব বলিলেও হয়। কোন কোন স্থলে ভাষার গতি এবং ধর্ম্মবিকাশের ক্রম দেখিয়া সময় নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। বেদকে অতিপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং উহার উৎপত্তি কাল খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর ধরিয়া লইবার জন্য অনেকের মধ্যে ঔৎসুক্য দেখা যায়। মোক্ষমূলার বলেন বৈদিক-যুগ খৃঃ পূঃ ১২০০ হইতে আরম্ভ; তাহাই সমীচীন বলিয়া অনেক মনে করেন। প্রোফেসার Jacobi (of Bonn) জ্যোতিষের ধুয়া ধরিয়া বৈদিক যুগকে খৃঃ পূর্ব্ব ৪০০০ অব্দ বলিতে চান। কিন্তু বেদের অন্তর্গত যে জ্যোতিষের বচনের উপর নির্ভর করিয়া ঐ খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ মীমাংসিত হইয়াছে, অনেকের মতে উহার অর্থ সেরূপ পরিষ্কার নহে। সে যাহা হউক গ্রীসীয় প্রাচীনত্ব অপেক্ষা বৈদিক সাহিত্য যে পুরাতন, তাহা ধরিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে। আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৬ সালে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার পরে মেগাস্থিনিষ প্রমুখ অনেক গ্রীক ভারতে বাস করিতে থাকেন। মেগাস্থিনিস খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে পাটলিপুত্রে থাকিয়া

যে অসম্পূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। তাহার পরে ফাহিয়ান ৩৯৯ অব্দে এবং হিউয়েনসাং ৬৩০ হইতে ৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত এবং ইসিং ৬৭১ হইতে ৬৯৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া যে ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান। হিউয়ান সাং তাঁহার সমসাময়িক কয়েক জন ভারতীয় কবির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দুই একজন ভারতীয় জ্যোতিষী তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে স্বীয় আবির্ভাব কাল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিওয়েন সাং ও ফাহিয়ানের গ্রন্থ হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু ১৮৯৬ সালে নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ স্থানে অশোকের নির্ম্মিত স্তম্ভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ১০৩৯ অব্দে আরবীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও মূলবান গ্রন্থ বলিতে হইবে। শিলালিপি ও ধাতু ফলক যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা সময় নিরূপণের যথেষ্ট অনুকূল। অশোক রাজার রাজত্বকালের বিবরণী, অব্দ সহ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ করিবার সময় মনে হয় না, যে অনৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস পড়িতেছি। প্রত্যেক বিশেষ ঘটনার অব্দ উহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা অশোকের নির্ম্মিত স্তম্ভে খোদিত লিপি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভারতের প্রাচীনতম বর্ণ ও অক্ষরের পরিচয় দিতেছে। কতদিন হইতে ভারতে লিখনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছিল। প্রোফেসার বুলার (Buller) প্রভৃত গবেষণার ফলে উহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন খারোষ্ঠি অক্ষর খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে গান্ধার দেশে (বর্ত্তমান কান্দাহারে) প্রচলিত ছিল। উক্ত অক্ষরে দক্ষিণ হইতে বামে লিখিতে হইতে। এবং ব্রাহ্মী অক্ষর যাহা ভারতের প্রকৃত অক্ষর, উক্ত অক্ষরে বাম হইতে দক্ষিণে লেখা হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অক্ষর, আপাততঃ যদিও বিভিন্ন ধরণের, তাহা হইলেও তৎসমস্তই উক্ত ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে উদ্ভূত। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যে একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহার লেখা দক্ষিণ হইতে বামে। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই কথাটি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ অঙ্ক লিখিবার সময়ে দক্ষিণ হইতে বামে গণনার নিয়ম। অধ্যাপক বিদায়ের সময় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে পত্র বাহির হয়, তাহাতে সন তারিখের যে ইঙ্গিত থাকে, ঐ তারিখ নির্ণয় করিতে হইলে দক্ষিণ দিক হইতে বামের দিকে গণনা করিয়া যাইতে হয়। ডাক্তার বুলার বলেন যে মেসোপোটেমিয়া দিয়া যে সকল বণিক ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, তাহারাই খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে উক্ত অক্ষর ভারতে প্রবর্ত্তন করে। খুব প্রাচীন সময়ে ভারতে অক্ষরের প্রচলনের কোনরূপ প্রমাণ মিলে না। অশোকের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে অক্ষরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষীয়গণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত স্মৃতিশক্তির বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়া থাকে। তাহারা পুঁথির বড় ধার ধারে না। শাস্ত্রাদি একজনের নিকট আর একজন কণ্ঠস্থ করিয়া তাহা অনর্গল বলিতে পারে। এইরূপে বৈদিকযুগে মুখে মুখে বেদাদি শাস্ত্র চলিয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে লিখনের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে যে অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আকৃতিগত ভেদ এত বিভিন্ন, অর্থাৎ একই অক্ষর এতই বিভিন্নভাবে লিখিত হইত, তাহাতে মনে হয় যে অক্ষরের প্রচলন ভারতবর্ষে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু সেমিটিক অক্ষরের সংখ্যা ২২টি মাত্র। এবং উক্ত ২২টি অক্ষর হইতে ৪৬টি ব্রাহ্মী অক্ষর পরিণত হইতে যে ব্যাপক কাল লাগিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ৪৬টি অক্ষর ভারতীয় অক্ষর; ধ্বনির উপর উহার প্রতিষ্ঠা; প্রফেসার বুলারের মতে উহার অস্তিত্ব খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের পূর্ব্বেও ছিল। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে রচিত পাণিনি ব্যাকরণে ঐ ৪৬টি অক্ষরেরই উল্লেখ আছে, এবং উহাই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিতভাবে রহিয়াছে। এই ৪৬ অক্ষরের বা ধ্বনির যে কল্পনা, তাহা নিতান্তই বিজ্ঞানসম্মত। সর্ব্বাগ্রে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জন বর্ণ, ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা। আর ইউরোপে যে অক্ষরাবলী প্রচলিত, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ; উহার সাহায্যে সকল শব্দ ঠিক প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু ইংরাজি বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ বিশৃঙ্খল ভাবে মিশ্রিত। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী অক্ষরের ভিতরেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে নাগরী (দেবনাগরী) অক্ষরের উৎপত্তি। উহাতেই সংস্কৃত হস্তলিপি গুলি লিখিত। উক্ত অক্ষরের মস্তকে মাত্রা আছে। অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপিতে সম্পূর্ণ (অবিমিশ্র) নাগরী (নগরী) অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় এবং একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সম্পূর্ণ নাগরী অক্ষরের হস্তলিপি বা পুঁথির সন্ধান মিলে। এবং দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ দেশীয় অক্ষরাবলী উদ্ভূত হইয়াছে। কেনারি ও তেলেগু অক্ষর উহার অন্যতম। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব আমলের পুঁথি দুষ্প্রাপ্য। ভূর্জ্জ পত্রে ও তাল পত্রে পুঁথি লেখা হইত। ভূর্জ্জপত্রে পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত এক-

খানি সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান মিলে এবং ১৮৯৭ অব্দে আবিষ্কৃত খারোষ্ঠি অক্ষরে লিখিত আরও প্রাচীন সময়ের আর একখানি পালিভাষায় লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। হিওয়েন সাং বলেন যে সপ্তম শতাব্দীতে তালপত্রে ব্যাপকভাবে লিখনের কার্য্য চলিত। প্রথম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রলিপির আকার ঠিক তালপত্রের মত। কাগজের প্রবর্ত্তন ভারতে মুসলমানদিগের অভিযানের পর হইতে হয়। কাগজে লিখিত একখানি পুঁথি, গুজরাটে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। উত্তর ভারতে ক্রমে কাগজের প্রচলন অধিক হইয়া পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সূক্ষ্মাগ্র লৌহ কলমের সাহায্যে তালপত্রের উপর দাগ কাটিয়া এবং পশ্চাৎ তাহাকে আবশ্যকমত মসীলিপ্ত করিয়া লিখনের কার্য্য চলিত। পুঁথির প্রতি পত্রের মধ্যভাগে একটি ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া মোটা সুতা চালাইয়া দেওয়া হইত। এবং উক্ত সুতার দ্বারাপুঁথিখানি বাঁধা থাকিত বলিয়া পুঁথির নাম (গ্রন্থিবদ্ধ) গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং উহাই বর্ত্তমানে পুস্তকের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে মেষচর্ম্ম কখনও লিখনের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মসীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কেহ বা বলেন, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে উহার প্রচলন হয়। খাগ্‌ড়ার কলমে সর্ব্বপ্রথমে লেখা হইত, এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য যে ভারতীয় অক্ষর আবিষ্কার সম্বন্ধে আমরা বিজাতীয় মতের পক্ষপাতী হইতে পারি না। ২২টি সেমেটিক অক্ষর হইতে ৪৬টি অক্ষরের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমাদের ধারণা যে ৪৬ অক্ষরের আবিষ্কার, আর্য্য-মস্তিষ্কের অত্যদ্ভুত সাধনা প্রসূত। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে আর্য্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কোন স্থান হইতে কোনরূপ সাহায্য আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। ২২টি সেমেটিক অক্ষর হইতে ৪৬ বর্ণের উৎপত্তি হইলে উভয়ের মধ্যে কোন না কোনরূপ সাদৃশ্য অনিবার্য্য হইত। অধিকন্তু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগে আমরা যে মৌলিকতা দেখিতে পাই, অন্যত্র তাহার চিহ্নমাত্র দেখি না। বলিতে কি এইরূপ পার্থক্য অন্য ভাষায় নিতান্ত দুর্লভ।*

হুগলির উৎপত্তি। †

(শ্রীরামলাল মুখোপাধ্যায়)

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার সম্মুখে একটী মাস্তুল দাঁড় করানো আছে। সেই মাস্তুল সম্বন্ধে প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন একটী কথা প্রচলিত আছে যে এক সময়ে একটী পর্ত্তুগীজ জাহাজ বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড ঝড় অতিক্রম করিয়া অনুকূল বায়ু ও অনুকূল স্রোতের সাহায্যে ব্যাণ্ডেল ঘাটে আনীত হইয়াছিল, এবং সেই কারণে তাহার কাপ্তেন "সুখযাত্রার দেবী" কে (Our Lady of Happy Voyage) "মানত" স্বরূপে এই মাস্তুল সমর্পণ করিয়াছিলেন। জাহাজ চড়ায় লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে জাহাজের কাপ্তেনেরা ব্যাণ্ডেলের দেবীকে (Our Lady of Bandel) মানত করিত এটা জানা কথা। কেহ কেহ বলেন যে কাপ্তেনেরা এখনও মানত করিয়া থাকে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পূর্ব্বেও এরূপ মানত করা হইত। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে দুইজন পর্ত্তুগীজ ফাদার বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড ঝড় সহ্য করিয়া হুগলিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "গুলুমের দেবীর" (Our Lady of Gullum) নিকটে তাঁহাদের জাহাজের সম্মুখস্থ পালের মূল্য দিবার মানত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনের মানতের গল্প সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে আরও অনেক স্থানের পর্ত্তুগীজ গির্জ্জাতে মাস্তুল রাখা আছে—সেই মাস্তুলগুলি উৎসবের দিনে পতাকা উড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। টিউটিকরিনের গির্জ্জার সম্মুখে একটী মাস্তুল আছে, সেটা এখনও পতাকার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৈলাপুরে একটী গির্জ্জার সামনে একটা পুরাতন মাস্তুল আছে, কিন্তু সেটা কোন কার্য্যের জন্য আর ব্যবহৃত হয় না। "Bengal, Past and Present" নামক পত্রের নবপ্রকাশিত সংখ্যায় ফাদার হষ্টেন (Father Hosten) ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা সম্বন্ধীয় একটী সুলিখিত প্রবন্ধে চট্টগ্রামস্থ ক্যাথলিক মিশনের একটী কাষ্ঠফলক চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এড়োকাঠ ও পালসহ একটী মাস্তুল প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেলের মাস্তুল সম্বন্ধে আর একটী গল্প প্রচলিত আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ১৭৮৪ কিম্বা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজ গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন যে "হুগলির ব্যাণ্ডেল" এর উপরে পর্ত্তুগীজ পতাকা উড়ানো হইয়াছে কি না এবং সাজাহান যে জমী অনুগ্রহদান করিয়াছিলেন, তাহা পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে কি না। অনুমান হয় যে পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেন্ট ব্যাণ্ডেলে একটী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। "হুগলির ব্যাণ্ডেল" বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্যাণ্ডেল শব্দ "বন্দর" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ Macdonell সাহেবের রচিত History of Sanskrit literature হইতে গৃহীত।

† *The statesman*, ১লা জুন, ১৯১৫।

গবর্ণরের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ফাদার জোয়াও ডি এস, নিকোলাও হুগলিতে বহুকাল মঠাধ্যক্ষরূপে থাকিয়া তথা হইতে গোয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজদিগের অবস্থা জানাইলেন। সাজাহান যে জমী ও তৎসম্বন্ধে যে অধিকার দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ব্যাণ্ডেলের ফাদারদিগকে গির্জ্জার জন্য দিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টকে দেন নাই।

ফাদার নিকোলাও লিখিয়াছিলেন—"ব্যাণ্ডেলের উপর পর্ত্তুগীজ পতাকা কখনও উড্ডীয়মান হয় নাই; কিন্তু যে সময়ে হুগলি (Houguly) বন্দর পর্ত্তুগীজদিগের অধীনে ছিল, সেই সময়ে হুগলি দুর্গের উপর পতাকা উঠানো হইয়াছিল। ব্যাণ্ডেলে যে চন্দ্রাতপ উঠানো হইত, তাহা ঐস্থানের গির্জ্জা প্রভৃতির মালিক "জপমালার অধিষ্ঠাত্রী দেবী"র (Our Lady of the Rosary); আর তাহাও কেবল তাঁহার উৎসব ও নববার্ষিকী উপলক্ষে হইত। সম্ভবত ইহাই (ব্যাণ্ডেলে পর্ত্তুগীজ পতাকা স্থাপনরূপ) অমূলক সংবাদ প্রচারের কারণ; ইহা অসম্ভব নহে যে কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশে আসিয়া ব্যাণ্ডেলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যে মাস্তুলদণ্ডে পতাকা লাগানো প্রথা ছিল, সেই মাস্তুল দেখিয়াছিলেন এবং আর কোন বিচার না করিয়াই লিসবনে প্রচার করিয়াছিলেন যে ব্যাণ্ডেলে পর্ত্তুগীজ পতাকা উড়িতেছিল।" ফাদার হষ্টেন বলেন যে মাস্তুলদণ্ডটী যদি কাহারও মানতের ভেটী সেলামী হইত, তাহা হইলে পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের দাবী কাটাইবার উদ্দেশ্যে ফাদার নিকোলাও সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। এইরূপ উল্লেখ নাই বলিয়া ফাদার হষ্টেন কাপ্তেনের মাস্তুলদানের গল্প বিশ্বাস করেন না।

ফাদার হষ্টেন তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে "হুগলি" নাম হোগলা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, হয় পর্ত্তুগীজ গুদাম "গোলাঘর" হইতে অথবা হিন্দী শব্দ "গলি" হইতে "হুগলি" নাম আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যে অংশে জুবিলী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই অংশ অত্যন্ত সরু বলিয়া তাহাকে হয়তো "গলি" বলা হইত। কিন্তু হুগলি নাম যখন প্রথমে হুগলির সহর অংশেই দেওয়া হইয়াছিল, তখন খুব সম্ভবত গুদামঘরের পর্ত্তুগীজ প্রতিশব্দ "ও গোলিম" হইতেই হুগলি নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

নারায়ণ—বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা। বৈশাখ ১৩২২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। ২০৮। ২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

আমরা আলোচ্য সংখ্যা পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই সংখ্যা হইতে বঙ্কিম বাবুর জীবনী-লেখকের তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আমরা জানি না যে বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কোন জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে কি না। যদি না হইয়া থাকে তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যালোচনা এবং ধর্ম্মালোচনাকে জনসাধারণের অভিরুচিকর করিয়া সমগ্র জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার এক অভিনব পথ স্বদেশবাসীকে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী আজও প্রকাশিত হইল না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যাঁহার কীর্ত্তিগুণে আজ বঙ্গবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের দেশবাসী বলিয়া সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই বঙ্কিমভক্ত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি এই জীবনী লিখিবার ভারগ্রহণে অগ্রসর হইবেন? যতদিন না আমরা আমাদের মহৎলোকদিগের প্রতি, কেবল মুখের নহে, অন্তরের ভক্তি প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিব এবং বংশপরম্পরায় সেই শিক্ষা দিতে থাকিব, ততদিন স্বদেশের উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। আমাদের দেশ পুরাকালে তর্পণ, পূজা, জন্মোৎসব প্রভৃতি নানা উপায়ে স্বদেশের বড়লোকদিগকে অন্তরের পূজা অর্পণ করিতে জানিত, তাই আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ এক সময়ে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইতে সক্ষম হইয়াছিল। আমাদের মতে তর্পণ পূজা প্রভৃতির পরেই মহদ্ব্যক্তিগণের জীবনচরিতই তাঁহাদিগকে পূজা করিতে শিক্ষা করিবার এবং বংশ-পরম্পরায় সেই শিক্ষা সঞ্চারিত করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, যে বঙ্কিম বাবুর একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহাপুরুষত্ব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। একবার "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে লিখিবার জন্য বঙ্কিম বাবু পাঁচশত বা ততোধিক টাকা প্রাপ্তির আশ্বাস পাইয়াছিলেন। তিনি আশ্বাসদাতাকে বড় উচুদরের একটী কথা বলিয়াছিলেন "ভক্তি প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার

জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি?" কথাটা মহাপুরুষের কথা।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর বঙ্গভাষায় সমালোচকের দৃষ্টিতে ইতিহাস আলোচনা করিবার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে বাধ্য যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গদর্শন আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যে একথা বলিতেছি এরূপ কেহ যেন বিবেচনা না করেন। আমাদের বিবেচনায় ভারতের ইতিহাস আলোচনায় সমালোচকের দৃষ্টিপথ বঙ্কিম বাবুই সুবিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আর একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য সংখ্যায় সমালোচনার উপসংহার করিব। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার বঙ্কিমপ্রসঙ্গে বলেন যে বঙ্কিম বাবুর মতে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। বিষয়টী অতীব গুরুতর। আমরাও হীরেন্দ্র বাবুর সহিত একমত হইয়া গীতার পাঠক ও সমালোচকবর্গের আলোচনার উদ্দেশ্যে কথাটী উল্লেখ করিলাম।

নারায়ণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সন।

"ভাষার কথার" লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে প্রাদেশিক ভাষায় বঙ্গসাহিত্য গঠিত করা উচিত নহে। "বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালীর নিজস্ব জিনিস * * * * আজি কালিকার সঙ্কট সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তিতে দলাদলির খেয়ালে বা দম্ভের আনন্দে ভাগবাটোয়ারা বহাল করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সুমহৎ জাতীয় অমঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত যত প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই সার্ব্বজনীন ভাষা ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য রচনা করেন নাই।" আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী তাঁহার "শুয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি" প্রবন্ধে স্বদেশবাসীদিগকে স্বাধীনভাবে কীট ও পতঙ্গাদির প্রকৃতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই সমালোচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবার ঠিক পূর্ব্বেই বঙ্গ এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালের নবপ্রকাশিত সংখ্যায় ভারতের মাকড়সা বিষয়ক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছিল যে স্বদেশীয়গণ এখনকার চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞান আলোচনার দিকে কেন মনোযোগ দেন না; আর যাঁহারা দেন, তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার ফল বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করেন না কেন? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে যদি কেহ সেই ফলগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত দাঁড় করাইতে চাহেন, ভালইতো—কোন সুপ্রচলিত পাশ্চাত্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করুন; কিন্তু আমরা যদি স্বদেশপ্রেমের অহঙ্কার করিবার এতটুকু অধিকার রাখি, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে মাতৃভাষায়, যে মায়ের স্তন্যপানে এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মায়ের ভাষায় আমাদের সকল বিষয়ই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করা উচিত এবং স্বাভাবিক। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে যে কি উপকার হয় জর্ম্মণী তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। বলিতে গেলে একমাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চার আধিক্য বশতই জর্ম্মণী তাহার দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত এই মহাসমর এতদিন পর্য্যন্ত সবলে চালাইতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের দেশে যদি সেরকম বিজ্ঞানচর্চ্চা হইত, তাহা হইলে আজ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কোন ভাবনা থাকিত, না যুদ্ধে জয়লাভের বিলম্ব ঘটিত? ভারতের ভূগর্ভে যে ধনধান্য প্রোথিত আছে, বিজ্ঞানবলে আমরা যদি তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে আমাদের দেশে কি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী বা তাহার অনুচর মহামারী সমূহ সহজে পদার্পণ করিতে পারিত? তখন আমরা গবর্ণমেণ্টের পোষ্য মধ্যে পরিগণিত না হইয়া সহায় বলিয়া আলিঙ্গন লাভ করিতে পারিতাম। শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত মির্জ্জা হোসেন আলী বিষয়ক একটী সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণত আমাদের বিশ্বাস যে হিন্দুরা মুসলমান হয়, কিন্তু মুসলমানদের হিন্দুধর্ম্মে কিছুতেই মতি হয় না। এই প্রবন্ধ আমাদের সেই বিশ্বাস দূর করিয়া দিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র রচয়িতা দরাপখাঁ মুসলমান হইয়াও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে হরিদাস প্রভৃতি অনেকগুলি মুসলমান যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা জানা কথা। কিন্তু একটি মুসলমান যে কালীভক্ত হইতে পারেন, আমাদের তাহা মনেই আসিতে পারিত না, যদি আমরা মির্জ্জা হোসেন আলীর জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ না করিতাম। "মরণে জয়" রয়াল আটপেজী ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটী কথানাট্য। কথা নাট্য এত দীর্ঘ না হইলেই বোধ হয় ভাল হয়।

উদ্বোধন—বৈশাখ ১৩২২। স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক কথিত ৺স্বামী বিবেকানন্দের ব্রহ্মচারীগণের প্রতি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধীয় উপদেশ অতি সুন্দর বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্ম্ম-জীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্য্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাৎ থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস—আমি সংসারে থেকেও ধর্ম্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস নে যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম-জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী,—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশ পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেই জন্যই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এতটুকু ধর্ম্মলাভও হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করবি।"

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় নানা মনোযোগার্হ প্রবন্ধপত্রাদিতেই পূর্ণ।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩২২। উপযুক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অধীনে ভারতবর্ষ যে নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার প্রাচীন কীর্ত্তিসম্বন্ধীয় একটী উচ্চদরের প্রত্ন প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "ভূদেব বাবু ও ছেলেদের শিক্ষা" প্রণিধানযোগ্য সুলিখিত প্রবন্ধ। অনাদি বাবু এই প্রবন্ধটী পুস্তিকাকারে বাহির করিলে দেশের উপকার হয়। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ" প্রবন্ধে টাঙ্গাইলের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যাইবে। শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় তাঁহার সুলিখিত "সূর্য্য সংবাদ" প্রবন্ধে সূর্য্য সম্বন্ধীয় অনেকগুলি তথ্য একসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকেরা বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সেই কারণে তাহাদিগকে সেপথে চালাইতে ইচ্ছা করিলে খুব সরল ভাষায় এক একটী বিষয় বিশদরূপে বুঝাইতে হইবে। ত্রিগুণানন্দ বাবু Spectrum শব্দের বাঙ্গালা করিয়াছেন "বর্ণচ্ছত্র"—অতি সুন্দর হইয়াছে। আমাদের মতে Spectroscope এর বাঙ্গালা "আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রের" পরিবর্ত্তে "বর্ণ বিশ্লেষক" করিলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিবেচনার জন্য এই ইঙ্গিত করিলাম। "মধুস্মৃতি"তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত পুরাতন কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর "নাম" কবিতাটী অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩২২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পল্লীর উন্নতি" প্রবন্ধটী কালের উপযোগী হইয়াছে। আমরা এই সংখ্যার পত্রিকাতেই তাহা উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "ভারতীয় দর্শন" একটী সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। "পরশুরাম ক্ষেত্র" ত্রিবাঙ্কুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের চিত্রবহুল ও জ্ঞাতব্য-বহুল একটী প্রবন্ধ। সুখের বিষয় যে বাঙ্গালীদের মধ্যে এরূপ অনুসন্ধিৎসা দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার "বাঙ্গলার শিল্প" প্রবন্ধে দেশের শিল্পের প্রতি যে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইলেও প্রবন্ধলিখিত সকল মতগুলিতে সায় দিতে পারিলাম না। একটী বিষয়ে আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি মান্ধাতার আমলের বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানের সুপরিহিত মহিলাপরিচ্ছদে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। বিভিন্ন লোকে সৌন্দর্য্য দৃষ্টির নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ হইলেও আমরা এ বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত বাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহি।

আল এসলাম—বৈশাখ, ১৩২২। ৩০নং ফুলবাগান রোড হইতে প্রকাশিত। এই মাসিকপত্র মুসলমান সম্পাদক কর্ত্তৃক পরিচালিত, এজন্য আমরা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আলোচ্য সংখ্যা ইহার প্রথম সংখ্যা, তাই যাহাতে স্বদেশবাসীদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হয় তদ্বিষয়ে দুই চারিটী উপদেশ দিব, আশা করি সম্পাদক মহাশয় তাহাতে আমাদের ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। প্রথম সংখ্যা যে ভাবে বাহির হইয়াছে তাহাতে ইহা উর্দ্দু ও বাঙ্গলা এই দুইটী ভাষায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানেরা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুরা ইহা গ্রহণ করেন কি না সন্দেহ, কারণ ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত অনেক উর্দ্দু শব্দ স্থান পাইয়াছে। কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু উর্দ্দু অক্ষর পড়িতে পারে? যখন কাগজখানি বাঙ্গলা ভাষায় বাহির হইতেছে, তখন উর্দ্দু শব্দ বন্ধনীর মধ্যে দিয়া তাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ প্রবন্ধে ব্যবহার করা উচিত। তাহা হইলেই বাঙ্গালা ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বাঙ্গালী

হিন্দুদিগেরও এই পত্রের গ্রাহক হইবার পক্ষে কোনই বাধা থাকিবে না। দ্বিতীয় কথাটী এই যে অনেক বাঙ্গলা শব্দ ভুল বানানে লেখা হইয়াছে। সম্ভবত সেগুলি প্রুফ পড়িবার লোকের দোষে ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে পাছে কেহ প্রবন্ধগুলিকে মুসলমানী বাঙ্গলায় লিখিত বলিয়া উপেক্ষার সহিত উল্লেখ করে তাই এই বিষয়ে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। এই সংখ্যার প্রায় সকল প্রবন্ধই সুলিখিত ও চিন্তাপ্রসূত—প্রবন্ধগুলি হইতে আমরা মুসলমান ধর্ম্মতত্বের অনেক বিষয় জানিতে পারিতেছি। "পারস্য সাহিত্য" প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা লেখককে অনুরোধ করি যে তিনি কেবল পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াই যেন ক্ষান্ত না হয়েন, পারস্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির অনুবাদ করিয়া যেন এই পত্রের অঙ্গ বিভূষিত করিয়া তুলেন এবং ইহাকে সর্ব্বজাতির আদরের বস্তু করেন। "সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠনে" লেখক মুসলমান সাহিত্যসেবকগণকে সাবধান করিয়া দিয়া সাহিত্যে পবিত্রতা ও নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে বলিয়াছেন। আমরা লেখকের সহিত সর্ব্বতোভাবে একমত। "প্রায়শ্চিত্ত-তত্ব" খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্ত-তত্বের প্রতিবাদ। মুসলমান সমাজে এই প্রবন্ধ উপকারে আসিবে বলিয়া বিশ্বাস।

পল্লীর উন্নতি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(বৈশাখের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা—তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্ত্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্ব্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপাল-দোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখেছি। খেতে বস্লে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুস্কিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল সুতরাং সাহস বেশি ছিল সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালীর ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালীর ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতাবশত যদিবা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয় তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড় একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বল্‌তে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিইনে। সত্য কথাও থামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্ত্তর মধ্যে পড়তে যাচ্চে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে। যেই সময় পেলেই দেখ্‌তে পায় সাম্‌নে গর্ত্ত আছে তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকার নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল—সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্বসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনিনে, ক্ষেত্রও চিনিনে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সাম্‌লাতে পারিনে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তাহলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্য্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, এই আমাদের কাজ, এস আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই। তাঁরা বলেন নি, কাজ কর, তাঁরা বলেছেন প্রার্থনা কর। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর কর।

তাঁদের দোষ দিতে পারিনে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি—আত্মানং বিদ্ধি এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার

পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষ্যে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে-পথ দিয়ে এসেছি আজ সে-পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে "আয় বৃষ্টি হেনে।" আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তাহলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখিনি। এক দিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পসলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্য্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবল মাত্র চাইবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছি কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হইনি। এমনতর অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক-ছাত্র—দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত তাহলে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কি রকম বীভৎস হত; প্রবীণের সঙ্গে নবীনের প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কি রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিষও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে, তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা শাসন করা এর প্রতি সদ্বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্ব্যয় হবে না তা নয় অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারন আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা এবং ধৈর্য্য চাই। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা অমনি তার পর দিনেই কারখানা খুলে বসে সর্ব্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনো রকমের মাল তৈরি করতে পারিনে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরীয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি তবে দেশের সর্ব্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ সে অবস্থায় শক্তির কেবলি অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্ম্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে সয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানচে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্যপথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্য্যোগের চেহারা দেখচি, আমাদের ফসলের ক্ষেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগে হয়ে উঠবে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা বাহির হইল। গ্রাহকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন কাল বিলম্ব না করিয়া বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের সাহায্যের উপরেই পত্রিকার জীবন নির্ভর করিতেছে। আগামী ১লা ভাদ্র পত্রিকা ৭৩ তম বৎসরে পদার্পণ করিবে। আগামী মাসের পত্রিকা সুচিত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মহর্ষিদেবের বাণী।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক পারিবারিক উপাসনার দিবসে বলেছিলেন—"সমস্ত জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে কি বিদ্যায় কি ধর্ম্মে কি অর্থে, উন্নত না হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।" কয়জন ব্রাহ্ম এই মহদ্বাণী হৃদয়ে ধারণ করে তাকে কাজেতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন? আমরা ব্রাহ্ম হয়েছি কিসের জন্য? সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হবার জন্য নয়; অথবা বৎসরান্তে মাঘোৎসবে উপস্থিত হবার জন্যও নয়। আমরা ব্রাহ্ম হয়েছি জনসাধারণকে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ দেখাবার জন্য। বাস্তবিকই এটা মুখের কথা নয়। আমাদের ঘুমিয়ে উঠে বল্লে হবে না যে আমরা ব্রাহ্ম হয়েছি অতএব আমরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। আমরা যদি সত্যি সত্যি নিজেদের ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিতে চাই, তবে আলস্যকে দূর থেকে পরিহার করতে হবে; ঈশ্বরকে জানবার পথে এগোবার চেষ্টা করতে হবে; দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে ব্রহ্মপথে দীপাবলী সাজাতে হবে; আপনার গর্ব্ব অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে ভগবানের চরণে মাথা নুইয়ে তাঁরই আশ্রয়ে বড় হতে হবে।

আলস্যের কোলে মাথা রাখলে চলবে না, কিছুতেই চলবে না। হে ব্রাহ্মগণ, হে স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, আমাদের জাগতেই হবে। ঘুমিয়ে কাল কাটাবার এখন আর সময় নেই। আমাদের চোখের সামনে কি দেখতে পাচ্ছি নে যে সমস্ত পৃথিবী এগিয়ে চলেছে? সেই পৃথিবীতে আমরাই কি কেবল ঘুমন্ত চোখে চলতে থাকব? আমরা কি এতই অন্ধ হয়ে গেছি যে, সমস্ত পৃথিবীতে যে একটা মহাজাগরণের বন্যা এসেছে, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছিনে?

এসো, আমরা আমাদের ঘরের দরজা উন্মুক্ত করে দিই, ঘরের ভিতর আলো আসুক, পাখী-দের মুক্ত প্রাণের গান ঘরেতে প্রবেশ করুক, হৃদয় প্রশস্ত হোক, মুক্তির পথে অগ্রসর হোক। ঘরের দরজা চিরকাল রুদ্ধ রেখে ঘরকে অন্ধকারের রাজ্য করে তুলো না, অজ্ঞানের চিরন্তন বাসস্থান করে রেখো না। এটা স্থির জেনো যে জ্ঞানময় ধর্ম্মাবহ ভগবানের রাজ্যে অজ্ঞানের অন্ধকার অধর্ম্মের রাজত্ব কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তুমি যদি জ্ঞানধর্ম্মকে তোমার ঘরে প্রবেশ করতে না দাও, তবে ভগবান তাঁর বজ্রের দ্বারা তোমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে জ্ঞানধর্ম্মের প্রবেশের উপায় করে দেবেন। তখন ঈশ্বর সেই অন্ধকারের পাষাণ দুয়ার ভাঙ্গবার উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য প্রদান করে মহাপুরুষদিগকে সংসারে প্রেরণ করেন।

এক সময়ে বঙ্গদেশ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে

যাবার উপক্রম হয়েছিল। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে দেবার জন্য এবং বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করবার জন্য রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর কর্ত্তব্যসাধন করে অমরধামে চলে গেলেন। আবার যথাসময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রেরিত হলেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে জ্ঞানধর্ম্মের নবতর বৈদ্যুতিক আলোক এই বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই আলোকের দীপ্তরশ্মি এক সময়ে ভারতের চারিপ্রান্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। সেই যে বৈদ্যুতিক আলোকের তেজ দেশময় বিকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তারই নিগূঢ় কার্য্যকারিতার ফলে আজ সমগ্র দেশ জ্ঞানধর্ম্মে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে এক সময়ে যে বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একমাত্র আলোক-যষ্টিস্বরূপে দাঁড়িয়েছিল, আজ সেই বঙ্গদেশে মাসিক পাক্ষিক প্রভৃতি কতগুলি ধর্ম্মপ্রধান সাময়িক পত্র দেখা দিয়েছে এবং দাঁড়িয়ে গেছে।

এই যে এতগুলি ধর্ম্মপ্রধান সাময়িক পত্র বাহির হয়েছে এবং সেইগুলির অনুরক্ত পাঠক জুটেছে, এইটাই হচ্ছে প্রমাণ যে আমাদের দেশেও জাগরণের ভাব এসে লেগেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাহার গ্রাহকসংখ্যা হয়েছিল ৭০০। বঙ্গদেশের সাত কোটী অধিবাসীর মধ্যে মাত্র সাত শত লোকে ধর্ম্মালোচনাতে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাতে এতটুকু মনোযোগ দিতেন!

এই ভাবতরঙ্গের আঘাতে আজ আমরা যে কয়জন জাগ্রত হতে পেরেছি, তা ছাড়া দেশের কত লোকে এখনও যে অজ্ঞানের অন্ধকার ঘরে বাস করছে তার ইয়ত্তা নেই। দু চারজন লোকে বা শত সহস্র লোকেও জাগ্রত হলে চলবে না। বঙ্গের সাত কোটী লোক, ভারতের ত্রিশ কোটী লোকের প্রত্যেককে জেগে উঠতে হবে। যাঁরা জ্ঞানে ধর্ম্মে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা ধর্ম্মের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত করে পশ্চাৎপদ ভ্রাতাদিগকে জাগিয়ে তুলুন; তাঁরা জ্ঞানের মহাভেরীর ভৈরব রবে দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করে তুলুন, যাতে অপরাপর ভাইয়েরা মুহূর্ত্তকালও আলস্যশয্যায় শুয়ে থাকতে না পারে—যাতে তারা জাগ্রত হয়ে এই জ্ঞানধর্ম্মের জাগরণোৎসবে মেতে ওঠে।

মহর্ষিদেব যে বলেছিলেন যে ব্রাহ্মদিগকে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে,—তাঁর বলবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে ভারতবাসীমাত্রেই তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রদর্শিত ব্রহ্মপথের পথিক হবে এবং ভারতবাসীমাত্রকেই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। বন্ধুগণ, আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না, জগতের পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না। মহর্ষির পবিত্র উৎসাহবাণী হৃদয়ে ধারণ করে, এসো, আমরা পরস্পরকে বলতে থাকি, জ্ঞানে ধর্ম্মে জাগ্রত হও; এসো, দ্বেষ বিদ্বেষ মান অভিমান সকলই ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ভগবানের পবিত্র নামে উৎসাহিত করি। ভারতমাতার শুষ্ক বদনে সেই আর্য্যযুগের বিমল হাসি ফিরে আসুক, তাঁর শুষ্ক জীবনে প্রাণ আসুক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

মুখবন্ধ।

আজ ১লা ভাদ্র। বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬৫ শকে ভাদ্র মাসের প্রথম দিবসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম বৎসরের তত্ত্ববোধিনীও দুষ্প্রাপ্য হয়েছে এবং যে সকল বৃদ্ধ লোক পত্রিকাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছেন, তাঁদেরও মধ্যে যে কয়জন জীবিত আছেন তাহাও বলতে পারিনে। সেই কারণে আজ নব্যবঙ্গের যুবকগণের সম্মুখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মবিবরণ দুই চারিটী কথা বললে তাহা তাঁদের কাছে ভাল লাগবে আশা করি।

রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ।

রামমোহন রায় বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যতটুকু বিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন, সেটুকু বিবাদ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু বিরোধ করতে গিয়েও কোন

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করেন নি। এই ভাবে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক বিতর্ক পরিচালিত করে ব্রাহ্মসমাজকে এক মহান উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মের মূলগত ঐক্যের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তি গ্রথিত করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর অতীত করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ভাবটী ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে আদর্শ হতে পারে, কিন্তু একটা সমাজের মধ্যে এই ভাবটী কতদূর চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করা যেতে পারে, সেটা গভীর চিন্তার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখি যে ব্রাহ্মসমাজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার অতীত থাকবার আদর্শ রক্ষা করতে পারেন নি। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই যে হিন্দুসন্তান ছিলেন, সুতরাং বাধ্য হয়ে তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজের ভাবের অন্তত কতকটা উপযোগী করে ব্রাহ্মসমাজের গঠন দিতে হয়েছিল। কাজেই আসলে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি। এটা সকলেই জানেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাকে এদেশ-বাসীর উপযোগী করবার জন্য রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে উপনিষৎব্যাখ্যা প্রবর্ত্তিত করেছিলেন। এ-ও সকলেই জানেন যে তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে খৃষ্টান বালকদিগের দ্বারা ঈশ্বরস্তোত্র গান করাতেন। কিন্তু, তিনি যেমন গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনাবিধান লিখতে পেরেছিলেন, কোরাণ অথবা বাইবেল থেকে তো সেরকম উপাসনাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করবার চেষ্টা করেন নি। এই সকল আলোচনা করলে বোঝা যায় যেকোন ধর্ম্মকে একটা সমাজের মধ্যে প্রচলিত করবার চেষ্টা করলে সেই সমাজের সাম্প্রদায়িকতার কোন না কোন রকম প্রভাব ও ছায়া সেই ধর্ম্মের উপর পড়বেই পড়বে, তা নইলে সেই ধর্ম্ম সেই সমাজস্থ জনসাধারণের গ্রহণ করবার উপযোগী হতে পারে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় ভাব।

রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব থাকলেও তাহা অব্যক্ত আকারে ছিল। কিন্তু তাঁর পরে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের সেই সাম্প্রদায়িক ভাব সেই হিন্দু আদর্শ ব্যক্ত আকার ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষাগুণে ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু ভাবটাই সহজে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এবং সেই ভাবটাই দেশমধ্যে প্রচার করলে জনসাধারণের সহজগ্রাহ্য হবে এবং দেশের কল্যাণ হবে এই সরল বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে তাহাই প্রচার করতে উদ্যুক্ত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নেতৃত্বের প্রথমাবস্থায় বেদ ও উপনিষৎকেই ব্রাহ্মসমাজের পথপ্রদর্শক ও বলতে গেলে সর্ব্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়েছিলেন। তারপর, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করে এদেশের শাস্ত্রসমূহের মর্ম্ম প্রচার করাকেই তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন এবং কাল-ক্রমে দেবেন্দ্রনাথই সেই সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পরিণয় সাধিত করলেন। আবার, তিনি সেই তত্ত্ববোধিনী সভার ছায়াতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত করে তার আগাগোড়া শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে পরিচালিত করা স্থির করে দিলেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের স্বদেশী ও হিন্দুভাব—তাকে সাম্প্রদায়িক ভাবই বল অথবা অন্য যে কোন নামই দাও—খুব স্পষ্ট ও ব্যক্ত আকার ধারণ করেছিল।

জাতীয় ভাবের উপযোগিতা।

ব্রাহ্মসমাজকে এইরূপ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করবার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ভাবে উপনিষৎ প্রভৃতির সাহায্যে হিন্দুভাব প্রবেশ করাবার কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ হিন্দু সমাজের বিদ্বেষভাব বিদূরিত হয়েছিল—ব্রাহ্মসমাজ বিশাল হিন্দু সমাজের ভিতর প্রবেশ করে তাঁর সংস্কার সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন। এমন কি, সময়ে সমগ্র হিন্দুসমাজ স্বীয় উন্নত ধর্ম্মমতের সমর্থন জন্য ব্রাহ্মসমাজের মতামতের প্রতি আগ্রহসহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতেন। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে হিন্দুভাব প্রবেশ করাবার ফলে আজ দেখি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি উন্নত ধর্ম্ম-

মতের চর্চ্চা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাব বিশেষভাবে আনবার ব্যবস্থা না করলে ভারতবর্ষে, অন্তত এই বঙ্গদেশে হিন্দু শাস্ত্রের চর্চ্চা থাকত কি না সন্দেহ। তা হলে খুব সম্ভবত উপনিষৎপ্রকাশিত ব্রহ্মতত্ত্ব ক্রমশ চর্চ্চার অভাবে অজ্ঞাত থেকে যেত। সেকালে এদেশে বেদবেদান্তের চর্চ্চা বলতে গেলে কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মসমাজেরই বেদচর্চ্চা সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলরের হৃদয়ে বেদচর্চ্চা জাগ্রত করে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বেদমাহাত্ম্য প্রচার করবার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুভাবপ্রবণতার কারণ।

দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে হিন্দুভাবপ্রবণতার অনেকগুলি কারণ জুটেছিল। শৈশবে তিনি ঠাকুরমার কাছে বেশীভাগ থাকতেন, তাঁর সেই সেকেলে প্রথায় দেবসেবা প্রভৃতি উপায়ে ধর্ম্মচর্চ্চা দেখতে পেতেন। তার পর, তাঁর জননীকেও তিনি পরম নিষ্ঠাবতী দেখতেন। আবার তাঁর প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষে সহায় হোল উপনিষদের একটী ছিন্ন পত্র। সর্ব্বোপরি সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় মিশনরি ডফসাহেবের কৃতঘ্নতা দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুপ্রবণতারূপ আগুনকে জ্বালিয়ে দেবার পক্ষে ইন্ধনের কার্য্য করেছিল।

ডফসাহেবের হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আক্রমণ।

১৭৫২ (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) ডফ সাহেব রামমোহন রায়ের বিশেষ সাহায্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের পত্তন করতে পেরেছিলেন। ১৭৫২ শক থেকে ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত (১৮৩০ থেকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) তেত্রিশ বৎসর ডফ সাহেব এদেশের খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভগবানের মঙ্গল হস্ত কত কার্য্যে কত উপায়ে যে প্রকাশ পায় তাহা কে বলতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ *প্রতিষ্ঠার সমসময়ে নাস্তিকতার এক বিষম বাত্যা* প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর এমন এক ঘটনা প্রেরণ করলেন, যার ফলে একদিকে এদেশ থেকে নাস্তিকতার মূল উৎপাটিত হোল, অপরদিকে এদেশে উপনিষৎনিহিত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে ডিরোজিও যে নাস্তিক্য এনে দিয়েছিলেন, ডফসাহেবের খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের গুণে, তাঁর হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতার ফলে, সেই নাস্তিক্য স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভেসে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেই সঙ্গে শিক্ষিত মণ্ডলীর হৃদয়ে সর্ব্বধর্ম্মকুৎসা-পরিপোষক এক বিষম "খৃষ্টানী" ভাব প্রবেশ করে হিন্দুধর্ম্মেরও প্রতি বিদ্বেষ ও বিরাগ উৎপাদন করছিল। এই সর্ব্বধর্ম্মদ্বেষী খৃষ্টানী মোহে পড়ে সুবিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী শিক্ষিত যুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিছিলেন। ডফসাহেব তাঁর তেত্রিশ বৎসর মিশন কার্য্যের মধ্যে দুইবার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেকালে ইউরোপ ও আমেরিকাতে খৃষ্টীয়েতর ধর্ম্মকে বিশেষত হিন্দুধর্ম্মকে অতি জঘন্য মূর্ত্তিতে চিত্রিত করে খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলে তথাকার দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতই পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিস্তর অর্থসাহায্য করতেন। পূর্ব্বাপর প্রায় সকল মিশনরিরাই এই সহজ উপায়ে আপনাপন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহায্যকল্পে অর্থসংগ্রহ করতেন। ডফসাহেবও এমন সহজ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধা করেন নি। ১৭৫৬ শকে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি "India and India's missions" (ভারত ও ভারতের মিশনসকল) নামক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটাইয়া ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লেগেছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফসাহেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোন কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত করতে পারতেন, আর না ছিল এমন কোন বন্ধুবান্ধব যাঁদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারতেন। ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী

সভা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল।' পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠ হোল এবং সেই সঙ্গে অন্ততঃ ছোট-খাটো একটা দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব করতে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম হোল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।)

নামে অবশ্য ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র এবং সেই সভার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল—তিনিই ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতেন। এই পত্রিকা প্রকাশ করায় দেবেন্দ্রনাথের অল্প সাহস ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি। সে সময়ে বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গসাহিত্যপ্রিয় পাঠকেরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এটা বেশ জানা ছিল যে এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যও যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের পাঠকেরও সৃষ্টি করতে হবে। এই অবস্থায় একটি ধর্ম্মসভার মুখপত্র স্বরূপে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশে হস্তক্ষেপ করা কি কম সাহসের কথা? আর, সেই মাসিক পত্রকে প্রথম শ্রেণীর কাগজে দাঁড় করানো কি কম প্রতিভার কথা? বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করা বলতে গেলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা জন্মগ্রহণ করেছিল, পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই একটি ঘোষণাপত্র সেই উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত হয়েছে। কি উচ্চ আদর্শ নিয়ে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাহা সেই ঘোষণাপত্রেই সুপরিস্ফুট রয়েছে। সুখের বিষয় যে আজ বাশাত্তর বৎসর পত্রিকা সেই উচ্চ আদর্শ থেকে বিশেষ কোনরূপে বিচ্যুত হয় নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ঘোষণা পত্র।

পত্রিকার সেই উদ্দেশ্য পরিচায়ক প্রথম ঘোষণা পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হোল:—

"কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহাদিগের এসকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশত বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন, বিশেষত তাঁহাদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে, তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

"পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক।

"বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন। অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ

হইয়া তাঁহাদিগের সেই খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক-বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহার-দিগের বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।"

পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসঙ্গী গ্রন্থপ্রকাশের কথা বড়ই সময়োপযোগী ও শিক্ষিতমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইয়া ছিল। রামমোহন রায়ের জীবিতকালে এদেশবাসী অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহান্তর প্রাপ্তির পর এদেশের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতি যে দেশের লোকের একটা টান হয়েছিল, তাহা উপ-রোক্ত ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে বড়ই উপাদেয় লেগেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের কাছে পত্রিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হোত, সুতরাং রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসঙ্গী অন্যান্য গ্রন্থ প্রকারান্তরে বিনামূল্যে সভ্য-দের হস্তগত হোত। কাজেই পত্রিকা যে পাঠক সাধারণের বিশেষ আদরভাজন হয়েছিল, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ঘোষণা পত্রের আরও দুএকটি বিষয় শিক্ষিত পাঠকসম্প্রদায় এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনার্থে আমাদের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করা তাদের অন্যতর। এইখানেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এর ফলে ব্রহ্মসভার পক্ষ-পাতী ও বিরোধী উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদবিসম্বাদ ঘুচে গিয়ে মিলনের পথ প্রশস্ত হোল। শাস্ত্র সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করবার কারণে আমাদের জাতীয় সম্মান পরিরক্ষিত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও হিন্দুসমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠতে লাগল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্র-পাত করে বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতরূপে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হওয়া সেকালের লোকেদের কাছে খুবই নূতন বোধ হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্টবস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করবার অঙ্গীকার সূত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। আমরা জানি যে সেকালে বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর অনেকে এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ প্রতীক্ষা করে থাকতেন। তাঁরা প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুরূপে লেখা যেতে পারে।

অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির পরমার্থ সম্বন্ধীয় রচনা পত্রিকায় প্রকাশ হতে পারবে, ঘোষণাপত্রের এই সর্ব্বশেষ উক্তি বোধ হয় পত্রিকাকে সাধারণের কাছে অতীব প্রিয় করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। সকলেই স্বরচিত প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে দেখতে ভালবাসেন। পত্রিকায় তার পথ যখন উন্মুক্ত হোল, তখন তাহা যে লেখকপদে অভিষিক্ত হবার অভিলাষীদিগের খুব আদরের বস্তু হবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ডফসাহেবের প্রতিবাদ ও জাতীয় ভাবের প্রথম প্রচার।

এই উন্নত ঘোষণাপত্র সম্মুখে রেখে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করে চলতে থাকল। দেবেন্দ্রনাথ একটি বৎসর কারো সঙ্গে কোনপ্রকার বিবাদবিসম্বাদে নামেন নি। প্রথমে তাঁর আশাই ছিল না যে পত্রিকা এক বৎ-সরেরও জন্য লোকের হৃদয়রঞ্জক হয়ে চলতে পারবে। কিন্তু ক্রমে এক বৎসরের পরিবর্ত্তে পত্রিকা নির্ব্বিঘ্নে দুই বৎসর কাটিয়া গেল এবং পত্রি-কার মতামতের উপর লোকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে লাগল। ডফসাহেব হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উপর গালাগালি বর্ষণ করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেটা

ভুলতে পারেন নি। যখন, বলতে গেলে, পত্রিকার পাঠক, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য এবং ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত সভ্য নিয়ে একটা সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ডফসাহেবের সেই "India and India's missions" পুস্তিকার প্রতিবাদে "Vedantic Doctrinnes Vindicated" (বৈদান্তিক মতের জয়) এবং "Rational Analysis of the Gospel" (বাইবেলের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ) নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুনেছি যে শেষোক্ত প্রবন্ধে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয়েছে দেখে ডফসাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার নাম দিয়েছিলেন "The irrational paralysis of the Gospel" (বাইবেলের অযুক্তিপূর্ণ পক্ষাঘাত)। পূর্ব্বেই বলে এসেছি যে ডফসাহেবের প্রচারগুণে তদানীন্তন শিক্ষিতমণ্ডলীর অনেকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেহই আশা করতে পারে নি যে কোন শিক্ষিত ভারতবাসী আবার হিন্দুধর্ম্মের সমর্থনে লেখনী ধারণে অগ্রসর হবেন। উপরোক্ত দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শক্তিমত্তা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হোল। আর, ডফসাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভার এবং সুতরাং সেই সভা যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজেরও জাতীয় হিন্দু ভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ল। এইরূপে নানা উপায়ে বলতে গেলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই এদেশে জাতীয় ভাবের পত্তন করে দেয়।

গ্রন্থসভা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে সকল উপায়ে বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল, গ্রন্থসভা সেই সকল উপায়ের অন্যতর। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হবার কিছুকাল পরে "এসিয়াটিক সোসাইটী"র প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক "গ্রন্থসভা" (Paper committee) সংস্থাপিত হোল। সেই সভাতে কোন্ কোন্ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী, তাহাই বিবেচিত হোত। পাঁচজনের বেশী এই সভার সভ্য "গ্রন্থাধ্যক্ষ" থাকা নিয়ম ছিল না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে অপর একজন মনোনীত হয়ে তাঁর স্থান অধিকার করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমসাময়িক স্বনামধন্য মহোদয়গণ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম এই ছিল যে পত্রিকার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হলে প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন সহকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। অন্যের কথা দূরে থাক, বিদ্যাসাগর মহাশয় বা দেবেন্দ্রনাথেরও রচিত প্রবন্ধ অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হোত।

মুদ্রাযন্ত্র লাভ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থায়িত্বলাভের প্রধান কারণ একটী মুদ্রাযন্ত্র লাভ। মাসিক পত্র স্বল্পব্যয়ে নিয়মিতরূপে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে নিজের একটী মুদ্রাযন্ত্র নিতান্তই আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস যে নিজের মুদ্রাযন্ত্র না থাকলে কোন সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হতে পারে না, এবং কাজেই তার স্থায়িত্বের প্রতি বিশেষ সন্দেহ থাকে। প্রয়োজন বুঝে রমাপ্রসাদ রায় অক্ষরাদি উপকরণসহ একটী মুদ্রাযন্ত্র তত্ত্ববোধিনী সভাকে প্রদান্ করেছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করেছে তার ইয়ত্তা হয় না। সময়ে সময়ে এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণরক্ষা হয়ে গেছে। আজও এই মুদ্রাযন্ত্রটী আদি ব্রাহ্মসমাজের আয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। এই কলিকাতায় হেদুয়াতলার (বর্ত্তমানে Cornwallis Square) কাছে যে বাড়ীতে রামমোহন রায়ের স্কুল বসিত, সেই বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় প্রথম স্থাপিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থসম্পাদকপদে নিয়োগ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেই অক্ষয়কুমার দত্তের কথা স্বতই মনে আসে। পত্রিকার প্রথমাবস্থার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনের কথা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। প্রথম অবধি দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে অক্ষয় বাবু পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

বলা বাহুল্য যে সম্পাদকের ক্ষমতার উপরেই যে কোন সম্বাদপত্র বা সাময়িক পত্রের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অক্ষয় বাবুর মত সম্পাদক না পেলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিত সমাজে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারত কি না সন্দেহ। অক্ষয় বাবুকে নির্বাচিত করে পত্রিকার সম্পাদনে নিযুক্ত করবার জন্য বঙ্গদেশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। পত্রিকাসম্পাদক তখন গ্রন্থসম্পাদক নামে অভিহিত হতেন। দেবেন্দ্রনাথই গ্রন্থসম্পাদকের বেতন বহন করতেন। বোধ হয় সেই কারণে পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথেরই মতানুযায়ী প্রবন্ধ সকলই প্রকাশিত হোত, অন্তত তাঁর মতবিরোধী কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত না।

অক্ষয় বাবুকে গ্রন্থসম্পাদক পদে নিয়োগ সম্বন্ধীয় কথাটী এই:—"কোন্ ব্যক্তিকে ইহার (পত্রিকার) সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায়, এই গুরুতর বিষয়টী সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্ম্মানুরাগী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টী অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত।

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের রচনা "অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর" বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন—"আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলত তাহাই ঘটিল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। * * * ফলত আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।"

অক্ষয়কুমার দত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১২২৭ সালের (১৮২০ খৃষ্টাব্দের) ১লা শ্রাবণ রবিবার শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপীগ্রামে কায়স্থকুলে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামাতা অতি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। অক্ষয়জননী বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের হাতে খড়ি হয়। গুরুমহাশয়ের নিকট বৎসর তিন অধ্যয়নের পর, নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হয়ে ইংরাজী শিক্ষায় শীঘ্রই খুব উন্নতি লাভ করেছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়ে বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁর অনাস্থা এসে পড়ল। এই সময়ে অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁর আহারাদি অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হোত। উনিশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগে ইঁহার সাংসারিক অবস্থা আরও মন্দ হওয়াতে ইঁহাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্কুল ছাড়বার পর অক্ষয়কুমার দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও বাসগ্রামের গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকটে সংস্কৃত শিক্ষা করতে আরম্ভ করে শীঘ্রই তাতে বুৎপত্তি লাভ করলেন। সময়ক্রমে তিনি সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে বাঙ্গালা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন। একদিন অবসর মত ঈশ্বরগুপ্ত তাঁকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভায় এনে তার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে দেন। পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হলে অক্ষয়কুমার আট টাকায় আরম্ভ করে দু এক মাসের মধ্যেই চোদ্দ টাকা বেতনে তার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি একখানি ভূগোল রচনা করেন। ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) তিনি টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "বিদ্যাদর্শন" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা ছয়মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল। ১৭৬৫ শকে

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হলে অক্ষয়বাবু সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। অবশেষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হলে তিনি মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা বেতনে ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহচক্ষে দেখতেন যে পরে তিনি পত্রিকার কারণে দেড়শত টাকা বেতনেরও পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। ১৭৬৫ শক অবধি ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি পত্রিকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৭ শকে কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুল সংস্থাপিত হলে ঘটনাচক্রে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তার প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁকে বিশেষ কষ্টে পড়তে হয়েছিল। এই বৎসর অবধিই তিনি শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে বালীগ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করতে থাকেন। ১৭৭৯ শকের ২৯শে ভাদ্র তত্ত্ববোধিনী সভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁর কৃত উপকার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল এবং তাঁকে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য দান স্থির হয়েছিল। আমরা যতদূর জানি, তিনি যখন একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে বাড়ীতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথকে তাঁর কষ্টের কথা জ্ঞাপন করাতে তিনি অক্ষয়কুমারকে মাসিক ষাট টাকা করেই সাহায্য প্রদান করতেন। ১৭৮৪ শক থেকে কয়েক বৎসর অক্ষয়বাবু স্বেচ্ছায় এই সাহায্য গ্রহণ করতে বিরত ছিলেন।

"১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া উহাকে কতদূর শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ও তদ্দারা বঙ্গদেশের, এমন কি ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভসাধন হইয়াছে, সেকথা সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখনও তিরোহিত হইবার নয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রগাঢ় রচনা-বিশিষ্ট পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না।"

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তর পরিহারপূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতি বর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন।"

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।"

১৭৭২ শকে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) ৩১শে বৈশাখ তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবনায় এবং দেবেন্দ্রনাথের পোষকতায় সভা গ্রন্থসম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের যত্নে পত্রিকার উন্নতির কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

উপসংহার।

পত্রিকার এই বাহাত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে এই একটি বিশেষত্ব দেখেছি যে ইহা খৃষ্টীয় মিশনরি প্রভৃতি নানাবিধ লোকের সঙ্গে নানাবিষয়ে বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হলেও কখনই কারো প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে নি; অপর ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি কখনও অযথা নিন্দাবাদ করে নি। এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ফলে পত্রিকা বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকটে আজ বাহাত্তর বৎসর ধরে সমানভাবে সম্মান আকর্ষণ করে আসছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিস্তম্ভরূপে পরিগণিত হতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ ও ত্যাগস্বীকার।

প্রায় ৮৫ বৎসর অতীত হইল, এদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব জনসাধারণের উপরে কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহাই আজ আমরা আলোচনা করিব। এই ব্যাপক কালের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা যেরূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মনুষ্যের ধারণাশক্তি যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত বুঝিবার যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহার কিছুমাত্র ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মমত প্রকৃত ধর্ম্মসাধনা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; গতানুগতিকতা অন্য সকলকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ব্রাহ্মসমাজের মতামত, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মচিন্তাতে যে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনুষ্যের ধারণাশক্তির বৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখে সমুন্নত ধর্ম্মের আদর্শ, এবং প্রকৃত সত্যের ভাব আনিয়া দিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য যাঁহারা পরিণামদর্শী, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করেন; সাধারণের কল্যাণ ভাবিয়া সমুন্নত ধর্ম্মের আদর্শ সকলের সম্মুখে ধারণ করেন।

আমাদের দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় ঐ শ্রেণীর লোক ছিলেন। এতদিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি আমরা তাঁহাকে এমনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আপনার সমুদয় বলবীর্য্য নিঃশেষ করিয়া তিনি তাঁহার অত্যুন্নত প্রতিভার বলে প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে সঞ্চাত ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া দিয়া এবং প্রাচীনত্বের সঙ্গে সুসঙ্গত যোগ রক্ষা করিয়া তিনি জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব শ্রী সাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়া গেলেন, স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। এ দেশের প্রকৃতির উপযোগী যে সংস্কার তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে।

এই ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান ও সত্যধর্ম্ম বলিয়াই ইহার সাধনায় ঐকান্তিকতা চাই। ঐকান্তিকতার অভাবে ধর্ম্ম ম্লান ভাব ধারণ করে। আমরা বিশদ সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ঐ সকল ভাস্বর সত্যকে আমরা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, ততদিন কিছুই হইল না, ইহা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে আমাদের আয়ত্তের ভিতরে আনিতে হইবে। ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার দ্বারা স্পর্শ করিতে হইবে। সকল স্থানে সকল কালে অন্তরে বাহিরে যে তাঁহার আবির্ভাব, তিনি যে আমাদের শক্তির মূলে প্রাণের মূলে বিরাজমান, তাঁহা হইতে যে আমরা সকলই লাভ করিতেছি, সকলই যে তাঁহার কৃপা, তাঁহার কৃপা ভিন্ন যে আমাদের নিজেদের কিছুই নাই, দিনে নিশীথে তাহাই চিন্তা করিতে হইবে; জানিতে হইবে। তবেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অনুভবের ভিতরে আনিতে পারিব; তবেই প্রত্যক্ষানুভূতি আমাদের জীবনে ঘটিবে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাদের চরম লক্ষ্য। অনেক সময়ে আমরা ব্রাহ্মসমাজের সাধনাকে সহজ সাধ্য মনে করিয়া ইহার গুরুভার ভুলিয়া যাই। ধর্ম্মের সাধন যেমন সহজ, ইহা আবার তেমনই কঠোর, তত আয়াস সাধ্য, তত সংযমসাপেক্ষ। অনেক সময়ে সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় বিভোর হইয়া মনে করি ব্রহ্মকে পাইয়াছি, ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সপ্তাহান্তে এক দিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বক্তৃতা বা ব্রহ্মসঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য অশ্রুপাত করিলে যে প্রকৃত ফলোদয় হয় না, ইহা যেন আমরা স্মরণে রাখি।

ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিতে হইবে। অন্য যে কোন সংস্কারে আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহা অবান্তর সাধনা। ব্রহ্মকে আমাদের জীবনে ও সাধনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে হইলে যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, বাক্যে ও কার্য্যে যে অবিচলিত নিষ্ঠার আবশ্যক, তাহা আমরা বড় দেখিতে পাই না। নানাবিধ কোলাহলের ভিতর দিয়া নানা স্বার্থ চেষ্টার মধ্য দিয়া আমাদের জীবন কাটিয়া যায়।

হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে অকাতরে স্বার্থত্যাগ করিতে এক দিনের জন্যও কাতর নহে। পিতামাতার শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি ব্যাপার, দেবপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বৃক্ষ রোপণ ও নানা ব্রতাদি করে অকুষ্ঠিত ভাবে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুগণ কত বিভিন্ন উপায়ে আপনাদিগকে স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত করে। সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিয়া জল গ্রহণ করিতে পারিবে না, ধর্ম্মের এই গুরুতর অনুশাসন থাকাতেই হিন্দুদের জীবন এত ধর্ম্মানুগত হইয়াছে। আমরা স্বাধীন চিন্তার বা ভাবের বিরোধী নহি; কিন্তু এই প্রাচীন ধর্ম্মসাধনের ভাব আমাদের মধ্যে আনিতে হইবে। সাধনা সম্বন্ধে এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা হারাইলে চলিবে না। মহর্ষির একটি সঙ্গীতে আছে, "যাঁহার কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও"। আমরা ধর্ম্মসাধনার এই অবশ্যকর্ত্তব্য ভাব হারাইয়া স্বেচ্ছাচার আনিতে চলিয়াছি; সংযম হারাইতে বসিয়াছি, আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইতে চলিতেছে; আমরা একেবারেই নিষ্ঠা হারাইতে বসিয়াছি।

যে সকল উপায়ে মনুষ্য ধর্ম্মসাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাহাদের মধ্যে দান অতি উচ্চস্থান অধিকার করে। ব্যক্তিগত দানের অনুষ্ঠানে হৃদয়ের কোমল বৃত্তির সম্প্রসারণ হয়। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এই ভাব সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকের যে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। প্রতিদিন আমরা যেমন অন্ন পান আহরণের জন্য অর্থব্যয় করি, যে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে আমরা আত্মার অন্ন সত্য লাভ করিবার পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে

যদি আমরা অর্থ সাহায্য করিতে বিমুখ হই, তবে আমাদের নিষ্কৃতি কোথায়? আমরা যে অকৃতজ্ঞতার পাষাণভারে দিন দিন ডুবিতে থাকিব। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন যে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে, এ কথা আমরা মনে স্থান দিতে চাহি না। আধ্যাত্মিক জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে জ্ঞানপ্রেম, শ্রদ্ধাভক্তি, বিনয়কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের ভাবকে যথেষ্টই ফুটাইয়া তুলিতে হয়। হিন্দুর পক্ষে পূজা সমাপন করিয়া পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতেই হইবে। কেন দিতে হয়,—পুরোহিত ধর্ম্মের ধারা রক্ষা করেন বলিয়া এবং এই দানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা হইতে ত্যাগস্বীকার অভ্যস্ত হইবে বলিয়া। হিন্দুর কোন অনুষ্ঠান অদক্ষিণ নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এই অর্থ-সাহায্যের কথা যে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার দায়িত্ব যে ব্রাহ্ম-মাত্রেরই আছে, তাহা যে বলিয়া দিতে হয়, ইহা অপেক্ষা সমধিক দুঃখের ও বিস্ময়ের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

ধর্ম্মের জন্য আমরা যে দান করি, তাহা অর্থনাশ নহে। ইহা নামে দান বটে, কিন্তু উহাই প্রকৃত সঞ্চয়। দানে হৃদয় যেমন উদার হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। দানের আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয় আনন্দ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মের নামে পিতাকে দানশীল দেখিয়া পুত্র যে শিক্ষা বাল্যে লাভ করেন, তাহাও অমূল্য। স্বয়ং দানশীল হইয়া সন্তানকে দানে ও ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত করা পিতার একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে দেবোত্তর সম্পত্তি সৃষ্টি করার পদ্ধতি আছে। অনেক স্থলে পিতা পুত্রকে নির্ব্বোধ ও চরিত্রহীন দেখিয়া এবং বিষয় কর্ম্মের অনুপযোগী প্রতীতি করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবতাকে অর্পণ করিয়া যান। ঐ সকল সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি করিবার কোন অধিকার পুত্রে থাকে না। পুত্র দেবপূজার ব্যয় এবং নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট অর্থে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে। এইরূপ দেবোত্তর সম্পত্তি সৃষ্টির একটি দিক আছে, যাহা সকল সময়ে আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হয় না। চরিত্রহীন পুত্র এইরূপ ব্যবস্থার ভিতরে পড়িয়া বাধ্য হইয়া ব্যয়সাধ্য দেবসেবা ও ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মসাধনা করিবার ও ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা করিবার যে অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার কলুষিত জীবন পরিশুদ্ধ হইবার অনেক সম্ভাবনা থাকে।

মহর্ষির জীবদ্দশায় প্রায় ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে অনেকেই সাপ্তাহিক উপাসনার দিন প্রতি বুধবার আদি-ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। আমরা শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের দানাধারে দিবার জন্য মহর্ষি তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে টাকা দিয়া দিতেন। কেমন করিয়া বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুরাগ পড়িবে, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই ভাবে তিনি বাল্যকাল হইতে পুত্র পৌত্রগণের শিক্ষা দিতেন। তাই আজ তাঁহারা যশস্বী মনস্বী ও হৃদয়বান হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন; এবং ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

আমাদের দেশে মুষ্টিভিক্ষা দিবার পদ্ধতি আছে। অনেক চিন্তাশীল পিতা-মাতা পুত্রকন্যার দ্বারা ভিখারিগণকে ভিক্ষা দেওয়ান। যাহারা ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষান্ন সংগ্রহে দিনপাত করে বটে, কিন্তু যাহারা নিজ হস্তে ভিক্ষা দান করে, তাহারাই বিশেষ ভাগ্যবান।

আমরাও যদি নিজে কর্ত্তব্যবোধে ব্রাহ্মসমাজে যথাসাধ্য দান করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ইহা আশা করা কি অসঙ্গত, যে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বে যেরূপ দেশের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ নবোৎসাহে নবজীবনে দেশের মঙ্গলসাধনে পুনরায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আমরা কি ব্রাহ্মসমাজকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াও পরিপুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইব না? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম যেখানে সেখানে স্থান ও কাল বিবেচনা না করিয়া মত প্রকাশ করেন যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এই সকল কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। মহর্ষিদেবকে আমরা অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আকাশের ন্যায় বিস্তৃত এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যও অনন্ত। সমুদয় বিশ্বজগতে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে। অর্থের অভাবে কত শুভকার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে। সকলে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা কর—সকলে ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত হও, ব্রহ্মনাম প্রচারে অগ্রসর হও! তোমাদের আদর্শ তোমাদের আন্তরিকতা, তোমাদের জ্ঞান, তোমাদের বৈরাগ্য, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নূতন যুগ আনয়ন করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

চরিত্র গঠনে চিন্তার প্রভাব।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা কতকগুলি অভ্যাস গড়িয়া তুলি। তন্মধ্যে কতকগুলি বাঞ্ছনীয় এবং কতকগুলি অবাঞ্ছনীয়। কতকগুলি অভ্যাস খুব

খারাপ না হইলেও, তাহাদের পুঞ্জীভূত শক্তি বড়ই অনিষ্টকর; কখন কখন তাহার দরুণ আমাদের খুব কষ্ট ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে কতকগুলি অভ্যাসের পুঞ্জীভূত শক্তি আমাদিগকে শান্তি আরাম ও আনন্দ বিধান করে।

কোন্ ছাঁচের অভ্যাসগুলি আমাদের জীবনে গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে স্থির করা আমাদের কি সাধ্যায়ত্ত? অর্থাৎ, অভ্যাস গঠন ও চরিত্র গঠনের কাজটা শুধু কি দৈব ঘটনার অধীন, না আমাদের নিজের আয়ত্তাধীন? আমার ত মনে হয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন। প্রত্যেক মানব-আত্মা এই কথা বলিতে পারে এবং প্রত্যেক মানব-আত্মার এই কথা বলা উচিত যে, "যাহা আমি ইচ্ছা করিব, তাহাই আমি হইব।"

এই কথাটি সাহস করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিবার পর, এবং শুধু বলা নয়, অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার পর, আরো কিছু অবশিষ্ট থাকে। অভ্যাস গঠন ও চরিত্র গঠনের মূলে যে একটা বড় রকমের নিয়ম নিহিত আছে সেই নিয়মের কথা বলা বাকি থাকে। কারণ, সকলেরই জানা আবশ্যক, একটা সরল ও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে। সেই প্রণালীটি অনুসরণ করিলে খারাপ অভ্যাসগুলির উচ্ছেদ সাধন করা যায় এবং ভাল অভ্যাসগুলি অর্জ্জন করা যায়; অংশত বা সমগ্রভাবে জীবনকে পরিবর্ত্তিত করা যায়। তবে কিনা, এই প্রণালীটি জানিবার জন্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা চাই, এবং জানিয়া উহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করা চাই।

সমস্তের মূলে নিহিত—চিন্তার প্রভাব। ইহার তাৎপর্য্য অর্থটা কি? অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়:— তোমার প্রত্যেক কার্য্যের—প্রত্যেক সজ্ঞান কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারটা কি?—না তোমার একটা মনোভাব। তোমার প্রবল মনোভাবই তোমার কোন কার্য্যকে সবেগে পরিচালিত করে। ঐ কার্য্য পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে, উহা দানা-বাঁধিয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। তোমার অভ্যাসের সমষ্টিই তোমার চরিত্র। অতএব, যে কাজই তুমি করিতে ইচ্ছা কর না কেন, তোমার মনোভাবটির প্রকৃতি কিরূপ, তাহার প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে। যে কাজ তুমি করিতে ইচ্ছা কর না, যে অভ্যাসটি অর্জ্জন করিতে তুমি চাও না,—সে কাজটি, সে অভ্যাসটি, যে-মনোভাব হইতে উৎপন্ন, সেই মনোভাবের প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে।

মনোবিজ্ঞানের একটা সাধাসিধা নিয়ম এই যে, যে কোন ছাঁচের চিন্তা তুমি মনের মধ্যে অধিকক্ষণ পোষণ করিবে, সেই চিন্তাটি তোমার মস্তিকের বহির্মুখী বা ক্রিয়ামুখী পথগুলিতে ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং পরিশেষে উহা অনিবার্য্যভাবে কার্য্যে প্রকট হইয়া উঠিবে। নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম অনেক সময় এইরূপেই উৎপন্ন হয়। আবার এইরূপেই, অনেক উৎকৃষ্ট শক্তি অর্জ্জিত হয়, দেবদুর্ল্লভ সদ্গুণ সকল উৎপন্ন হয়, বীরোপম কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়।

চিন্তাই কার্য্যের জনক—এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের দেখিতে হইবে কি করিয়া এই চিন্তাকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারি।

আমাদের দৈহিক স্নায়ু-তন্ত্রের যেরূপ একটি স্বতঃপ্রবর্ত্তনী ক্রিয়াশক্তি আছে, আমাদের মনেরও সেইরূপ একটি ক্রিয়াশক্তি আছে। সেই ক্রিয়াশক্তির নিয়মটি এই:—একবার যখন আমরা কোন একটা কাজ কোন বিশেষ রকমে করি, দ্বিতীয়বারে তাহা করা আরো সহজ হয়—এবং তাহার পর প্রত্যেক বারেই উহা আরও অধিক সহজ হইয়া উঠে। এমন কি, তখন আর কোন প্রকার চেষ্টা বা প্রযত্ন করিতেও হয় না। যদি আমার কোন চিন্তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করি, সেই প্রথম চেষ্টাটা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে পরে যতবার চেষ্টা করি, ক্রমশঃ তাহা সাধন করা সহজ হইয়া উঠে। চেষ্টা একবার ব্যর্থ হইলেও ক্ষতি নাই। চেষ্টাতেই সাফল্য। প্রত্যেকবারের চেষ্টাতেই আমরা একটু একটু করিয়া বলসঞ্চয় করি। এইরূপে আমাদের চিন্তাকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারি।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মনে কর, একজন বেঙ্কের কিংবা কোন মহাজনী কুঠীর খাতাঞ্চী। এই খাতাঞ্চি খবরের কাগজে দেখিল, একব্যক্তি কোম্পানী কাগজের "স্পেকুলেসান" করিয়া রাতারাতি লক্ষপতি হইয়া পড়িয়াছে। আর একজনও এই উপায়ে প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। কিন্তু সে যদি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিত ত দেখিতে পাইত, এই কাগজের খেলায় কত শত লোক সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি মনে করিলেন, ভাগ্যলক্ষ্মীর বর-পুত্রদিগের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর কখনই লোকসান হইবে না। এই মনে করিয়া তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এই কাজে প্রয়োগ করিলেন। সমস্তই নষ্ট হইল। এখন মনে করিলেন, যদি তাঁর আর কিছু টাকা থাকিত, তাহা হইলে এই কাজে খাটাইয়া শুধু নষ্ট ধন উদ্ধার নহে, আরো অনেক টাকা শীঘ্র লাভ করিতে পারিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, বেঙ্কের যে টাকা তাঁর জিম্মায় আছে, তাহা হইতে কতকটা লইলে হয়,

না? পরে তিনি তহবিল ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কথা যেমন তাঁর মনে আসিয়াছিল, অমনি যদি ঐ কথাটা মন হইতে তাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি বিজ্ঞজনের মত কাজ করিতেন। তাহা না করিয়া এই কথাটাই তিনি ক্রমাগত মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই চিন্তাটা তাঁকে একেবারে পাইয়া বসিল। এবং তাহার পর ঐ চিন্তার কি পরিণাম হইল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

মানব-জীবনের এই কথাটি খুবই সত্য,—যাহার আমরা ধ্যান করি, কতকটা আমরা তাহার সাদৃশ্যও লাভ করি, তাহার মতো হইয়া পড়ি। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। "যাহার যেরূপ ভাবনা, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ"। এখানে সিদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, চরিত্র সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা, চরিত্রও তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। অভ্যাসের সমষ্টিই আমাদের চরিত্র। আমাদের জ্ঞানকৃত কার্য্যের দ্বারাই এই অভ্যাসগুলি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। এবং কার্য্যের গোড়ায় কি?—না চিন্তা বা ভাবনা।

অতএব এই ধ্যান ও চিন্তার দ্বারাই আমরা আমাদের মানস-আদর্শে উপনীত হইতে পারি। দুইটি ধাপ আছে। প্রথম, আমাদের একটা জীবনের আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়া; দ্বিতীয়, যাহাই ঘটুক না কেন, যেখানেই আমরা নীত হই না কেন, বরাবর এই আদর্শটি অনুসরণ করিয়া চলা। এইটি স্মরণে রাখিবে, সেই ব্যক্তিই চরিত্রবলে বলী যে ভাবী মঙ্গলের জন্য বর্ত্তমান সুখ বিসর্জ্জন করিতে পারে। জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য জীবনকে মহৎ করিয়া তোলা, পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিয়া তোলাই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। সুখ সাধন জীবনের লক্ষ্য নহে। পর-সেবায় যে উচ্চতর আনন্দ অনুভূত হয় তাহার তুলনায় এই সুখ অতীব তুচ্ছ। এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক, একটা পুরাতন অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা, কিংবা একটা নূতন অভ্যাসকে অর্জ্জন করা একেবারেই হয় না। যতই আমরা চিৎ-শক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিব, ততই আমরা সফলতা লাভ করিব। প্রথমে উন্নতির গতি খুবই বিলম্বিত, কিন্তু যাইতে যাইতে ক্রমশ দ্রুত হইয়া উঠিবে। শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই শক্তির বৃদ্ধি হয়। আর সকল জিনিসের মত ইহারও একটা নিয়ম আছে। একজন সেতার শিখিতে গিয়া প্রথম উদ্যমেই শক্ত গৎগুলা কখনই আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই বলিয়া তার এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, কখনই ঐগুলা তাহার আয়ত্তে আসিবে না। অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমেই উহা সহজ হইয়া আসিবে। তখন তাহার মন ও হস্ত উভয়ই যন্ত্রের মত কাজ করিবে। কোন প্রকার আয়াস অনুভূত হইবে না। চিন্তার এই একই নিয়ম। পুনঃপুনঃ চিন্তাপ্রবাহ কোন বিশেষ পথে প্রবাহিত করিলে তাহার ক্রিয়াফল বাহিরে প্রকাশ হইবেই হইবে।

জীবনের সমস্ত ক্রিয়াই ভিতর হইতে বাহিরে। জীবনের সমস্ত উৎস ভিতর হইতেই নিঃসৃত হয়। সেইজন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। পাশ্চাত্যদিগের এই অন্তর্দৃষ্টি খুবই কম, উহারা বাহিরের কাজ লইয়াই বিব্রত। জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। কেন না তাহা হইলে আমাদের সমস্ত চিৎশক্তি একটা বিশেষ জায়গায় নিয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা অনবচ্ছেদে অনন্তের সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা দৈনিক জীবনের ত্বরার মধ্যেও স্থিরভাবে সেই অনন্ত শক্তি ও অনন্ত প্রাণকে উপলব্ধি করিতে পারি—যাহা সকলের অন্তরালে অবস্থিত এবং যাহা সকলের মধ্যে এবং সকলের মধ্য দিয়া অবিরত কাজ করিতেছে;—যাহা সকলের প্রাণ, যাহা প্রাণের প্রাণ, এবং যাহা সকল শক্তির মূলাধার। যাহার বাহিরে কোন প্রাণ নাই, কোন শক্তি নাই। ইহা ঠিক্ ধারণা করিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করা আবশ্যক—অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। মানুষের আত্মার মধ্যে অনন্তকে—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা—ইহাই সকল ধর্ম্মের প্রাণ। "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তি শাশ্বতী"।

এই জন্য প্রাচ্যদেশের লোক আমরা ধ্যান ধারণার এত পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাও আবার বেশী মাত্রায় লইয়া গেলে কুফল উৎপন্ন হয়। আমাদের ধ্যান অনেক সময় ধ্যানেতেই পর্য্যবসিত হয়, উহার ফল জীবনের কাজে প্রকাশ পায় না। আমাদের আদর্শ ধ্যান; পাশ্চাত্যদের আদর্শ কার্য্য। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই চরিত্রের চরম উৎকর্ষ লাভ করা যায়—মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

পল্লীর উন্নতি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। একদিকে মেঘের আয়োজন, একদিকে চাষের। আমাদের নব

শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠ্‌চে। আমাদের বিশেষ করে দেখ্‌তে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষম শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণহাওয়ার মত আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুল্‌চে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্ম্মসাধনের যোগ নেই তা নয়—এর মধ্যে সঙ্গীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই,—আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড় দৈন্য তার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্য্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এই জন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তি-প্রাচুর্য্য জন্মে না। সেই জন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনো রকম বড় ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করচেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরাণীগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করচে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্র যাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আস্‌চে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই ত গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা—যে মাটিতে আমরা জন্মেচি। এই হচ্চে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করচে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্চে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফল্‌বে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়চে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচীর হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্দ্ধপানে তাকিয়ে বল্‌চে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও ত আমারই জন্য—আমাকে দাও, আমাকে দাও!—সমস্ত নেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শত ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে. এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কে হে, সহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কি জান? আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাক্‌লেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মান্‌তে পারিনে। কেবল মাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিষ নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা—সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানচেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না; আর যাঁরা মানচেন না, তাঁরা উদ্যম সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকল প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নাম্‌তে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম "তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল কর।" এজন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমি কৃতকার্য্য হতে পারিনি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে।

যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবী আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব এ কথা আমরা ভুলতে পারিনে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মৎলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে অমন ঘটনা তারা সর্ব্বদা দেখে না—উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা, অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাহাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকল প্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবী করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয়নি—কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক্ আমি পারিনি তার কারণ আমাতেই বর্ত্তমান—কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় আমিই সব করব। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম্ম, এতে লাভ আমারই—এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভাল কাজ করব এদিকে লক্ষ্য না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ্য করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারিনে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাব মোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে-গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করেনি। আমি বল্লুম "তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস্ তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।"—তারা বল্লে, "এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!"

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যই যখন গ্রামের লোক বল্লে, মাছের তেলে মাছ ভাজা, তখন তারা এই কথাই জানত যে, এক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্চে সেটা আমারি পারত্রিক ভোজের—অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জলে যাচ্চে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দুতিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনচে, কিন্তু তারা আজ পর্য্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচন দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয় তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বল অন্ন বল বিদ্যা বল স্বাস্থ্য বল যে-কোন অভাবমোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয় সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন কি, তার একপ্রকার অহঙ্কার থাকে। সেই অহঙ্কার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে উঠে, "এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!"

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চল্‌বে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্চে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠ্‌চে—পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়ে-মহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তারপরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষ্যেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন সহরে সহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়চে। কৃতী সহরে যায় কাজ করতে, ধনী সহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী সহরে যায় জ্ঞানের চর্চ্চা করতে, রোগী সহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভাল কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা—এতে ক্ষতিই হোক্ আর যাই হোক এ অনিবার্য্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতাবৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড় অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে-লোক দেবে এবং যে-লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। একদল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করেনি, কারণ তারা জান্‌ত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্ত্তে যে-ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড় ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া তাকে কোনমতেই কোনো দয়ার বা কোন বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্যসহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্ব্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্ব্বলতা বাড়িয়ে তুল্‌তে না থাকি।

দুর্ব্বলতা যে কি রকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছুদূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই:—কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরুণাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দুচারজন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর সহরে রটে গেল যে পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আস্‌চে। বোলপুরে কেউ বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুট্‌ল। এর কারণ এই বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চারজন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর-বাজারে যখন আগুন লাগ্‌ল তখন কেউ যে কারো সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে তখন নিজের কলসীটা পর্য্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসী তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন কি গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকৃতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক্ একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চ্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী-পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি জরীপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা, ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি

ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিশ্রিত করতে পারেন তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

বর্ত্তমান যুদ্ধ।

জে, ডবলিউ, হেডলাম (J. W. Headlam) সাহেব "বার দিনের ইতিহাস" বলিয়া একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। ১৯১৪ সালের ২৪শে জুলাই হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, জর্ম্মানির যে বাদানুবাদ ও লেখালিখি চলিয়াছিল, তাহাই উক্ত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই দ্বাদশ দিবস ব্যাপী আলোচনার অন্তে যে মহাসমর প্রজ্বলিত হইল তাহাতে য়ুরোপের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম। নেপোলিয়নের পরে এইরূপ মহাযুদ্ধ আর কখন কোথাও ঘটে নাই। জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া অকস্মাৎ যে দাবী করিয়া বসিলেন তাহাতে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। অষ্ট্রীয়া সর্ব্বিয়াকে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ৪৮ ঘণ্টা মাত্র অবকাশ দিয়াছিলেন, এবং রুসিয়াকে সৈন্য সমাবেশ হইতে নিরস্ত হইবার জন্য ১২ ঘণ্টা মাত্র সময় দেওয়া হইয়াছিল। এই যে অত্যল্প সময় নির্দ্দেশ, ইহা চিরকালের জন্য জর্ম্মানের অন্যায় নীতির এবং অসম্ভব প্রস্তাবের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। সর্ব্বিয়া সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ার দাবী যখন বিঘোষিত হইল, সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিকগণ সে কথার মর্ম্ম পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হন নাই, শান্তিসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবারও তাঁহারা কোন সুবিধা পান নাই। এই শান্তি স্থাপনের জন্য জর্ম্মানিও পূর্ব্ব হইতে নিজে কোন চেষ্টা করেন নাই। সর্ব্বিয়া সম্বন্ধে সময়বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য রুসিয়ার সম্রাট জর্ম্মাণ সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে আপোষে বিবাদ মিটাইবার জন্য অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল। জর্ম্মাণ-রাজ ইংলণ্ডের সার এডোয়ার্ড গ্রের কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তাহা দেখিয়া সার এডোয়ার্ড গ্রে সাহেব কায়সরকে বলিয়া পাঠাইলেন,কিসে বিবাদ মিটিতে পারে, জর্ম্মাণ সম্রাট নিজেই তাহার প্রস্তাব করুন। জর্ম্মাণি গূঢ় অভিসন্ধি বশতঃ নিজেও কোন প্রস্তাব করিলেন না। রুসিয়ার এইরূপ প্রস্তাবেও ফলোদয় হইল না। রুসিয়ার সম্রাট ও সর্ব্বিয়ার রাজা সকল বিবাদ (Hague conference) হেগ কনফারেন্সের সাহায্যে মিটাইয়া লইবার জন্য অনুনয় করিলেন। জর্ম্মাণ রাজ তাহাতে রাজি হইলেন না। সর্ব্বিয়ার সহিত যুদ্ধ বিঘোষিত হইল ও চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এবং আন্তর্জাতিক সন্ধিতে বাধ্য হইয়া ইংরাজ, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও রুসিয়া, জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুদ্ধে অবতরণ করিলেন।

যুদ্ধ তীব্রভাবে চলিয়া বেলজিয়মের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। রুষিয়ার পশ্চিম অংশ জর্ম্মানির কবলগ্রস্ত। ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত কাইসার অধিকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু জর্ম্মণের গর্ব্ব অচিরে খর্ব্ব হইবে, ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গলের জয় হইবে না, ঔদ্ধত্য চিরকাল মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা স্থির নিশ্চিত। জর্ম্মাণির উত্থান তাহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা দেখিতেছি মিত্রপক্ষগণের আদর্শ "যতোধর্ম্মস্ততোজয়", তাঁহারা য়ুরোপের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন;—অন্যদিকে জর্ম্মাণ রাজনীতির আদর্শ দুর্ব্বলের বিনাশ ও অস্ত্রবল প্রতিষ্ঠা। জর্ম্মাণি অমিততেজে সংগ্রাম করিতেছে বটে, কিন্তু অর্থক্ষয়ে ও অসংখ্য সৈন্যের বিনাশে এবং মিত্র রাজ্য সকলের পরাক্রমে জর্ম্মণি আর কতদিন টেঁকিতে পারিবে। ডোবা-জাহাজের কামানের গোলা বর্ষণে নিমজ্জিত নির্দ্দোষ আরোহীর বিধবার অশ্রুজল, পিতৃহীন বালক বালিকার কাতর ক্রন্দন, ঈশ্বরের সিংহাসন প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। ইহার ফলে জর্ম্মণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। "দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ" জর্ম্মাণ অধ্যাপকেরা এই দুর্নীতি সদর্পে প্রচার করিয়া বেড়ান; আমরা বলি দর্পহারী মধুসূদন আছেন তাঁহার বিধানে দুর্দ্দান্ত লঙ্কাধিপতিও ধরাশায়ী হইলেন; বলীর অতিদর্প চূর্ণ হইয়া যাইবে।*

য়ুরোপে জাতীয়তার একটা বিশেষ বন্ধন আছে। ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, ভৌগোলিক বিভাগ, অতীত ইতিহাস, চলাফেরার পার্থক্য, ও ভাবের বিশেষত্ব, লইয়াই ইউরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পত্তন হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধিবাসী বলিয়া ইংরাজগণ, ফ্রান্স দেশের অধিবাসী বলিয়া ফরাসিগণ, বেলজিয়মের অধিবাসী বলিয়া বেলজিয়ানগণ, রুসিয়ার অধিবাসী বলিয়া রুসগণ যে গর্ব্ব ও দায়িত্ব অনুভব করে, আমরা অনেকে ঠিক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। এত বিভিন্ন সম্প্রদায়, এত বিভিন্ন ভাষা ধর্ম্ম, আচার ব্যবহারাদি এদেশে রহিয়াছে যে,

---

* খ্যাতনামা Bernhardi র মতে জর্ম্মণির বীজ মন্ত্র হচ্ছে—World-power or Downfall হয় বিশ্বনাথ নয় অধঃপাত।

nation বলিয়া গর্ব্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিবার সম্পূর্ণ শক্তি আমাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। Nation এর অন্তর্গত বলিয়া স্বদেশ-প্রেম ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে যে বিদ্যুৎগতি আনিয়া দেয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার ও দেশের ধারা রক্ষা করিবার জন্য যে আত্মত্যাগ ও জীবনবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা উহার জাজ্বল্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। আমরা অতীতের ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাই যে, এই জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার জন্য কতদেশ যুদ্ধ ব্যপদেশে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন দেশ এই জাতীয়ত্বকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে নিজ নিজ জাতীয়তা প্রাণপণে রক্ষা কর কিন্তু অন্যের উপর তাহা জোর জবরদস্তী করিয়া চাপাইতে যাইও না—গেলেই অনর্থপাত! নেপোলিয়ান এক সময়ে পারিস হইতে আসিয়ার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত বিজিত দেশে ফরাসী জীবন, ফরাসী ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, কিন্তু পরিণামদর্শী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই একই বিলাতীভাবে সকলকে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা না পাইয়া বিজিত দেশের বিশেষত্ব যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ইহাতেই তাঁহাদের শাসন জয়যুক্ত হইতেছে। জর্ম্মনির চেষ্টা যে তিনি পৃথিবীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করেন—তাহারই পরিণাম এই ভীষণ সংগ্রাম।

সর্ব্বীয় রাজা বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনে গত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সৈন্যগণকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, বীর সৈনিকগণ! তোমরা সকলেই দুইটি শপথ গ্রহণ করিয়াছ; উহার প্রথম কথা এই যে তোমরা আমাকে প্রাণান্তেও ছাড়িবে না; দ্বিতীয় কথা এই যে তোমরা তোমাদের দেশের চির অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। আমি তোমাদিগকে প্রথম শপথের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতেছি। আমি নিজে বৃদ্ধ ও কবরের সম্মুখীন। কিন্তু তোমরা দ্বিতীয় শপথ যে গ্রহণ করিয়াছ তাহা হইতে কেহই যেন তোমাদিগকে বিযুক্ত করিতে না পারে। কি সহৃদয়তার কথা! কি মর্ম্মস্পর্শী উত্তেজনা! ফরাসীর প্রেসিডেণ্ট সে দিন বলিয়াছিলেন, যে-জাতি বিনষ্ট হইতে না চায় এবং বাঁচিবার জন্য সবই সহ্য করিতে ও সবই বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, জগতে কেবল তাহারাই বিজয় লাভ করিতে পারে এবং জগতে তাহাদের স্থান আছে।

জার্ম্মণী অমিততেজে সংগ্রাম করিতেছে, নগর গ্রাম ক্রমে ধ্বংশ করিয়া ফেলিতেছে এ কথা সত্য, কিন্তু এই সমরশেষে এমন একটি দিন আসিবে যেদিন জর্ম্মণীর শক্তিপীড়িত সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবসান হইবে। তাহারা জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে শিক্ষা করিবে; সর্ব্ববিধ দৌরাত্ম্য বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অষ্ট্রীয় ও জর্ম্মণগণ শান্ত ও সৌহার্দ্দ্যভাবে অন্যান্য জাতির সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে গ্রথিত হইবার অবকাশ পাইবে, এবং সামন্ত দেশে আপনার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা হইতে চিরকালের জন্য ক্ষান্ত হইবে। তখন আপনার শক্তি ও আদর্শ বিস্তারের জন্য জর্ম্মণী বা অষ্ট্রিয়া আর লালায়িত হইবে না। এবং ক্ষুদ্র জাতিই হউক, আর বড় জাতিই হউক, সকল জাতিরই বাঁচিয়া থাকিবার যে একটি অধিকার আছে, তাহা চারিদিক হইতে স্বীকৃত হইবে এবং এই ভাবেই মনুষ্য জাতির নব ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হইবে।

কিন্তু এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র যাহা আমরা কল্পনাতে অঙ্কিত করিতেছি, তাহার পূর্ব্বকার এই ভীষণ লোকক্ষয়ের কথা যখন স্মরণ করি, তখন শরীর শিহরিয়া উঠে। শত্রুমিত্রের উভয় পক্ষ হইতে যে বিরাট সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ন্যূনাধিক প্রায় তিন কোটী হইবে। অগণিত কামান ও বন্দুক অনবরত অগ্নিরাশি উদ্‌গার করিতেছে। আকাশে কামানবাহী পোত সঞ্চরণ করিতেছে। জলগর্ভে প্রচ্ছন্ন জাহাজ পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিতেছে, জলের উপরে রণপোত শত্রুকে আক্রমণ করিতেছে। দয়ামমতার লেশমাত্র নাই, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুরতার রাজত্ব চারিদিকে। তাহার উপরে অর্থনাশ যে কত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। প্রকাণ্ড কামানের মুখ হইতে বিনির্গত সুপ্রকাণ্ড একটি শেলের বা গোলার মূল্য প্রায় পোনের হাজার টাকা। ক্ষুদ্র সেল বা গোলার প্রত্যেকটির মূল্য দুই তিন শত টাকা। একখানি প্রকাণ্ড রণতরির মূল্য কোটী টাকা। এ পর্য্যন্ত শত্রুমিত্রের যে লোক ক্ষয় হইয়াছে, তাহাও বিশ পঁচিশ লক্ষের কম নহে। আরও বা কত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বপ্রথা যে সম্মুখ-যুদ্ধ, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহার ব্যবস্থা ছিল, তাহা আজ তিরোহিত। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে সঙ্গোপণ-যুদ্ধ সমস্ত ইউরোপের ভিতরে কেন, তুরস্কের ভিতরে ও এড্রিয়ানোপালেও চলিতেছে। নর হত্যার এই বিরাট আয়োজন, এই প্রলয়ঙ্কর অভিনয় জর্ম্মণ-রাজ যাহার জন্য একমাত্র দায়ী, তাহার ভীষণ কাহিনী সংবাদপত্রে পড়িতেও আর প্রবৃত্তি হয় না। পৃথিবীময় বাণিজ্যরোধে কষ্ট ও অসুবিধা চরম সীমায় উঠিয়াছে। যে সমস্ত দেশ, যুদ্ধের অভিনয়-ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই, অন্তর্জ্জাত ও বহির্জ্জাত বাণিজ্যের সঙ্কোচে তাহাদেরও উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অর্থের অভাবে শত শত সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। ভারতের লোক, আমরা শান্তির ভিখারী। এই মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়া ভগবান তাঁহার যে, কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহার নিকট আমাদের সকরুণ প্রার্থনা যে শান্তির বারি বর্ষণে এই ভীষণ দাবানল, যাহা ক্রমিকই বাড়িয়া চলিয়া আপনার পরিধি চারিদিকে বিস্তার করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রশমন করুণ। এই মহাযুদ্ধের উপরে যবনিকা পাত করিয়া দিন; এবং তাঁহার এই জগৎকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই ভব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে বসিলে আজি হৃদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর।
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে
পাষাণে বহে সুধাধারা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ ২´
II র্সা -া -ণা -া -া -া ধপা ধা | ধণা -র্সণা -ধা -ণা -া ধা পা -া |
কে • • • • • ব• সি লে• •• • • • আ জি ••

৩ • ॥
| -া -া মা পা -া -া -মপধা পধপা | মজ্ঞা -া -া -া -া -া রা জ্ঞা I
• • হৃ দা • • ••• স• নে • • • • • ভু ব

১ ২´
I রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা রা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -জ্ঞা | -সা -া -া -া -া রা পা -া |
নে• •• • শ্ব র• •• • • • • • • • প্র ভু •

৩ •
| -া -া -া মা পা পা পর্সা -া | -ননা -র্সা -া -া পা র্সনা র্সা র্রা I
• • • জা গা ই লে • •• • • • অ নু• প ম

১ ২´
I র্জ্ঞর্রা -র্সর্রা র্জ্ঞমা -র্জ্ঞমর্জ্ঞর্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা -া | -া -া নর্সা -র্রর্জ্ঞা র্রর্সা -ণধা -পমা -া |
সু• •• •• •••• ন্ দ র • • •শো• •• ভা• •• •• •

৩ •
| মমা -পধা -ণর্সা -া র্সর্রা র্সর্রর্সা -ণধা -পমা | মপা -ধপা -মজ্ঞরা রা রজ্ঞা
হে• •• •• • হৃ• দ• •• •• য়ে• •• ••• শ্ব র•

-মজ্ঞরা -সমা -া II
••• •• •

১ ২´
II মা পা I র্সা -া -া -ননা -র্সা -া র্সা র্রা | র্জ্ঞর্রা -র্সর্রা -র্জ্ঞর্মা -র্মর্জ্ঞা -র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা |
স হ সা • • •• • • ফু টি ল• •• •• •• • • ফু ল

৩ •
| -া -া র্সা -া -ণধা -পমা -মমপধা -ণর্সা | না র্সা -া -া -া -া পা র্সনা I
• • ম • •• •• •••• •• ঞ্জ রী • • • • শু কা•

১ ২´
I র্সা -া র্সা র্রা র্সর্রর্সা -ণধা -পমা -া | মা পা পর্জ্ঞা -া -া -া -া -া |
নো • ত রু তে• •• •• • পা ষা ণে • • • • •

৩ •
| র্সর্রা র্সর্রর্সা -ণধা -পমা -া -া -া মা | মপা -ধপা -মজ্ঞা -রা রজ্ঞা -মজ্ঞা
ব• হে• •• •• • • • সু ধা• •• •• • ধা• ••

-রসা রা II II
•• রা

৺ কাঙ্গালীচরণ সেন।

নানা কথা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আসামের বন্যা।—এবার আমরা আসামের ভীষণ বন্যার কথা যতই শ্রবণ করিতেছি, এবং তাহার ধারাবাহিক বিবরণ যতই আমাদের হস্তগত হইতেছে, ততই আমরা বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছি। এই দারুণ দুর্নিমিত্তে ইংরাজ চা-কর ও আসামীগণ উভয়েই বিপন্ন। আসামের রেল-লাইনে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে পাঁচ কোটী টাকার অধিক ব্যয় পড়িবে। আসামে যাতায়াতের পথ একপ্রকার রুদ্ধ বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে নৌকা ও ষ্টীমারের সাহায্য গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই। রেল লাইন স্থানে স্থানে একেবারে ধৌত হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি পাহাড়ের ভিতরের সুড়ঙ্গ ও (tunnel) ভূমিসাৎ হইয়াছে। ধ্বংসের পরিমাণ এতই অধিক, যে কতদিনে তাহার সংস্কার-সাধন হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। ভোজো হইতে লমডিং ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্য সময়ে সিলেট হইতে শিলং আসিতে আড়াই দিন মাত্র লাগে, কিন্তু বর্ত্তমানে সাত দিন লাগিতেছে। সিলেটের কোন কোন স্থানে প্রায় ৪০ ফুট জল বৃদ্ধি হইয়াছিল। ঐ জল ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, তাহার উপরে আসামে এই বিপদপাত। এ বৎসরের ফলাফল ভারতের পক্ষে শুভ বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান সমর।—বর্ত্তমান যুদ্ধে বারটি জাতি সংশ্লিষ্ট, আরও তিনটি জাতির মিলিবার সম্ভাবনা আছে। আট্‌লাণ্টিকের অপর পারের অন্য একটি জাতি এ যুদ্ধে মিলিতে পারে। সমর যেভাবে চলিতেছে, নানা কারণে তাহাতে কাহারও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার উপায় নাই; কোন না কোন পক্ষের সহিত মিলিত হইবার বিবিধ-কারণ ঘটিতেছে। ইউরোপের প্রতি ৭ বর্গমাইলের মধ্যে প্রতি ৫ বর্গমাইলের অধিবাসী সংগ্রামে অবতীর্ণ, এবং ইউরোপের প্রতি বারজন অধিবাসীর মধ্যে প্রতি দশ জন সংগ্রাম ক্যারী জাতিগণের অন্তর্ভুত। ইউরোপের প্রায় ৪০ কোটী অধিবাসী কোন না কোনরূপে এই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। ইউরোপে কেবলমাত্র ৬ কোটী লোক শান্তির ভিতরে রহিয়াছে।

আফ্রিকা দেশে এই অনুপাতের সংখ্যা আরও অধিক। মরক্কো দেশকে যদি ফরাসী অধিকারের মধ্যে ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল মাত্র আবিসিনিয়া দেশ ও লাইবেরিয়া এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নহে। কিন্তু ঐ ঐ দেশ আফ্রিকার বিংশতি অংশের একাংশ মাত্র। উত্তর আমেরিকা, যাহা রায়ো-গ্রাণ্ডির উত্তরে উহার অধিবাসীবর্গ কোন না কোন দলের অন্তর্ভূত। দক্ষিণ আমেরিকাই নির্ব্বিরোধী বলিতে হইবে। এসিয়ার প্রায় অর্দ্ধাংশের অধিবাসী কোন একটি দলের দিকে রহিয়াছে। এই সমস্তগুলিকে একত্র করিয়া ধরিলে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালি ও রুসের মিলিত শক্তির দিকে লোকের আধিক্য বলিতে হইবে। এই সম্মিলিত শক্তি যে যে দেশ শাসন করে, ঐ ঐ দেশের বিস্তৃতি, জর্ম্মাণ ও তুরস্ক শাসিত দেশের ছয় গুণ অধিক এবং শাসিত-লোকের সংখ্যা পরিমাণে দ্বিগুণ।

অর্থের দিক হইয়া ধরিলেও সম্মিলিত দলের অর্থের পরিমাণ যে নিতান্ত অধিক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যুদ্ধের ক্ষেত্র ও পরিসর লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে ইহা চারিদিকে প্রসারিত। কোথায় উত্তর মহাসাগর আর কোথায় বঙ্গোপসাগর, কোথায় চিলির উপকূলস্থ দ্বীপ আর কোথায় নাইল নদের সান্নিধ্য প্রদেশ, কোথায় পারস্য উপসাগর কোথায় আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত, কোথায় টোগোল্যাণ্ড কোথায় কার্পেথিয় পর্ব্বত, কোথায় ইটালি কোথায় ডার্ডানেলিশ, কোথায় সিরিয়া ও পারস্য কোথায় ইংলণ্ডের দক্ষিণ ভাগ, ও ফ্রান্স; চারিদিকেই। কামানের গর্জ্জন চলিতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যয়ের ইয়ত্তা নাই। প্রতিদিন কোটী কোটী টাকার গুলি গোলা বারুদ উড়িয়া যাইতেছে। কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই যুদ্ধের সংশ্লীভূত হইয়াছে। সকল লোকেই কোন কোন রূপে এই যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রভাব সকলকেই কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখন ঘটে নাই। কোন যুদ্ধের পরিসর এত সুবিস্তৃত হয় নাই, কোন যুদ্ধে এত লোক ক্ষয় হয় নাই, কোন যুদ্ধে এত অর্থ বিনষ্ট হয় নাই, কোন যুদ্ধে দৈহিক মানসিক ও নৈতিক বল এত তেজের সহিত কার্য্য করে নাই, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন যুদ্ধ এমন সজোরে তাহার অঙ্কপাত করে নাই, কোন যুদ্ধে এত সহিষ্ণুতা ও বিক্রমের পরিচয় মিলে নাই, ইউরোপের মানচিত্র, এমন বিপ্লবের ও পরিবর্ত্তনের ভিতরে আর কখন পড়ে নাই। রাজ্যের বিনাশ ও রাজত্বের বিলোপ এমনভাবে আর কখন সংঘটিত হয় নাই।

গ্রাহকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন।

বহু গ্রাহকের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকী আছে। একটী ধর্ম্মসমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র পরিচালন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। অন্যান্য মাসিক পত্রে ডিটেকটিব উপন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বিনী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সে প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশ করা অসম্ভব। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা সেই কারণে অধিক না হইলেও একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ। তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য, যে পত্রিকার জীবন তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। আমরা বর্ত্তমানে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠাইয়া গ্রাহকদিগকে উত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি তাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাদের দেয় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমাদের সহায় গ্রাহকগণের নিকট আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে তাঁহারা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে পত্রিকার গ্রাহক করিয়া দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আত্মসম্মান।

আমাদের শাস্ত্রে আছে "নাত্মানমবমন্যেত" আপনাকে অবমাননা করবে না; আপনাকে দীন-হীন হেয় মনে করে ধিক্কার দেবে না, কাতর হয়ে পড়বে না। শাস্ত্রের এই অনুশাসনেরই ফলশ্রুতি স্বরূপে আমরা আর একটী কথা বলতে চাই যে মানুষ আপনাকে যথাযুক্ত সম্মান দিতে বিরত হবে না, নিজের মনুষ্যত্বের গৌরব ও মর্য্যাদা মহামূল্য জেনে অক্ষুণ্ন রাখবে।

মানুষের মন এমনভাবে গঠিত যে, সে হয় আপনাকে অবজ্ঞার পাত্র, হেয় ও অপদার্থ বলে মনে করতে পারে, আর না হয় তো নিজেকে সম্মানের পাত্র, একজন মানুষের মত মানুষ বলে মনে করতে পারে—এই দুইটী ভাবের মধ্যে কোন মধ্যপথ আমরা দেখতে পাইনে। তাই উপরোক্ত শাস্ত্র-লিখিত অনুশাসন অনুসরণ করে আমরা এই বলতে চাই যে মানুষ কেবলমাত্র আপনাকে নির্ধন নয় বলে মনে করলেই তার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হোল না; মানুষের নিজেকে মহাধনীর সন্তান এবং সুতরাং মহা ঐশ্বর্য্যবান বলে জানতে হবে। সমস্ত বিশ্ব-সংসার যাঁর রাজ্য, সেই রাজরাজেশ্বরের সন্তান হয়ে মানুষ কেমন করে আপনাকে দীনহীন কৃপা-পাত্র বলে মনে করতে পারে? মানুষের দেহের পরিমাণ সাড়ে তিন হাত বটে, কিন্তু তার ভিতরে যে সেই মহান অগ্নি বিশ্বাত্মার চির প্রজ্বলিত বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ একটি আত্মা আছে, সেই আত্মার কথা মনে করলে মানুষ কখনই নিজেকে হেয় অপদার্থ বলে মনে করতে পারে না। এই বিস্ফুলিঙ্গই উপযুক্ত পাত্রে নিপতিত হলে সেই মহান অগ্নির শক্তিসাদৃশ্য অনেকাংশে প্রদর্শন করতে পারে। মানুষের ভিতরে যখন এত বড় একটা শক্তি আছে, যাকে জাগিয়ে তুললে সমস্ত বিশ্বরাজ্য বিস্ময়স্তম্ভিত হয়ে ওঠে, তখন তার নিজেকে কৃপাপাত্র দীন বলে অবমাননা করবার অবসর কোথায়? প্রত্যুত, নিজেকে সেই বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বরের সন্তান ও অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী জেনে প্রত্যেক মানুষের আত্মসম্মানের উপর দাঁড়ানো উচিত। বিশেষ সাধনা দ্বারা প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে উন্নত হয়ে বিশ্বেশ্বরের উত্তরাধিকারীস্বরূপে নিজের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করবার উপযুক্ত হওয়া উচিত।

মানুষ যদি এই আত্মসম্মানের উপর দাঁড়াতে পারে, আপনার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার গভীরতা বুঝে নিজেকে ভাল বাসতে পারে, তাহলে তার হৃদয়কে এমন এক প্রশস্ত ভাব অধিকার করে, তার আত্ম-প্রীতি এমন এক গভীর ভাব ধারণ করে যে সেই প্রশস্ত ভাব ও আত্মপ্রীতি সম্প্রসারিত হতে হতে পরিণামে সমগ্র জগতকে আপনার বিশাল অধিকারের মধ্যে আনতে চায়। তখন আর আত্মীয়ের শত্রুতা, গ্রামের আবর্জ্জনা, দেশের মোটা ভাত মোটা

কাপড়, এ সকল কিছুই সেই প্রীতির দৃষ্টিতে পরিত্যজ্য বলে মনে হয় না। তখন আত্মীয় গ্রাম দেশ সকলেরই সকল বিষয়ে উন্নতিসাধনে অভিরুচি হয়।

মানুষ আত্মসম্মানের উপর দাঁড়ালে নিজের শক্তির উপর দাঁড়াতে পারবে, কথায় কথায় পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। তখন আমার সংক্রান্ত যাহা কিছু, সকলেরই গৌরব ও মর্য্যাদা আমার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন পাড়াগেঁয়ে নাম পাবার ভয়ে স্বগ্রাম ছেড়ে সহরের কোলাহলে আসবার ইচ্ছা হবে না এবং সময়ে অসময়ে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে ছুটতে প্রাণ কাঁদবে না।

দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই মানুষ আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে। তখন মানুষ নিজের মর্য্যাদা ও গৌরব বুঝতে না পেরে মুহ্যমান হয়ে পড়ে এবং কেবলই হাহুতাশ করতে থাকে। তখন কাজেই সে নিজের কিছুই ভাল দেখতে পায় না এবং নিজের ছেড়ে অপরের, দেশ ছেড়ে বিদেশের যাহা কিছু তাই সোনার চক্ষে দেখে, আর তারই প্রতি সর্ব্বদা লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন সে আর নিজের শক্তির উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রতি পদে পরের কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে, পরের কাছে নিজকর্ম্মের সায় পাবার জন্য ও প্রশংসালাভের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকে। আত্মসম্মান হারিয়ে মানুষ নিজের ভালমন্দ বিচার করবার অবসরও পায় না, আর শক্তিও হারিয়ে ফেলে। তখন সে নিজের সুখটুকুরই অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না—স্বার্থপরতায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে ফেলে; অনুসন্ধান করলে আমাদের দেশে এ বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব ঘটবে না।

আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে আত্মসম্মানের মূল অসীমের উপর নির্ভর এবং আত্মাবমাননার মূল আমাদের সীমাবদ্ধ ভাব। আমরা যখন বুঝতে পারি যে আমরা সেই অনন্ত পুরুষের সন্তান, এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই পিতার রাজ্য, যখন আমরা তাঁর শক্তিতে আপনাদিগকে অজেয় মনে করতে পারি, তখনই পরের ছোটখাটো সাহায্য, ছোটখাটো কানাকানি ও ক্ষুদ্রভাবের প্রতি আমরা উপেক্ষাদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি এবং তখনই আমাদের আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে ওঠে।

মানুষ যখন আপনাকে কেবলই সীমাবদ্ধ করে দেখে; সে যে অসীমের সন্তান সে কথা যখন ভুলে যায়, যখন সে প্রত্যেক ভাবে, প্রত্যেক কর্ম্মে আপনাকে ছোট করে দেখে, তখনই সে নিজের উপর শ্রদ্ধাবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তখনই সে প্রত্যেক কাজে অপর পাঁচ জনের প্রশংসা শোনবার জন্য কান পেতে বসে থাকে। তার সম্মুখেই যে অসীমের ছায়া এই মুক্ত আকাশ পড়ে আছে, তার সম্মুখেই যে অনন্তপুরুষের লীলাভূমি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সেটা সে দেখতে পেয়েও যে দেখে না। সে ভুলে যায় যে পাঁচজনের কাছে প্রশংসালাভের ইচ্ছাই যে সেই অসীম পুরুষের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করছে।

মানুষ কিন্তু আত্মসম্মান হারিয়ে চিরকাল বাঁচতে পারে না। সে যে স্বাধীন মুক্ত পূর্ণপুরুষের সন্তান—সে কখনো চিরকাল সঙ্কীর্ণতার বেড়ার মধ্যে আটক থাকতে পারে না। সেই অনন্ত পুরুষের যে তেজবিন্দু তার অন্তরে নিহিত আছে, সেই তেজের বলে সে সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে আত্মাবমাননার ক্ষুদ্রভাব অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করে আত্মসম্মানের মুক্তরাজ্যে বেরিয়ে পড়বেই; আপনার উপর শ্রদ্ধাবিশ্বাসের মুক্ত বায়ু সেবন করে জীবন লাভ করবেই।

আত্মাবমাননা মানবাত্মার মৃত্যু, আত্মসম্মান মানবাত্মার জীবন।

ধ্যানের অবসর।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

জুলাই মাসের "রিভিউ-অফ্-রিভিউস্" পত্রিকায়, "কি উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের শেষ হয়" এই নামে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, ইয়ুরোপীয় চিন্তার স্রোত যেন একটু উল্টা দিকে ফিরিতে আরম্ভ

করিয়াছে। একদল লোক ইহারই মধ্যে শান্তির প্রয়াসী হইয়াছেন। যুদ্ধ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহারা একটু ধ্যানের অবসর খুঁজিতেছেন। এই মহাযুদ্ধের অবসানে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে, তাহারই আভাস যেন এখনি পাওয়া যাইতেছে। প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"এই জগতে চিরদিন দুই শক্তির মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে ;—একটি বিনাশের শক্তি, আর একটি গঠনের শক্তি ; একটি মরণ, আর একটি জীবন। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী? গঠন-শক্তিরই জয় হইতেছে ইহা সমস্ত জগৎ সাক্ষ্য দিবে। এই মৃত্যুর তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে, এই লোমহর্ষণ প্রলয়-ব্যাপারের মধ্যে, আমরা কি করিয়া জগতের সহিত আমাদের একতা স্থাপন করিব? Bergson আমাদিগকে দেখাইতেছেন,—জীবনের সহিত স্থায়িত্ব একীভূত ; এবং আমরা তখনি বাস্তবিক বাঁচিয়া থাকি, যখন কালচক্রের বিষম ঘূর্ণন হইতে আপনাদিগকে অপসারিত করিয়া, আমাদের অন্তরতম সত্তাকে উপলব্ধি করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করি। বাহির হইতে অন্তরে আসিয়া আমরা একটা জীবন-প্রবাহ প্রাপ্ত হই। যে একবার এই জীবনের অন্তঃ-প্রবাহের সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, ইহার কি অপরিসীম শক্তি। ইহা আমাদিগকে অন্তর্জ্ঞান (intuition) প্রদান করে, অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ইহা কি অমূল্য দান, তাহা ঐ দুইটি কথাতেই ব্যক্ত হইতেছে।

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য এই অন্তঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান বা অন্তর্জ্ঞান ও অন্ত-র্দৃষ্টিই এক্ষণে যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। এই জীবন-প্রবাহের প্রবল বেগেই, আমাদের নূতন পরিবেষ্টনের উপযোগী আত্মসত্তার একটি নূতন আকার আমরা প্রাপ্ত হইব।

""জুলিয়ার পত্র" যাহা সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত সারগর্ভ বাক্যগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় :—"এ যুগের যাঁহা বিশেষ প্রয়োজন তাহা এই—চিন্তার অবসর, ধ্যানের অবসর * * * এমন কি, আমরা চাই যে, সংবাদপত্রের লোকেরাও, অন্তত দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিটের জন্যও একটু শান্তভাবে আপনার আত্মাকে উপলব্ধি করে। আমার সহিত প্রেমের কি সম্বন্ধ (ভগবানই যে-প্রেমের সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি) সেই বিষয়ে যদি পাঁচ মিনিটের জন্যও একটু শান্তভাবে ভাবিতে পারি, তাহা হইলে আমার নষ্ট চক্ষুর দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে না কি? * * * আর কিছু নয়, এই ভাবটা আমাদের এই নব্যবংশীয়দের মনের উপর মুদ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর-চিন্তা এবং যে প্রেমরূপে ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছেন সেই প্রেমের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আমাদের অবসর চাই। প্রেম-হীন জীবন আর ঈশ্বর-বিহীন জীবন—সে একই কথা। প্রধানত প্রেমের পরিপুষ্টির জন্যই এই "ধ্যান-মুহূর্ত্তের" প্রয়োজন।" আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে দেব-প্রকৃতি নিহিত আছে তাহাকে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াই এই কার্য্যটি সংসাধিত হইতে পারে।

"বর্ত্তমান লেখক, এই "ধ্যান-মুহূর্ত্তগুলির" মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহুকাল পরীক্ষা করিয়া-ছেন। উদ্যমপূর্ণ জীবনযাত্রা এবং কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার মত কার্য্যতৎপরতা—এই সমস্ত "ধ্যান-মুহূর্ত্ত" হইতেই নিঃসৃত হইতে পারে ; পাঁচ মিনিট-ব্যাপী প্রেমের চিন্তা, নিবিড় মানসিক কুজ্ঝটিকাকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া শান্তির রাজত্ব আনয়ন করিতে পারে। তাই আমরা কতকগুলি বন্ধু মিলিয়া আমাদের অন্তরের মধ্যে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা প্রতি রাত্রে ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে, পাঁচ দশ মিনিট কাল, আত্মায়-আত্মায় পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এবং নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া, সেই প্রেমের উৎস আলোকের উৎস, শান্তির উৎসের মধ্যে আপনা-দিগকে একেবারে ঢালিয়া দিই। আমরা একত্র থাকি বা একাকী থাকি—আমাদের আত্মার একতা সকল অবস্থাতেই আমরা অনুভব করিয়া থাকি। যে গভীর দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে সমস্ত সংসার ডুবিয়া আছে,—তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, আমরা সেই দুঃখ-সাগরের মধ্য হইতে উপরে ভাসিয়া উঠি। আমরা একটা বিশুদ্ধতর বায়ু নিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ

করি, বিদ্বেষপূর্ণ জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি প্রেমের জীবন আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি, এবং তখন আমাদের বিশ্বাস হয়,—জীবনের গঠন-শক্তির দল-ভুক্ত সৈনিক হইয়া আমরা বিনাশ-শক্তির উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইব। বেলজিয়মের যেরূপ পুনর্গঠন আবশ্যক, ইংলণ্ডেরও সেইরূপ পুনর্গঠন আবশ্যক। বস্তুতঃ প্রেম শান্তি ও বিশুদ্ধতার মধ্যে সমস্ত জগতের পুনর্জ্জন্ম লাভ করা কি এক্ষণে প্রয়োজনীয় নহে ?

"এই জীবন-প্রবাহ নবীকৃত করিবার জন্য, স্বল্প হইলেও অবিরাম চেষ্টা আবশ্যক। যদি স্থিরভাবে ও অধ্যবসায়সহকারে এই পরীক্ষার পথটি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস —আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, আমাদের জাতীয় জীবনে—এমন কি সমস্ত জগতে, পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সংঘটিত হইবে।"

তত্ত্ববোধিনী সভা।

মুখবন্ধ।

আগামী ২১শে আশ্বিন তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মদিবস। এই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম। আর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতেই ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এমন কি, মহাসাগর ভেদ করিয়া সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ২১শে আশ্বিন ব্রাহ্মসমাজের একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিবস কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে; তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রাপ্ত উপকার স্মরণ করিলে আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ঐ দিবস কেবল বঙ্গদেশেরও নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতের স্মরণীয় দিবস। আমরা গত মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে পত্রিকার জন্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবারে সেই তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মকথা লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলাম।

জমীদার সমিতি।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন, বাল্যকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র কুড়াইয়া পাইয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তখন অবধি তাঁহারই নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপনিষৎ অধ্যয়ন যখন নীরবে চলিতেছিল, সেই সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কথায় কথায় সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতাদির সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিবার একটা বাতাস বহিয়া গিয়াছিল। সেই সকল সভাসমিতির মধ্যে আমরা এস্থলে দুইটি সভার কথা উল্লেখ করিব—একটি জমীদার সমিতি (Landholders' Society) এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (The Society for the acquisition of general knowledge)। ১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর জমীদার সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল জমীদারদিগের মঙ্গলসাধন। কিন্তু রামগোপাল ঘোষ ইহার সভাপতিপদে বরিত হইবার পূর্ব্বে এই সভা এক ইংরাজ সভাপতির নেতৃত্বে মাঝে মাঝে বিধবাবিবাহের উপায় বিধান, বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রামগোপাল ঘোষ সভাপতি হইয়া অবধি এই সভার দৃষ্টি প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।

আবার ঐ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দেরই ১৬ই মে তারিখে হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। সেই সভাতে সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় এবং সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতেও বক্তৃতা দেওয়া হইত। ছাত্রাবস্থায় অল্পস্বল্প যেটুকু জ্ঞানসঞ্চয় হইত, সেই জ্ঞানেরই অধিকার বৃদ্ধি করা এবং সভ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদন, এই দুইটিই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় দুইশত যুবক লইয়া মহাসমারোহের সহিত এই সভা হিন্দু কলেজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার সভ্যগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথেরও নাম দৃষ্ট হয়। এই সভার কার্য্যপ্রণালীতে ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা করা নিষিদ্ধ ছিল। ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে ডিরোজিওর সময়ের মত ঘটনা পুনঃসংঘটিত

হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে, হিন্দুসমাজের আবহমানকাল প্রচলিত রীতিনীতি সমূহ সভ্যদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় কলেজের অধ্যক্ষগণ ছাত্রদিগের পক্ষে উক্ত সভায় ধর্ম্মচর্চ্চা করা দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিষয়ক সভাস্থাপনের কল্পনা।

এই সময়ে (১৭৬১ শকে) সুপ্রসিদ্ধ মিশনরি ডফ সাহেব তাঁহার "India and India's missions" নামক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্ম এবং রামমোহন রায় প্রচারিত একেশ্বরবাদের উপর তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে একদিকে সভা-সমিতিতে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল, অপরদিকে ডফসাহেবের নেতৃত্বে মিশনরিগণ আড়েহাতে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে একদিকে উত্তরাধিকারসূত্রে সুদৃঢ় স্বদেশপ্রীতি স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অপরদিকে তিনি উপনিষদাদি অধ্যয়নের ফলে নিত্যই ধর্ম্মবিষয়ে উপনিষদের ইঙ্গিতব্যক্ত নানা নূতন তত্ত্ব নূতন ভাব লাভ করিতেছিলেন। সে সময়ে হিউম প্রভৃতির লিখিত যে সকল পাশ্চাত্য দর্শনগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, সে সকলের মধ্য হইতে দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত বিশেষ কোন তত্ত্ব লাভ করেন নাই, বরঞ্চ সেগুলিতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য স্বীকৃত দেখিয়া তাহা ধর্ম্মপ্রমাণস্বরূপে গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। উপনিষদাদি আলোচনার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ধর্ম্মের জন্য—ব্রহ্মতত্ত্বলাভের জন্য আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের নিকটে ঋণগ্রহণ করিতে হইবে না। এখন উপনিষৎলব্ধ তত্ত্বসকল অপর পাঁচজনকে জানাইবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথও একটি সভাস্থাপন করা স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যকালের কুসঙ্গীগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু কয়েকজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা সমভাবেই দেবেন্দ্রনাথের সহচর ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে লইয়াই একটি সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তত্ত্বরঞ্জিনী সভার প্রথম অধিবেশন।

সভার উদ্যোগ করিতে করিতেই ১৭৬১ শকের আশ্বিন (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর) আসিয়া পড়িল। এই বৎসরের ২১ আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) দুর্গাপূজার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে রবিবার প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিত্যসহচর বাল্যবন্ধুগণ, সহোদরগণ এবং অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়স্বজন লইয়া সভাটী স্থাপিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনের দক্ষিণদিকের পুষ্করিণীর (বর্ত্তমানে উদ্যানের) ধারে একটা ছোট কুঠরীতে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

সভার নিয়ম ও নামপরিবর্ত্তন।

সভ্যগণ সকলে স্নান করিয়া সভাধিরূঢ় হইলে পর দেবেন্দ্রনাথ কঠোপনিষদের একটী মন্ত্র * অবলম্বনে প্রথম ব্যাখ্যান বিবৃত করেন। ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে তাঁহার প্রস্তাবক্রমে এই সভার নাম তত্ত্বরঞ্জিনী রাখা হইল। শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রচার করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য স্থির হইল। দেবেন্দ্রনাথই এই সভার সম্পাদক হইলেন—তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সভা স্থাপনের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্বাদি বিষয়ে স্বাধীন ভাবে বক্তৃতা করিতে পাইয়া যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহার আত্মজীবনী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইয়া আচার্য্যপদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহারই প্রস্তাবক্রমে সভার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "তত্ত্ববোধিনী" রাখা হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সন্ধ্যার সময় এই সভার অধিবেশন হইত। এক-একজন সভ্য নির্দ্দিষ্টমত বক্তৃতা পাঠ করিলে পর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইত। সকল সভ্যেরই বক্তৃতা করিবার অধিকার ছিল; কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে যিনি সকলের পূর্ব্বে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হস্তে প্রদান করিবেন, তিনিই পরবর্ত্তী অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পাইবেন। এই নিয়ম থাকাতে কোন কোন সভ্য বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের শয্যায় বালিশের নীচে রাখিয়া

---

* ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে॥ অর্থ:—প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্ব্বোধের নিকটে পরলোকসাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে, পরলোক নাই, যাহারা এই মনে করে, তাহারা বারম্বার মৃত্যুর বশে আসে।

আসিতেন—অভিপ্রায় এই যে সম্পাদক মহাশয় প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারই বক্তৃতা সর্ব্বাগ্রে পাইবেন। বক্তৃতা পাঠ শেষ হইয়া গেলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের আসন হইতে উপদেশ দিতেন।

সভার প্রথম অবস্থা।

প্রথম দিবসে সভায় দশজন মাত্র সভ্য ছিলেন। এই দশজনের মধ্যে কেহই বাহিরের লোক ছিলেন না—দেবেন্দ্রনাথেরই আত্মীয় পরিজন ছিলেন। ক্রমে অবশ্য সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেও বহুকাল যাবৎ দেবেন্দ্রনাথেরই আত্মীয় পরিজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের মধ্যেই সভা আবদ্ধ ছিল। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। ১৭৬১ শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত সভা দেখিতে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হয়েন। ইহার অব্যবহিত পরে অক্ষয় বাবুও সভার সভ্যরূপে মনোনীত হয়েন। সভার খরচের নিমিত্ত প্রত্যেকের নিজ নিজ আয়ের চৌষট্টিভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টাকায় এক পয়সা করিয়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল। সভার প্রতিষ্ঠার বৎসর (১৭৬১ শকে) আয় দাঁড়াইয়াছিল ২৪৭৩ টাকা। অক্ষয়কুমার নিজেই এই সময়ে অর্থাভাবে এক আত্মীয়ের বাড়ী অবস্থিতি করিতেছিলেন। লালা হাজারীলাল দেবেন্দ্রনাথেরই পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে এই আয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি স্বহস্তগঠিত সভায় একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন—তাঁহার কোন বিষয়ে কোন কথা কেহ ঠেলিত বলিয়া বোধ হয় না।

সাম্বৎসরিক উৎসবের উদ্যোগ।

প্রথম দুই বৎসর সভ্যসংখ্যা আশানুরূপ বাড়ে নাই এবং সভার কোনই উন্নতি হইতেছে না ভাবিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে সভাটীকে আগে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করানো আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সভার সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত করা তাঁহার অভিপ্রায় হইল। এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেন—"এই তত্ত্ববোধিনী সভার দুই বৎসর চলিয়া গেল, লোকের সংখ্যা আমার মনের মত হয় না, আর একটা সভা হইয়াছে তাহা ভাল প্রকাশও হয় না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ক্রমে ১৭৬৩ শকের ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী (১৮৪১ খৃষ্টাব্দ) আসিল। এই সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এইবার একটা খুব জাঁকের সহিত সভা করিয়া সকলকে তাহা জানাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল।" এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর নানাবিধ বৈষয়িক ও সাধারণহিতকর কর্ম্মসমূহে এতটা নিযুক্ত ছিলেন যে সংসারের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিতেন না—দেবেন্দ্রনাথের উপরেই বলিতে গেলে সমুদয় সংসার পরিদর্শনের ভার পড়িয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ যে সভার সাম্বৎসরিক উৎসবটী নিজের মনের মত সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। উৎসবে প্রায় ত্রিশত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

উৎসবের বিবরণ।

তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ বর্ত্তমানে কৌতূহলপ্রদ হইবে বিবেচনায় দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

"তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে সংবাদ বড় প্রচার হইত না। অতএব আমি করিলাম কি না, কলিকাতায় যত আফিস ও কার্য্যালয় আছে, সকল আফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিলাম। কর্ম্মচারীরা আফিসে আসিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকের ডেস্কের উপর আপন আপন নামের এক একখানা পত্র রহিয়াছে—খুলিয়া দেখে, তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভায় নিমন্ত্রণ। তাহারা কখনও তত্ত্ববোধিনী সভার নামও শুনে নাই। আমরা এদিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া সভা সাজাইয়া সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এই নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে

করিয়া এক একটা লোক আসিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে * বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদেরও উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারা কি জন্যই বা আসিয়াছেন, এবং এখানে কি-ই বা হইবে। আমি ব্যগ্র হইয়া ঘড়ি খুলিয়া বারম্বার দেখিতেছি, আটটা বাজে কখন্। যেই আটটা বাজিল, অমনি ছাদের উপর হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা ও শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। আর অমনি ঘরের যতগুলি দরজা ছিল, সকলই একবারে একসময়ে খুলিয়া গেল। লোকেরা সকলেই অবাক হইয়া উঠিল। আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলাম। সম্মুখেই বেদী। তাহার দুই পার্শ্বে দশদশ জন করিয়া দুই শ্রেণীতে বিশজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের গাত্রে লাল রঙ্গের বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন। বেদপাঠ শেষ হইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। * * * আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, তদনন্তর অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ রায়। ইহাতেই রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান হয়রাণ। সকলেই আফিসের ফেরতা। হয়তো কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভাভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছেন না। কেই বা কি বুঝিল, কেই বা কি শুনিল, কিছুই না, কিন্তু সভাটা ভারি জাঁকের সহিত শেষ হইল। এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা এবং এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সাম্বৎসরিক উৎসব।"

* আমরা দেখিতেছি যে সভার সাম্বৎসরিক উৎসব দেবেন্দ্রনাথের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তং বোং সং

উৎসবে দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

নিম্নে আমরা এই সাম্বৎসরিক সভায় দেবেন্দ্রনাথপ্রোক্ত বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম, যাহাতে সেই সময়ে তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে :—

"এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই এবং এদেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খলোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠলোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্যমনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্তধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মরক্ষায় যত্ন পাইতেছি। * * * এই সভাতে সংযুক্ত হইয়া সাহায্য দ্বারা এই সভাকে বর্দ্ধিনী করিলে পরের উপকারের সহিত আপনারও উপকার হইবে। * পিতামাতার কি দুঃখ যখন স্নেহের পাত্র বিধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের শত্রুর আশ্রয়ে বাস করে। তখন পিতামাতার কি দুঃখ হয় যখন দেখেন যে স্নেহের সন্তান স্বধর্ম্মপক্ষ হইতে ত্যক্ত হইয়া অতি হীন লোকের সেবার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া কোনপ্রকারে কালযাপন করিতেছে, স্ববন্ধুবান্ধব দ্বারা ঘৃণিত হইতেছে এবং নীচলোকের দ্বারা সর্ব্বদা অপমানিত হইতেছে। তখন কি তাঁহারা এমন মনে করেন না যে এমন পুত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের মঙ্গল হইত? অতএব যাঁহারা পুত্রের শারীরিক রোগ হইতে রক্ষার

* এই উপদেশটী আমরা সকলকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। তং বোং সং

নিমিত্তে বৈদ্যকে বেতন দেন, তাঁহারদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের বালককে মানসিক পীড়া হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে এই সভার সাহায্য যত্নপূর্ব্বক করেন। এই সকল পরম হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।”

ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন প্রস্তাব।

বলা বাহুল্য যে এত জাঁকজমকের সহিত উৎসব সমাধা করিবার পরেও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই—নিমন্ত্রিত কেরাণীকুলের কে সমস্ত রাত্রিব্যাপী ধর্ম্মোৎসবে কেবলই ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার বিভীষিকা সম্মুখে দেখিয়া সভ্য হইতে সাহস করিবে? সভার সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এই অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ এক বুধবার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য দেখিতে গেলেন—দেখিলেন যে সমাজেরও অবস্থা অতি শোচনীয়। ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা নাড়িবার মত বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বেদী হইতে বক্তৃতা করিয়া যান, আর সেই বক্তৃতার শ্রোতার মধ্যে দু একটি প্রাচীন ব্যক্তি ব্যতীত শূন্য গৃহের শূন্য প্রাচীর।

অনুমান হয় যে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে উভয় সভার মিলন সাধিত হইলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে প্রচারকার্য্য হইতে পারে, ইহা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও ধারণাতে আসে নাই। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে কেবল উপাসনাকার্য্যেরই কথা লিখিত আছে, সুতরাং সেখানে উপাসনাকার্য্য নিয়মিত রূপে করা হইত। কিন্তু ট্রষ্টডীডে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কোন কথাই লিখিত নাই বলিয়া সমাজ হইতে সে কার্য্য হইতে পারে বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না, বিশেষতঃ রামমোহন রায়প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধীদিগের সংখ্যা দেবেন্দ্রনাথেরও সময়ে বড় কম ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে উভয় সভার মিলনসাধনের পর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকার্য্য যে ভাবে চলিতেছিল সেই ভাবেই চলিতে থাকিবে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা তাহার প্রচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে।

“তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক থাকা আবশ্যক, কি ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজ ধার্য্য হইল, এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দিবসে এখানে (বর্ত্তমান স্থানে) উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল।” * এক কথায়, ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা সভা হইল এবং “তত্ত্ববোধিনী সভাও এই সময় হইতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মতপ্রচারের উপায় হইল।”

উভয় সভার সম্মিলন।

কেবলমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত চাঁদার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, এবং তত্ত্ববোধিনী সভারও ব্যয় বলিতে গেলে একা দেবেন্দ্রনাথই বহন করিতেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যখন উভয় সভার মিলনের প্রস্তাব করিলেন তখন কোনই আপত্তি উঠে নাই। ১৭৬৩ শকের শেষভাগে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) এই মিলনপ্রস্তাব গৃহীত হইল এবং ১৭৬৪ শকের বৈশাখ মাসেই (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) উভয় সভার মিলন সাধিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বার বিলাত গমন করেন, সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের অভিলষিত কার্য্য সমাধা করিবার বিষয়ে বলিতে গেলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন।

সম্মিলনের ফল।

উভয় সভার এই সম্মিলনের ফল যে শুভ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান সম্বন্ধে যাঁহাদের আপত্তি ছিল, তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিতে তাঁহাদের আপত্তি রহিল না, এবং যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদানে অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অবসর

* দাসী, নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে উভয় দিক হইতেই ব্রাহ্মসমাজেরই দলপুষ্টি হইতে লাগিল। এই মিলনের পর বৎসর দুই তিনের মধ্যে দেশের অনেকগুলি গণ্যমান্য ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী সভায় এবং প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। মিলনের পর তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রধানতঃ বেদান্ত শাস্ত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যানাদি প্রদত্ত হইত এবং তত্ত্ববোধিনী সভাও প্রধানতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করিত বলিয়া উভয় সভারই সভ্যগণ সাধারণতঃ বৈদান্তিক নামে অভিহিত হইতেন। এই মিলনের ফলে ব্রাহ্মসমাজের জাতীয়ভাব বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং উত্তরকালে ইহাই অনেক বাদবিতণ্ডা ও গোলযোগের কারণ হইয়াছিল।

১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভার আয় হইয়াছিল ৩৪৭৬ টাকা। নামে মাত্র নিয়ম ছিল যে সভ্যগণ নিজ নিজ আয়ের চৌষট্টিভাগের একভাগ চাঁদা দিবেন, কিন্তু যতদূর বুঝা যায় সকল সভ্য সে নিয়ম প্রতিপালন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমে এই সভার চাঁদা মাসিক চার আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তাহাও অধিকাংশ সভ্যের নিকটে আদায় করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অগত্যা সভার আয় হইতে ব্যয় সকল সময়ে সংকুলান হইত না; যাহা কিছু অকুলান হইত, দেবেন্দ্রনাথই তাহা পূর্ণ করিতেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে সভার কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথেরই প্রস্তাবসমূহ অধিকাংশ স্থলেই স্বীকৃত হইত।

কল্যাণের পথ।

(শ্রীশরৎকুমার রায়)

তোমার আমার যে বুদ্ধি তাহাকে বুদ্ধিই বলা চলে না। এই বুদ্ধির কোনো-একটা আশ্রয়ই নাই। বুদ্ধি আজ যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিল কাল তাহা মন্দ বলিয়া ত্যাগ করিল। চঞ্চল বুদ্ধি আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরিয়া মরে, কোনোখানেই শান্তি পায় না। এমন বুদ্ধি যাহার, তাহার পক্ষে ঈশ্বর ধ্যান অসম্ভব। ধ্যান ভিন্ন মন শান্ত হয় না; আর যার মন শান্ত নহে সে কেমন করিয়া সুখ লাভ করিবে?

এই জন্য যে সুখ শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও ভক্তবাঞ্ছিত তাহা আমাদের কপালে ঘটে না। আমরা খোসাভুষি লইয়া নাড়াচাড়া করি, শস্যের খোঁজই রাখি না। আমাদের মন এক দণ্ড স্থির থাকে না; সে যেন ঢেউয়ের উপরের ছোট্ট ডিঙ্গির মত উথালিপাথালি আছাড় খাইতেছে। প্রবৃত্তির ঢেউয়ের উপর বেচারা মন এমনই দোল খাইতেছে। তাহার সোয়াস্তি নাই।

এমন হইবার কারণ এই যে কল্যাণের পথটি বড় খাড়াই। সেখানে মুক্তির হাওয়া থাকিলেও পথ চলার সংগ্রাম আছে। পথের রকম দেখিয়াই আমোদপ্রিয় অলসেরা বলে—"না, আমরা এত ক্লেশ সহিতে পারিব না।" দ্বিতীয় পথটি প্রবৃত্তির পথ, বড়ই সুগম, একটু একটু করিয়া নীচু হইয়া শেষে যাইয়া মরণসাগরে পড়িয়াছে। এই পথে মনকে টানিয়া লইবার নানা আয়োজন আছে; পাঁচ রকমের হাল্কা মুখরোচক আমোদের গন্ধ পাইয়া মন এই দিকে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে। এই হাল্কা সুখের মধ্যে মন একবার ডুবিলে তাহার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠে। কাম্য বিষয়গুলি তখন তাহার পাওয়াই চাই। পাওয়ার পথে কোনো বাধা আসিলে তাহার ক্রোধ জন্মে; তখন তাহার হিতাহিতবিবেকবুদ্ধি লোপ পায়; শাস্ত্রের অনুশাসনের দিকে তখন সে ফিরিয়াও চায় না; বুদ্ধি তখন বিকৃত হয়, সে তখন মরণের দিকেই ছুটিয়া চলে। ভোগের রাস্তার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সংসারের বেশি সংখ্যক লোকই এই সোজা রাস্তার যাত্রী সুতরাং এই পথের সংবাদ সকলেরই জানা আছে।

কিন্তু যে পথ উর্দ্ধমুখীন হইয়া ভূমার দিকে গিয়াছে সেই পথের সন্ধান কে আমাদিগকে কৃপা করিয়া জানাইবেন? "দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" "ঋষিরা কহেন সেই পথ দুর্গম।" হাঁ, এই পথ দুর্গম হইতে পারে; দুর্গম হইলেও এই পথ ধরিয়াইতো আমাদিগকে চলিতে হইবে। কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা এই শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা কি কি পাথেয় লইয়া যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন? তাঁহাদের চলার ইতিহাস জানার জন্য আমাদের মন কৌতূহল অনুভব করে। বড়র সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, বিরাটের মধ্যে যাঁহাদের মন ডুবিয়া রহিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করিলে এই প্রশ্নের

উত্তর একপ্রকার প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু এমন মহাত্মার সঙ্গলাভ কেবল মাত্র ভাগ্যবানেরই কপালে ঘটিয়া থাকে। এমন দুর্লভ জীবন যিনি লাভ করিয়াছেন বাহিরের প্রলোভন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিবে কেমন করিয়া? তাঁহার মনকে তিনি এমনভাবে স্ববশে আনিয়াছেন যে ইচ্ছামাত্রেই কচ্ছপের শুণ্ডের মত গুটাইয়া যখন খুসি ভিতরে লইয়া যাইতে পারেন। রসের সমুদ্রের মধ্যে যাঁহার নিত্য বিহার বাহিরের তুচ্ছ সুখের দিকে তাঁহার মন যাইবে কেন? তিনি যে আপনাতে আপনি তুষ্ট হইয়া আছেন।

কিন্তু এমন মানুষতো লক্ষের মধ্যে একজনও দেখা যায় না। দেখা যায়; সংসারের তুচ্ছ সুখ কেবল মাত্র সাধারণ মানুষকে নহে, বড় বড় বিদ্বানকেও নাকে ধরিয়া ঘুরাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সুখলালসায় মানুষের মন ওলট পালট হইয়া নাচিতে থাকে। যাঁহারা আপনাদের সংগ্রামময় জীবন লইয়া বড়র দিকে ছুটিয়াছেন, উঠিয়া পড়িয়া সুখে দুঃখে কল্যাণের পথেই চলিতেছেন এমন মানুষ সংসারে বিরল নহে। তাঁহারা বড়র মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বড়র হাওয়া তাঁহাদের গায়ে লাগিয়াছে। কল্যাণপথের এই অগ্রগামী যাত্রীদের জীবন সাধারণ মানুষদের আশার স্থল। তাঁহারা বলেন, কল্যাণের পথ পার্ব্বত্য চড়াইর মত দুরারোহ, বেশি বোঝা লইয়া এই পথ দিয়া চলা বড় শক্ত, দেহ ও মন হাল্কা হইলেই চলা অনায়াস হয়, খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে হয়, কারণ একবার পা টলিলে অনেকটা নীচে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এই পথে চলার আনন্দও আছে, নীচেকার একটা ধাপ ছাড়াইয়া একটু উপরে উঠিলেই মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়া পাওয়া যায়, যত উর্দ্ধে উঠা যাইবে ততই নূতন নূতন দৃশ্য নূতন নূতন আনন্দ দান করিতে থাকিবে এবং যাহা এতকাল চোখে একান্ত বড় বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইতে থাকিবে; আর একটু উপরে উঠিলেই অমৃত লোকের অনির্ব্বাণ আলোকরশ্মি নয়নকে মুগ্ধ করিবে।

মাধ্যাকর্ষণ যেমন উপরের জিনিসকে নীচের দিকে টানিয়া নামায় পাপ তেমনি কল্যাণপথ হইতে মানুষকে বিনাশের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে। কিন্তু মানুষ যাবৎ আপনার পুণ্যের প্রতিষ্ঠানভূমি হইতে স্বয়ং বাহির হইয়া পাপের এলেকায় আসিয়া না পঁহুছিবে তাবৎ পাপ তাহাকে স্পর্শই করিতে পারিবে না। পাপের দশটা মুণ্ড ও কুড়িটা হাত থাকিতে পারে তবু এমন দুর্ব্বল যে মানুষরূপী সীতা তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে না আসিলে সে তাঁহাকে ছুঁইতেই পারে না। তবু মূঢ় মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া পাপের মধ্যে ছুটিয়া যাইয়া আপনা-আপনি ধরা দিয়া থাকে।

মানুষের আশা এই যে তাহার মধ্যে অনন্তের আহ্বান আছে। পাপের সৈন্যেরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া কিছুদিন নাচাইতে পারে; পাপের বাহিনীদের কলকোলাহলে হয়তো তাহার কানে ভিতরের আহ্বান কিছুদিন পঁহুছিবে না। কিন্তু একদিন সে পাপের দুর্গম দুর্গমধ্য হইতেই কাঁদিয়া উঠিবে। সেদিন পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য পাপীর বন্ধু ভগবান অসাধ্য সাধন করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ভগবান যেদিন তাহার প্রিয় মানবসন্তানের প্রাণের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন সেইদিন পাপের সকল আড়ম্বর, সকল জাঁকজমক ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেই দুইটি পথ আছে;—একটি শ্রেয়ের পথ আর একটি প্রেয়ের পথ। প্রেয়ের পথ অসংযত ভোগের দ্বারা কলুষিত, আপাত মধুর, কিন্তু পরিণামে ক্লেশকর। দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ শ্রেয়ের পথ, সঙ্কীর্ণ প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ হইয়া অনন্ত আনন্দে গিয়া পঁহুছিয়াছে। যাঁহাকে আমাদের চিরসুহৃদ, চিরনির্ভর বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে—শ্রেয়ের পথের শেষে আমাদের জন্য তিনিই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি যেমন আমাদের সকলের পিতা মাতা বন্ধু—তেমনি আবার প্রত্যেক মানবসন্তানেরই বিশেষ বন্ধু। আমার বন্ধু আমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, আমি পথ দুর্গম বলিয়া তাঁহার কাছে যাইব না? না, তাহা হইতেই পারে না, এই দুর্গম পথ ধরিয়া আমার বন্ধুর বাড়ী যাত্রা করিবই করিব। তাঁহাকে না পাইলে যে আমার চলিবে না।

নীহারিকা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রহ্মতত্বের আলোচনায় মানুষ দুই দিক থেকে সহজে অগ্রসর হতে পারে—বাহির এবং অন্তর। শিশু যেমন প্রথম প্রথম বাহিরের জগত থেকেই, বহির্জ্জগতের ঘাতপ্রতিঘাত থেকেই আপনার অন্তর্জ্জগতের পরিচয় পেতে থাকে, আপনার মন ও আত্মাকে চিনতে থাকে, বিষয় থেকে বিষয়ীকে পৃথক করে দেখতে শেখে, তেমনি মানবজাতিও বাহিরের আকাশে বিশ্বস্রষ্টার সুনিপুণ লেখনীর পরিচয় পেয়ে তবে আত্মার অন্তরে ব্রহ্মতত্বের অনুধ্যান করতে শিক্ষা করে। উপনিষদের ঋষি তাই বলেছেন যে, "যে তেজোময় পুরুষ এই আকাশে বর্ত্তমান এবং যে তেজোময় পুরুষ এই আত্মাতে বর্ত্তমান।"

অন্তরাত্মা অপেক্ষা বহিরাকাশে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা ঈশ্বর নিজেই সহজ করে দিয়েছেন। একটী বালুকণা কোথা থেকে এল, কেন এল, এই সকল ভেবে কূলকিনারা পাইনে। একটা গাছ আমাদের জন্য কেমন ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে, কেমন সুমিষ্ট ফল দিচ্ছে, একসঙ্গে কেমন সহজে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করছে, এক নদী আপনার করুণাস্রোত ঢেলে দিয়ে জগতের কত শত সহস্র লক্ষকোটী প্রাণীর লক্ষকোটী যুগ ধরে প্রাণধারণের উপায় হয়ে চলেছে ; আমাদের বাহিরের এই সকল বস্তুর উপকারিতা ও উপযোগিতা ভাবলেই তো আমরা আত্মহারা হয়ে যাই। তখন সীমাবদ্ধ জগতের উপর অসীমের রূপ প্রতিবিম্বিত দেখে সেই বিশ্বপাতার চরণে বারবার প্রণিপাত করি। কিন্তু বহিরাকাশের যে সকল বস্তু আমাদিগকে অসীমের রূপ সহজে প্রদর্শন করতে পারে, তাদের মধ্যে আকাশের সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের কাছে অন্য কোন পদার্থেরই তুলনা হয় না।

প্রতিদিন প্রভাতে পূর্ব্বদিক অরুণরাগরঞ্জিত করে সূর্য্য উদিত হয়, তারপর ক্রমেই সে মাথার উপরে উঠতে উঠতে প্রচণ্ড তেজ বিকীর্ণ করতে থাকে, আবার সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিক স্বীয় অস্তমিত মহিমায় রঞ্জিত করে সাগরের পরপারে লুক্কায়িত হয়ে পড়ে। এই সকল দেখে মানবের অন্তরে সূর্য্যের অন্তরাত্মা দেবতার বিষয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেটা কি কিছু আশ্চর্য্য ? প্রতিদিন রাত্রিতে সুশীতল চন্দ্রমা স্বীয় সুধাধারা ঢালতে ঢালতে গগনমণ্ডল জ্যোৎস্নাধবলিত করে তোলে। তাহা দেখতে দেখতে সেই মধুময় চন্দ্রমার অন্তরে থেকে যিনি চন্দ্রমাকে নিয়মিত করছেন, মানুষের অন্তরে যে সেই চন্দ্রমার অন্তরাত্মার বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে সেটা একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। প্রতিদিন রাত্রে অগণ্য গ্রহতারকাগণ শতলক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে গগনমণ্ডলকে এক মহা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করে, আবার প্রভাতের আগমনে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আকাশের গভীর অন্তরে লুকিয়ে পড়ে। এই যে নিয়মে নিয়মে ছন্দে ছন্দে গ্রহনক্ষত্রগণ প্রতিদিন একই ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, ইহা থেকে সেই নিয়মের নিয়ন্তাকে অন্বেষণ করবার ইচ্ছা মানুষের মনে জাগরূক হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রত্যেক বালুকণা, প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতা, মাটীর প্রত্যেক পরমাণুর তত্ত্ব আলোচনা করলেও আমরা সেই সকলে বিশ্বপিতার হস্ত উপলব্ধি করতে পারি বটে, কিন্তু আকাশের সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকাগণ আমাদের হৃদয়কে যেমন সহজে তাঁর বিষয় জানবার পথে আকর্ষণ করে, এই পৃথিবীর মাটী গাছ প্রভৃতি জিনিসগুলি তেমন সহজে তাঁকে জানবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিতে পারে না। তার কারণ এই যে পৃথিবীর জিনিসগুলিকে আমরা এতই স্থির অপরিবর্ত্তনীয় বলে মনে করি যে তাদের বিষয়ে আলোচনা করে তাদের স্রষ্টা ও পাতার প্রতি মনটাকে তুলে ধরা আবশ্যকই মনে হয় না। কিন্তু অত বড় আকাশে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতির নিরবলম্বভাবে থাকা এবং প্রতিদিন যথানিয়মে তাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবই তাদের কারণান্বেষণে আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, আর তখন কাজেই আমাদের দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা সেই সকলের মূলের প্রতি স্বভাবতই ধাবিত হয়। এই কারণে জ্যোতির্বিদ্যাই সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আদিতে উন্নতি লাভ করেছিল।

পুরাকালে জ্যোতির্বেত্তাগণ জ্যোতিষ্কমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের কাছে পুরাকালের তত্ত্ব সকল নিতান্তই ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে নীহারিকাবাদ বোধ হয় নব্যযুগের জ্যোতির্বেত্তাদের মনোযোগ সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে। জগতের মধ্যে সৃষ্টিকার্য্য যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি এবং কখনও সম্পূর্ণ হবার আশাও নেই এই আশ্চর্য্য বার্ত্তা নব্যজ্যোতিষের নীহারিকাবাদ ঘোষণা করে দিয়েছে। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রে আছে যে জগতসৃষ্টির কার্য্য শেষ হয়ে গেছে—এই নীহারিকাবাদ সেই মতকে ভ্রান্ত বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। এখনও অগণিত যুগ ধরে বিশ্বজগত নূতন জীবনের পথে চলতে থাকবে। নব্যজ্যোতিষ এখন প্রায় স্থির সিদ্ধান্তরূপে প্রমাণ করেছে যে আজ পর্য্যন্ত অগণিত তারকারাজির সত্যসত্য সৃষ্টিকার্য্য চলছে। এখন সেই এক একটি তারা থেকে যে কত গ্রহের উৎপত্তি হতে পারে, আবার সেই এক একটি গ্রহ থেকে যে কতশত চন্দ্র জন্মগ্রহণ করতে পারে, কে তাহার ইয়ত্তা করবে ? ভাবলে সত্যই স্তম্ভিত হয়ে পড়তে হয় যে এইভাবে আজ পর্য্যন্ত আমাদের এই সৌরজগতের মত কতশত জগতের সৃষ্টিকার্য্য অবিশ্রামে চলেছে।

শতাব্দীরও উপর হবে, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতির্বিৎ লাপ্লাস জগতের সৃষ্টি যে কি রকমে হতে পারে সেই বিষয়ে একটী সম্ভবপর অনুমান প্রকাশ করেন। এই অনুমানের নাম পণ্ডিতেরা নীহারিকাবাদ দিয়েছেন। লাপ্লাস তাঁর এই মতটীকে কোন গণিতের সিদ্ধান্তের উপর অথবা সেই সময়ের পণ্ডিতদিগের জ্ঞাত মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি অন্য কোন সিদ্ধান্তেরই উপর কষেমেজে দাঁড় করান নি। এটীকে তিনি নিতান্তই অনুমান বলেই

প্রকাশ করেছিলেন—অনুমানটী অবশ্য খুবই ভড়কালো রকমের হয়ে ছিল। কাজেই এর সত্যাসত্যতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। ফলে দেখা যায় যে একবার বা জ্যোতির্বেত্তাগণ এই মতটীকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, একবার বা এই মতকে মোটেই আমল দেন নি।

লাপ্লাসের সময়ে তেমন ভাল দূরবীন ছিল না এবং বর্ণচ্ছত্রবিশ্লেষণ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই আবিষ্কৃত হয় নি, তাই তিনি তাঁর অনুমানের সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেন নি। এখন তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে বোধ হয়। এ কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারা যায় যে বর্ত্তমানে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ফলে নীহারিকাবাদ জ্যোতিষের অনুমানরাজ্য থেকে সিদ্ধান্তের রাজ্যে এসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। লাপ্লাসের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যান্টও জগতসৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতই ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু লাপ্লাস এটীকে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের বোঝবার সুবিধা করে দিয়েছেন বলে এটী তাঁরই নামে চলে এসেছে।

লাপ্লাসের সিদ্ধান্তকল্প এই অনুমানের কথা মোটামুটি এই:—সৌরজগতের প্রত্যেকের গতির (অবশ্য তখন যে কয়েকটীর গতির বিষয় জানা ছিল) মুখ একই দিকে দেখা গিয়েছিল। গ্রহগণও সূর্য্যের চারধারে যে মুখে ঘুরছে, চন্দ্রগণও স্বীয় স্বীয় গ্রহগণের চারদিকে সেই একই মুখে ঘোরে। আবার সৌরজগতের যে কোন অংশ স্বীয় মেরুদণ্ডের বা অক্ষের চারদিকে ঘোরে, তারও গতি সেই একই মুখে। তার উপর দেখা যায় যে গ্রহগুলি আকাশেতে এদিক ওদিক যথেচ্ছভাবে বিস্তৃত না হয়ে প্রায় একই তলে (plane) অথবা তারই কাছাকাছি অবস্থিত। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদগণও জানতেন যে সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহগণ রাশিচক্রের বলয়ের অন্তর্গত রবিমার্গেরই নিকটে দাঁড়িয়ে আছে—কোনটীই আকাশের অপর কোন অংশে উন্মার্গগামী হয় না। উপগ্রহ বল অথবা গ্রহবেষ্টক অঙ্গুরী বল, সেগুলিও একই সমতলে অবস্থিত; আবার বিভিন্ন জ্যোতিষ্কদের বিষুববৃত্ত বা দৈনিক আবর্ত্তনের তলও প্রায় একই সমতলে অবস্থিত।

এখন, এই সকল ঘটনা অকারণ সংঘটিত হতে পারে না। এগুলির তবে কারণ কি? জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে এরূপ পারিবারিক সাদৃশ্য আসে কোথা হতে? তাদের মধ্যে তবে কি কোন সংযোগ আছে অথবা মূল একই কারণ থেকে তাদের সকলের উৎপত্তি হয়েছে? বর্ত্তমানে তো তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনই সংযোগ দেখা যায় না। কাজেই অনুমান হয় যে এক সময়ে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই পরস্পর সংযোগ ছিল—মনে হয় যে তারা এক সময়ে এক আবর্ত্তনশীল মহাপিণ্ডেরই অংশ ছিল; এই রকম আবর্ত্তমান পিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তার অংশগুলিরও আবর্ত্তনমুখ একই দিকে থেকে যাবে। কিন্তু এই মহা পিণ্ডেরই ভিতরে সমগ্র সৌরজগতের উপাদান নিহিত থাকিলেও, সেগুলি নিশ্চয়ই অতি সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে বর্ত্তমান ছিল, কারণ তাহা না হলে সেই মহাপিণ্ড শনৈশ্চর গ্রহ পর্য্যন্ত অথবা তাহাও অতিক্রম করে আকাশে বিস্তৃত থাকতে পারত না। এত বড় আয়তনের পদার্থ কখনই কঠিন বা জলের মত তরল ছিল বলে বোধ হয় না—সম্ভবত ইহা মারুত (Gaseous) আকারেই ছিল।

এরকম অনুমানের প্রমাণ কি? বর্ত্তমানে কি আকাশে এই রকম সুবৃহৎ আবর্ত্তমান মারুত পিণ্ড আছে? এরই উত্তরে বলা যায় যে আকাশে নীহারিকা-পুঞ্জ আছে—তাদের কতকগুলি মারুত আকারে আছে এবং অন্তত কতকগুলিকে আবর্ত্তমান অবস্থায় দেখা যায়। লাপ্লাস এইটী একেবারে ঠিক করে জানতে পারেন নি, কিন্তু ইহা অনুমান করেছিলেন। লর্ড রসের (Lord Rosse) দূরবীনের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম কুণ্ডলিত নীহারিকা স্পষ্টরূপে দেখা গিয়েছিল। আর, সম্প্রতি অ্যাণ্ড্রমীডা (Andromeda) মণ্ডলের (উত্তর ভাদ্রপদের নিকটবর্ত্তী) নীহারিকার ফোটোগ্রাফ থেকে দেখা গিয়েছে যে এই নীহারিকাপিণ্ডটীও আশ্চর্য্য রকমের ঘূর্ণীপাক খাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, একটী প্রকাণ্ড আবর্ত্তমান মারুতপিণ্ড যদি যুগযুগান্তর ধরে ঠাণ্ডা হতে থাকে, আর ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধতে থাকে, তবে তার কি অবস্থা হবে? এটী একটী গণিত সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম সমস্যা—এই সমস্যাটী আজ পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপ আলোচিত হয় নি। অনেকের বিশ্বাস যে এই সমস্যাটীর সম্পূর্ণ মীমাংসা হলেই সৌরজগতের ইতিহাস সহজে উদ্‌ঘাটিত করা যেতে পারবে।

লাপ্লাস কল্পনা করলেন যে এই মারুতপিণ্ডটী ক্রমাগতই বেশী তাড়াতাড়ি ঘুরছে এবং তার ফলে সঙ্কুচিত হচ্ছে। ঘূর্ণায়মান কোন পদার্থ যদি সঙ্কুচিত হতে থাকে, অথচ আবর্ত্তনের আদিম শক্তি ধরে রাখে, তাহলে কোন প্রকার বাধা না পেলে সেটা যতই সঙ্কুচিত হতে থাকবে ততই বেশী থেকে বেশী জোরে ঘুরতে থাকবে। গণিতীগণ ইহাকে "বেগের ক্রমিক ঝোঁক" বলে নির্দ্দিষ্ট করেন। সমগ্র পিণ্ডটী মাধ্যাকর্ষণ বা অণুগণের অন্যোন্য আকর্ষণের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু উহার সমস্ত

কয়েকটী নীহারিকার প্রতিকৃতি।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮৩০ শক আশ্বিন নীহারিকা প্রবন্ধ দেখ।)

চিত্র ১—অঙ্গুরীসহ শনৈশ্চর গ্রহ।

চিত্র ২—বহির্গমোন্মুখ অংশ সহ কুণ্ডলিতাকার নীহারিকা।

চিত্র ৩—সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নীহারিকা।

চিত্র ৪—মীন রাশির নীহারিকা।

চিত্র ৫—মীন ও কুম্ভ রাশির মধ্যবর্ত্তী নীহারিকা
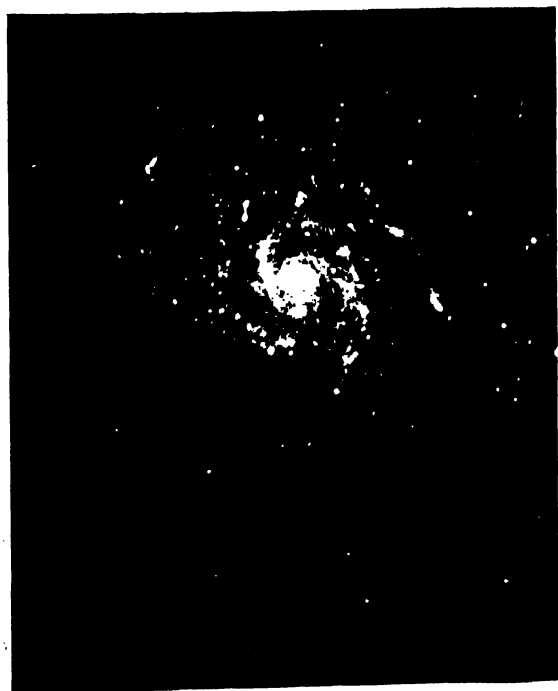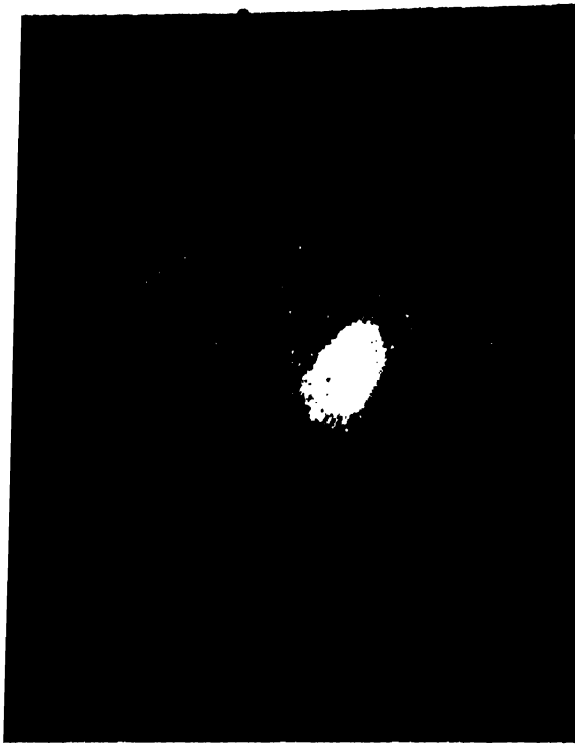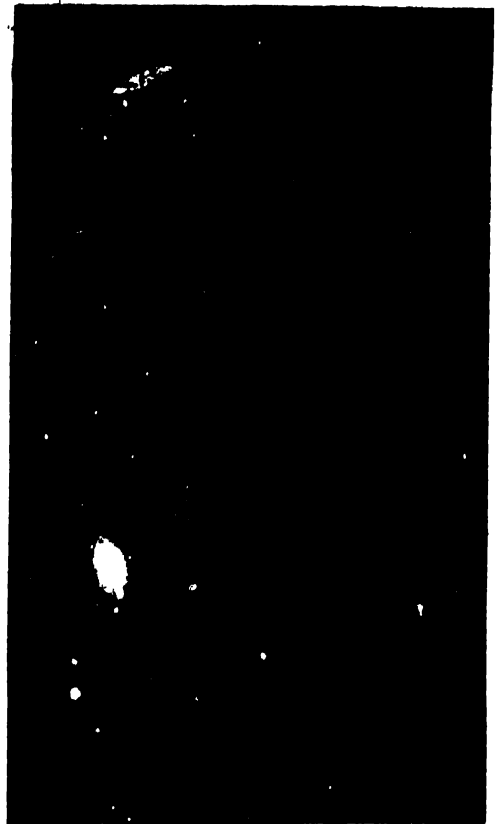
চিত্র ৬—সপ্তর্ষিমণ্ডলের সুপ্রা নীহারিকা
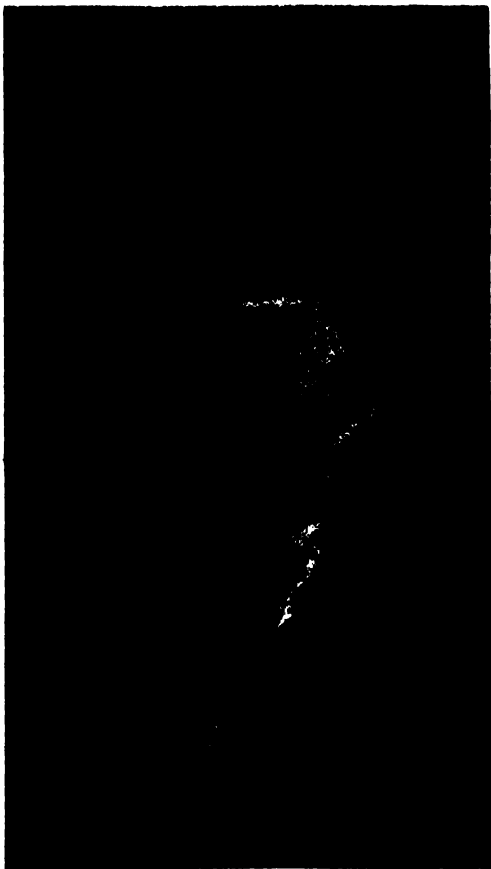
চিত্র ৭—হংসমণ্ডলের নীহারিকা

চিত্র ৮—বীণামণ্ডলের নীহারিকা

চিত্র ৯—ডমরু-আকৃতি নীহারিকা

অণুই আবর্ত্তনের ঘূর্ণী রাস্তায় চলছে বলে সেগুলি ছুটকে বেরিয়ে যেতে চায়, কেবল সেই কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রানুগ শক্তির সামান্য আধিক্যই অণুগুলিকে ধরে রাখে এবং নীহারিকাটীকে জমাট বাঁধবার দিকে নিয়ে যায়। অংশগুলির পরস্পরের আকর্ষণের বিরুদ্ধে ঘূর্ণীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি দণ্ডায়মান হয়। শেষকালে এমন একটী স্থানে পৌঁছান যায় যেখানে ঐ দুই শক্তি সমবলে কাজ করে। কাজেই নীহারিকাপিণ্ডটীর ঐরূপ স্থান-নির্দ্দেশক রেখাটীর বাহিরে যে অংশটী থাকবে সেটী উভয় শক্তির সমতোলের উপর দাঁড়াবে। সে অংশটী আর মূল পিণ্ডের সঙ্গে ঘুরতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে থাকবে এবং মূলপিণ্ডের অবশিষ্ট অংশ সেই পিছিয়ে-পড়া অংশকে ছেড়ে দিয়েই সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তখন সেই পিছিয়ে পড়া অংশটী অঙ্গুরীতে পরিণত হয় এবং মূল-পিণ্ডের নাভিটী (nucleus) একটী কেন্দ্রের অভিমুখে সঙ্কুচিত হতে হতে অঙ্গুরী থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আবার কিছুকাল পরে পরে সেই একই প্রণালী অনুসরণ করে মূলপিণ্ড হতে অঙ্গুরীর পর অঙ্গুরী উৎক্ষিপ্ত হয়। এই অঙ্গুরীগুলি কি করে? যদিও আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় শক্তির সাম্যবশত উৎক্ষিপ্ত অংশ বলতে গেলে একটী নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে মূলপিণ্ড থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই উহাতে যে আবর্ত্তনগতি নিহিত হয়েছিল, সেটা তো সেই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করতে পারে নি, কাজেই উৎক্ষিপ্ত হবার সময়ে উহাতে যে আবর্ত্তনগতি ছিল, সেই গতি নিয়েই উহা ঘুরতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন এই যে এই উৎক্ষিপ্ত অংশগুলি অঙ্গুরীর আকারে বরাবর থাকবে কি না? সহজেই বোঝা যায় যে, যে অঙ্গুরীর সকল দিক ঠিক সমান থাকবে, যার কোন দিকে আকারে বা পরিমাণে কম বেশী থাকবে না, সেইটীই বরাবর অঙ্গুরী আকারেই থেকে যাবে; আর, যদি কোন অঙ্গুরীর কোন দিকে কোন বিষয়ে অসমান থাকে, তাহলেই তার ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাহাও আবার বিভিন্ন অসমান খণ্ডে ভাঙ্গা সম্ভব, কাজেই এটা খুব সম্ভব বলে মনে হয় যে সেই খণ্ডগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে—ছোট অংশ বড় অংশে গিয়ে পড়বে। ঐ নবগঠিত ঘূর্ণায়মান খণ্ড তখন পর্য্যন্ত একটা আবর্ত্তনশীল মারুত পিণ্ডই রয়েছে এটা যেন না ভুলি। এই পিণ্ডই আবার, যে নাভি-পিণ্ড থেকে ইহা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই আদিম নাভি-পিণ্ডেরই মত শীতল হয়ে সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুরীরাশি উৎক্ষিপ্ত করতে থাকবে। কোন নাভি-পিণ্ড ক্রমশ যতই ক্ষুদ্রাকৃতি হতে থাকে, তার আবর্ত্তন বেগ ততই বেশী বাড়তে থাকে। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যে অঙ্গুরীগুলি যত শেষে উৎক্ষিপ্ত হবে, সেই অঙ্গুরীগুলি পূর্ব্বোৎক্ষিপ্ত অঙ্গুরী অপেক্ষা অধিকতর বেগে ঘুরতে থাকবে। সর্ব্বশেষে যে নাভিপিণ্ড অবশিষ্ট থাকবে, সেটি সব চেয়ে বেশী বেগে আবর্ত্তিত হবে।

সমগ্র আদিম পিণ্ডের নাভি সঙ্কুচিত হতে হতে বর্ত্তমানে সূর্য্যে পরিণত হয়েছে—এই সূর্য্য স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পঁচিশদিনে একবার আবর্ত্তিত হয়। যে সকল অঙ্গুরী ইহা কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল সেগুলি এখন গ্রহে পরিণত হয়েছে—কতকগুলি বড় এবং কতকগুলি ছোট। যেগুলি প্রথম প্রথম ছুটকে বেরিয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে সূর্য্যের চারিধারে ঘোরে এবং যেগুলি শেষাশেষি বেরিয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ঘোরে। আবার এই সকল গ্রহদের মারুত পিণ্ড থেকে যে সকল অঙ্গুরী উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল সেগুলি এখন উপগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কেবল শনৈশ্চর গ্রহের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনশীল একটি অঙ্গুরী আজ পর্য্যন্ত ভেঙ্গেচুরে উপগ্রহে পরিণত হয় নি। আর একটি অনুরূপ অঙ্গুরী গ্রহ হতে হতে রয়ে গিয়ে গ্রহকবলয়ে (অতি ক্ষুদ্র গ্রহ-সমষ্টিতে) পরিণত হয়ে সূর্য্যকে বেষ্টন করে আছে। এইতো গেল ক্যাণ্টকথিত এবং লাপ্লাস ব্যাখ্যাত নীহারিকাবাদের মোটামুটি কথা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলে এসেছি যে জোরালো দূরবীনের অভাবে লাপ্লাস তাঁর অনুমানের সমর্থক কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নি। আকাশে অবশ্য মেঘের মত ধোঁয়াটে কতকগুলি পদার্থ দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু ইহা স্থির নির্ণীত হয় নি যে সেগুলি তাঁর অনুমিত নীহারিকা জাতীয় কোন পদার্থ কিম্বা দূরবর্ত্তী কোন তারকাপুঞ্জ। অবশেষে স্যার উইলিয়ম হগিনসের হাতে বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বের অনুমান নিঃসন্দেহরূপে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে—মেঘের মত পদার্থগুলি সত্যই সুবৃহৎ মারুত পিণ্ড বা নীহারিকাপুঞ্জ। তার উপর আবার, দূরবীণের সঙ্গে ফটোগ্রাফির ক্যামেরা সংযুক্ত করবার ফলে এই আশ্চর্য্যতর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এই সকল নীহারিকাপুঞ্জের কতকগুলির আকার এ রকম যে তাহা দেখে স্বভাবতই মনে আসে যে সেগুলি সত্যই আবর্ত্তমান অবস্থায় রয়েছে এবং প্রকৃতই সেগুলি থেকে অঙ্গুরীরাশি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এইরূপ নীহারিকা ২ সংখ্যক চিত্রে সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। এর কুণ্ডলিত আকার দেখলেই স্পষ্ট মনে হয় যে এই আকার আবর্ত্তনগতির ফল। নিম্নাংশে প্রদর্শিত অংশটি মূল পিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মুখে এসেছে।

কালক্রমে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নূতন তারকার নাভি হয়ে দাঁড়াবে। এটি যে কত সহস্র বা কোটি বৎসরে একটি পরিণত তারকা হতে পারবে তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত। আমাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট যে আমাদের মন সেই সুদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একটি উজ্জ্বল তারকায় পরিণতি অন্ততঃ কল্পনাতেও স্থান দিতে পারে।

বর্ত্তমানকালে নীহারিকা পর্য্যবেক্ষণে ও জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারে ফটোগ্রাফি বড়ই সহায়তা করছে। পূর্ব্বে ছবি তোলাই ফটোগ্রাফির প্রধান কার্য্য ছিল। কে জানিত যে ইহা দূরবীক্ষণেরও একপ্রকার অগোচর জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব নির্ভুলরূপে সপ্রমাণ করতে সক্ষম হবে? নীহারিকার কতকগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট গঠন মানবচক্ষু খুব ভাল দূরবীনেরও সাহায্যে দেখতে পায় না। মানুষ কোন পদার্থের উপর বেশীক্ষণ চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারে না—রাখলে চক্ষু অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন দ্রষ্টব্য পদার্থটি ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু ফটোগ্রাফের খুব সগাড় শুষ্কফলক কখনই সেরূপ অবসন্ন হয় না। ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে যে ছাপ প্রাপ্ত হয় সেটা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রাপ্ত ছাপের উপর আরও চেপে বসে। দূরবীন-সংযুক্ত একটি ক্যামেরার ভিতরে এইরূপ একটি শুষ্কফলক আকাশের যে কোন বিন্দুর দিকে অনায়াসে একটানে অনেক ঘণ্টা উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। তারপর তুমি ইচ্ছামত টুপি দিয়ে ক্যামেরা বন্ধ করে দিলে, আবার সুবিধামত পরবর্ত্তী কোন পরিষ্কার রাত্রে সেই বিন্দুর দিকে ফলকটা উন্মুক্ত রাখলে। এই রকম করে ফলকটা একই বিন্দুর দিকে পরে পরে অনেক পরিষ্কার রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে। তার ফলে, খুব ভাল দূরবীনেরও সাহায্যে যে জ্যোতিষ্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই জ্যোতিষ্ক ও তার খুঁটিনাটি সকল বিবরণ কাচফলকের চিত্রে ফুটে উঠবে।

এইরূপ জ্যোতিষিক ফোটোগ্রাফির সাহায্যে যে সকল নীহারিকা চিত্র পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে সপ্তর্ষি মণ্ডলের এবং মীনরাশির নীহারিকাতে দেখা যায় যে মূল পিণ্ড থেকে কতকগুলি অংশ ছটকে বেরোচ্ছে। ৩ সংখ্যক চিত্রে সপ্তর্ষির নীহারিকা দেখানো হয়েছে, তার উপরের বাঁদিকে একটা এবং ডানদিকে দুইটা, এই তিনটির বিচ্ছিন্ন হওয়া বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই নীহারিকাটী ঠিক আমাদের মাথার উপরে দৃষ্ট হয়। মীনরাশির নীহারিকাটী আমাদের দৃষ্টিতে একটু কোণাচে ভাবে আছে চিত্র ৪।

উত্তরভাদ্রপদের নিকটবর্ত্তী এবং মীন ও কুম্ভরাশির মধ্যবর্ত্তী নীহারিকাকে আমরা কোণাচেভাবেই দেখতে পাই (চিত্র ৫)। এর চিত্র দেখে মনে হয় যে, উপরে ও নীচে দুইদিকে দুইটি পিণ্ডাংশ মূল পিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারকাতে পরিণত হবার দিকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের ভিতরে আরও এক যোড়া নীহারিকা দেখা যায় (৬ সংখ্যক চিত্র), তন্মধ্যে নীচেরটি কোণাচেভাবে থাকাতে তার কুণ্ডলাকৃতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উপরেরটি এতটা কোণে অবস্থিত যে আমরা সেটিকে কেবলমাত্র কিনারা থেকে দেখতে পাই, তাই সেটিকে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের দণ্ডের মত দেখি। একটি সুগোল রৌপ্যফলককে ঠিক লম্বভাবে দেখলে তাকে গোলই দেখতে পাব; তাকে একটু কোণাচেভাবে দেখলে ডিম্বাকৃতি বলে মনে হবে; আবার সেই-টিকে একেবারে কিনারার দিক থেকে দেখলে একটি রূপার পাত বলে মনে হবে।

সিগনাই (cygni=হংস) নক্ষত্রমণ্ডলে যে নীহা-রিকা দেখা যায় (চিত্র ৭), তার আকৃতি যেন ওঠবার দিকে পাক খেয়েছে—আরোহীকুণ্ডলাকৃতি। ইহা দেখে মনে হয় যে, আর কিছুকাল পরে এটার আকার অন্য রকম হয়ে যাবে। এর আকৃতি কেন যে এরকম হোল, মানুষের বর্ত্তমান জ্ঞানে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নি।

৮ম চিত্রে প্রদর্শিত লায়রা মণ্ডলের (Lyra= বীণা) নীহারিকাচিত্রে দেখা যায় যে সমগ্র নীহারিকাটি একটি নাভির চতুর্দ্দিকে বলয়াকার ধারণ করেছে—অনেকটা শনিগ্রহের আবেষ্টক অঙ্গুরীর ন্যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে শনির অঙ্গুরীটি সম্ভবতঃ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থেকে যাবে, আর এই নীহারিকা সম্ভবত বিখণ্ডিত হয়ে একটি পৃথক তারকায় পরিণত হবে। অনুমিত হয় যে ডানদিকে দৃষ্ট পদার্থটির দ্বারা এই বিখণ্ডীকরণ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হবে।

৯ম চিত্রের ডমরু-আকৃতি নীহারিকা দেখে বেশ বোঝা যায় যে এটির মধ্যভাগ সরু হতে চলেছে এবং দুই প্রান্তে দুইটি গোলকের আবির্ভাব হচ্ছে। অনুমান হয় যে মধ্যভাগটি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকবে, আর গোলকদুটি ক্রমশ বৃহৎ হতে বৃহত্তর হবে। এইরূপ হতে হতে দুইটি গোলক পরস্পরকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে এবং এইরূপ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন মধ্যদণ্ডটি ভেঙ্গে যাবে ও গোলকদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের উভয়ের আদিম আবর্ত্তনগতির কারণে তারা সম্ভবতঃ পরস্পরকে ঘিরে ঘোরবার অভ্যাস থেকে বিরত হতে পারবে না। তখন পরিণামে ঐ দুইটি নূতন তারকা যুগ্মতারকারূপে প্রকাশ পাবে।

এই সকল নীহারিকাপুঞ্জ থেকে যে সকল তারার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি বা একে-বারে ধপধপে সাদা, আর কতকগুলি বা একটু লোহিত

তাম্র বা লাল ধরণের। জ্যোতির্বীগণ অনুমান করেন যে সাদা তারাগুলি লাল তারার চেয়ে বেশী গরম। তাঁরা বলেন যে সাদা তারাগুলি সঙ্কোচনের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে বলেই তাদের উত্তাপ খুব বেশী রকমে ফুটে বেরিয়েছে এবং সেই কারণে সেই তারাগুলি অত জলজ্বলে। আর যে সকল তারা সবেমাত্র জীবনের পথে চলতে আরম্ভ করেছে, সেগুলির উত্তাপ এখনও তত বেশী জন্মায় নি, তাই সেগুলির আভা অল্লাধিক লাল। আবার যে তারাগুলি জীবনের কার্য্য শেষ করে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়েছে সেগুলিরও উত্তাপ কমে যাওয়াতে তাদের আভা অল্লাধিক লাল হবে। স্পঞ্জের দৃষ্টান্তে কথাটা কতকটা বোঝা যেতে পারে। একটা স্পঞ্জ জলে ডুবিয়ে তাকে আস্তে আস্তে নিংড়াতে থাক, তাহলে তার ভিতরের জলটা ধীরে ধীরে বাহিরে বেরিয়ে আসবে। তার উপর চাপ যত বেশী দেবে, জলও তত বেশী বেরোবে। সেইরকম তারাতেও সঙ্কোচনের চাপ যত শীঘ্র শীঘ্র পড়বে, তাপও ততই বেশী পরিমাণে বেরিয়ে পড়বে। সঙ্কোচনের কারণে তারার উপরকার পৃষ্ঠদেশ যতই কেন্দ্রাভিমুখে আসতে থাকে, ততই সেই ভয়ানক চাপের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে উত্তাপ আপনাপনি উপজাত হয়ে পৃষ্ঠভাগে এসে পড়ে—সময়ে সময়ে আভ্যন্তরীণ জলন্ত পদার্থ সকল অসংখ্য আলাগহ্বরের মুখ দিয়ে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের আকারে উত্থিত হয়। তারপর যখন তারা সঙ্কোচনের শেষ সীমায় আসে, তখন তাহা থেকে আর উত্তাপ বহির্গত হয় না; তখন অবধি তারা চারিধারের আকাশে পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ বিক্ষিপ্ত করতে করতে শীতল হতে থাকে। শীতল হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পৃষ্ঠোপরি "সর" বা স্তর পড়তে আরম্ভ হবে। যে তারার এই অবস্থা হবে, সেই তারা বার্দ্ধক্যে বা মৃত্যুর পথে এসেছে একথা আমরা বলতে পারি। মৃত তারার অস্তিত্ব বিষয়ে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই। আলগল বা দৈত্যতারা নামক একটি তারার নিয়মিতরূপে উজ্জ্বল ও অন্ধকারাবৃত হওয়া একমাত্র এই অনুমানের সাহায্যে বোঝান যেতে পারে যে উহার সঙ্গে একটি মৃত ও অদৃশ্য তারা আছে এবং সেইটি উক্ত তারার চতুর্দ্দিকে ঘুরতে ঘুরতে নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে পড়ে। তখন আলগল তারার বলতে গেলে গ্রহণ হয়, আর আমরা কাজেই তার আলো সেই গ্রহণের সময় দেখতে পাইনে।

আমরা যেমন নীহারিকার বিষয়ে আলোচনা করতে করতে মৃত এবং মৃতোন্মুখ তারার বিষয় জানতে পেরেছি, সেই রকম সময়ে সময়ে নীহারিকার ভিতর থেকে নবজাত তারাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রত্যূষে এইরূপ একটি নবজাত তারকা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল। ২৩শে তারিখের রাত্রে ইহার আত্যন্তরীণ উজ্জ্বলতা সূর্য্য অপেক্ষা আট হাজার গুণ বেশী হয়েছিল। তারপরে অল্পদিনেরই ভিতর ইহা আবার রক্তবর্ণ হয়ে পড়ল এবং কয়েক মাস এইরকম লাল থেকে আকাশের গভীর অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে ফেলল।

আশ্চর্য্য এই যে এই তারার জন্ম হইতে আর একটি জ্যোতিষিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তারার জন্মের পরে যে সকল ফোটোগ্রাফীয় চিত্র লওয়া হয়েছে, সেই সকল চিত্রে উহার চারধারে একটি নীহারিকার অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে। কিন্তু ঐ তারার সন্নিহিত আকাশ ইতিপূর্ব্বেও খুব সাবধানে ফোটোগ্রাফ করা হয়েছিল, তখন নীহারিকার কোন চিহ্নই দেখা যায় নি। এ থেকে বোঝা যায় যে নীহারিকা ঐ স্থলেই ছিল, কিন্তু তাহা মৃত অবস্থায়। ইহা তারকাতে পরিণত হবার পূর্ব্বেই কোন অজ্ঞাত কারণে ইহার জ্যোতি বিনষ্ট হয়েছে। তার পর যখন ঐ নূতন তারার প্রতিফলিত কিরণ উহাতে পৌছল, তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হোল। এইরূপে নীহারিকাও যে মৃত হতে পারে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

এই পৃথিবীতে আমরা তো নিত্যই প্রত্যক্ষ করছি যে এখানে জন্মমৃত্যু কিরূপ খেলা খেলছে। কেবল যে জন্মই হচ্ছে, বা কেবলই যে মৃত্যুই হচ্ছে তা নয়—জাত জিনিসের কিরূপে মৃত্যু হচ্ছে এবং মৃতপদার্থ থেকে যে কিরূপে নূতন প্রাণী জন্মগ্রহণ করছে, তাহাও আমরা নিত্যই দেখছি। সেই রকম জ্যোতির্বীগণ আকাশেও জন্মমৃত্যুর অনন্তলীলা বলতে গেলে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়ে আমাদিগকে খুবই আশ্চর্য্য করেছেন। আমরা তো দেখেই এলুম যে তাঁরা কেমন সপ্রমাণ করেছেন যে অনন্তগভীর আকাশ থেকে রাশি রাশি নূতন তারা অবিশ্রামে জন্মগ্রহণ করছে, আবার অনন্তগভীর আকাশে কতশত তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে স্বীয় মৃত শরীর বহন করে নিজ কক্ষপথে অন্ধকার মলিন বদনে চলেছে।

ইহা ছাড়াও বর্ত্তমান কালের জ্যোতির্বীগণ এইটুকু মাত্র বলেই ক্ষান্ত নেই। তাঁরা বলেন যে আকাশেও নিত্যই মৃত্যু থেকে নবজীবনের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে অনেক জ্যোতির্বীর মত এই যে মৃত বা জীবিত তারাদের পরস্পর সংঘর্ষণে তাদের চিতাগ্নিস্বরূপে নীহারিকার উৎপত্তি হয়, আবার সেই নীহারিকা থেকেই নূতন তারার উৎপত্তি হয়। এখানে দুইটি বেগগামী রেলগাড়ীর বা দুইটী বেগগামী মোটর গাড়ীর

পরস্পরের ধাক্কা লাগলে যে কি অবস্থা হয় তাহা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন কি না সন্দেহ—দুইটা গাড়ীই কেবল ধাক্কার জোরে জ্বলে যায়। তখন যে তারা প্রতি সেকেণ্ডে সহস্র সহস্র মাইল বেগে চলছে তাদের পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগলে যে কি অবস্থা হয় সেটা আমরা সত্যিসত্যি কল্পনাও করতে পারি কি না সন্দেহ—কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি যে উভয় তারাই জ্বলে গিয়ে মারুতাকার ধারণ করে। তখন আবার সেই নীহারিকাবেশী মারুতপিণ্ড নূতন তারার জন্মদান করে এবং সেই নূতন তারা নূতন করে নবজীবনের খেলা খেলে। অনন্ত পুরুষের অনন্ত খেলা—ঐ অনন্ত আকাশে জন্ম মৃত্যুর খেলা সম্বন্ধে মানুষ যতই কেন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করুক, তার পরেও আরও কত সত্য অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে!

ফোটোগ্রাফী যেমন লাপ্লাসের নীহারিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় অনুমানের সমর্থন করেছে, সেই রকম উত্তাপ সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্বও নীহারিকাবাদের মূল কথাকে খুবই সমর্থন করে। সেই সকল তত্ত্ব তাঁর সময়ে অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত ছিল। এখন আবার নানা নূতন নূতন অনুমান জ্যোতিবীদের অন্তরে উপস্থিত হচ্ছে। তাঁরা দেখেছেন যে জোয়ার ভাঁটারও একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই কল্পনা করেন নি। শতাব্দী পরে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রসম্বলিত এই ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের নীহারিকা থেকে উৎপত্তিবিষয়ক অনুমানটী অনেক নূতন বেশ পরিধান করে জ্যোতিবীদের নিকট পরিচিত হবে নিঃসন্দেহ।

বিশ্বজগতের গঠন-বিন্যাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর)

গ্রীনুইচ্ মান-মন্দিরের প্রধান-সহকারী, "Science Progress" পত্রিকায় জগতের গঠন-বিন্যাস সম্বন্ধে একটি মনোমুগ্ধকর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন:—"এই সমস্যাটির স্বল্প আলোচনা হইতেও অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদের নিকট স্বতই উপস্থিত হয়। আমাদের জগৎটা আয়তনে সসীম, না অসীম? আমাদের দূরবীক্ষণের সাহায্যে উহার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা প্রবেশ করিতে পারি কি না? সমস্ত নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা করিতে পারি কি না? আমাদের জগৎটা যদি সসীম হয়, ইহার বাহিরে অন্যান্য নক্ষত্র-জগৎ আছে কি না? যদি থাকে, তাহাদের সহিত আমাদের জগতের কিরূপ সম্বন্ধ? আমাদের জগৎটা কি করিয়া ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিল? উহার শেষ পরিণাম কি? উহা কত-কাল স্থায়ী হইবে? উহার আকার কিরূপ? উহার কেন্দ্রটি কোথায়? ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর ন্যূনাধিক নিশ্চয়সহকারে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু আর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ।"

বিশ্বজগতের আয়তন সম্বন্ধে উপস্থিত প্রমাণাদি হইতে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,—"যদিও আমাদের নাক্ষত্রিক জগতের বিশালতায় আমাদের মন স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়ে, তথাপি বলিতে হইবে,—আমাদের জগতের আয়তন সসীম, এবং ইহার বাহিরে অন্যান্য স্বতন্ত্র জগৎ আছে।" আর ইহার গঠনের কথা বলিতে হইলে,—"ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ন্যূনাধিক গোলাকৃতি একটা কেন্দ্রগত জড়পিণ্ড লইয়াই এই জগৎ; এবং ইহার বাহিরে ছায়াপথ (Milky way) বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং তাহার মধ্যে বহু পরিমাণে ক্ষীণরশ্মি তারকা সকল অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান হয়, আসলে আমাদের নাক্ষত্রিক জগৎটা একটা ক্ষীণপ্রভ পেঁচাল (spiral) নীহারিকা (nebula) এবং অন্যান্য পেঁচাল নীহারিকা আসলে কতকগুলি স্বতন্ত্র জগৎ।"

আর একটা কথার আলোচনা প্রায়ই হইয়া থাকে—এমন কোন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র আছে কি না, যাহার চারিদিকে সমস্ত জগৎ ঘুরিতেছে। এইরূপ একটা কেন্দ্রগত সূর্য্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে বিবিধ তারার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, সূর্য্য অপেক্ষা লক্ষগুণ যাহার উজ্জ্বলতা সেই Canopus নক্ষত্রের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই মতবাদটি সম্বন্ধে Spencer বলেন, "একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য আমাদের নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র এবং এই সূর্য্যটি আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা বহু সহস্রগুণ বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর; এবং তাহার চারিদিকে বিবিধ পরিমাণের আরও লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্রতর সূর্য্য রহিয়াছে, যাহারা সকলে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড পেঁচাল নীহারিকার নাভিবিন্দু; এবং এই সমস্ত লইয়া একটি নক্ষত্রজগৎ—সম্ভবত অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র-জগৎ; অসীম আকাশসমুদ্রে ভাসমান সহস্র সহস্র এমন কি লক্ষ-লক্ষ জগৎরূপ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ইহা যেন একটি দ্বীপ মাত্র;—এই যে বিরাট কল্পনা ইহা মানুষের মনকে বড়ই মুগ্ধ করে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

প্রভু দয়াময়, কোথা হে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর,
তুমিই এক মম ভরসা।
প্রিয় জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়
একেলা ফেলি আঁধারে,
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ,
পূরাও এই আশা॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ ২´ ৩ ॥
মা পা গা II { মা -া পা পা I পণদা -া দা দা। দা দা পা -া।
প্র ভু, দ য়া ৺ ম য় কো০০ ০ থা, হে দে খা দা ও

১ ২´
।(-দা মা পা গা) } । মা পা পা পণদা। -া দা পা মগা I মা -ণদা দা পা।
ও প্র ভু, দ বি প দ মা০০ ০ ঝে, ব ল০ কা ০০ রে, ডা

৩ ১ ২´
। -মপা মা মা -পগা। মা মণা -দা দা। -া দপা পদা পমা I মগা পমা মাঃ -পঃ।
০ কি, আ ০র্ তু মি০ ই, এ ০ ক০ ম০ ম০ ভ০ র০ সা ০

৩
। -গা -া -ঋা -সা। -া মা পা গা II
০ ০ ০ ০ ০ "প্র ভু, দ"

১ ২´ ৩
II দা দা দা পা। পণা দা পা মগা I মা দা দা -া। না না র্সা -া।
প্রি য় জ ন এ কে এ কে০ কে, কো থা ০ চ লে যা য়্

১ ২´ ৩
। দা দা দা -া। না -া র্সাঃ -র্ঋাঃ I না র্ঋা র্সাঃ -র্ঋাঃ। -নর্সা -া -না -দা } ।
এ কা লা ০ ফে ০ লি ০ আঁ ধা রে ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩
। দা -া দা দপা। পণা দা পা মগা I মা -দা দা না। -া না র্সা -া।
শূ ০ ন্য, হৃ০ দ য়, ম ম০ পূ ০ র্ণ, ক ০ র, না থ্

১ ২´
। দা দা দা -া। না -া র্সাঃ -র্ঋাঃ I না -া -র্সাঃ -র্ঋাঃ। নর্সা -না -পা -দা।
পূ রা ও ০ এ ০ ই ০ আ ০ ০ ০ শা ০ ০ ০

। -নর্সা র্সনা দপা মগা II II
০ "প্র০ ভু০ দ০"

৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

সাহিত্য পরিচয়।

বিচিত্র প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থের নামে হঠাৎ একটা ভুল ধারণা মনে হইতে পারে যে বোধ হয় এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিপিন বাবুর লিখিত এক একটী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিতরে বিপিন বাবুর একটীও প্রবন্ধ নাই। দেশের ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনেক দিন যাবৎ অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। মধ্যে তিনি এতদূর পীড়িত হইয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের আশাও খুবই অল্প ছিল। সেই সময়ে বিপিন বাবু ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট বসিয়া কথোপকথন সূত্রে তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে যে দুই চারিটী কথা টানিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই বিচিত্র প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থাকারে বিপিন বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বিপিন বাবু এই কার্য্য করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমাদিগের কিন্তু মনে হয় যে গ্রন্থের নাম "ব্রাহ্মণ্যসমাজ সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর কথা" এই প্রকারের একটা কোন সুবিধামত নাম দিতে পারিলে ভাল হইত, গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় বুঝিবার সুবিধা হইত এবং আমাদের স্থির ধারণা যে তাহা হইলে ইহার বহুলতর প্রচারেরও অবসর হইত।

বিপিন বাবু যে নিতান্তই অকারণেও গ্রন্থের নাম বিচিত্র প্রসঙ্গ দিয়াছেন তাহা নহে। তাহারও কারণ যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ্যসমাজের ইতিহাস যে কি বৃহৎ ব্যাপার, তাহা যিনি এবিষয়ে কিছু মাত্র আলোচনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। কাজেই রামেন্দ্র বাবু যখন সেই বিষয়ে এতটুকুও কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহাকে সেই ইতিহাসকথার সম্পর্কেই নানা কথা প্রসঙ্গক্রমে অবতারণা করিতে হইয়াছিল। সেই কারণেই বিপিন বাবু তাঁহার গ্রন্থের নাম বিচিত্র প্রসঙ্গ দিয়াছেন। এদিক থেকে দেখিলে গ্রন্থের নাম নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। আমাদের মতে প্রত্যেক মূল মূল কথা ধরিয়া গ্রন্থকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলে বিষয়গুলি ধারণা করিবার পক্ষে সুবিধা হইত। আমরা বিষয়গুলি ধারণা করিবার কথা বলিলাম। প্রকৃতই রামেন্দ্র বাবু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র উপর উপর পড়িয়া গেলে কোনই ফল হইবে না, তাহা নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আলোচনা করিলে তবে সত্য সত্য পাঠকের এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের উপকার হইবে।

বিপিন বাবু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের গাত্রে অশ্লীল বীভৎস মূর্ত্তি খোদিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা উপলক্ষে রামেন্দ্র বাবুর মনে তাঁহার বক্তব্য কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি কত বিষয়ে কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই সকল বিষয়ের মধ্যে লিঙ্গপূজা, বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কয়েকটী মূল মন্ত্রের বৈদিকধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষত্ব, খৃষ্টীয়ধর্ম্মের শয়তানের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধমূলক ধর্ম্মের পার্থক্যমূল, যজ্ঞের মূলভাব, জগন্নাথদেবের আখ্যায়িকার সম্ভবপর জ্যোতিষিক মূল, পুনর্জ্জন্ম, শিবলোকের জ্যোতিষিক মূল, কৃষ্ণ ও খৃষ্টকথার পরস্পর ঋণ, কৃষ্ণের গোপালত্বের প্রকৃত অর্থ, উপনয়নের মূলভাব, শ্রুতি ও স্মৃতি, নির্ব্বাণ—বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক, স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার এইরূপ কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আমরা রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার ঐ সকল বিষয়ের উপর মন্তব্যগুলি আমাদের চিন্তাকে অনেকস্থলে যে নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। যাহা হইতে গ্রন্থের উৎপত্তি যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্গাত্রে বীভৎস মূর্ত্তি খোদিত কেন, সেই মূল কথা সম্বন্ধে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হয় যে বাস্তবিকই ওগুলি কামলোকের চিত্র খোদিত হইয়াছে এবং যেকালে ওগুলি খোদিত হয় সেই সময়ে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের গভীর পঙ্কে ডুবিয়া থাকায় তাহাদিগকেই সেই সকল চিত্রের আদর্শ model লওয়া হইয়াছিল। আমরা পুরীতে অবস্থান কালে কোন প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম যে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু ঐ সকল চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে কামনার প্রতিমূর্ত্তি এই সংসারের কি অনন্ত চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে। কাশীধামে নেপালী শিবালয়টী কাষ্ঠে নির্ম্মিত। সেই শিবালয়েরও বহির্ভাগ ঐরূপ বীভৎস চিত্রে পরিপূর্ণ—তিলার্দ্ধ স্থান ফাঁক রাখা হয় নাই। আমরা সেই মন্দিরের পুরোহিতকে দেবালয়ের গাত্রে এরূপ চিত্র খোদিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে মানুষ মন্দপথে চলিতে চলিতে যে মৃত্যুমুখে কিরূপ অগ্রসর হয় তাহাই এই সকল চিত্রে দেখান হয়েছে; কিন্তু ভিতরে অন্যরূপ—সেখানে যাঁহারা এই চিত্রপ্রদর্শিত কার্য্য হইতে উদ্ধার পাইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর তাঁহাদেরই ভক্তি-সুখী অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। শুনিয়াছি যে এই মন্দিরটী নেপালী কারিগরদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত। ঢাকা

পারস্থ ভোটগোঁসাইয়ের মঠাধ্যক্ষও তাঁহার মন্দিরে দুইটী বীভৎস প্রতিকৃতি দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন— একটির ভাব হইতেছে (অবশ্য তাঁহার শ্রুতমতে) মহাকাল স্বীয় শক্তির সহিত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঙ্গত হইতেছেন। ঐ প্রকার মূর্ত্তি হইতে এরূপ মহাকালের ভাব মনে আনা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক (ingenious) বটে। মঠাধ্যক্ষ বলিলেন যে নেপাল হইতে ঐ দুইটি প্রতিমূর্ত্তি আনীত হইয়াছে এবং নেপালে এরূপ প্রতিমূর্ত্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমাদের মনে হয় যে, একই কারণে নেপালে এবং পুরীতে ঐ ভাবের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইবার প্রথা উৎপন্ন হয়। নেপালেও বোধ হয় বৌদ্ধগণ কামপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের অনেকগুলি ভাল অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়া কতকটা বৌদ্ধবেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহার প্রচারকগণ বৌদ্ধদিগকে সম্ভবত হেয় করিবার উদ্দেশ্যে কামলোকের আদর্শরূপে চিত্রিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মন্দিরের দেওয়াল চিত্রিত করিবার বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুঁথিলিখিত নিয়মাবলী যে খুবই সহায়তা করিয়াছিল তাহা আর আশ্চর্য্য কি? সংস্কৃত অলঙ্কারেও তো মহাকাব্য প্রভৃতির আদি রসকে অপরিহার্য্য অঙ্গ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

রামেন্দ্র বাবু বোধ হয় লিঙ্গপূজার সহিত এই সকল চিত্রের কোনই সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। আমরাও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। তবে এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে "লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী, একথা সত্য", এ বিষয়ে আমরা সায় দিতে পারিলাম না। তিনি যদি এই অর্থে কথাটি বলিয়া থাকেন যে কোন জাতি যখন বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করে, তখন সেই জাতি সৃষ্টিতত্ত্বকে রূপকের দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য কখনও বা হিন্দুদিগের ন্যায় ধর্ম্মের গম্ভীর আবরণে আবৃত করিয়া লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা করে এবং কখনও বা আমোদ উৎসবের আকারে ব্যাকাসপূজা প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

রামেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া যে একটি সূত্র বাহির করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন—"আধুনিক হিন্দুর মধ্যে বোধ হয় মোটামুটি একটা সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত; যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রাহ্মণ্যভাব প্রবল।"

অন্যত্রে আমরা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে গ্রন্থে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের যে সকল মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে "মনুর সময়ে বাল্যবিবাহ সমাজে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত," আমরা একথা একেবারেই স্বীকার করি না।

রামেন্দ্র বাবু দেবযান ও পিতৃযানের যে জ্যোতিষিক উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমাদের অতি সুন্দর লাগিয়াছে। কৃষ্ণের গোপালত্বের এবং গোপীবল্লভ হইবার ও শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব হইতে উৎপত্তিরও সুন্দর ইঙ্গিত করিয়াছেন। উপনয়ন সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের এত সুন্দর লাগিয়াছে যে সময়ান্তরে তাহা পত্রিকাতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থের যথাযথ সমালোচনা করিতে গেলে প্রত্যেক প্রত্যেক বিষয়টীর উপর বিস্তৃত আলোচনা অথবা এক একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লেখা আবশ্যক। আশা করি প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ইহার এক একটি বিষয় ধরিয়া গবেষণা দ্বারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবেন।

উপসংহারে বিপিন বাবুর নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণকালে ইহাকে যেন বিষয়ানুসারে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থলিখিত প্রত্যেক বিষয়ের একটি সূচী প্রকাশ করেন। গ্রন্থোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক বক্তব্য থাকিলেও সাহিত্য-পরিচয়ের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বলিতে অসমর্থ হইলাম বলিয়া আমরাই অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি, গ্রন্থের বক্তা ও প্রকাশক উভয়েই তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীসত্যকাম শর্ম্মা।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

INDIAN MESSENGER—July 18, 1915.—

আলোচ্য সংখ্যার প্রথমেই উইলিয়ম আলগারের একটি সুন্দর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে—"full self possession in equilibrium which is at once happiness and religion." গীতাতে স্বল্পাক্ষরে এই কথাই উক্ত হয়েছে—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" আমরা দেখে সুখী হইলাম যে কাশ্মীরের মহারাজা দরবার প্রভৃতি উপলক্ষে বাইনাচ বন্ধ করে দিয়েছেন। আজকাল আমরা দেখেছি যে ব্রাহ্মদিগকে অনেক হিন্দু বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন যে বাইনাচ হচ্ছে। তাঁরা ভদ্রতার ও বন্ধুতার খাতিরে সেই বিবাহ সভা থেকে উঠতে পারেন না। তাতে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত প্রকারান্তরে ব্রাহ্মদিগকে বাইনাচ সমর্থন

করতে হয়। এটা কি উপায়ে বন্ধ করা যেতে পারে তাহা বিবেচ্য। শিক্ষিত হিন্দু প্রাচীনপন্থী বন্ধুরা বাইনাচ বন্ধ করে দিলেই সকল গোলযোগ চুকে যায়। তা নইলে, বিষয়টা যত শুনতে সহজ মনে হয়, আসলে তত সহজ নয়।

ব্রাহ্মসমাজ ও কলিকাতা বিষয়ক পরিচ্ছেদে 'কেশবকে ঠিক বুঝতে চেষ্টা না করাতেই কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় প্রভাব হারিয়েছেন' শ্রীযুক্ত পারেখের এই উক্তি উদ্ধৃত করে তার যুক্তি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন —বৃথা চেষ্টা। তার চেয়ে ওরকম উক্তি সকল উপেক্ষা দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করবার চেষ্টা করলে বোধ হয় সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। আসল কথা এই যে ব্রাহ্মসমাজের অনেক উচ্চভাব এখন ভারতের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হয়েছে। নূতন একটা কিছু আবির্ভূত হলেই প্রথমটা একটু সোরগোল হয়; তারপর কিছুদিন চলে গেলেই সেটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকে না। কেশববাবু ব্রাহ্ম সাধারণের উৎসাহ এবং ব্রাহ্মেতর সাধারণের কৌতূহল জাগ্রত রাখবার জন্য অনেক নূতন নূতন ভাব ও বিষয়ের অবতারণা করতেন। সেই সকল ভাব এখন দেশের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে পড়েছে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বের মত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। তবে, এখন যদি ব্রাহ্মেরা তাঁদের উন্নত আদর্শ অনুসারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চলেন, তবেই পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এবং তখন পারেখ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করবেন। "মারহাট্টা" পত্রিকায় যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাহ্মদিগকে পৃথকভাবে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে নিষেধ ইঙ্গিত করেছেন, তাতে আমাদের বিশেষ হাহুতাশ করবার কারণ নেই। "যুক্তিযুক্ত ও দার্শনিক হিন্দু ধর্ম্মতত্ত্বের" শিক্ষা প্রদান করলেই ব্রাহ্মদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে আশা করি। জাপানের কাউণ্ট ওকুমা বলেন যে "কোন ধর্ম্মই মানুষের ন্যায়সঙ্গত কার্য্যশক্তি রুদ্ধ করতে চাহে না।" আমরাও ইহাতে সম্পূর্ণ সায় দিই। বর্ত্তমান আলোচ্য সংখ্যায় খৃষ্টীয় মিশনরি শ্রীযুক্ত ফারকুহার রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করাকে "একটী জটিল সমস্যার সোজাসুজি মীমাংসা" বলে যে উল্লেখ করেছেন, তার একটী দীর্ঘ প্রতিবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যিনি যাহাই বলুন, এখন আর রামমোহন রায়কে কি তাঁর সিংহাসন থেকে কেহ নামাতে পারবেন? তখন আর বৃথা বাগযুদ্ধে প্রয়োজন কি? "ভারতের অসভ্য জাতির সমস্যা" প্রবন্ধে একটী গুরুতর বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। ছোটনাগপুর, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে গেলে বোঝা যায় যে অসভ্য জাতিদের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের এখনও কত গুরুতর কাজ বাকী আছে। সকল ব্রাহ্মসমাজের মিলিত ভাবে এবিষয়ে আলোচনা করলে সুফল হতে পারে। বিষয়টী অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত এ, সি, বাঁড়ুয্যে তামাকের অপকারিতা সম্বন্ধে লিখেছেন। ইহা এদেশের বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত করে বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

শোক-সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত শ্রাবণ মাসের ৮ই তারিখে শনিবার বেলা প্রায় দুইটার সময় শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে ৮৫।২ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শিলংএ পরলোক গমন করিয়াছেন। মহর্ষিদেবের পৌত্রী শ্রীমতী মনীষা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে তাঁহার চিকিৎসা কার্য্যেরই সূত্রে একটী অক্সিজেন প্রয়োগের যন্ত্র খুলিতে গিয়া ফুসফুসের শিরা ছিঁড়িয়া যাওয়াতেই কাসরোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। গত তিন বৎসর যাবৎ সেই কাসরোগেই তিনি ভুগিতেছিলেন। অবশেষে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি শিলংএ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় অমায়িকতা ও সরলতা গুণে কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু শিলংবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল এবং তাঁহার উচ্চহাস্যে প্রাণের সরল ভাব জীবন্তরূপে প্রকাশ পাইত। তাঁহার মৃত্যু যে এত শীঘ্র হইবে তাহা কেহ আশা করে নাই, সেই কারণে তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই মৃত্যুকালে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃতদেহ শিলংএর বন্ধুবান্ধবেরাই স্কন্ধে করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দাহস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দেবিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন। ইতঃপরেই কলিকাতা হইতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং মহর্ষিদেবের কুলপুরোহিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি কলিকাতা হইতে উপস্থিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। শ্রাদ্ধদিবসের সন্ধ্যাবেলায় তথাকার ব্রাহ্মগণ ডাক্তারের গৃহে উপাসনা ও পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী এই উপলক্ষে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডাক্তারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথাকার বন্ধুবান্ধবেরা যে প্রকার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ডাক্তার মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৪৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা—সকলেই নাবালক। আমরা প্রার্থনা করি যে ভগবান তাঁহার বিধবা পত্নী এবং পুত্র কন্যাদিগের হৃদয়ে এই দুর্ব্বহ শোক সহ্য করিবার বল প্রদান করিয়া স্বীয় শান্তিরূপে তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া রাখুন।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

যুদ্ধশান্তির প্রার্থনায় উদ্বোধন।*

মোচন কর স্বার্থপাশ মোচন কর হে। আজ একদিকে মহাসমরের করাল রাক্ষস সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে, আর একদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আমাদিগের এই প্রিয়তম ভারতবর্ষকে ছারখার করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। চতুর্দ্দিকে যে প্রকার মৃত্যুর খেলা চলিতেছে, তাহা মনের ভিতরে একবার আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রাণটা নিতান্তই হাঁপাইয়া উঠে, প্রাণের ভিতরে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইচ্ছা হয় যে ঐ সমরমদে প্রমত্ত জাতি সমূহকে যোড়করে অনুনয় করিয়া বলি যে 'একবার তোমরা আপনাদিগের ভীষণ স্বার্থপরতা ভুলিয়া পরস্পরের দিকে সহায়হস্ত বিস্তৃত করিয়া দাও—দেখ, জগত তাহার ফলে উন্নতির পথে কি প্রকার অগ্রসর হয়। দেখ, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ যে আজ তোমরা সসাগরা পৃথিবীকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া জগতের উন্নতি কতদূর পশ্চাৎপদ করিতে বসিয়াছ।'

আমরা বেশ জানি যে সমরমত্ত কোন জাতিই আজ আমাদের এই প্রাণের প্রার্থনা শুনিতে প্রস্তুত নহে। তাই আমরা সেই দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ ভগবানের নিকটে এই প্রচণ্ড সমরানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য প্রার্থনা ব্যতীত আর কি করিতে পারি? এস, আমরা সেই দয়াময় রাজরাজেশ্বরের চরণে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করি, তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া বলি—হে মঙ্গলময় প্রভু, হে মৃত্যুসংহারক বিশ্বেশ্বর তুমি তোমার বজ্রের দ্বারা মানুষের স্বার্থ একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দাও। প্রভু, লক্ষ লক্ষ গৃহের পরিবার হইতে, অযুতকোটী মানবের কণ্ঠ হইতে আজ যে গভীর হাহাকার উঠিতেছে, কয়েকজনের স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে আজ যে এই দেশবিদেশে এক মহা মৃত্যুবিলাপ উঠিয়াছে, সেই হাহাকার সেই ক্রন্দনবিলাপ আজও কি তোমার সিংহাসনতলে পৌঁছায় নি? হে রুদ্রদেব, তুমি একবার তোমার রুদ্রমূর্ত্তিতে জাগ্রত হও এবং সেই রুদ্রমূর্ত্তিতে এই মোহান্ধ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া দেখ, তোমার এমন সুগঠিত এমন মঙ্গলপ্রসূ পৃথিবী বোধ হয় আর থাকে না, সকলই যে যুদ্ধের অগ্নিতে জ্বলিয়া গেল। তুমি এস, তোমার বজ্রের আগুনে ধনমদের মোহ, স্বার্থের মোহ পুড়াইয়া দিয়া একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দাও। তোমারই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মে পৃথিবী যখন উত্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন প্রভঞ্জন বায়ু তোমারই বলে বলী হইয়া বিষম ঝটিকা উঠাইয়া সেই উত্তাপ বিদূরিত করে এবং ধরণীতে সুশীতল শান্তি স্থাপন করে। আজ মানুষের গর্ব্বের উত্তাপ দূর করিবার জন্য তোমার রুদ্রমূর্ত্তি কেন

---

* গত ২২ শে ভাদ্র বুধবার সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা উপলক্ষে।

জাগ্রত হইতেছে না? প্রভু, আর বিলম্ব করিও না—একবার জাগিয়া উঠ, তোমার বজ্রের দ্বারা ধনের উত্তাপ, ঈর্ষ্যার উত্তাপ সকলই দূর করিয়া দাও। আমরা তোমার প্রসন্ন মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া শীতল হই। দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ চলিয়া গিয়া সুভিক্ষ আসুক। আমাদের প্রাণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন প্রশমিত হউক।

প্রলয়ে ঈশ্বর।*

আজকাল আমাদের মনে কেবল প্রলয়েরই কথা জাগিয়া উঠে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পত্র খুলিলেই দেখা যায় যে বলিতে গেলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষেরা মৃত্যুর সর্ব্বসংহারক অগ্নিকুণ্ডে আপনাদিগকে কি প্রকারে আহুতিস্বরূপে নিক্ষেপ করিতে চলিয়াছে। এই প্রকার প্রলয়ের ব্যাপার দেখিয়া আমাদের সহজেই মনে হইতে পারে যে যাঁহার শাসনে এই এক পৃথিবীতেই মঙ্গল ভাব জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহারই রাজ্যে মৃত্যু এপ্রকার বিকট সংহার মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে পায় কেন? এই মৃত্যুর মধ্যে সেই অমৃতপুরুষকে দেখিতে না পাইয়া আমরা সময়ে সময়ে ভাবিয়া আকুল হই—সময়ে সময়ে আমাদের বিশ্বাস টলমল করিতে থাকে—যে, যিনি প্রলয়কর্ত্তা, জগতে যিনি ভীষণ প্রলয় প্রেরণ করিয়া আমাদের মস্তকের উপরে ভয়ের একটা বিকটকরাল ছায়া রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে আবার পিতা বলিয়া কিপ্রকারে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিব? কিন্তু তাহা করিতেই হইবে। কারণ ইহা একেবারে ধ্রুব সত্য যে, যে দেবাধিদেব আদিদেব এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে, প্রলয়ের বিকট প্রচণ্ড নৃত্যের ভিতরেও তাঁহারই মঙ্গলহস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

প্রলয় ঘটনাসমূহে অকস্মাৎ মৃত্যুর সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তির বিকট খেলা দেখিয়া আমরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ি। তখন আমরা ভয়ের তাড়নায় চিন্তা করিবার অবসর পাই না যে জগতে কোন ঘটনাই অকস্মাৎ ঘটিতে পারে না এবং জগতে মৃত্যু বলিয়া সত্যসত্য কোন কিছু নাই। আমরা হয়তো কোন ঘটনার কারণ না জানিতে পারি, কিম্বা কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারিব না যে সেই ঘটনা বিনা কারণে সংঘটিত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক ঘটনাই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা। সামান্য নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে অনন্ত কোটী সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত পর্য্যন্ত একটী ঘটনাও আকস্মিক হইতে পারে না। প্রচণ্ড ঝটিকায় বাড়ীঘর সকল ভূমিসাৎ হইয়া গেল। ইহার কারণ কি? প্রথমে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে বাষ্প উঠিয়া মেঘ হইল; তাহার ফলে ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। আবার, যে সকল বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছিল, সেগুলিও গৃহনির্ম্মাতাদিগের অর্থাভাব বশত বা অন্যান্য কারণে ঝড়ের বেগ সহ্য করিবার উপযুক্তরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। এই প্রকারে আলোচনা করিতে করিতে যতই কেন পিছাইয়া যাই না, প্রত্যেক ঘটনাই কার্য্যকারণশৃঙ্খলে গ্রথিত দেখিতে পাইব।

জগতে মৃত্যু বলিয়াও সত্য সত্য কোন কিছু নাই। প্রকৃত মৃত্যু থাকিলে বিজ্ঞানের ভিত্তিই থাকিতে পারিত না। বিজ্ঞানের যেমন একটী সিদ্ধান্ত এই যে জগতে কারণ বিনা কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি সম্ভব নহে, সেইরূপ ইহাও একটী সিদ্ধান্ত যে জগতে পরমাণু বা শক্তি কোন কিছুরই বিনাশ নাই—রূপান্তর হইতে পারে, কিন্তু বিনাশ হইতে পারে না।

উপরোক্ত দুইটী আশ্চর্য্য নিয়ম যখন প্রলয়েরও ভিতরে কার্য্য করিতেছে এবং সেই প্রলয়ের কার্য্য যখন এই সৃষ্টিরই মধ্যে সংঘটিত হইতেছে, তখন বিশ্বজগত যাঁহার সৃষ্টি, যাঁহার আদেশে এই ব্রহ্মচক্র নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই আদেশে যে প্রলয়ঘটনা সকলও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। তিনি যেমন জগতের স্রষ্টা ও পাতা, সেইরূপ জগতের প্রলয়কর্ত্তাও বটে। একটী নিমেষও তাঁহার আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। তাঁহারই নিয়মে যখন প্রলয় হইতে বিনাশ ও মৃত্যুর ছায়া অপসারিত হইয়াছে, তখন সেই

---

* গত ২২ শে ভাদ্র বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা উপলক্ষে বিবৃত।

প্রলয়ের মধ্যে কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের পিতৃভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না?

ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই বিচিত্র। প্রলয় হইতে বিনাশ ও মৃত্যুকে কেবল মাত্র বিদূরিত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, প্রলয়ের মধ্যে আবার তিনি সৃষ্টিবীজও নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ক্ষুধার ফলে একদিকে শরীরের ক্ষয়সাধন হয়, আহার পরিপাকেরও সময়ে শরীরের ক্ষয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সেই ক্ষয়েরই ফলে আমাদের শরীরে বলাধান হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তিলাভ করে। প্রচণ্ড ঝটিকার প্রলয় ব্যাপারের ফলে দূষিত বায়ু নির্ম্মল হইয়া গেল, জগতে নূতন প্রাণের আবির্ভাব হইল। ভাবিলে নির্ব্বাক হইতে হয় যে কিপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ প্রলয়ব্যাপারের ফলে আজ আমরা পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি লাভ করিয়া শরীরের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সমর্থ হইতেছি।

এই সকল মঙ্গলবিধান দেখিয়াও যে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময় পিতৃভাব ভুলিয়া যাই, তাহার কারণ এই যে আমরা প্রলয়ঘটনাকে স্বার্থের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখি। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু, গৃহাদি ভূমিসাৎ হওয়া প্রভৃতি যে সকল ঘটনাতে আমাদের স্বার্থে গুরুতর আঘাত পড়ে অথবা পড়িবার সম্ভাবনা, সেই সকল ঘটনাকে প্রলয় মনে করিয়া ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি এবং ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে সন্দিহান হই। এই যে ইউরোপে প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে ইউরোপের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেরও স্বার্থে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পড়িবে মনে করিয়াই আমরা ইহাকে প্রলয় ঘটনা ভাবিতেছি এবং ভয়ব্যাকুল চিত্তে প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার সংহরণ প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু যদি এই সকল ঘটনাকে আমরা বিশ্বজগতের স্বার্থের দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে দেখিব যে এই প্রকার ঘটনাসমূহেও আমাদিগের ভয় পাইবার কোন কথাই নাই। একটী বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগুলি যদি আমরা পাড়িয়া খাই, গাছ সেই ঘটনাকে নিজের দিক হইতে দেখিলে তাহাকে নিশ্চয়ই প্রলয়ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু গাছটী যদি মনুষ্যের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে সেই ঘটনাকে দেখে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে সেই প্রলয়ঘটনা হইতে কিপ্রকার উপকার সাধিত হইয়াছে। তেমনি সংগ্রাম প্রভৃতি প্রলয়ব্যাপারকে আমাদের স্বার্থের দিকে হইতে না দেখিয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের দিক হইতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে এই সকল ঘটনা কখনও অমঙ্গলজনক হইতে পারে না। ইতিমধ্যেই আমরা আভাস পাইতেছি যে ইউরোপের এই মহাসমরের ফলে কিপ্রকার মঙ্গল প্রসূত হইবে। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে যে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে, ক্ষাত্রবলের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মতেজের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারই যথেষ্ট আভাস ও ইঙ্গিত পাইতেছি। ভগবান তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানে ঠিক জানিতেছেন যে কোন্ স্থানে এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ ঘটনাটী সংঘটিত হইলে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে। সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাঁহার মঙ্গলভাব নীরবে অবিচলিতভাবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে। তাঁহার সেই মঙ্গলভাবকে স্বীয় কার্য্য হইতে কোন কিছুই বাধা দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। আমরা সকল সময়ে তাঁহার সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না, তাঁহার সেই মঙ্গলভাবকে অনুভব করিতে পারি না বলিয়া আমরা তাঁহার নিকট প্রলয়ের সংহারমূর্ত্তি সংহরণ করিয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করি।

যে দেবাধিদেবের আদেশে জগত হইতে মৃত্যু পলায়ন করিয়াছে, যিনি জগত হইতে অমঙ্গল দূর করিয়া স্বীয় অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছেন, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্যে যাঁহার পিতৃভাব নিত্যনিয়ত সুব্যক্ত হইতেছে, এস, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা পরম পিতা বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখি এবং সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনা হইতে মুক্ত হই। এস, আমরা তাঁহারই চরণে দাঁড়াইয়া বলি—মা মা হিংসীঃ, হে দেব, হে পিতা আমাকে বিনাশ করিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ।

মুখবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে রাজা রামমোহন রায় কয়েকজনের নিকট এতদূর সাহায্য লাভ

করিয়াছিলেন যে আমরা সেই কয়েকজনকে সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। সেই সহযোগী প্রতিষ্ঠাতাদিগের সাহায্য ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। তাঁহারা কেবল মাত্র রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় ও ভারতে অবস্থানকালেই যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। রামমোহন রায়ের বিলাতে অবস্থানকালে এবং তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তির পরেও সেই সহযোগীগণ প্রাণপণ যত্নে ব্রাহ্মসমাজকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদিগের মতে ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তিনজনের নাম উল্লিখিত হইতে পারে—দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ ও সেকালের দলাদলি।

কলিকাতাবাসী অনেক ধনী ব্যক্তি রামমোহন রায়ের নিকটে বৈষয়িক পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন। বলিতে গেলে, সেই বৈষয়িক পরামর্শেরই বিনিময়ে তাঁহারা হয় নামে মাত্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য করিতেন, অথবা ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত, দলাদলির ফলেও ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি ধনী লোকের সাহায্য লাভ করিয়াছিল। সেকালে কলিকাতায় দলাদলির কিছু বেশী প্রাবল্য ছিল বলিয়া শোনা যায়। দলাদলি সেকালের ধনীদিগের সময় অতিবাহিত করিবার অন্যতর উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়া ক্রমে তাহা পাকিয়া দাঁড়াইত। তখন আর উভয় দলের হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। তখন উভয় দলেরই এই উদ্দেশ্য দাঁড়াইত যে, প্রতি বিষয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে এবং যে কোন উপায়ে হউক বিপক্ষ দলকে অপ্রতিভ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কালেও আমরা এই প্রকার দুইটী বিরোধী দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই—একদলের নেতা যোড়াসাঁকোস্থ ধনীসম্প্রদায়, দ্বিতীয় দলের নেতা সভাবাজারের ধনীসম্প্রদায়। এই দলাদলির মূল সূত্রপাত কোথা হইতে কি কারণে হইল তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু এই দলাদলির ফলে আমরা দেখি যে যোড়াসাঁকোস্থ ধনীসম্প্রদায়ের অনেকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছিলেন এবং সভাবাজারস্থ ধনীসম্প্রদায়ের অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একটা ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় বৈষয়িক পরামর্শ বা দলাদলি যে বেশীদিন অধিকার রাখিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের প্রথম উৎসাহ কমিয়া গেল, তখন একদিকে যেমন দলাদলির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভাও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, তেমনি রামমোহন রায়েরও "খাতিরের" বন্ধুগণের উৎসাহ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ণধারস্বরূপে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহা রক্ষা পাইত না। দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কর্ম্মেই নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করিয়া দিতেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারের ফলে দেশের যে কি উপকার সাধিত হইবে তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার উপর ব্রহ্মসভাটী তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর বলিতে গেলে একমাত্র অক্ষয়কীর্ত্তি; সুতরাং সেই ব্রহ্মসভাকে বজায় রাখিবার জন্য যে তিনি সাহায্য করিবেন ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর আত্মীয় সভার সভ্য।

রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের যেরূপ প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল, এই উভয়ের কাহারও সহিত অপর কোন ব্যক্তির সেরূপ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল বলিয়া জানি না। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা হইতেই এই বন্ধুতার সূত্রপাত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়া পর বৎসরেই আত্মীয় সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাঁহার নিজের বন্ধুবান্ধব লইয়াই এই সভা সংগঠিত হয়। সপ্তাহে একবার সভার অধিবেশন হইত। সেই অধিবেশনে শাস্ত্রপাঠ হইত এবং রামমোহন রায়ের স্বরচিত অথবা তাঁহার কোন বন্ধুরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। রামমোহন রায়ের পণ্ডিত

শিবপ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন এবং গোবিন্দ মালা এই সভার বেতনভোগী গায়ক ছিলেন। এই সময় অবধিই রামমোহন রায়ের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের আন্তরিক প্রীতি দৃষ্ট হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর আত্মীয় সভার সভ্যরূপে তাহার প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের কিরূপ সহায় ছিলেন।

রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর, উভয়েই স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন। উভয়েই স্বাধীনতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। রামমোহন রায় যেমন কোরাণ প্রভৃতি অধ্যয়নের ফলে মূর্ত্তিপূজার অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অনুমান হয় যে দ্বারকানাথ ঠাকুরও সেইরূপ আপন শিক্ষার ফলে মূর্ত্তিপূজার অসারতা বুঝিয়াছিলেন। উভয়েই ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যে মূর্ত্তিপূজার শতগ্রন্থি শৃঙ্খল কাটিয়া বাহির হইতে না পারিলে এদেশের মঙ্গল নাই,—দেশের মধ্যে মুক্তির একমাত্র উপায় উন্নত স্বাধীনভাব আসিবার পথ চিররুদ্ধ থাকিবে। তাই, রামমোহন রায় সেই উদ্দেশ্যে যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেশের স্বাধীন ভাব আনয়ন ও মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই দ্বারকানাথ ঠাকুর সহস্রপদ অগ্রসর হইয়া নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সকল কার্য্যের প্রায় প্রত্যেকটীতেই তিনি সহযোগী হইয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেলের নিকট সতীদাহের বিরুদ্ধে যে আবেদন করা হইয়াছিল, সেই আবেদন বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরও যে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন, লেডি বেণ্টিঙ্ক দ্বারকানাথ ঠাকুরকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই উহা সপ্রমাণ হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই সূত্রে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, শুনিয়াছি যে সেই অভিনন্দনসভায় ফাঁসি যাইবার ভয়ে রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন স্বদেশীয় ব্যক্তিই উপস্থিত হয়েন নাই।

একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের কি প্রকার সহযোগী ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব প্রধানত রামমোহন রায়ের সহায়তায় একেশ্বরবাদ প্রচারার্থ ইউনিটেরীয় কমিটি নামক এক সমিতি স্থাপন করেন। ইহারই তত্ত্বাবধানে একটি ইঙ্গ-হিন্দু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতিরও সভ্যগণের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক সভ্য ছিলেন। আমরা আরও দেখিতে পাই যে এই সমিতিরই পরিচালনে ইউনিটেরীয় মিশন নামে একেশ্বরবাদের একটি প্রচারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মিশনের সাহায্য কল্পে রামমোহন রায় যেমন ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরও ইহাতে নিজের নামে ২৫০০৲ টাকা এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে ২৫০০৲ * সর্ব্বসমেত পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল হেরল্ড" নামক এক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার অন্যতর স্বত্বাধিকারীদ্বয় ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়েও রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মতি লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাতে অগ্রসর হয়েন নাই। দ্বারকানাথেরই পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ ৬০৮০ ছয় হাজার আশি টাকা তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় ও এদেশে অবস্থানকালে তাঁহার জনহিতকর নানাবিধ গুরুভার কার্য্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নানা উপায়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া প্রগাঢ় বন্ধুতার কিরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; এমন কি, তাঁহার বিলাত যাত্রার দিবসে একমাত্র

* ইহা মহর্ষিদেবের প্রমুখাৎ শ্রুত।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় দ্বারকানাথভবনে পৌঁছিবামাত্র সে সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে সুবৃহৎ দ্বারকানাথ-ভবনের সিঁড়িতে পর্য্যন্ত দাঁড়াইবার স্থান ছিল না।

রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর তাঁহার বন্ধুগণের বন্ধুতার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় কয়েকটি বন্ধু ব্যতীত অনেকেই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাঁহার নামেমাত্র বন্ধুগণের উৎসাহ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া আসিল। টাকীর রায়-চৌধুরী, যোড়াসাঁকোর মল্লিক ও সিংহ পরিবারগণ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাঁহার দুই তিনজন প্রকৃত বন্ধু ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিবার লোকই পাওয়া যায় নাই। এই প্রকৃত বন্ধুগণের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের বৈষয়িক ভার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থসাহায্যরূপ অন্নদানের দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ যখন এদেশে পৌঁছিয়াছিল, পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেন যে "তখন আমি আমার পিতার নিকট ছিলাম, আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।" রামমোহন রায়ের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের অকৃত্রিম অনুরাগ এইপ্রকার অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া পরিণামে আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে প্রথমেই ব্রাহ্ম-সমাজের ভার প্রধানত তাহার নামেমাত্র ট্রষ্টীদ্বয় রমানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপর পড়িল। ইঁহারা ঘোর বৈষয়িক লোক ছিলেন; ইঁহাদের নিকটে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ কোন সাহায্য লাভ করে নাই। যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের ইঙ্গিতে রামমোহন রায়ের মনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কল্পনা আসিয়াছিল, তাঁহারাও তাঁহার বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান রাজের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। এই অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ট্রষ্টী ও রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তাহার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজার বিলাত গমন অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বের ন্যায় বজায় রাখিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে দিল্লীর বাদসাহের নিকট পিতার প্রাপ্য বুঝিয়া লইবার জন্য দিল্লী যাত্রা করিতে হইয়াছিল। সেখানে অনেকদিন আবদ্ধ থাকায় তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। দেশে যখন তিনি প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার বিশেষ অর্থাভাব ঘটিয়াছিল এবং সেই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে পূর্ব্ব-বৎ উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্য।

ব্রাহ্মসমাজের অদৃষ্টচক্র এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিণামে দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে আসিয়া পড়িল। যতদিন অন্যের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছিল, ততদিন তিনি তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু ক্রমে যখন ব্রাহ্মসমাজকে একে একে সকলে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন তিনি জনহিতৈষণা ও বন্ধুতার আকর্ষণে অভিন্নহৃদয় রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহার দেওয়ান রামচন্দ্র গাঙ্গুলীর উপর সমাজ পরিরক্ষণের ভার ন্যস্ত করিলেন। গাঙ্গুলি মহাশয় কয়েক বৎসর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে সমাজের কার্য্য সুপরিচালিত করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিলাত গমন অবধি সমাজে মাসিক ৬০৲ ষাট টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে তাহা বাড়াইয়া দিয়া ৮০৲ আশী টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ ৬০৮০৲ টাকা দ্বারকানাথ ঠাকুরেরই পরামর্শে ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর এই কোম্পানি দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকা উঠাইয়া লইয়া নিজের বাটীতে রাখিলেন।

মাসিক ৮০৲ টাকা ব্যতীত দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যান্য নানা উপায়ে ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতেন। পূর্ব্বে দলাদলির কথা বলিয়া আসিয়াছি। যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্রহ্মসভার দলের কাহারও অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্মে দান গ্রহণ করিতেন অথবা দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, ধর্ম্মসভাভুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ ও "বিদায়" প্রাপ্তি রহিত হইয়া যাইত—ধর্ম্মসভার সভ্যগণ তাঁহাদিগকে একঘরে করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মসভার দলপতিগণ স্বপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভাস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত দলপতিগণ অর্থদান করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধুগণ ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিবার পর একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁহার শেষবারের বিলাত গমন পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অর্থদান প্রভৃতি উপায়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সম্বর্দ্ধনা প্রথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকৃতি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার বহুকাল যাবৎ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আমরা পরিবারস্থ বর্ষীয়সী মহিলাদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে তাঁহার বাটীতে মাংস দূরে থাক, পেঁয়াজ পর্য্যন্ত আসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং সেই পরিবারের শীর্ষস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও প্রকৃতি যে অনেকাংশে সত্ত্বগুণান্বিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পূজ্যপাদ মহর্ষির উক্তি হইতেও তাঁহার প্রকৃতির সত্বভাব পরিস্ফুট হয়। মহর্ষি বলেন—"তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। * * * যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন।" এই উক্তি হইতে আমরা পূজার আসনে উপবিষ্ট পট্টদুকূল-পরিহিত সত্ত্বপ্রকৃতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রশান্ত মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে জীবন্ত দেখিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আর একটী বিশেষ ঘটনায় আমরা দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকৃতি ও সহজাত দেশীয় ভাবের সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হই। রামমোহন রায় মুসলমানী ধরণের দরবারী পোষাক পরিয়া সমাজে উপস্থিত হইতেন। "রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তরূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলে উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা এই ভাবটী মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন।" রামমোহন রায়ের রজঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে এই ভাবটী উঠিয়াছিল। দ্বারকানাথের হৃদয় বিভিন্নভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাই রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের মধ্যে একমাত্র তিনি কিছুতেই এইরূপ পোষাক পরিয়া সমাজে আসিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি বলিতেন যে "পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।" দ্বারকানাথ ঠাকুর ধুতি চাদর পরিয়াই সমাজে উপস্থিত হইতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, কারণ রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তপ্রভাব অতিক্রম করিতে সক্ষম দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ তখন ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য অবধি শ্রোতৃবর্গ পর্য্যন্ত সকলেই দরবারী পোষাকে আসিতেছেন, এরূপ দৃশ্য এখন কল্পনা করিতেও কিরূপ হাস্যকর ও বিসদৃশ বোধ হয়! অধিকন্তু, এই দরবারী পোষাক প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ অতি শীঘ্রই হিন্দুসমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। এই ঘটনা হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাধীনতাপ্রিয়তারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধ ও প্রতাপশালী রামমোহন রায়ের নিকট সম্মান লাভের প্রত্যাশা এবং রামমোহন রায়ের মতবিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে উপহাসপ্রাপ্তি প্রভৃতির ভয় থাকিলেও দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের জ্ঞানবুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হয়েন নাই।*

* মহর্ষিদেব একস্থলে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন

রামমোহন রায়ের প্রকৃতি এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও সেই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির পথে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সহৃদয় দ্বারকানাথ আমৃত্যু তাঁহার বন্ধুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এদেশে তাঁহার বন্ধুর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের দশ বৎসর পরে তিনি যখন বিলাত গমন করেন, তখনও তিনি বন্ধুর দেহত্যাগের উপর অশ্রুবর্ষণ করিতে বিরত হয়েন নাই। তিনি বন্ধুর দেহাবশেষ একটি সুন্দর নিভৃত স্থানে প্রোথিত করাইয়া তদুপরি এক সুন্দর স্মৃতি-স্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর, এই দুই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম এক অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গেলে যেমন রামমোহন রায়কে পরিত্যাগ করা যায় না, সেইরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

"পূজার অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন।" রামমোহন রায়ের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভক্তি যদি দেবপূজা অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে তিনি সর্বাঙ্গে দরবারী পোষাক পরিয়া আসা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের অনুজ্ঞা নিশ্চয়ই অবহেলা করিতে পারিতেন না। আমাদের অনুমান হয় যে মহর্ষিদেব সেই সময়ে অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন বলিয়া (রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা কালে তাঁহার বয়স বারো বৎসর মাত্র হইয়াছিল) তাঁহার পিতার কার্য্যটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। দ্বারকানাথ প্রকৃতপক্ষে পূজা করিতেছেন অথবা নামজপ প্রভৃতি পূজার অবান্তর অঙ্গ সকল শেষ করিতেছেন, এরূপ বিচার করিবার বুদ্ধি দ্বাদশবৎসরেরও ন্যূনবয়স্ক বালক দেবেন্দ্রনাথের হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে দ্বারকানাথ ঠাকুর পূজা সাঙ্গ করিয়া যখন নামজপে বসিতেন, সেই সময় রামমোহন রায় উপস্থিত হওয়াতে তিনি সেকালের প্রচলিত প্রথামত নামজপ ক্ষণকালের জন্য স্থগিত করিয়া রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেন এবং পরে সেই অবশিষ্ট নামজপ সম্পূর্ণ করিতেন। সেকালে "সন্ধ্যা" করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণ মাত্রেই সন্ধ্যাকার্য্যে উপবিষ্ট হইতেন এবং ঠিক সেই পূজার সময়ে রামমোহন রায়ের দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না—পূজার পর নামজপের সময়ে উপস্থিত হওয়াই একমাত্র সম্ভব অনুমিত হয়।

নির্ভর।

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

তোমার কাছে যাওয়ার পথে
সকল বেদনা ভালো—
নিশার ঘন তিমির, আর সে
নিদাঘের তপ্ত আলো।
গহন বনের কণ্টক বীথি
হে মোর পরাণ প্রিয়,
রাজীব চরণ-পরশ আশে
সেও মোর রমণীয়।
প্রাবৃটের ঘন ঘোর দুর্দ্দিনে
চিকুর মেঘের ঘটা—
তবুও নাইক শঙ্কা, না হবে
বন্ধ এ পথের হাঁটা।
দীর্ঘ আমার দুর্গম পথ-
চলা যে তোমার আশে—
সার্থক করি দুঃখ ব্যথা যত
ডেকে লও তব পাশে॥

ভগবৎ প্রেম।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন)

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম বা ভক্তি কেন হয়? ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, তিনি আমাদের পালন কর্ত্তা পিতা, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, আহার দিতেছেন ও স্নেহ করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত শক্তি। এই সকল কারণেই কি আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি? এ সকল অতি নিম্ন স্তরের কথা। এই কথার স্থান ও পাত্র থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ ঠিক কথা নহে। এ জাতীয় ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। ইহাতে স্বার্থ মিশ্রিত আছে। প্রকৃত প্রেমিক এই জাতীয় প্রেম লইয়া স্থির থাকিতে পারেন না। আমাদের পার্থিব পিতা আমাদিগকে লালন পালন করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, স্নেহ করেন, ইহা ত তাঁহার কাজ। সেই জন্যই কি আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সদ্যজাত জননীক্রোড়ে শায়িত শিশুকে, জননীর

মুখের দিকে, একদৃষ্টে তাকাইয়া সুমধুর হাসি হাসিতে দেখিতাম না। সে হাসির অর্থ স্বার্থ বা কৃতজ্ঞতা নহে। শিশুর অন্তরে তখনও স্বার্থের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। সে জগতের কোন ধারই ধারে না; মাতার স্তন্য তাহার নিজস্ব বলিয়াই সে পান করে এবং না পাইলে রাগ করে, পাইবার জন্য তোষামোদ বা যাচ্ঞা করে না। তবে সে হাসির অর্থ কি? সে হাসির অর্থ প্রেম। সন্তানের হৃদয় ও জনকজননীর হৃদয় যে প্রেম-তন্ত্রীদ্বারা বাঁধা আছে সেই প্রেমতন্ত্রী যখন বাজিয়া উঠে তখন শিশুর মুখে মধুর হাসি আপনা হইতেই উদয় হয় এবং জনকজননীরও হৃদয় সেই প্রেমসঙ্গীতে নাচিয়া উঠে।

এই অকারণ নিঃস্বার্থ প্রেম আমরা জগতের অনেক বস্তুতেই দেখিতে পাই। ঐ শিশুটী আবার যখন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পায় তখন প্রেম-ভরে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, আয় আয় বলিয়া ডাকে; শিশু যেমন চাঁদকে চায় আমরাও তেমনই চাই, শুধু চাঁদ কেন, জগতের অনেক বস্তুকেই চাই। তারকাবলীমণ্ডিত আকাশ দর্শন করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হই, তরঙ্গায়িত জলনিধির বিশাল বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া আমরা বিভোর হইয়া পড়ি, গিরিনদীবনপ্রান্তরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আমরা অপার আনন্দ অনুভব করি। শিশুর হাসি, কুসুমরাশির কমনীয়তা, সঙ্গীতের সুমধুর স্বর-লহরীতে কে না মুগ্ধ হয়? কিন্তু কেন হয়? কোন্ আকর্ষণীশক্তি আমাদিগকে ঐ সকল বস্তুর দিকে টানিয়া লইয়া যায়? সহজ কথায় উত্তর হইবে যে, সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই উত্তর কি যথেষ্ট হইল? সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্যের এরূপ আকর্ষণী শক্তি কেন থাকে? সুন্দরের আমরা এত পক্ষপাতী কেন? সুন্দরকে আমরা কেন চাই? আমাদের প্রাণ সুন্দরকে দেখিয়া এত সুখী কেন হয়?

আমরা যেখান হইতে আসিয়াছি তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, তাহা অসীম সৌন্দর্য্যসমুদ্র—তাহা নিত্য অবিনাশী ও আনন্দ। সেই অমৃতের খনি হইতে বিন্দু বিন্দু চ্যুত জগতে বিক্ষিপ্ত হইয়া জগত এত সুন্দর হইয়াছে। আমরা সেই অমৃতের এক একটি কণা মাত্র। কণাগুলি আকর পরিত্যাগ করিয়া হাসি কান্নার মধ্যে পড়িয়াছে, সুখী হইয়াও হইতে পারিতেছে না—কি যেন একটা অভাব বোধ করিতেছে। কিসের অভাব? পূর্ণতার অভাব। কণাগুলি পূর্ণ হইতে আসিয়াছে, আবার পূর্ণে যাইতে চায়, তাহা হইলেই অভাব মোচন হইবে, অভাব মোচন হইলেই আনন্দ। তাই একটি কণা আর একটি কণাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পানে ধাবিত হয়, জগতে ছড়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া এক পূর্ণ আনন্দময় হইতে ইচ্ছা করে। তাই তোমাকে আমি এত ভালবাসি, আর তুমি আমাকে এত ভালবাস। তাই ঐ ফুটন্ত ফুলটি দেখিয়া, ঐ মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়া, ঐ ময়ূরের পুচ্ছে চক্র দেখিয়া, ঐ চাঁদের সুন্দর মুখ দেখিয়া, আরও কত কি দেখিয়া আমার মনটা নাচিয়া উঠে, ঐদিকে দৌড়াইয়া যাইতে চায়, ঐ সুন্দরগুলিকে আমার কাছে আনিতে চাই। আমিও সুন্দর, তাহারাও সুন্দর; সুন্দরে সুন্দরে মিলিয়া একটা বড় সুন্দর হইতে চাই; সুন্দরে সুন্দরে এমনই একটি অলক্ষিত সূত্র আছে। এই অলক্ষিত সূত্রে সমস্ত জগতটা গাঁথা।

জগতটা যেমন পরস্পর গাঁথা তেমনই অপর একটা অলক্ষিত সূত্রে ভগবানের সহিত জগতটা গাঁথা আছে। ভগবান সকল সৌন্দর্য্যের আকর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য যেমন ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যকে, তেমনই বৃহৎ সৌন্দর্য্য, অনন্ত সৌন্দর্য্য ভগবান এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রসৌন্দর্য্য-রাশিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমস্ত জগৎ সেই অনন্তে মিলিয়া যাইতে চায়, অপূর্ণ অবস্থায় কেহই থাকিতে চায় না। অপূর্ণতাই অভাব, অভাব যেখানে আনন্দ সেখানে নাই। পূর্ণতাই আনন্দ। তাই আমি তোমার সঙ্গে মিলিতে চাহি; আবার তুমি আমি উভয়ে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে চাই। ইহাই প্রেম। এই প্রেম তোমাতে আমাতে আছে, এবং আমাদের সহিত ভগবানের আছে। তোমাকে আমি কেন ভালবাসি? তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি আমি এক, আমরা এক হইয়া যাইতে চাই, তাই তোমাকে দেখিলে আমি তোমার কাছে সরিয়া যাই, তোমাকে

আলিঙ্গন করি; ইচ্ছা করি, তোমার আমার মাঝে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে, যেন মনে করিতে পারি তুমি আমি এক। ভগবানও আমাদের পক্ষে তাই। ভগবানের প্রতি আমাদের এত প্রেম কেন ? ভগবান ও আমরা মূলে এক; তিনি পূর্ণ, আমরা অংশ; আমরা তাঁহারই অংশ। তাঁহাতে মিলিতে পারিলেই আমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইব। তাই আমাদের প্রাণ তাঁহাকে চায়। ইহা একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে। ইহাতে লাভালাভের হিসাব, কৃতজ্ঞতা কর্ত্তব্য ইত্যাদি কিছুই নাই।

হিয়ার মাঝারে যতটুকু স্থান
তত‌টুকু তব ঠাঁই।
তুমি বিনে আর এ হৃদি মাঝারে
খুঁজে কিছু নাহি পাই॥
যতটুকু আমি ততটুকু তুমি
তুমি আমি নাহি ভেদ।
পাইয়া তোমায় তোমাতে মিশিব
ঘুচে যাবে সব খেদ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

নায়কী কানেড়া—কাওয়ালী।

বলিহারি তব মহিমা দ্যুলোকে ভূলোকে;
তোমারি মাধুরী চন্দ্র-আলোকে।
তোমারি আনন্দ প্রেমের পুলকে;
তুমিই সান্ত্বনা দারুণ শোকে॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II সসা ণা ণধা পপা। মধা পা সা রা I মজ্ঞা -া জ্ঞমপা -জ্ঞমা। রা -া সা -া।
বলি হা রি, তব মহি মা, দ্যু লো কে • ভূ•• • লো • কে •

। সা সা ণ্সরা সা। -ণ্সরা -সসণ্ ধ্ প্ I মা -া পা পা। মপধা -পমপা মজ্ঞা -রা II
তো মা রি•• মা ••• ••• ধু রী চ • ন্দ্র, আ লো•• ••• কে •

II ণপা -ণপা না না। র্সা -া র্সা র্সা I -া র্সনা র্রা র্সা। ণর্সর্রা -র্সনর্সা ণদা ণপা।
তো• •• মা রি আ • ন ন্দ • প্রে• মে র পু•• ••• ল• কে•

। -া মরা -মজ্ঞা -জ্ঞমা। জ্ঞমপা -ধণর্সা নর্সা -া I -া ণণা পা পা।
• তুমি •ই • সা•• ••• ন্ত্বনা • • দা• রু ণ

। মপধা -পমপা মজ্ঞা -রা II II
শো•• ••• কে •

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর উইলিয়ম ক্রুকস্।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর্-উইলিয়াম ক্রুকস্, যিনি Order of Merit উপাধিধারী সম্প্রদায়-ভুক্ত ও ইংলণ্ডের Royal Societyর সভাপতি, তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর। Mr. Harold Begbie তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, "Chronicle" নামক পত্রিকায় তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মানসিক শক্তি এখনো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

"৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকাটাই ত একটা সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই বয়সে বুদ্ধিকে সতেজ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকা, এবং স্বজাতির সঙ্কটকালে সমস্ত মানসিক বৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া স্বজাতির জন্য অবিশ্রান্ত কাজ করা—ইহার মত ভাল জিনিস আর কিছুই নাই। ইহা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম চিত্তকে উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ করে; এবং স্বভাবতই আমাদের মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হয়।

তাঁহার নম্রতা।

"যদি আমাদের লিখিতে হইত যে, এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিক খুব হুঙ্কার করিয়া আশার কথা বলিতেছেন, খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাজ করিতেছেন, স্বদেশ-প্রেমের অনুরোধে আপনার বয়সের বড়াই করিতেছেন, এবং নিতান্ত অবজ্ঞাসহকারে শত্রুদের কথা বলিতেছেন ও তাহাদিগকে উপহাস করিতেছেন, তাহা হইলে কথাটা বড়ই খারাপ ঠেকিত। কিন্তু সর উইলিয়াম ঠিক ইহার বিপরীত। তিনি একদিকে যেমন আধুনিক কালের একজন পরম সাহসী বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু, তেমনি চিরকালই তিনি নম্রতারও পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। এবং তাঁহার মনের উপর তাঁহার বয়সের প্রভাব এইমাত্র লক্ষিত হয় যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই নম্রতা আরো যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি খুব সাবধানে ও বিবেচনা সহকারে নিজ মত প্রকাশ করেন এবং অন্যের কার্য্য বা মতামত তিনি যেরূপ সদয়ভাবে আলোচনা করেন তাহাতে তাঁহার হৃদ্গত মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার কর্ম্ম-কক্ষ।

"তিনি আমাকে বলিলেন, এই ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোন মনোবৃত্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি জানেন না। পূর্ব্বেও যেমন তিনি কঠিন শ্রমের কাজ করিতে পারিতেন, এখনো তাহা পারেন। পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ছিল, জীবনের কাজে ঔৎসুক্য ছিল, এখনো তাহাই আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কোন দৈহিক অসামর্থ্য ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি বুঝিতে পারেন না। তিনি বলিলেন "৩৫ বৎসর বয়সে আমি যেরূপ অনুভব করিতাম, এখনো আমি সেইরূপ অনুভব করি।"

"জান্‌লার ধারে উপবিষ্ট এই বৃদ্ধের কার্য্য-নিরত সজাগ-সতর্ক পাত্‌লা দেহ-যষ্টি, অবনত স্কন্ধদেশ, প্রশান্ত ও কৌতূহলোৎফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার অনুশীলন-কক্ষের গবাক্ষদেশটি কতকগুলি কাচের গোলকে পূর্ণ; গোলকের মধ্যে স্থাপিত কতকগুলি ফিতা ও ধাতব চাকতি অবিরাম চলিতেছে—শুধু দিবালোকের শক্তি-প্রভাবে স্পন্দিত হইতেছে, ফর্-ফর্ করিয়া নড়িতেছে, চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এই খেলনাগুলির মধ্যে দুই একটি খেলনা তাঁহার প্রথম পরীক্ষার জিনিস—ইহা হইতেই (Radio meter) কিরণ-মিতি যন্ত্রের উৎপত্তি।

"ইহার পর, আমরা আরও অনেক গভীরতর প্রশ্নের অবতারণা করিলাম। এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিক আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে কতকগুলি কথা সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত।

"বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতই গভীরতর হইতেছে, যান্ত্রিক নিয়মানুসারে জীবন-ব্যাপারের ব্যাখ্যা ততই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। যদিও ৩০ বৎসর কাল ক্রুকস্ সাহেব প্রেতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ আর চালান নাই, তথাপি তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পরেও ব্যক্তির তাদাত্ম্য থাকিয়া যায়। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিধাতৃত্বে তাঁহার যে বিশ্বাস, এই যুদ্ধ তাহা টলাইতে পারে নাই। তিনি বলেন, জর্ম্মাণ যুদ্ধ-প্রণালীর ঐকান্তিক দুর্নীতিতে মত-বদ্ধ ধর্ম্মের

উপর খুব একটা আঘাত লাগিবে, যেহেতু জর্ম্মানরা নিশ্চয়ই ধর্ম্মানুরক্ত জাতি। সম্ভবত ইহার দরুণ ধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হইবে। 'পাদ্রি'-ধর্ম্মতন্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে লোকেরা আরো অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে। কিন্তু সমস্ত জড়জগতে যে আধ্যাত্মিক মূল সত্য ওত-প্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে সেই মূল সত্যে বিশ্বাস, যুদ্ধের এই সকল ভীষণ ব্যাপার কখনই শিথিল করিতে পারিবে না। জড়বিজ্ঞান কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। যে ক্ষেত্রে জড়-বিজ্ঞান কাজ করে সে ক্ষেত্র হইতে মানবের আত্মা বহিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে এবং মানবাত্মার স্পৃহাসকল চিরকালই ঐ ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন দিকে নিয়োজিত হইবে। সম্ভবত পাদ্রি-ধর্ম্মতন্ত্র অন্তর্হিত হইবে; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কখনই বিনষ্ট হইবে না; কেন না, ধর্ম্ম সনাতন; মানব ও মানব-আত্মার চরম গতি—ইহা লইয়াই ধর্ম্ম। তাছাড়া, এই যুদ্ধটা আশীর্ব্বাদ কি অভিসম্পাৎ তাহা বলা এখন অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, মঙ্গল ও অমঙ্গলের শক্তির মধ্যে ইহা একটা মহা সংগ্রাম। সম্ভবত, যে জাগতিক সংগ্রাম অনন্ত-কালের নিয়তিকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই সংগ্রা-মের একটা ছায়ামাত্র আমাদের বিশেষ-নক্ষত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুইই আছে এবং মঙ্গল অমঙ্গলের মধ্যে চিরকালই দ্বন্দ্ব চলিবে। কোন কোন সময়ে এই দ্বন্দ্ব প্রজ্বলিত হইয়া মহাযুদ্ধে পরিণত হয়, আগুন ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি, ইহা নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রে সংক্রামিত হয়।

যতোধর্ম্মস্ততোজয়।

"স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জর্ম্মানি জড়বাদ গ্রহণ করিয়াছে। "উদ্দেশ্য উপায়কে সমর্থন করে"—এই সয়তানী বুদ্ধি সমস্ত জর্ম্মান জাতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সয়তান যেরূপ স্বর্গে রাজত্ব করিতে চাহিয়াছিল সেইরূপ জর্ম্মানী যখন পৃথিবীতে একাধিপত্য করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিল, তখন, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি স্বভাবসিদ্ধ ভূত-দয়া—ইহার কোন কিছুই জর্ম্মাণ-তৌলদণ্ডের ওজনকে এক তিলও কমাইতে বাড়াইতে পারিল না। ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের শত্রু মনে করিয়া, মৈত্রীবদ্ধ শক্তিগণ জর্ম্মনীকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। রাজ্যবিস্তার বা স্বার্থ-বর্দ্ধন তাহাদের লক্ষ্য নহে, স্বাধীনতাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। মনে হয় যেন, অমঙ্গলের শক্তিগুলি জর্ম্মনের দিকে এবং মঙ্গলের শক্তিগুলি মিত্রসঙ্ঘের দিকে সবেগে ধাবমান হইয়াছে।

বিশ্বমানব-ধর্ম্ম জর্ম্মানের বিরুদ্ধে।

"এই বর্ষীয়ান বিজ্ঞানরথী অতীব শান্ত ও নম্র-ভাবে আমাদিগকে বলিলেন যে এই যুদ্ধের চরম ফল সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় নাই। বলিলেন, "তোমরা বিজয় লাভের জন্য খুব চেষ্টা কর; নিশ্চয় জানিবে, যতোধর্ম্মস্ততোজয়। "যাহা মানববুদ্ধিকে পরাস্ত করে ও হৃদয়কে নিষ্পে-ষিত করে সেই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা জানি-বার জন্য যুদ্ধ-খাতের ও-পারে,—যুবক বীরবৃন্দের সমাধিস্থানের পরপারে দৃষ্টি নিয়োগ কর। ধর্ম্মেরই জয় হইবে। সত্যই আমাদিগকে মুক্তিদান করিবে।"

ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায়।

[১৩২২ সালের ১লা ও ১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদী পাঠ কর।]

আজকাল ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষভাবে আলোচনা হই-তেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই আলোচনা নিরপেক্ষ হওয়া চাই। চিকিৎসকেরা যে ভাবে রোগ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, বৈজ্ঞানিকেরা যে ভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল পরীক্ষা করেন, আমরাও যদি সেই প্রকার নিরপেক্ষ ভাবে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির অন্তরায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করি তবেই ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল। প্রকৃত রোগ কি, নির্ণয় করিতে পারিলেই তাহার ঔষধ আবিষ্কারও সহজ হইয়া পড়ে। সত্যনির্ণয়ে কোন প্রকার পক্ষপাতের আবরণে চক্ষু ঢাকিয়া রাখিলে পরিণামে আমাদিগের নিজে-কেই ঠকিতে হইবে।

আজ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ব্রাহ্মযুবকদিগের নৈতিক অবনতির কথা বড়ই বৃহৎ আকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। কোন কোন ব্রাহ্ম বর্ত্তমানে ব্রাহ্মযুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকায় অতিমাত্র ভীত হইয়া সাধারণ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে আজকালকার ব্রাহ্মযুবকগণ চরিত্রহীন। আমরা এপ্রকার সর্ব্বগ্রাহী মন্তব্য কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। তবে এটুকু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সাধারণত ব্রাহ্মযুবকদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা নৈতিক অবনতি আজকাল বৃদ্ধ ব্রাহ্মদিগের একটা গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজ একসময়ে যে আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সে আদর্শ দেখাইতে পারিতেছেন না। নিজের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইলে যে বলের সহিত কোন কথা বলা যায়, আজকাল অধিকাংশ ব্রাহ্মযুবক সেপ্রকার দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির স্বপক্ষে কোন কথা বলিতেই পারেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতিসমর্থক কোন কথা বলিতে গেলেই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রহীনতা ও অন্যায় কার্য্যকলাপের কারণে শ্রোতৃবর্গের উপহাসের পাত্র হইয়া পড়েন এবং অগত্যা তাঁহারা শ্রোতাদিগের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে অক্ষম হয়েন।

একথা বলিলে চলিবে না যে অন্যান্য সমাজেও এই প্রকার ধর্ম্মভাবের অভাব ও নৈতিক অবনতি দেখা গিয়া থাকে। আমরা ব্রাহ্মসমাজে কেন যে আসিয়াছি সে কথা আমাদিগের যেন বেশ স্মরণ থাকে। কতকগুলি বিশেষ চিহ্নে আপনাদিগকে চিহ্নিত করিয়া কেবলমাত্র একটা সম্প্রদায় সংগঠিত করিবার জন্য তো আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই। আমাদিগের পিতামাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শের এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত আত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তভাবের কথায় আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পরিবারের সহিত কোমলতম পূর্ব্বতম স্নেহবন্ধন সকল কাটিয়া দিয়া রক্তমাখা হৃদয় লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, সে কথা কি আমরা এই অল্পদিনের ভিতরেই ভুলিতে পারি? সমাজের হস্তে তাঁহারা যে কঠোর নির্য্যাতন লাভ করিয়াছিলেন, যে প্রকার নির্দ্দয় নিষ্ঠুররূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা কি এত সহজে ভুলিবার জিনিস? তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আপনাদিগের রক্তের বিনিময়ে ব্রাহ্মসমাজকে ধর্ম্ম ও নীতির একটা উচ্চ সোপানে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা আজ তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী স্বরূপে আপনাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অধিকারী হইয়াছি; আমাদিগকে এখন আর নির্য্যাতনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে না। সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় না বলিয়াই কি আমরা ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অবনতি আনয়ন করিব? আমাদিগের যে মনে রাখিতেই হইবে যে আমরা ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে তাহার মধুময় ফল প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। অন্যান্য সমাজের তুলনায় আমাদিগের জীবনে ধর্ম্মভাবের অভাব ও নৈতিক অবনতিকে উপেক্ষা-দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিবার কোন অবকাশই নাই।

এই নৈতিক অবনতির কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের পূর্ব্বের ন্যায় নির্য্যাতনের অভাব ইহার অন্যতর কারণ। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মগণ যে নির্য্যাতন ভোগ করিতেন, সেই নির্য্যাতনের ফলে তাঁহারা আপনাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেন এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন। সেই নির্য্যাতনের কারণে ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বরে প্রীতি যেমন স্থিরনিবদ্ধ থাকিত, তেমনি তাঁহারা ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে পরস্পরকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনেও সর্ব্বদা অগ্রসর হইতেন। তখন ব্রাহ্মেরা পাছে কেহ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিবার অবসর পায়, এই জন্য আপনাদিগের চরিত্রাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মদিগের মতসমূহ প্রাচীনপন্থী

হিন্দুসমাজের ভিতরে এতটা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং সাধারণত ব্রাহ্মদিগের ভিতরে হিন্দুসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এতটা চলিয়া গিয়াছে এবং নানা সূত্রে উভয় সমাজের পরস্পর এতটা মেলা-মেশা চলিতেছে যে ব্রাহ্মদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুসমাজের নিকট তীব্র নির্যাতন ভোগ করিতে হয় না—সুবৃহৎ হিন্দুসমাজ স্বল্প পরিসর ব্রাহ্মসমাজকে পূর্ব্বের ন্যায় তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন না। কাজেই ব্রাহ্মগণ এখন একটা খুব নিশ্চিন্তভাবের মধ্যে বাস করিতেছেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এখন তাঁহারা সাংসারিক সুখের প্রতি অতি-মাত্র মমতাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদিগের হৃদয় অহমিকাতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। পরস্পরের প্রতি যে সহানুভূতির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, সংসারসুখকে অন্তরঙ্গ বন্ধুপদে বরণ করিবার কারণে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মেরা সেই অন্যোন্যসহানুভূতিও হারাইয়া ফেলিতেছেন। এই প্রকারে ঈশ্বরপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের প্রতি অনুরাগের হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহ্মদিগের নীতিমূল সকলও শিথিল হইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নিশ্চিন্তভাব আসিবার ফলে সুখের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে গেলে অর্থ সংস্থান আবশ্যক। তাই ব্রাহ্মদিগেরও মধ্যে অপরাপর সমাজভুক্ত লোকদিগের ন্যায় অর্থচেষ্টাও খুব প্রবল রূপে চলিতেছে। অর্থের যে একটা প্রবল শক্তি আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ইহার উপর আমরা একথা শতবার বলিব যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অর্থবিষয়েও ব্রাহ্মদিগের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এইটুকু বলিতে চাহি যে, যে অর্থচেষ্টাতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতে হয়, সে প্রকার অর্থচেষ্টা ব্রাহ্মের পক্ষে নরকস্বরূপ। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে নিতান্ত অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন ভাবিয়া অর্থচেষ্টা করেন। তাহাই যদি না করিলেন, তবে অন্যান্য সমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রতি নিশ্বাসে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের সহিত আত্মার দ্বারা সংযুক্ত থাকাতেই তো ব্রহ্মোপাসকদিগের বিশেষত্ব। ঈশ্বরবর্জ্জিত অর্থ-চেষ্টার ফলে দাঁড়ায় এই যে, কোন কার্য্যে অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলে আমরা সেটাকে নীতির দিক হইতে বড় একটা দেখিতে ইচ্ছা করি না—আইন বাঁচাইয়া, লোকনিন্দা, শাস্তি প্রভৃতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই পরিতুষ্ট হই। তার পর, সেই অর্থ আমার গৃহনির্ম্মাণ, আমার গাড়ীঘোড়া ক্রয়, আমার গৃহের আসাবাবক্রয় প্রভৃতি আত্মসুখবিধায়ক বিলাসসাধক কার্য্যে ব্যয় করিয়া দরিদ্র প্রতি-বেশীদিগের বা স্বসমাজস্থ দুঃস্থ বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ তাহার স্বল্পাংশও ব্যয় করিতে বিরক্তি বোধ করি। ব্রাহ্মেরা এই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মের ব্যতিরেকস্থল হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

ঈশ্বরের সহিত সকল কর্ম্মে আত্মার দ্বারা সংযুক্ত থাকাই হইল ব্রাহ্মদিগের বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্বরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইল প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা। এই নিয়মিত উপাসনার ফলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মসংযোগের অভ্যাস আসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য ঈশ্বরের নাম না লইয়া জলগ্রহণ না করা। প্রাচীনপন্থী হিন্দু-সমাজের মধ্যে আহ্নিক না করিয়া জলস্পর্শ না করিবার একটী সুন্দর নিয়ম প্রচলিত ছিল। অর্থচেষ্টার পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া সে সমাজ হইতে এই প্রথাটী অল্পে অল্পে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে। প্রাচীনপন্থী সমাজে এখনও যাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিয়া আছেন তাঁহাদিগের অনেকে অনুষ্ঠানটীর মন্ত্রাদির অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবলমাত্র নিয়মরক্ষাস্বরূপে প্রথাটী বজায় রাখিয়া যান। কিন্তু বর্ত্তমানে কয়টী ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে নিয়মিত উপাসনার প্রথা রক্ষিত হইয়াছে? যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মদিগের গৃহে এই প্রথা রক্ষিত হয়, তাহাদিগেরও অধিকাংশ স্থলে ইহা মাত্র নিয়মরক্ষাতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিতে চক্ষে জল আসে যে, অনেক

ব্রাহ্ম ঈশ্বরের উপাসনাকেই কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্ম পরিবারসমূহে উপাসনার ভাব জাগ্রত ছিল বলিয়াই তদানীন্তন ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে এক আশ্চর্য্য দৃঢ়তা দেখিতে পাই। সে প্রকার দৃঢ়তা বর্ত্তমানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। এই উপাসনার অভাবেই ব্রাহ্মসমাজ আজ পূর্ব্বের প্রভা হারাইতে বসিয়াছেন। কেবল সভাসমিতি দ্বারা, কেবল বক্তৃতা সঙ্গীতাদির দ্বারা, বা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপদেশাদি শ্রবণের দ্বারা সেই নিত্য উপাসনার স্থল কখনই পূর্ণ হইতে পারে না।

ঈশ্বরবর্জ্জিত অর্থচেষ্টার ন্যায় অতিমাত্র বা বিকৃত সাহেবীয়ানাও ব্রাহ্মদিগের নৈতিক অবনতির আর একটী কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই বিকৃত সাহেবীয়ানার দুইটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে মদ্যপান এবং স্ত্রীসংগ্রহ। অনেক ব্রাহ্ম নেতৃপরিবার ইউরোপের ও আমেরিকার দেশবিদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দুই চারি স্থলে সেই সকল পরিবারের অল্পবয়স্ক সন্তানেরা ভাল বিষয় যত শিক্ষা করুক আর নাই করুক, মদ্যপান প্রভৃতি মন্দ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া আসে। প্রাচীনপন্থী সমাজের শাস্ত্রকারগণ অনেক অভিজ্ঞতার ফলে মদ্যপানকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তার্হ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বিলাতফেরত ব্রাহ্মযুবকগণ মদ্যপান করিয়া সেই নিষেধ বিধিকে কুসংস্কার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। মদ্যপান যে দেশের, সমাজের কি ভীষণ শত্রু তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেলে মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে, স্মরণ হয়। এক সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি নানা প্রলোভন দেখাইয়াও কোন প্রকারে কুপথে লইয়া যাইতে পারে নাই; অবশেষে সে যখন সেই সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করাইতে পারিল তখন আর তাহার কোন কুকর্ম্ম অনুষ্ঠানেই বাধা রহিল না। মহর্ষিদেব উপদেশ দিয়াছেন বটে যে মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং। সকল ব্রাহ্মসমাজেরই বেদী হইতে এই বিষয়ের উপদেশ শত শতবার পুনরাবৃত্তও হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধনী ব্রাহ্ম পরিবারদিগের কয়টী পরিপার্শ্বের প্রচলিত প্রথার প্রভাব অতিক্রম করিয়া সে উপদেশ কানে তুলিবার সাহস রাখেন? মদ্যপান যে কিরূপ ভীষণ শত্রু, তাহা আজ মিত্রসঙ্ঘের রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যে সমাজ জ্ঞানে, কর্ম্মে এবং বিশেষত ধর্ম্মধনে উচ্চ আসন অধিকার করিতে চাহে, সে সমাজ হইতে মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এত স্বল্পপরিসর যে তাহার মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দোষে সমগ্র সমাজকে দোষী প্রতিপন্ন হইতে হয়।

ব্রাহ্মগণ যে মদ্যপান প্রভৃতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তেমন বলের সহিত দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, তাহার একটী প্রধান কারণ ব্রাহ্মসমাজে "জাতিব্রাহ্ম" ভাবের আবির্ভাব। আমি ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে গৃহ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মদলভুক্ত হইলাম; তার পর আমি মদ্যপানই করি বা অন্য কোন গর্হিত আচরণই করি, আমি ব্রাহ্মই রহিলাম এবং আমার বংশের সকলেই ব্রাহ্ম রহিল—আমার পরিবার ব্রাহ্মসমাজের সকল অধিকারই পাইতে থাকিল। এ অবস্থায় আমার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে আত্মরক্ষা কি সহজ? ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণের ভয় হয় যে এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে পাছে ব্রাহ্মসংখ্যা কমিয়া যায়, পাছে ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা হীন হয় ইত্যাদি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বল কি আত্মত্যাগী দৃঢ়চিত্ত দীন দরিদ্র ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? কোন কিছুর ভয় না করিয়া কর্ম্মফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মনেতাগণ নিজেদের দলের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া নির্ভীকচিত্তে অনাচারসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন, ব্রাহ্মসমাজের মলিন প্রভা উজ্জ্বল হইয়া সমগ্র জগত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, ব্রাহ্মসমাজের বলের নিকটে সকল সমাজের বল পরাজয় স্বীকার করিবে।

মদ্যপানের ন্যায় স্ত্রীসংগ্রহ বা স্ত্রীলোকের সহিত অসংযত ব্যবহার ও অল্পসংখ্যক নেতৃপরিবারে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজেরই যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন

করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা যদি ব্রাহ্মদিগের অভিলষিত হয়, জনসাধারণের সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত আদর্শ ধারণ করা যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীসংগ্রহের ন্যায় ভীষণ শত্রুকেও ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীসংগ্রহের পথ অত্যন্ত পিছিল সেটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমরা স্ত্রীপুরুষের সংযত ও সরল ভাবে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তার বিরোধী নহি—অসংযত ভাবে মেলামেশারই বিরোধী। অসংযত মেলামেশাতে মহিলাগণ আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়েন এবং পুরুষেরা স্বীয় পুরুষত্বের মর্য্যাদা হারাইয়া বসেন।

ব্রাহ্মমাত্রেরই বিশেষভাবে স্ত্রীপুরুষদিগের মেলামেশাতে সংযত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যেরই এবিষয়ে উচ্চতম আদর্শ দেখানো কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা বলিতে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আজকাল অনেক ব্রাহ্মযুবক সংসারের ভার গ্রহণে উপযুক্তরূপে সমর্থ হইতে পারেন না বলিয়া দারপরিগ্রহকে নিগ্রহ মনে করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। বাল্যবিবাহ রহিত হওয়া খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু ইহাতেই কি এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পূর্ণ হইল বলিতে পারি? প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজে এখনও বাল্যবিবাহ প্রথা সবলে চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের বাল্যবিবাহ রহিত করিবার ফলাফল কি হয় দেখিবার জন্য হিন্দুসমাজ উৎসুকনয়নে চাহিয়া আছেন। যৌবনবিবাহ প্রবর্ত্তনের ফলে ব্রাহ্মযুবকদিগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে দেখাইতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুসমাজকে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবার কোনই অধিকার নাই। যৌবনবিবাহের সুফল দেখাইবার জন্যই ব্রাহ্মদিগের সকল অবস্থাতেই স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা বিষয়ে সংযত থাকা কর্ত্তব্য। তাহার ব্যতিক্রমে ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক অবনতি এবং ধর্ম্মভাবের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী।

যে কোন সমাজে স্ত্রীসংগ্রহের ভাব প্রবল হইয়া উঠিলে বিলাসের মাত্রাও যে অধিক হইয়া উঠে, সে কথা বোধ হয় কাহাকেও সবিস্তার বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তখন সেই সমাজের লোকেরা এতই বিলাসী হইয়া উঠে যে দেশের মোটা ভাতে তাহাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং দেশের মোটা কাপড় নিতান্ত ভারবহ মনে হয়। তখন তাহাদিগের শরীর রক্ষার জন্য যেমন ক্রমাগত সরু হইতে সরু চাউলের অন্ন ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ বেশভূষার জন্য তাহাদিগের নিকটে জর্ম্মানি প্রভৃতি বিদেশে প্রস্তুত সকল রেশম প্রভৃতির পাতলা হইতে পাতলা এবং ক্ষণিকচমক অথচ ক্ষণনশ্বর বস্ত্রসকল যথেষ্ট আদর পাইয়া থাকে। সেই সকলের পশ্চাতে তাহাদিগের এত অর্থ অকাতরে ব্যয় হইয়া যায় যে অপরের দুঃখ কষ্ট নিবারণে ব্যয় করিবার মত অর্থ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তারপর, কেবল নিজেরাই ইহার ফলভোগী হয় না। তাহারা নিজেদের দুর্ব্বল শরীর দুর্ব্বল মন উত্তরাধিকারসূত্রে বংশপরম্পরায় পরিচালিত করে; নিজেদের দৃষ্টান্তে সন্তানদিগকে বিলাসী প্রভৃতি করিয়া গড়িয়া তুলে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্রাহ্মনেতাগণ এই সকল ভীষণ রোগের প্রতীকারের অক্ষমতা স্বীকার করিলে অবিলম্বে ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিউন। তাঁহারা কেবল অর্থচেষ্টা প্রভৃতি সাংসারিক সুখসাধক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা দেশের মুখ চাহিয়া, সমাজের মুখ চাহিয়া, পরিবারের মুখ চাহিয়া এই সকল রোগের প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হউন। এই প্রতীকারের উপায় প্রতি ব্রাহ্মের গৃহে—গৃহে—গৃহে। প্রতি ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনার ভাব জাগিয়া উঠুক; বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা বর্ষীয়সী মহিলা স্ব স্ব পরিবারের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনাকে নিত্যকর্ম্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন; পরিবারস্থ সন্তানবর্গের নিকটে ঈশ্বরের কথা নীতির কথা সকল ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হউক। ঈশ্বরের মঙ্গল নিশ্বাস প্রতি গৃহে প্রবাহিত হউক। মদ্যপান প্রভৃতি অমিতাচার তখন আপনিই ব্রাহ্ম পরিবার হইতে পলায়ন করিবে। এ সকল বিষয়ে গৃহে পিতামাতা ভাইভগ্নীর দৃষ্টান্তের ন্যায়, শত সহস্র সভাসমিতিই বল বা প্রতিজ্ঞাই বল, অপর কোন কিছুই ফলদায়ক হয় না। এই সকল অমি-

তাচার বিদূরিত হইলে আমাদিগের এত অধিক সংখ্যক বালক বালিকাকে অল্পবয়সে চসমা ধারণ করিতে দেখিতে হইবে না এবং nervous break-down বা অবসাদের ফলে এত কাসরোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখিতে হইবে না। প্রত্যেক পিতামাতা স্বীয় দৃষ্টান্তে সন্তানগণকে উপাসনার পথে এবং ব্রহ্মচর্য্যের পথে পরিচালিত করুন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদিগের গৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

আমরা যেমন ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক অবনতির কয়েকটী মূল কারণ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য বলিয়া আসিলাম, সেইরূপ অবান্তর কারণ বিষয়েও দুই একটী কথা বলিতে চাহি। অবান্তর কারণসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে উপযুক্ত প্রচারকের অভাব। গৃহে যেমন পিতা-মাতা সন্তানগণের শরীরমনকে ঈশ্বরের পথে চলিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন, বাহিরে সেইরূপ প্রচারকগণ বালকদিগকে পরিপার্শ্বের মন্দ-প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই কারণে এমন প্রচারক নিযুক্ত করা উচিত যাঁহায়া সহজেই বালকদিগের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মসাহিত্যের দুই চারিটী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচারকের পদে আসীন হইলে চলিবে না। বর্ত্তমানে প্রচারকদিগের একটু প্রৌঢ়বয়স্ক এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক বিষয়ে সুপণ্ডিত হইতে হইবে। বর্ত্তমানের অনেক প্রচারকদিগের অসার বক্তৃতার ফলে কুফল ফলিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আসলে ধরিতে গেলে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই কথাতে ও কার্য্যে এক একটী প্রচারক হওয়া উচিত, কেবল কর্ম্মের সুবিধার জন্য কতকগুলি লোককে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া বিশেষভাবে প্রচারকপদে বরিত হইতে হয় এইমাত্র।

বিলাতী ধরণে প্রচারক প্রস্তুত করিলে ভারতের যে বিশেষ উপকার হইবে আমাদিগের তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রচারকের বিভিন্নতার কারণেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের কৃতকার্য্যতা বিষয়ে এতটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তির সাহায্যে কেবল বিলাত পাঠাইলেই ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী প্রচারক প্রস্তুত হয় কি না সন্দেহ। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অবশ্য সাধু উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী স্বর্ণগোলক নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেইটী পাইয়া বিলাত যাইবার জন্য ব্রাহ্মমহলে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই উপলক্ষে ভোটসংগ্রহ ব্যাপারটী অনেকটা রাজনৈতিক ভোটসংগ্রহের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে প্রার্থীগণের অন্তর হইতে ধর্ম্মের ভাব প্রথমাবধিই পলায়ন করিবার উপক্রম করে—ধর্ম্মভাবের বিরোধী শত্রু অহমিকা অত্যন্ত জাগ্রত হইয়া উঠে, আত্মগরিমা প্রকাশ করিতে গিয়া বিনয় বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বা স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াও সংবাদপত্রে স্বীয় নাম মুদ্রিত দেখিবার ইচ্ছা বা লোকমুখে আত্মপ্রশংসা শুনিবার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তবে প্রচারক রূপে উপযুক্ত হইবার পথে দাঁড়াইবে। ম্যাঞ্চেষ্টার-প্রত্যাগতদিগের মধ্যে সে ভাবটী আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও তাহার সম্ভাবনা খুব অল্প।

ব্রাহ্মসমাজের যাঁহারা প্রচারক হইবেন, তাঁহাদিগের শাখানির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকা কর্ত্তব্য। ম্যাঞ্চেষ্টারপ্রত্যাগত প্রচারকগণ এবং তিন ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ মিলিত হইয়া এই ভারতবর্ষে কি একটী প্রচারক-বিদ্যালয়ের মত সত্যিকার কোন কিছু খুলিতে পারেন না? এই বিষয়ে যদি তিন সমাজ না মিলিতে পারেন, তবে তাঁহারা ভ্রাতৃভাবের সুদীর্ঘ বক্তৃতা পরিত্যাগ করুন। আর এই বিষয়ে মিলিত হওয়া এতই কি কঠিন? যদি তিন সমাজ আপনাপন সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব রক্ষার দিকে বেশী ঝোঁক না দিয়া মূল ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের উপর দাঁড়ান, তাহা হইলেই এবিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক থাকে বলিয়া বোধ হয় না। এই বিদ্যালয়ে প্রস্তুত প্রচারকগণের একটী প্রতিজ্ঞা বিশেষভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে আত্মধর্ম্মের প্রশংসা করিতে গিয়া পরধর্ম্মের নিন্দা কিছুতেই করিবেন না; আত্মধর্ম্ম লইয়াও বৃথা গর্ব্ব করিবেন না। তাঁহাদের জানা উচিত যে, সকল নদী যেমন

সাগরের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এক মাত্র সকলেরই গন্তব্যস্থল। ঈশ্বরে প্রতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহাদের যেমন সর্ব্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত, তেমনি তাহাই তাঁহাদের প্রচারেরও সর্ব্বপ্রধান বিষয় হওয়া উচিত। সামাজিক অনুষ্ঠানাদির ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া তর্ক করিতে ইচ্ছা করিলে সে তর্কের সীমা পাওয়া যাইবে না, সুতরাং তাহা প্রচারকদিগের পাঠ্যতালিকা হইতে পরিবর্জ্জনীয়। অবান্তর বিষয়ে একজনের সহিত অপরের মতের ঐক্য হইল না বলিয়া যেন উভয়ে পরস্পরকে হেয় বলিয়া মনে না করেন। রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীডের মূল মন্ত্র এবং ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ অবলম্বনে, আমাদের বিশ্বাস, তিন সমাজ মিলিত হইয়া অনায়াসে এইরূপ একটী প্রচারকবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে সমর্থ। প্রচারক সংগঠিত হইলে তাঁহারা ছাত্রাবাস প্রভৃতি স্থানে গিয়া আশাতীত উপকার করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

আমাদের উক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায় সমুহ অচিরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, ইহা খুব আশা করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহন রায়।

(গত ১৩ই আশ্বিনের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

৮২ বৎসর পুর্ব্বে ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে নববঙ্গের জন্মদাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার জন্ম দ্বারা পূর্ব্ব এবং মৃত্যু দ্বারা পশ্চিমকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সুধীসমাজ বাঙ্গালীর এই মহাপুরুষকে প্রত্যেক বৎসর এই দিনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন।

গত ১০ই আশ্বিন সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে এই মহাপুরুষের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই স্মৃতিসভার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

আপনারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার মুখে শুনেছেন যে রাজা রামমোহনের কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম্মবৈচিত্র্য বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলিব। এ যাবৎ আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁহার রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজ সংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুক্‌রা টুক্‌রা করে কোন মহৎ-চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষতঃ যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ব, তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা, কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা'হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে স্বীকার করে, রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁহার মহত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দালাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।" সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্চে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলি দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ছন্ন করে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই একেকেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখা'লেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বল্‌লেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এই খানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একেকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদুর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন—"ভাব সেই একে।"

আজকার সভার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত—"ভাব সেই একে" ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড় যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড় যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক দিয়া দেখ্‌লে চল্‌বে না; তিনি একেকে, সত্যকে লাভ করেছেন. সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দায় মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা

কড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হো'ক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।"

এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী, ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই তাঁর জীবনধারা দেখ্‌তে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্চি তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করচি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখ্‌তে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই; সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে, আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড় হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড় না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড় হতে পারে না। তাঁদের সেবা, তাঁদের প্রেম তাঁদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা একথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার।*

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত দানবীর শ্রীযুক্ত রতন তাতা পাটলিপুত্র খননের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হওয়ায় বিগত ১৯১২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী স্যর্ জন মার্শাল পাটলিপুত্রে আগমন করেন এবং ডাক্তার ডি, বি, স্পুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া কুমরাহার ও বুলন্দিবাগ নামক দুইটি স্থান খনন করিতে উপদেশ দেন। ১৯১৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী ডাঃ সপুনারের তত্ত্বাবধানে প্রথম খনন কার্য্যারম্ভ হয়। এই খননে পাটলিপুত্র, অশোক ও বৌদ্ধ ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। বিগত বর্ষে (১৯১৪ খৃঃ) ডাক্তার সপুনার কুমরাহারে (site no III) মৃত্তিকা নির্ম্মিত একখানি 'প্লাক' (Plaque measures 41/8" by 35/8") এক ফুট ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিয়া বোধগয়া মন্দিরের প্রচলিত ইতিহাসকে একটু নাড়াচাড়া দিয়াছেন। মানুষ বহুদিন হইতে যে কথাটী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে আজ হঠাৎ সেই সত্যের মূলে কেহ ধাক্কা দিলে তাহা সমাজের অধিকাংশ লোকই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে চায় না। তবে বড় একটা শক্তি আসিয়া যখন নূতন সত্য প্রচার করে তখন তাহা আজ হউক কাল হউক সকলকেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। একখানি মৃণ্ময় মূর্ত্তি (Plaque) প্রাচীন বোধগয়া মন্দিরের আকার ও অবয়বের যে অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব বাহির করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। জীর্ণ সংস্কারে বর্ত্তমান মন্দিরটীকে যে ভাবে ও আকারে দেখিতে পাই পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত 'প্লাকের' সঙ্গে তাহার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ সপুনার বলেন কানিংহাম সাহেব ১৮৮০ অব্দে বোধিমন্দিরের সংস্কারের সময় এই 'প্লাক' খানি পাইলে বোধ হয় মন্দিরের মৌলিক গঠন কিরূপ ছিল তাহা ঠিক ঠিক রূপে বুঝিতে পারিতেন। কেবল কানিংহামের সময়েই নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যখন এই মন্দিরের কোনরূপ সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেই সঙ্গে ইহার স্থাপত্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হুয়েনস্যাঙ্‌ ইহার গঠন প্রণালীর যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এক্ষণে মন্দিরের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দে ব্রহ্মদেশবাসিগণের দ্বারা এই মন্দির সংস্কারের সময় ব্রহ্মদেশীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য কতক পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মোটকথা, বিভিন্ন যুগের সংস্কারে ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়া এক্ষণে উহা এক নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

প্লাক খানি বিশেষভাবে পরীক্ষার পর ডাঃ সপুনার স্থির করিয়াছেন "যেখানে ইহা পাওয়া গিয়াছে সেই স্থান একটি গোরস্থানের উত্তরে অবস্থিত। এই সমাধিস্তূপ পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পর্সিপলিস্‌ নগরের সম্রাট ডরাউস্‌-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলীর অনুরূপ।" এইস্থানে মৃত্তিকাস্তরের এত উর্দ্ধে কি করিয়া প্লাক খানি আসিল সে সম্বন্ধে ডাঃ সপুনার বলেন,—'it must be due to some disturbance of the soil' ভূকম্প অথবা অন্য কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত ভূস্তরের সহিত প্লাক খানি উর্দ্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত ভূমির সন্নিকট ৬ ফিট্‌ মাটির নীচে কুশান যুগের বহু তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ডাঃ সপুনার অনুমান করেন 'প্লাক খানা সম্ভবতঃ কুশান যুগের, অন্ততঃ ২য় অথবা ৩য় শতাব্দের হইবে।' * * * * 'প্লাকের সম্মুখভাগ অতি অল্প মাত্রায় সংবৃত-মধ্য (concave), পশ্চাদ্ভাগ কুব্জপৃষ্ঠ। পশ্চাদ্ভাগে ধরিবার জন্য দুইটি (সম্ভবতঃ চারিটি ছিল) বাঁট দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রয়োজন

* বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধান সমিতির ত্রৈমাসিক জর্ণেলের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Bodh Gaya Plaque' প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

ছিল না বলিয়া এই পশ্চাদ্ভাগ অন্যান্য সাদাসিদে রকমের প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সম্মুখভাগ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত। ইহার মাঝখানে বোধগয়া মন্দিরের অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীনতম চিত্র অঙ্কিত।" * এই মন্দিরের বাহ্যদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'We see a tall tower-like structure, with four stories or tiers with niches above the main cella, the whole being surmounted by a complete stupa with five-fold *hti*'.

ডাঃ সপুনার বলেন, 'বর্ত্তমান প্লাক দেখিয়া বুঝা যায় যে মন্দিরের চূড়ার গঠনপ্রণালী ঐতিহাসিক সূত্রে ভুল। প্রধান অংশটি আংশিক ভাবে অনাবৃত; সুবৃহৎ খিলানের মধ্যপথে সোজাসুজি মন্দিরের দিকে তাকাইলে বুদ্ধদেবের আসীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূল মন্দিরের বাহিরে, প্রধান মন্দিরাংশের দক্ষিণে ও বামদিকে আরও দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে; ইহাদের দেবভাব চতুর্দ্দিকের মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে প্রতিপন্ন হয়। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিই চৈন পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্বের রৌপ্যমূর্ত্তি, কিন্তু ইহার কোনও চিহ্ন এখন আর নাই। বহুমূল্য ধাতুসংযোগে পবিত্র মূর্ত্তিগঠন করা ভুল বলিতে হইবে। আরও দূরে এবং উভয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এবং এই সকল বোধিসত্বের মূর্ত্তি ঘিরিয়া বিখ্যাত রেলিং বা বেষ্টনী আছে। ইহা সাধারণতঃ অশোকরেলিং বলিয়া কথিত হয় এবং বহু গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মৌর্য্যদের সময়ের নয়, বরং তৎপরবর্ত্তী সুঙ্গরাজাদের সময়ের, কিম্বা আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই রেলিং কেবল মন্দিরের পবিত্র অংশটুকু ও আঙ্গিনা ঘিরিয়া আছে। প্রশস্ত প্রাচীর ও সুউচ্চ প্রবেশদ্বার হইতেই ইহার বাহিরের সীমা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার প্লাকের নিম্নভাগে অতি সংক্ষেপে অল্প স্থানের উপর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য দুই চারিটি রেখাপাত থাকিলেও প্রাচীর যে মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত জমিটার বেষ্টনীস্বরূপ তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।"

প্লাকের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, মধ্যবেষ্টনীর প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি হস্তী মূর্ত্তি; ইহার স্থাপত্য বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলে অশোকের অন্যান্য বহু স্তম্ভের সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা যে রাজা অশোকেরই নির্ম্মিত তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শুধু ইহা হইতেই প্লাকের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। চৈন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে বোধিগয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মৌর্য্যস্তম্ভের কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই, এমন কি তিনি সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখও করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই উক্ত স্তম্ভটী পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমান প্লাকখানি ন্যূনপক্ষে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে।

প্লাকে অতি অস্পষ্টভাবে খোদিত অক্ষর হইতেও উপরোক্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। অক্ষরগুলি এতই অস্পষ্ট যে উহা আলোকচিত্রে একেবারেই ফুটিয়া উঠে না। সুঙ্গন রেলিংএর মধ্যে প্রবেশপথের বামপার্শ্বে অক্ষরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ সপুনার উহা পড়িতে পারেন নাই। তবে তিনি অনুমান করেন যে 'it is certain even so that the characters are those of the kharoshthi alphabet. This is indeed an unexpected feature, and one which is most suggestive. It is the first epigraph in this India form of PersoAramaic to be found in eastern India.'

প্লাকের খোদিত মন্দির-প্রাঙ্গণ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, মাঝে মাঝে মন্দির, স্তূপ ও দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দুই একটি পূজারত ব্যক্তি এবং দুই একটি জীব জন্তুর (সম্ভবতঃ হস্তী) চিত্রও অঙ্কিত আছে। মূল মন্দিরের সর্ব্বোপরি আকাশে উড্ডীয়মান চারিটি দেবমূর্ত্তি এই পুণ্যভূমিকে পূজা করিতেছে এইভাবে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার নানা মূর্ত্তি অথবা পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরের চিত্র হইতে কোন্‌টি যে কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ প্লাকের শিল্পী চিত্রে ব্যক্তিত্ব অথবা বস্তুনির্দ্দেশের জন্য প্রয়াস পান নাই। পাটলিপুত্র খননে বোধগয়ার প্লাক কি করিয়া যে আবিষ্কৃত হইল সে সম্বন্ধে ডাঃ সপুনার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন—'ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অসংখ্য বৌদ্ধযাত্রী পুণ্যক্ষেত্র বোধগয়ায় আসিয়া মন্দিরের 'প্লাক' খরিদ করিয়া দেশে লইয়া যাইতেন।' * সম্ভবতঃ তীর্থযাত্রীরা বোধগয়া হইতে ইহা গৃহে আনিয়া থাকিবেন। ইহা নিশ্চয় যে আমাদের খননভূমির সন্নিকটে খৃষ্টশতাব্দের আদিযুগে কোন বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সম্ভবতঃ বিহারের কোন ভিক্ষু বোধগয়া হইতে এই প্লাকখান আনিয়া থাকিবেন।' † ইহাই প্লাকের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

বিজ্ঞাপন।

অগামী ৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে উৎসবে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

বেহালা
১৮৩১ শক,
২০শে কার্ত্তিক।

শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

---

* 'Unquestionably the oldest drawing of this building in existence.'

* 'Such plaques as these, although this is an unusually elaborate one, were seemingly manufactured at the various sacred sites and sold to pilgrims, who then brought them to their several homes as souvenirs or mementoes of their pilgrimage.'

† বর্ত্তমান যুগেও আমরা বহু পুণ্যস্থানের মন্দির ও দেবতার প্লাক বা মৃন্ময়মূর্ত্তি খরিদ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববঙ্গে আমরাই মাধবের মৃণ্ময়মূর্ত্তি ধনী-দরিদ্র সকল হিন্দুর গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একমেবাদ্বিতীয়ং

উনবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৬।

৮৬৮ সংখ্যা

১৮৩৭ শক,

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

প্রভাতে উদ্বোধন।

এই শুভ নির্ম্মল প্রাতঃকালে এসো আমরা সেই পবিত্র প্রাণারাম পরমপুরুষকে হৃদয়সিংহাসনে বসিবার জন্য আহ্বান করি। এসো, একবার ক্ষণকালের জন্য হৃদয় থেকে সংসারের সমুদয় চিন্তা, সমুদয় মলিনতা দূর করে সেখানে সেই পবিত্র স্বরূপকে বসাইয়া পূজা করি। সংসারের পথে চলিতে গেলেই আমরা আঘাত তো পাইবই—চারিদিকেই যে কণ্টকপূর্ণ পথ। সেই আঘাত পাইয়া আমরা যেন তাঁহাকে না ভুলিয়া যাই। ভুলিব কি রূপে? আঘাত পাইলেই তো সেই দয়াময় পিতা স্নেহময়ী মাতার নিকটে আশ্রয় লইবার জন্য আরও বেশী ইচ্ছা হইবে, তাঁরই কাছে তো আশ্রয়ের জন্য, আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছুটিয়া যাইব। তখন তিনিই যে আমাদিগকে কণ্টকাবৃত সংসারগহনের পথ হইতে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবেন। তাঁহার আশ্রয় পাইলে আমাদের কিসের ভয়? একদিকে তিনি বিশ্বের অধিপতি—তাঁহার ললাটে শতকোটী চন্দ্রসূর্য্যখচিত মুকুটরাজি ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে এবং আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আবার তিনিই আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কীটেরও হৃদয়ে বসিয়া প্রতি নিমিষের অশ্রুজল মুছাইয়া দেন, রক্ষাকবচ হইয়া আমাদের প্রত্যেককে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সকলই আশ্চর্য্য—তাঁহার মহিমাও যেমন আশ্চর্য্য, তাঁহার কৃপাও তেমনই আশ্চর্য্য। এই প্রাতঃকালে এসো, আমরা তাঁহার বিশ্বরাজ্যের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-তারকা গিরি অরণ্য নদ নদী সকলের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহারই গুণগান করিয়া জীবনকে ধন্য করি।

ঈশ্বর লাভ।

একদিন আমার একটী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কি প্রকারে? প্রশ্নটী চিরপুরাতন, কিন্তু ইহাতে চিরকালের মত ভাবিবারও যথেষ্ট নূতন নূতন বিষয় পাওয়া যায়। আমিও প্রশ্নের একটী চিরপুরাতন উত্তর দিলাম যে ঈশ্বরকে ডাকিবার মত ডাকিতে পারি-লেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এই উত্তরের উপর বন্ধুটী প্রশ্ন করিলেন যে তাঁকে ডাকিবার মত ডাকিতে গেলে কেমন করিয়া ডাকিতে হয়। এই প্রশ্নটী বন্ধু অবশ্য দুই নিশ্বাসে করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে তত সহজ হইল না। এই প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির আশাতেই কত ঋষি মুনি কত কাল ধরিয়া ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ধ্যান ধারণায় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। তথাপি আমাদের ভিতরে যখন

এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখন ইহার উত্তর একেবারে না দিলেই বা চলিবে কেন? প্রশ্নও যখন ভগবান পাঠাইয়াছেন, উত্তরও তখন তিনিই প্রেরণ করিবেন এই ভরসায় আমি উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে ঈশ্বরকে পাওয়া, এই কথাটীর অর্থ কি? যে প্রকারে টাকাকড়ি আমরা হস্তগত করি, যে প্রকারে গাড়ী ঘোড়া আমাদের হস্তগত হয়, ঈশ্বরকে তো আর সে প্রকারে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে পাইতে হইবে বলিলে আমি এই বুঝি যে নিজের আত্মাকে ঈশ্বরের দ্বারা (উপনিষদের কথায়) আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে হইবে, ঈশ্বরের ভিতরে আত্মাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে।

এইটুকু যদি আমরা একেবারে মনের মধ্যে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারি যে ঈশ্বরকে পাইতে হইলে নিজেকে ঈশ্বরের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া আসিবে।

ঈশ্বরের দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, তাঁহার ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবে বলিলেই বুঝা যায় যে, সে অবস্থায় তুমি তোমার চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাইবে না। ইহা বেশ বুঝা যায় যে, সে অবস্থায় তোমার জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের একটী নিমেষও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদনিক্ষেপ করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরকে পাওয়া আর তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া জীবন না চালানো, উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্বন্ধ—একটীকে ছাড়িয়া অপরটী থাকিতে পারে না। আমরা ইহাকে একটু ঘুরাইয়া খুব জোরের সহিত বলিতে পারি যে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া জীবনটাকে না পরিচালিত করিলেই আমরা তাঁহাকে পাইতে পারিব।

এখন দেখিতে হইবে যে কি উপায় অবলম্বন করিলে জীবনটা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিবে না। এইটীর সহজ উপায় হইতেছে সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করা। ঐ যে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে আহারে বিহারে, স্বপনে জাগরণে, বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিবার অভ্যাস করিতে হইবে, কথাটী অত্যন্ত ঠিক। আহারে বসিবে, ভাবিবে যে তাঁহারই দান উপভোগ করিতেছ; কর্ম্ম করিবে, ভাবিবে যে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছ। নিদ্রার আশ্রয় লইবে, ভাবিবে যে তাঁহারই অভয় ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছ; আবার যখন জাগ্রত হইবে, তখন ভাবিবে যে তাঁহারই প্রেমহস্ত তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তোমাকে জাগাইয়া দিয়াছেন। যখন সম্পদ লাভ হইবে, তখন ভাবিবে যে পরের দুঃখমোচনের জন্য তিনি তোমার নিকট সেই সম্পদ গচ্ছিত রাখিয়াছেন; আবার যখন বিপদ আসিবে, তখন ভাবিবে যে তিনিই তাহা তোমারই মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং অম্লানবদনে তাহা বহন করিবে। এইরূপে সকল কর্ম্মে, তোমার প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁহাকে দেখিতে অভ্যাস করিলেই তোমার জীবন কিছুতেই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ঐ যে লোকেরা কূটপ্রশ্ন করে যে কেহ মন্দ কর্ম্ম করিলেও কি তাঁহার কর্ম্ম করা হইতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে? এ প্রকার কূটপ্রশ্ন একটীবারও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। ঐ প্রকার কূটপ্রশ্ন মনে স্থান দিলেই আত্মা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ঈশ্বর হইতেও দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। তখন আবার সেই কেন্দ্রভ্রষ্ট আত্মাকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ যত্ন ও চেষ্টাসাপেক্ষ। প্রকৃত কথা এই যে তোমার প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করিলে, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কর্ম্ম সত্য সত্য ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া দিলে তুমি কিছুতেই মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তই হইতে পারিবে না—ইহা একেবারে ধ্রুবসত্য। কল্পিত দেবদেবীর কথা এস্থলে বলিতেছি না। সত্য সত্য জ্ঞানময় মঙ্গলময় ঈশ্বরকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহারই চরণে তোমার সকল কর্ম্ম সকল জীবন সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার জীবনের একটী পদনিক্ষেপও মন্দ পথে যাইতে পারিবে না। আর যদি তুমি ভুলক্রমে দৈবাৎ কোন সময়ে মন্দ পথে পদনিক্ষেপ করিয়াও ফেল, তাহা হইলে সেই শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরই তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাহা হইতে তোমাকে পরিমুক্ত করিবেন—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিও না।

সকল কর্ম্মে যখন ভগবানকে স্মরণ করিলেই তাঁহাকে সহজে পাওয়া যাইতে পারে, তখন আমাদিগের দেখিতে হইবে যে কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে স্মরণ করিবার অভ্যাসযোগটা আসিতে পারে। সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবার অর্থই এই যে সকল কার্য্যে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, আপনাকে দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। সকল কার্য্যেই 'আমি নয়, তুমি' বলিতে হইবে, জানিতে হইবে। এইরূপ 'আমি নয়, তুমি' বলা কিসে সহজ হইয়া দাঁড়ায় তাহাই দেখিতে হইবে।

আমার বোধ হয় যে একমাত্র প্রেমই এই ভাবের উপর দাঁড়াইবার সহজ পথ। আপনাকে ত্যাগ করাইবার পক্ষে প্রেমের ন্যায় আর কোন পদার্থ আছে কি না সন্দেহ। প্রেমই আপনাকে আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করে, আপনার বিষয় ভাবিবারই অবসর দেয় না। আবার প্রেমই পরকে আপনার করিয়া লয়; প্রেমই নিজের যাহা কিছু তাহার সকলই প্রীতিপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। আমি যদি নিজেকে ভাল বাসি, তাহা হইলে নিজেরই সুখ অন্বেষণ করিব, তাহাতে আমি স্বার্থপর হইয়া উঠিব। এই আত্মপ্রীতি প্রেমের অপভ্রংশ, প্রেমনামের উপযুক্ত নহে। যে প্রেমের বলে তুমি নিজেকে ভুলিতে পারিবে, তোমার অতিরিক্ত অপরের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হইয়া যাইতে পারিবে, সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম। এই প্রকার প্রেমের দ্বারা কাহাকেও ভাল না বাসিলে সকল কর্ম্মে তাহাকে স্মরণ করা, সকল কার্য্যে 'আমি নয় তুমি' বলা বড় সহজ নহে—বোধ হয় অসম্ভব। যাহাকে না প্রীতি করা যায়, তাহার জন্য কে কবে ভাবিয়া থাকে, নিজের চিন্তার মধ্যে কে কবে তাহাকে স্থান দেয়? তুমি যাহাকে ভাল বাসিবে তারই জন্য তুমি নিজেকে ছাড়িতে পার, আর তোমার সেই শূন্য স্থানে তোমার প্রীতিপাত্রকে বসাইতে পার। যে কাহাকেও ভালবাসে নাই সে মানুষ নহে। ভাল বাসিয়া যদি মৃত্যুও হয় তাহাও যে জীবন। এই জন্য কোন পাশ্চাত্য কবি বলিয়া গিয়াছেন যে ভাল বাসিয়া প্রীতিপাত্রকে হারাণোও একেবারে না ভাল বাসিবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভাল বাসিয়া হারাইলেও যে তুমি আপনাকে দিতে শিখিয়াছ, কিন্তু ভাল না বাসিলে আপনাকে যে কি প্রকারে দিতে হয় তাহাই যে শিখিলে না। এই প্রেমের পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখিতে পাইবে যে ইহা সেই ঈশ্বরে সমর্পিত না হইলে কিছুতেই কৃতার্থ হয় না। একমাত্র তাঁহাকেই যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করা যাইতে পারে, তাঁহাকেই যে প্রাণের সকল কথা, সকল ব্যথা বলা যাইতে পারে।

প্রেম ঈশ্বরকে পাইবার সহজ পথ বলিয়াই উহা আমাদের অন্তরে জন্মাবধি নিহিত থাকে। মানুষ, এমন কি, জীবজন্তু কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মাবধিই প্রেমের স্পর্শ দেয় এবং প্রেমের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়। আর, এমন মনুষ্য কি আছে, যাহার মৃত্যুতে অন্তত একটী লোককেও অশ্রুপাত করিতে দেখা যায় না? এমন মনুষ্য কি আছে যে মৃত্যুকালে অন্তত একটী লোকেরও কাছে স্নেহপ্রেমের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না?

এই প্রেম বিভিন্ন মনুষ্যের বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন আকারে ও বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সন্তান যখন পিতামাতাকে ভালবাসে, তখন তাহা ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়; স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম মধুর দাম্পত্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়; পিতামাতার প্রেম সন্তানের উপর স্নেহ করুণার আকারে নেমে আসে; আবার বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি মধুর সখ্যের মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। এখন, যাহার হৃদয়ে যে আকারে প্রেম প্রকটরূপে বিকশিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রেমের সেই মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে ডাকিলে সহজে ঈশ্বরকে পাইতে পারিবে। কোন সন্তান যদি পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তবে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলেই তাহার পক্ষে ঈশ্বরকে ডাকিবার মত ডাকা হইবে এবং তাহা হইলেই ভগবানের কাছে সহজে সেই ডাকের সাড়াও পাইতে পারিবে। তাহার পক্ষে পিতার জন্য আত্মত্যাগ সহজ হইবে। সে সকল কর্ম্মে পিতাকে সহজেই স্মরণ করিতে পারিবে, সকল কর্ম্মেই পিতার উদ্দেশ্যে অনায়াসেই 'আমি নয়, তুমি' বলিতে পারিবে; তাঁহার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে সে কখনই কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। পিতার জন্য এইরূপ আত্মত্যাগ যখন তাহার অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, তখন একবার ঈশ্বরকে পিতার পিতা পরমপিতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরের জন্যও আত্মত্যাগ সহজ হইবে; তখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'আমি নয়, তুমি' বলিতে বলিতে সে অনায়াসে আপনাকে ভগবৎ-প্রেমের অনন্তমধুর সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে পারিবে এবং তখনই তাহার ঈশ্বরকে পাওয়া সিদ্ধ হইবে। অন্যান্য প্রেমের মূর্ত্তি সম্বন্ধেও এই কথা সম্পূর্ণই খাটিবে।

সাকারে নিরাকার পূজা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাধনাসিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলে এইরূপ জীবন্ত সাকারের মধ্য দিয়া যাও, বাস্তবিকই সিদ্ধির পথে সহজে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে, মৃৎপাষাণ-নির্ম্মিত বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া যখন আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে, তখন তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া কোন কিছুই আর দেখিতে পাইবে না; তখন সকলেরই ভিতর তাঁহাকে এবং তাঁহারই ভিতর সকলকে দেখিতে পাইবে। তখন হিমাদ্রি শিখরের উচ্চতায় তাঁহারই মহোচ্চভাবের ছায়া দেখিতে পাইবে, সমুদ্রের মহিমায় তাঁহারই অতল-স্পর্শ অনন্তগম্ভীর ভাব উপলব্ধি করিবে। ঐ অগণিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রমণ্ডিত অনন্ত সুনীল আকাশকে বুদ্ধি দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহারই স্পর্শ অন্তরে অনুভব করিবে। গোলাপের সুগন্ধে তাঁহারই গন্ধের সুবাস পাইবে। পদ্মের কোমল শ্রীতে তাঁহারই কোমল মধুর শ্রীর আভাস পাইবে।

যখন সকল কর্ম্মে প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবে, যখন তুমি নিজেকে তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতে পারিবে, তখন তোমার আর এ প্রশ্ন করিতে হইবে না যে কেমন করিয়া ডাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—তোমার অন্তরে এই প্রশ্নের উত্তর আপনিই উপস্থিত হইবে।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সহযোগী বলিয়া যে কয়জন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহাদিগের অন্যতম। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর যখন সকলেই ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর যেমন একদিকে অর্থরূপ অন্নদানের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তেমনি অপরদিকে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ ও ব্যাখ্যান প্রভৃতির সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একাদিক্রমে দ্বাদশ-বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব বলেন—"বিদ্যাবাগীশ যথার্থ ধর্ম্মভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তাঁর কথায়, তাঁর ব্যাখ্যানে আমাদের মন আকৃষ্ট হইত। * * * তিনি রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই।" "রামমোহন রায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। * * * সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টিবাদল হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসনা এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্য্য একাকী করিতে হইত।" এক কথায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াইতে পারিত কি না সন্দেহ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এই তিনজনেরই রামমোহন রায়ের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ছিল, তাই তাঁহারা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রীতি সম্বন্ধে মহর্ষিদেব বলেন—"তিনিও (বিদ্যাবাগীশ মহাশয়) একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, তাঁহার হৃদয়ে ও চরিত্রে একত্র জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া

কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন।"

রামমোহন রায়ের সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ বিশেষ কৌতুহলজনক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ স্বীয় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীর বাগান হইতে পূজার জন্য প্রতিদিন পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন। একদিন বাগানে পুষ্পের অল্পতা প্রযুক্ত তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট পুষ্পের অভাব জানাইলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার নিকট রামমোহন রায়ের বাগানের কথা উল্লেখ করাতে প্রথমেই তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধে তিনি রামমোহন রায়ের বাগানে ফুল তুলিতে গেলেন। রামমোহন রায়ের বাগানের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের ফুল তোলা নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সেই স্থানের ফুল তুলিতে গিয়া প্রহরী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় সকলই দেখিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ঠাকুর এত উষ্ণ হইয়াছেন? আর, বলুন দেখি, কিসে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম?" উভয়ের মধ্যে ঘোর তর্ক চলিল। উভয়েই অনাহারী থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ তর্কে কাটাইলেন। পরিশেষে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ফুলের সাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরুসম্বোধনে রামমোহন রায়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন রামমোহন রায় সশঙ্কিত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক একত্র ভোজন করিতে গেলেন।

অধ্যাপক বংশে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জন্ম। গঙ্গাতীরে মালপাড়া গ্রামে ১৭০৭ শকে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) ২৯ শে মাঘ বুধবার রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। লক্ষ্মীনারায়ণের চারি পুত্র—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার রামধন বিদ্যালঙ্কার, রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিয়া তন্ত্রোক্ত বামাচার অবলম্বনে মহানির্ব্বাণতন্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসনা সাধন করিতেন। রামধন ও রামপ্রসাদ এই দুই ভ্রাতার নিকটে রামচন্দ্র অনেক অত্যাচার লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নন্দকুমারের নিকট তিনি বরাবর সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। নন্দকুমার অবধূতাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নানা তীর্থে পর্য্যটন তাঁহার জীবনের এক প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। রামচন্দ্র এদিকে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তদনন্তর প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের নিকট স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে রামচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

সম্ভবত এই সময়ে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁহার দেশপর্য্যটনসূত্রে রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রামমোহন রায় তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চায় ও হৃদয়ের উদারতায় পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তীর্থস্বামীও তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার পর তীর্থস্বামী বারাণসীধামে প্রস্থান করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইহারই কিছুকাল পরে রামমোহন রায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় বাসকালে যে কি সূত্রে তাঁহার সহিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আমরা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখিতে পাই না। তবে, বোধ হয় যে তিনি বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামমোহন রায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন।

একদিন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়কে বিষয়ঘটিত কোন গোলযোগের বিষয় জানাইলেন।

রামমোহন রায় তাঁহাকে আদালতের সাহায্যে সেই বিষয়টী মীমাংসা করিয়া লইবার উপদেশ দিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাক্ষ্য ব্যতীত আদালতের সাহায্যে সে বিষয়ের মীমাংসার অন্য উপায় নাই। এদিকে কলিকাতায় বাস করা অবধি রামমোহন রায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি হরিহরানন্দের সহিত একত্র ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে তীর্থস্বামীকে কলিকাতায় আসিবার জন্য কাশীর ঠিকানায় বারম্বার পত্র লিখিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এখন মকদ্দমা উপলক্ষে তীর্থস্বামী কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইবেন, রামচন্দ্রেরও বৈষয়িক গোলযোগ মিটিয়া যাইবে এবং তীর্থস্বামীর সহিত একত্র তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চাও হইবে, এই সকল ভাবিয়া রামমোহন রায় প্রফুল্লচিত্ত হইলেন।

রামমোহন রায়ের পরামর্শমত রামচন্দ্র আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। হরিহরানন্দ আদালতের আহ্বানে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়া, রামমোহন রায়ের পরামর্শমত এই মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে নিজের অনিচ্ছাতেও আসিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রায় অতি বিনীতভাবে গললগ্নীকৃতবাসে আসিয়া তীর্থস্বামীর পদতলে পতিত হইলেন। হরিহরানন্দও রামমোহন রায়ের স্তুতিমিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরোধে মানিকতলাস্থ ভবনেই তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়াই হরিহরানন্দ তন্ত্রমতে সাধনক্রিয়া এবং রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের সহিত এইরূপ একত্র অবস্থানকালেই তিনি রামমোহন রায়কে তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্রের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ও সেই অবধি রামচন্দ্রকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নিকট তাঁহার উপনিষৎ ও বেদান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পর গুণগ্রাহী রামমোহন রায় প্রথমেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে অধ্যাপনা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। রামমোহন রায়ের সাহায্যে ও উপদেশে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় হেদুয়ার দক্ষিণদিকে এক চতুষ্পাঠি খুলিয়া কয়েকজন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত, রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা সংস্থাপিত হইলে তিনি সেই সভায় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। বলিতে গেলে এই কার্য্য হইতেই রামমোহন রায়ের কাজকর্ম্মে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল।

আনুমানিক এই সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দশ বৎসর কাল নির্ব্বিরোধে কলেজের অধ্যাপনা করিয়া অবশেষে উক্ত বিদ্যালয়ের এক ইউরোপীয় সেক্রেটারী কর্ত্তৃক হিন্দু আইন সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ এক ব্যবস্থা দিবার অছিলায় পদচ্যুত হইলেন। রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুতাই নাকি এই পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ বলিয়া শোনা যায়। রামমোহন রায়ও এই বিষয় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর সভায় এক আবেদন প্রেরণ করিলেন। তাহার ফলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অধ্যাপনা কার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার কলিকাতাবাসের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বঙ্গভাষায় এক অভিধান এবং জ্যোতিষ বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই সময়ে এরূপ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করাই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে নিঃসন্দেহ। তাঁহার এই দুই গ্রন্থ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে গ্রন্থদ্বয়ের বিক্রয়ের ফলে যে অর্থসংগ্রহ হইয়াছিল তাহা দ্বারা তিনি "স্বীয় পরিবারের বাসের জন্য সিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটীক্রয়" করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রায়ের রচিত অথবা স্বরচিত উৎপনিষদ্ ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন। এইরূপ হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের

সংযোগের ফলে ব্রাহ্মসমাজের গৌরববর্দ্ধনে যে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন সেগুলির সংখ্যা অষ্টনবতি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার দুই বৎসর দুই মাস পূর্ব্বাবধি তিনি ব্রাহ্মসমাজে বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ব্রহ্মসভা সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়, এবং রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পঠিত ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র সপ্তদশ ব্যাখ্যান ৺ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যাখ্যানগুলি পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যাখ্যান আলোচনা করিলেও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বিদ্যা ও জ্ঞানের গভীরতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যোগদানের ফলে ব্রাহ্মসমাজের যেমন গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও কর্ত্তৃপক্ষের সংশ্রবে আসিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও নানাবিষয়ে সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে, রামমোহন রায়েরই চেষ্টায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আবার, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে উক্ত কলেজের অধীনে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এক উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় ছাত্রদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিযুক্ত করেন। সেই সকল উপদেশ নীতিদর্শন নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নীতিদর্শনের বিষয়গুলি উল্লেখ করিলেই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বিদ্যার গভীরতা ও প্রসারের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিষয়তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) ভূমিকা অর্থাৎ নীতিদর্শনোপদেশের প্রয়োজন এবং উপকার, (২) মাতাপিতা ও সন্তান, উভয়ের পরস্পর কর্ত্তব্য ও বিধি, (৩) বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন এবং উপকার, (৪) সত্যের মাহাত্ম্য এবং অসত্যের দোষ, (৫) কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন এবং আবশ্যকতা, (৬) মিত্রতার ফল এবং পরস্পর-কর্ত্তব্যতা, (৭) পরোপকারের প্রয়োজন, (৮) ইন্দ্রিয়সংযম, (৯) নম্রতার উপকার, (১০) স্বদেশ-প্রীতি, (১১) প্রতিহিংসা, (১২) বিবাহসংস্কারের উপকার এবং বহুত্বের দোষ, (১৩) লাম্পট্যদোষ, (১৪) দ্যূতক্রিয়া নিষেধ, (১৫) দানের সাত্ত্বিকতা, (১৬) ইতিহাসোপদেশের প্রয়োজন, (১৭) দেশ-পর্য্যটনের উপকার, (১৮) বাণিজ্যের উপকার, (১৯) সন্ধিবিগ্রহ, (২০) রাজার প্রয়োজন ও দেশবিশেষে তাহার অবস্থার ভিন্নতা, (২১) প্রজাগণের স্বাধীনতা ও রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের প্রয়োজন, (২২) সদ্ব্যবস্থা স্থাপনের আবশ্যক, (২৩) দেশাধিপতিদিগের পরস্পর কর্ত্তব্য, (২৪) সমাপ্তি পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ সযত্নে প্রতিপালিত হইবার ফলেই আমরা সময়ে দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগকে লাভ করিয়াছি। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরই উপনিষদব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরান্বেষণের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৭৬১ শকের (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের) ২১শে আশ্বিন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরই উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়। ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের) ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ একবিংশতিসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহারই নিকটে প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপে দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে তিনি আচার্য্যের পদে যথানিয়মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সম্ভবত এই বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে আচার্য্য পদে বরিত হইবার পর তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েন। ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে)

৯ই ফাল্গুন তিনি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মুরশিদাবাদে ২০শে ফাল্গুন রবিবার ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে দেহত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা অধিক বলা বাহুল্য। তাঁহার জীবদ্দশায় দুই পুত্র ও তিন কন্যার মৃত্যু হয়, কিন্তু কোন বাধাবিঘ্নই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য হইতে অনুপস্থিত রাখিতে পারে নাই। কেবল তাহাই নহে, তিনি দরিদ্র হইলেও মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচশত টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্বের পরিচয়স্বরূপে আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই পাঁচশত টাকা স্থায়ী মূলধনস্বরূপে সযত্নে রক্ষা করা উচিত।

আছি পড়ে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমি তোমারি চরণতলে
আছি পড়ে—আছি পড়ে—আছি পড়ে।
আমারে লহগো তুলে
তোমারি কোমল কোলে,
মুছায়ে নয়ন জলে—
ভয় যত যাক দূরে॥
অভয় বাণী
শুনি যে কানে
আনন্দ রস
বহে যে প্রাণে,
বহে প্রাণে—বহে প্রাণে—বহে প্রাণে।
অকূলের লভি কূলে,
পাপতাপ ব্যথা ভুলে
সদাই আনন্দমূলে
পরাণ রাখিব খুলে॥

ভগবৎসাধনা।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী)

ভগবানকে আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। দূরদেশস্থিত আত্মীয় যেমন কালক্রমে আমাদের স্মৃতির বহির্ভূত হইয়া পড়ে ভগবানও সময়ে সময়ে তেমনি হয়েন। যখন আমরা পার্থিব অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদে মত্ত হই তখন ভগবানকে ভাবিবার অবসর পাই না। না ভাবিতে ভাবিতে ভগবানের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক প্রেম-টুকু আছে তাহা ক্রমে মলিনতাপ্রাপ্ত হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, আর যে অকিঞ্চিৎ-কর বস্তুগুলিকে লইয়া সদাসর্ব্বদা আমোদে মগ্ন থাকি সেগুলির প্রতি আমাদের প্রেম বাড়িয়া উঠে। ক্রমে আমরা স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি এবং অবশেষে ঘোর নরকে পতিত হই। ঈশ্বরপ্রেমও প্রেম এবং পার্থিব অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি প্রেমও প্রেম—তবে বিশেষ এই যে একটী পূর্ণ অবিনাশী অনন্ত অমৃতের খনি, অপরটী অপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী বিষকুম্ভ পয়োমুখ। একটীকে পাইয়া আমরা অনন্ত আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করি, অপরটীকে অবলম্বন করিয়া নিম্ন হইতেও নিম্নতর স্থানে যাইয়া অবশেষে সুগভীর দুঃখময় সাগরে নিপতিত হই।

ভগবানকে হারাইয়া আমরা কিছুতেই চিরসুখী হইতে পারি না। পার্থিব প্রেমের সামগ্রীগুলি অতি নশ্বর—আজ আছে কাল নাই। কাঠের পুতুল দিয়া ঘর সাজাই, পুতুলগুলির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হই। একদিন দৈববিপাকে সেই পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন কাঁদিতে থাকি। আমাদের জীবনকে চিরসুখী ও শান্তিময় করিতে হইলে ঐ পার্থিব নশ্বর বস্তুগুলিকে লইয়া থাকিলে চলিবে না, ভগবৎপ্রেম ও তাহার সাধনা চাই।

ভগবৎপ্রেমের সাধনা কি প্রকারে হয়? প্রেমিক ভক্তগণ এ বিষয়ে অনেকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেষ্টারও অভাব নাই, উপদেশেরও অভাব নাই। মহর্ষি নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই এই পথের প্রদর্শক। মোটের উপর কথা এই যে যাহাকে ভাল বাসিতে হয় তাহাকে নিকটে আনিতে হয়, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হয় এবং নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। ভালবাসার জিনিষ নিকটে থাকিলে এবং সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিলে ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং যতক্ষণ ভালবাসার বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ না হইবে ততক্ষণ

এ দশা তোমার কেন হইল ? কে তোমার এ দশা করিল ? তুমিই তোমার এ দশা করিয়াছ; তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ; তুমি তোমার তুমিত্বটাকে বড় বাড়াইয়াছ; এই তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে যে জিনিষটী না পড়িবে, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে পার না। তুমি নর নারীকে ভাল বাস বটে কিন্তু তোমার ভালবাসার নর নারীগণ তোমার তুমিত্বের গণ্ডীর মধ্যস্থ হওয়া চাই, গণ্ডীর বাহিরে যাহারা আছেন তাঁহারা তোমার ভালবাসার পাত্র নহেন। তোমার পুত্র, তোমার কন্যা স্ত্রী ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি তোমার ভাল বাসার পাত্র; ইহার বাহিরের আর কেহ তোমার প্রেমভাজন নহে। তুমি-বৃক্ষলতাদি, মণিমুক্তাদি নানাবিধ বস্তুকে ভালবাস, কিন্তু এ গুলিকেও তুমি তোমার তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া ভাল বাস। তোমার উদ্যানের ফুলটী তোমার বড় প্রিয়, বন ফুলটী তেমন নয়, অপরের উদ্যানের ফুলটী একেবারেই নয়। মণি মুক্তাদি আস্‌বাব তোমার গৃহে শোভা পাইলেই তুমি তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পার। সকল বস্তুকে তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে আনাও যেমন ক্লেশকর, রক্ষণাবেক্ষণও তেমনি ক্লেশকর। অনেকে অনেক সময় গণ্ডীর ভিতরে থাকে না, বাহিরে চলিয়া যায়, নষ্ট হয় মরিয়া যায়, তখন তুমি শোকে তাপে অধীর হও। এ পাগলামি কেন ? বিশ্ব-সংসারের সমস্ত বস্তুই তোমার, ইহাই কেন মনে না কর ? অথবা তোমারও কোন বস্তু নাই আমারও কোন বস্তু নাই সমস্তই ভগবানের বস্তু, তিনি আমা-দিগকে ভোগের জন্য দিয়াছেন; যিনি দিতেছেন তিনিই নিতেছেন আবার তিনিই দিতেছেন, ইহাই বা কেন মনে না কর। তুমিত্বের গণ্ডীটা ক্রমে ছোট করিয়া আনিয়া কেবল মাত্র তোমাকেই বেষ্টন কর আর সকলকে তুমিত্ব বৃত্তের বাহিরে স্থাপন কর, তাহা হইলে আর এ পাগলামি থাকিবে না। তুমি একটী পুত্রকে হারাইয়া কাঁদিতেছ তখন দেখিবে যে এ অনন্ত প্রেম রাজ্যের কিছু মাত্র হ্রাস নাই। বিনাশ কোথায় ? মৃত্যু কোথায় ? কাহার জন্য কাঁদিতেছি ? সমস্ত ভগবানকে অর্পণ কর; তুমি তাঁহার শিশু সন্তান, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতেছ; তিনি তোমাকে সৃজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, সকল প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। এই ভাবটীকে যদি মনে স্থান দিতে পার তাহা হইলে দেখিবে অচিরাৎ তোমার শোক তাপ দুঃখ দূরে চলিয়া যাইবে; তোমার হৃদয়ে ভগবানের অনন্ত প্রেম নামিয়া আসিবে।

বুদ্ধগয়া।

গয়া হইতে সাত মাইল দক্ষিণে বোধগয়া বা উরুবেল গ্রামে অবস্থিত স্তূপ বহু পুরাতন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই পুণ্যস্থানে পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শাক্যসিংহ বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আজও গয়ার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধগয়া, কুক্কুটপাদ, রাজগৃহ, নালন্দ প্রভৃতি স্থানগুলি মহাতীর্থ রূপে পরিণত হইয়া সমগ্র জাতির এক তৃতীয়াংশের পূজা ও ভক্তি গ্রহণ করি-তেছে।

এই পুণ্যতীর্থ দর্শনের জন্য ১৯১২ খৃঃ ১০ই অক্টোবর শুক্রবার দ্বিপ্রহর ১টা ৫ মিনিটের সময় দুই টাকায় একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হই। দুইটি বালক আমার সঙ্গী জুটিয়াছিল। গয়া মিউনিসিপাল পুকুরের নিকটবর্ত্তী দীঘিরোড্ দিয়া দক্ষিণ দিকে আমাদের গাড়ী খানা দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। বামপার্শ্বে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য সূর্য্যমল প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা দেখিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রামসাগর দিঘী। এখানে গাড়োয়ান ঘোড়া বদল করিয়া লইল। গাড়ী পুনরায় ছুটিল। রাস্তার বামপার্শ্বে ছোট ও বড় বৈতরণী পুকুর, এখানে যাত্রিগণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। ডানদিকে কেবলি ধানক্ষেত, অদূরে সু-উচ্চ ব্রহ্মযোনি পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সোপান শ্রেণী। আমাদের গাড়ী কখনও ধানক্ষেতের ধার দিয়া, কখনও বা বালুকা-পূর্ণ ফল্গু-নদীর তীর দিয়া ছুটিয়া চলিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য তাল, আম ও খেজুর গাছের সারি। একস্থানে ডানদিকে বাবু উগ্রসিংহের

প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখিতে পাইলাম। নূতন জলের কলের কারখানা বামদিকে রাখিয়া আমরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইবার সহর ছাড়িয়া আমাদের গাড়ী ফল্গু নদীর তীর দিয়া চলিতে লাগিল। ফল্গুর অপর পারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাছপালাশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়। গাড়ীখানা সহসা একটা বাঁক ঘুরিবার পরই গাছের আড়াল দিয়া বোধিগয়া মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমে আমরা দুইটা পনর মিনিটের সময় মহান্তজীর মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে অনেকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি ও পুরাতন ইষ্টক সংগৃহীত হইয়াছে। জাপান হইতে প্রেরিত শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

মন্দির দেখিবার জন্য আমরা সীঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখেই কয়েকটী বৃহদাকারের ঘণ্টা। দুইজন চৌকিদার আমাদের সঙ্গে আসিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতে লাগিল। তখন মহাযোগীর নীরব সাধনার উপযোগী বিরাট্ মন্দিরের ধ্যানিভাব এবং চতুর্দ্দিকের শান্ত ও স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আমার বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তকে এক প্রগাঢ় আকর্ষণে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল।

মন্দির।

বোধিগয়া গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালুতে এই বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানেই বোধিবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনস্যাঙ্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দে সর্ব্বপ্রথমে সম্রাট্ অশোক তাঁহার মন্ত্রী উপগুপ্তের সহায়তায় এইস্থানে বিহারের প্রতিষ্ঠা ও ১লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে একটি অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি উর্দ্ধে ১৬০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্। এই মন্দিরে ভূমিস্পর্শ মুদ্রাবিশিষ্ট একটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

বোধিগয়ার বর্ত্তমান মন্দির কোন্ সময়ে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কানিংহাম সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে কুশানরাজ হুবিষ্কের সময় ইহা নির্ম্মিত এবং ৪র্থ শতাব্দে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আদেশে ইহার সংস্কার হয়। ফার্গুসন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য হইতে ইহার নির্ম্মাণ-কাল ষষ্ঠ শতাব্দে বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। মূল মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রায় ৫০ ফিট্ বিস্তৃত বেদীর উপর ইহা স্থাপিত এবং এক সময়ে ইহা ত্রিতল ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম দেশের রাজা মিণ্ডুন মিন এই মন্দির সংস্কারের জন্য তিনজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংস্কার কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়। মিঃ জে, ডি, বেগলার সংস্কার কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ খননের সময় মন্দিরের প্রস্তরের একটি ক্ষুদ্র মডেল আবিষ্কৃত হয়। ইহা হইতেই বর্ত্তমান মন্দিরের বহির্ভাগের ডিজাইন বা পরিকল্পনা অঙ্কিত হইয়াছিল। এই সময় ত্রিতলের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংস্কারের পর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট মন্দির-গাত্রে যে একখানি খোদিত লিপি স্থাপন করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

'This ancient temple of Mohabodhi erected on the holy spot where Prince Sakya Singha became Buddha was repaired by the British Government under the order of Sir Ashley Eden, Lieutenant Governor of Bengal in A. D. 1880.'

মন্দিরে একটি মাত্র প্রবেশ-পথ আছে। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের হলের উভয় পার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি সীঁড়ি আছে। গর্ভ-গৃহটী অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ, সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী এবং বেদীর উপরে সিংহাসনে উপবিষ্ট ধ্যানি বুদ্ধ মূর্ত্তি। এক খানা রেশমের পরদা দিয়া মূর্ত্তিটি ঢাকিয়া রাখা হয়। আমরা গৃহে

ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহাকে আমার নিকটে আনিতে হইবে তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বরকে আমরা কোথায় পাইব? কি প্রকারে তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিব এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব? তিনি ত সচ্চিদানন্দ নিরাকার পরব্রহ্ম। কথাটা বড় শক্ত, কিন্তু যতটা শক্ত বলিয়া বোধ হয়, তত শক্ত নয়। দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে—দুগ্ধের মত জলীয় পদার্থ হইতে অমন তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইবে একথা জানা না থাকিলে কিংবা কেহ বলিয়া না দিলে আপাতত নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। দুগ্ধের মধ্যে ওরূপ বস্তু যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, দুগ্ধ দেখিয়া কি তাহা বোধ হয়? অথচ তুমি দুগ্ধ মন্থন করিতে থাক, ঘৃত উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইলে দেশ দেশান্তরে যাইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে না। তিনি অতি নিকটেই আছেন। দুগ্ধের ভিতরে যেমন ঘৃত লুকায়িত থাকে, ঈশ্বরও তেমনি আমাতে লুকায়িত আছেন। মন্থন করিয়া তাঁহাকে বাহির করিলেই তিনি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবেন।

এই মন্থনপ্রক্রিয়া অনেক প্রকারের আছে। যিনি যে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করুন না কেন, মন্থনান্তে সকলেই সেই এক প্রেমরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। প্রক্রিয়াভেদ হইলেও পদার্থ ভিন্ন নহে। দুগ্ধকে যে ভাবে মন্থনকর, বিলাতী কল দিয়া বা দেশী মউনি দ্বারা কিংবা হাত দিয়াই মন্থন কর, ফলে আর কিছু না—ঘৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের মন্থনদণ্ড ভক্তি, ভক্তিদ্বারা কি প্রকারে ঈশ্বররূপ ঘৃতকে ভাসাইতে হয় এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

ঈশ্বর আমাতে আছেন। কি ভাবে আছেন? ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুইটী বস্তু লইয়াই আমার আমিত্বটুকু হইয়াছে। এই দুইটী বস্তু অংশাংশী ভাবে নাই, দুগ্ধ ও ঘৃতের ন্যায় ওতপ্রোত ভাবে আছে। আমাতে যে প্রেম আছে, সম্বিত্ আছে সেগুলি ঈশ্বরত্ব। এই ঈশ্বরত্ব আংশিক ভাবে আমাতে প্রকাশ, অবশিষ্ট অপ্রকাশ। মন্থনদ্বারা ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারিলেই ঈশ্বরকে আমরা অতি সন্নিকটে পাইব। পূর্ণতা সম্পাদন কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের এই আংশিক প্রকাশের তারতম্য আছে। আমার কাছে যতটুকু প্রকাশ, তোমার কাছে তাহা অপেক্ষা অধিক, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য প্রভৃতি সাধকদিগের নিকট আরও অধিক। শারদীয় পূর্ণ শশধরের কমনীয় কান্তি অবলোকন করিয়া আমি যতটা বিমোহিত হই, কালিদাস শেক্‌স্‌পিয়ার, শেলি চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ তদপেক্ষা অনেক অধিক বিমোহিত হন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে ভাসমান হন, আমি সেরূপ হই না। আমার সেরূপ হইবার শক্তি নাই। কেন নাই? তাঁহারাও মানুষ, আমিও মানুষ। মনুষ্যত্ব উভয়েতে সমান থাকিলেও ঈশ্বরত্ব উভয়েতে সমান নাই। সাধনা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব বাড়াইয়াছেন, আমি বাড়াই নাই, তাই এতটা পার্থক্য। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরত্ব বৃদ্ধি হয়, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের ঈশ্বরত্ব বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে যে পূর্ণতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিব, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আমাদের ভিতরে যে সামান্য একটুকু প্রেম আছে, যাহা দ্বারা আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আনন্দ লাভ করি, আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবকে পাইয়া পরম সুখী হই, তাহা ঐশ্বরিক ভাব। ঐ ঐশ্বরিক ভাবটুকুকে আমরা সাধনা দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া ভগবানের পূর্ণতার নিকটে আসিয়া উপনীত হইতে পারি। তখন কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও আত্মীয় স্বজনের প্রেমে মাত্র বিমুগ্ধ হইব না, তখন জগৎময় সেই সৌন্দর্য্য দেখিব, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই জানিব না। শোক, তাপ, দুঃখ, অভাব ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না, আনন্দময় হইয়া যাইব। তখন একদিকে আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকু অন্যদিকে অনন্ত

ভগবান, এই দুইটী মাত্র বস্তু থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না। ভক্তিসাধনা এইরূপে হয় অর্থাৎ আমার ভিতরে যে প্রেম অঙ্কুর ভাবে আছে, জলসিঞ্চন দ্বারা তাহার বৃদ্ধি সাধন করিয়া অনন্ত প্রেমরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়া।

কি প্রকারে এই বৃদ্ধি সাধন হইতে পারে? আমরা যদি ঈশ্বরকে প্রথমেই দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না; তাঁহাকে দেখিয়া একেবারেই তাঁহার প্রেমে ভাসিয়া যাইতাম, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং আমাদের ভিতরে যে সম্বল আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের হৃদয়স্থ প্রেম-অঙ্কুর পার্থিব উদ্যানে রোপিত, সুতরাং উহার বৃদ্ধি সাধনের জন্য পার্থিব উপকরণেরই প্রয়োজন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আর সে প্রেম পার্থিব উদ্যানে থাকিবে না, তখন স্বর্গীয় নন্দনকাননে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বর্গীয় উপকরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাদের পার্থিব প্রেমের বিষয় আমাদের পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—সুতরাং এই সকল বস্তু দ্বারাই প্রেমের বৃদ্ধি সাধন করা আবশ্যক। পিতা মাতাকে আমরা ভক্তি করি—এই ভক্তি যদি আমরা অকৃত্রিম ও পবিত্র ভাবে বাড়াইতে পারি তাহা হইলে আমাদের অন্তঃকরণ ক্রমশঃ ভক্তিময় হইয়া অবশেষে ভগবানকে পিতা-মাতা মনে করিয়া তাঁহার স্থানে উপস্থিত হইতে পারে। বন্ধুবান্ধবকে আমরা ভালবাসি, এই ভালবাসা যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং আমাদের হৃদয় সখ্য-প্রেমময় হইয়া উঠে তখন আমরা ঈশ্বরকে সখানির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে পারি। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা যদি বিশুদ্ধ ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই বিশুদ্ধ ভাবটী লইয়া যদি আমরা ভগবানের নিকট উপনীত হইতে পারি তাহা হইলে আমরা ভগবানকে প্রেমময় স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারি। এইরূপ প্রভুর প্রতি ভৃত্যের প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের প্রেম যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তবে সেই প্রেমই আমাদিগকে ভগবানের কাছে লইয়া যাইতে পারে। ফলকথা আমাদের ভিতরে যে প্রেমাঙ্কুর আছে, তাহার বৃদ্ধিসাধন করাই ভক্তিসাধন এবং সেই প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবৎপ্রেমে পরিণত হয়।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রেমকে ভক্তিশাস্ত্র শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাব নামে অভিহিত করিয়াছে। বিশ্বসংসার প্রেমে পরিপূর্ণ—ইহা বিপুল সৌন্দর্য্যের আকর। ইহার প্রত্যেক বারিবিন্দু, প্রত্যেক ধূলিকণা, নদ নদী, গ্রহ উপগ্রহ, বৃক্ষলতা, নরনারী ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। প্রেমচক্ষে অবলোকন কর, প্রত্যেক বস্তুতে ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইবে; তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না; ভগবানের অনন্ত মহিমা তোমাকে অনন্তের পথে লইয়া যাইবে—শোক তাপ দুঃখ দূরে পলায়ন করিবে। আমরা দেখিতে জানি না, তাই এই বিশ্বসংসার আমাদের নিকট সুখের সামগ্রী না হইয়া দুঃখের জলনিধি হইয়াছে; তাই আমরা শোকে তাপে অভিভূত হইয়া এই জগৎকে বিষতুল্য বোধ করিতেছি, নরকতুল্য মনে করিতেছি, ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই ভাবটী স্বাভাবিক ভাব নহে। ইহা কৃত্রিম; ইহা ভ্রান্তি। আমরা ভ্রমবশত অমৃতকে গরল মনে করিতেছি; প্রেমের আলিঙ্গনকে শত্রুর আক্রমণ মনে করিতেছি; সুখের ভবনকে কারাগার ভাবিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার প্রয়াস পাইতেছি।

দেখিতে শিখ, দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছ তাই আনন্দের পরিবর্ত্তে এত দুঃখ এত ক্লেশ। ঐ শিশুটীর প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ; কেমন আনন্দে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইয়া বেড়াইতেছে; প্রত্যেক বস্তুকে কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখিতেছে। এক কালে তুমিও ঐরূপ ছিলে। ঐ তোমার স্বাভাবিক অবস্থা। তাহা আর এখন নাই; এখন শোকে, তাপে, দুঃখে অশান্তিতে জড়ীভূত হইয়াছে। প্রাণে আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, মনে আর সে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে আর সে আনন্দ নাই।

প্রবেশ করিতেই একজন পুরোহিত বেদীর উপর উঠিয়া পরদা খানা সরাইয়া দিলেন। সিংহাসনে খোদিত তিন ছত্র লিপি হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি ও সিংহাসন ছিন্দ বংশীয় কোন রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতলে উঠিবার যে দুইটি সীঁড়ি আছে তাহার মধ্যস্থলে এক একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের বুদ্ধ মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে বীরেন্দ্র ভদ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে 'অনেন শুভমার্গেণ প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ মোক্ষমার্গ প্রকাশকঃ' শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখিলাম। আমরা চতুর্দ্দিকের বারান্দা ঘুরিয়া নানাস্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে দ্বিতল গৃহের এক পার্শ্বে একটী মন্দিরে সিদ্ধার্থ-জননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মায়াদেবী দণ্ডায়মানা, তাঁহার সুন্দর শান্ত নয়ন যুগলে স্নেহ ও করুণা অঙ্কিত। দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, আশেপাশে সুন্দর বাগান, বাঁধান চত্বর, চত্বর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ভগ্ন, অভগ্ন, খোদিত ইষ্টক। *

বোধিদ্রুম।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বৌদ্ধগণের পরম আদরের বস্তু বোধিদ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষ অবস্থিত। এখন যে গাছটি দেখিলাম উহার বয়স ত্রিশ চল্লিশের বেশী নয়। কথিত আছে এই অশ্বত্থ বা পিপুল গাছের নীচেই শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্য এই বৃক্ষকে বৌদ্ধগণ ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। এই সুপ্রাচীন বৃক্ষের ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বৌদ্ধ ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের হস্তে এই বৃক্ষকে বিভিন্ন যুগে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দীক্ষার পরে তিনি এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ভক্তি করিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাজার অত্যধিক ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া রাণী তিষ্যরক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি প্রভাবে উহা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এই বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন।

* 'The discoveries made during the restoration show that this temple was built over Asoka's temple, and some remains of the latter were, in fact, found in the course of the excavations. A throne of polished sandstone was discovered with four short pilasters in front, just as in the Bharhut bas-relief; two Persepolitan pillar bases of Asoka's age were found flanking it; and the remains of old walls were laid bare under the basement of the present temple. When this restoration was undertaken, the temple court was covered with the accumulated debris of ages and with deposits of sand left by the floods of the river Nilajan. The courtyard was cleared, the temple completely restored, the portico over the eastern door and the four pavilions flanking the pyramid were rebuilt, and the great granite Toran gateway to the east, which dates back to the 4th or 5th century, was again set up. The model used in restoring the temple was a small stone model of the temple as it existed in mediaeval times, from which the design (In his "Lhasa and its Mysteries" Lt.-Colonel Waddell gives an interesting comparison between the temple as it was before restoration and the great pagoda by the side of the temple at Gyantse in Tibet, which is locally known as the Gandhola, the old Indian title of the Bodh Gaya temple, and which is said to be a model of that temple transplanted to Tibet.) of the building as it then existed could be traced with some certainty. The work has been subjected to much adverse criticism, from which it might be presumed that visitors would find a temple robbed of its age and beauty, with a scene of havoc around it. The reverse is the case; the temple has been repaired as effectively and successfully as funds would permit, and the site has been excavated in a manner which will bear comparison with the best modern work elsewhere. Rising from the sunken courtyard, the temple still rears its lofty head, a monument worthy of the ancient religion it represents; the Vajrasan throne is in its old place; and the shrine is still surrounded by the memorials erected by Buddhist pilgrims of different countries and different ages.' Gaya Gazetteer P. p. 52.

কিন্তু মগধেশ্বর পূর্ণবর্ম্মণ উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প এই যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে এক রাত্রিতে এই গাছটি দশ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ণবর্ম্মণ শত্রু হস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

সম্রাট্ অশোকের সময় বৌদ্ধগণ বোধিবৃক্ষকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। একটি সুবর্ণ কৌটার মধ্যে পুরিয়া ইহার এক খণ্ড শাখা সিংহলে প্রেরিত হয়। সেই সময়ে পাটলিপুত্র হইতে বুদ্ধগয়া পর্য্যন্ত সমগ্র পথটি পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোক স্বয়ং কৌটাটি লইয়া বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন। তখন এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর গাছ হইতে একটি ডাল কাটিয়া উহা সুবর্ণ নির্ম্মিত আধারে সুরক্ষিত করিয়া অতি জাকজমকের সহিত সমুদ্রতীরে প্রেরিত হইয়াছিল। সাঞ্চিস্তূপের পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বারে স্থাপিত একখানি ফলকে এই ঘটনাটি সুন্দরভাবে সুচিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিলটন্ সাহেব বোধিগয়ায় আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন ইহার বয়স শতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান বৃক্ষটির বয়স ত্রিশ চল্লিশের বেশী হইবে না। সম্ভবতঃ ইহা মূল বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বরাহট গ্রামে ২য় শতাব্দের একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তূপের বেষ্টনীর স্তম্ভগাত্রে নানাবিধ ক্ষোদিত চিত্র আছে। বোধিবৃক্ষ যে সেই সময়ে তীর্থযাত্রিগণের আরাধ্য ছিল তাহা এই চিত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। *

* 'One of the bas-reliefs of the Bharhut stupa (2nd Century B, C.) gives a representation of the tree and its surroundings as they then were. It shows a Pipal-tree, with a stone platform in front, adorned with umbrellas and garlands and surrounded by a building with arched windows resting on pillars, while close to it stood a single pillar with a Persepolitan capital crowned with the figure of an elephant. Gaya Gazetter, pp. 46

বজ্রাসন।

বোধিবৃক্ষ এবং মূল মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন বা হীরক সিংহাসন দেখিলাম। এই আসন অক্ষয় ইহা কখনও নষ্ট হইবে না বলিয়া বৌদ্ধদের বিশ্বাস এবং তাঁহারা মনে করেন ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। ইহা প্রায় দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ চত্বরের উপরে স্থাপিত, ঐ চত্বরের গাত্রে সিংহ ও মনুষ্যের মূর্ত্তি অঙ্কিত। ইহার উপরিভাগ এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা অশোকের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বজ্রাসনের মধ্যস্থলে একটি মণ্ডল অঙ্কিত এবং তাহার, চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে জ্যামিতির ন্যায় বিবিধ চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে শাক্যসিংহ সিদ্ধিলাভের পর এই আসনের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। বজ্রাসনের উপরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। ইহার উপরিস্থিত প্রস্তর খণ্ডে ১ম ও ২য় শতাব্দের অক্ষরে লিখিত একটি ক্ষোদিত লিপির কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রাসনের সহিত পটোলা রাজপ্রাসাদের সিংহাসনের তুলনা করিয়া লেফটানেন্ট কার্নেল ওয়াডেল বলেন,—

'The plinth of the throne of the Grand Lama in the Potala at Lhasa is ornamented with the same simple diaper-worked flowers like marguerites.

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'Buddha Gaya' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'খাঁটি বজ্রাসন সুবৃহৎ ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা বহুকাল বোধিমন্দিরের পূর্ব্বাংশে ভাগ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরে ছিল। তিনি আরও বলেন,—

'This stone is a circular blue slab streaked with whitish veins, the surface of which is coverd with concentric circles of various

minute ornaments, the second circle being composed of conventional thunderbolts (Vajra), and the third being a wavy scroll filled with figures of men and animals.'

জেনারেল কানিংহামের মতে এই বজ্রাসন হুয়েনস্যাঙ্ বর্ণিত 'অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট নীল প্রস্তর'। *

কথিত আছে যে, বজ্রাসনের উপর সাতটি বহুমূল্য মণি ছিল এবং ইহা ইন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুশন বংশীয় রাজা হবিষ্ক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে এই বজ্রাসন সংস্কার করিয়াছিলেন। বজ্রাসনের সন্নিকট মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বৌদ্ধ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের মধ্যভাগে ইহা নৈরঞ্জনের বালুকা রাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং বহু পরিশ্রমে মগধেশ্বর পূর্ণবর্ম্মণ ৭ম খৃষ্টাব্দে বালুকাস্তূপ খনন করিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করেন।

বুদ্ধদেবের পদ-চিহ্ন।

পূর্ব্ব তোরণের বামপার্শ্বে একটি মন্দিরে একখানি প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন দেখিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই পদচিহ্ন ৯ম শতাব্দের অনুমান করেন। বোধিবৃক্ষ মূলে এইরূপ প্রস্তরে দুইখানি পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোক রেলিং।

অশোক নির্ম্মিত মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে এক সময়ে স্তম্ভ-শ্রেণীযুক্ত বেষ্টনী (Railing) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বেষ্টনীর অধিকাংশ স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। ইহার অনেকগুলিতে উৎকীর্ণ-লিপি আছে। ইহা অশোকের আদেশে খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রত্যেক রেলিংগাত্রে শিল্পের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। স্তম্ভগাত্রে নানা প্রকারের জীবজন্তু হাতী, পদ্মপুষ্প অঙ্কিত। কোনটিতে বৃষ লাঙ্গল টানিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে, কোথায়ও বা পদ্মপুষ্পের ভিতর দিয়া নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও বোধিদ্রুমের চিত্র, কোথাও যক্ষিণী যক্ষের বাহুতে পা রাখিয়া গাছে উঠিতেছে, কোথায়ও গমনোন্মুখ নারীর পশ্চাতে পুরুষ আসিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে, এই ভাবের সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিলাম। অধিকাংশ উৎকীর্ণ লিপিতে 'আর্য্য কুরঙ্গ দাবম' অর্থাৎ আর্য্য কুরনির দান খোদিত আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত একটি মাত্র স্তম্ভগাত্রে একটি যক্ষীর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা মিউজিয়মে সুরক্ষিত একটি রেলিংগাত্রে "বোধিরখিতসতবপনকস দানং' (সিংহলবাসী বোধিরক্ষিতর দান) ক্ষোদিত আছে। একস্থানে একটি সূর্য্য মূর্ত্তি দেখিলাম। ভাস্করদেব রথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, চারিটি অশ্ব উহা টানিতেছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি ব্যক্তি তীর ছুঁড়িতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই চিত্রকে গ্রীসের 'এপোলোর' সহিত তুলনা করিয়াছেন।*

বোধপোখর।

বোধিমন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে 'বোধপোখর' দেখিতে পাইলাম। ঘাট এবং ছত্রী ধ্বংসাবশেষ হইতে নির্ম্মিত। এই পুষ্করিণীর পরিধি ১৭৫০ ফিট্। কথিত আছে, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের মন্ত্রী এই পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে।

বুদ্ধদেবের পাদচারণ।

বোধপুকুর ও চতুর্দ্দিকের দর্শনযোগ্য স্থান ও মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মন্দিরের উত্তরদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি দীর্ঘাকার অপ্রশস্ত বেদী আছে। ইহার উপর প্রায় বিংশতিখানি প্রস্তরনির্ম্মিত পদ আছে। কথিত আছে শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধ হইবার পর দ্বিতীয় সপ্তাহে এইস্থানে চিন্তামগ্নভাবে পাদচারণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই তখন মহাপুরুষের পদতলে অদ্ভুত রকমের আঠারটি পুষ্প ফুটিয়াছিল। হুয়েন স্যাঙ্ বলেন যে 'তথাগতের এই বিচরণ স্থান উত্তরকালে দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। বেদীর উভয় দিকে কয়েকটি ঘটের মত স্তম্ভপাদ আছে। যে স্তম্ভপাদগুলি কালের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া আজিও বিদ্যমান, সে গুলিতে

* 'A blue stone, with wonderful marks upon it and strangely figured.'

* 'Is clearly an adoption of similar types of the Greek Apollo.'

অশোকের সমসাময়িক বর্ণমালার এক একটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে।' মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমরা নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতীর্থ যাত্রিগণের জন্য নির্ম্মিত বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হই। এখানে হলের ভিতর চিত্রগুলি দেখিয়া পূর্ত্তবিভাগের সব ডিভিসনেল অফিসার বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আফিস গৃহে যাই। এই মিষ্টভাষী বৃদ্ধের সঙ্গে মন্দির সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি ইংরেজীতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে একখানি Archeological Report লিখিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা ছাপিবার অবসর পান নাই। আমি প্রায় ২০ মিনিট কাল তাঁহার পাণ্ডুলিপি খানা পড়িলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়া আমরা মহান্তজীর উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ তুল্য মঠের সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছি। এখানে মহান্তজীর একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দে বুদ্ধগয়ার নীরব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধমন্ডি নাথ গিরি একদল সন্ন্যাসীর সহিত এখানে আসিয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত 'গিরি' শ্রেণীভুক্ত। মহান্তজীর সর্ব্ববিষয়ে অসীম ক্ষমতা। বর্ত্তমান মঠ ৩১৫ বৎসরের উপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহান্তজী বোধিমন্দিরের মালিক। ১১২৪ ফসলিতে (১৭২৭ খৃঃ) সম্রাট্ মহম্মদ ফরোকসিয়ার এই মন্দির সহ চতুর্দ্দিকের তারাদিয়া পল্লী (বিশ হাজার বিঘা জমি) তদানীন্তন মহান্তজীকে উপহারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

বোধিগয়া মন্দিরের বর্ত্তমান রক্ষক মহান্তজী কৃষ্ণ দয়ালু গিরি বড়ই সরল ও উদারচেতা। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, ইহাঁর নৈতিক ও ধর্ম্মবলও যথেষ্ট আছে। ইনি নেপাল দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি নিজে বিহার সংক্রান্ত সমস্ত কাজই পরিদর্শন করেন। জমিদারী হইতে ইহাঁর আয় বার্ষিক একলক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন মহাবোধি মন্দির ও যাত্রিগণের প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি হইতেও বেশ আয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান, অতিথিশালা, বিদ্যালয়, কাঙ্গালী ও সন্ন্যাসী ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করেন।

পূর্ব্বদিকের দ্বিতল তোরণের ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীর বেষ্টিত মঠে প্রবেশ লাভ করি। ভিতরে বড় একটি রাস্তা বিস্তৃত দেখিলাম। বাড়ীগুলি ত্রিতল। স্থানে স্থানে চারিতল বাড়ীও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ডানদিকে মহান্তজীর অনেকগুলি বড় বড় গরু, উট, হাতী ও ঘোড়া দেখিতে পাইলাম। আমরা মহান্তজীকে দেখিতে চাহিলাম। তখন তিনি সন্ন্যাসী ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখি বহু ভিখারী আহারে বসিয়াছে। এখানে একটি বহু প্রাচীন পাত্রে দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়। কথিত আছে ভগবতী অন্নপূর্ণা মহান্তদের দান, ধ্যান ও সদনুষ্ঠানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই 'অফুরন্ত পাত্রটি' মহাদেব গিরিকে দান করিয়াছিলেন। ইনি ১৬৪০ হইতে ১৬৮২ অব্দে গদিতে ছিলেন। ভগবতীর আদেশ ছিল যে এই পাত্র হইতে দরিদ্রকে চাউল বিতরণ করিলে কখনও মঠে অন্নের অভাব হইবে না।

মহান্তজীর গৃহ প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আমরা গাড়ীতে উঠি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ব্রহ্মযোনি ও অক্ষয়বট দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি।*

ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রখ্যাত জর্ম্মণ কবি (Goethe) গ্যয়্টের মতামত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

ধর্ম্ম—পরমার্থ বিদ্যা।

"আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি"—এইরূপ স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত ও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ঈশ্বর যখনই এবং যেখানেই আত্মপ্রকাশ করেন,—তাঁহাকে স্বীকার করা—ইহাই ধরাতলে একমাত্র প্রকৃত কল্যাণ।

একেশ্বরবাদ—পরমার্থ বিদ্যা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পরমার্থ-বিদ্যা যে-তর্ক অবলম্বন করেন, সমালোচনী বুদ্ধি তাহা খণ্ডন করিয়াছে, এইরূপ কথিত হয়। আচ্ছা,

* শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তাঁহার অপ্রকাশিত "গয়াকাহিনী" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

তাহাই হউক। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যাহা প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে, হৃদয়ের বৃত্তি—যাহা বুদ্ধিবৃত্তিরই ন্যায় ভগবদ্দত্ত—সেই হৃদ্‌বৃত্তি সাহসপূর্ব্বক উহা প্রতিপাদন করিতে পারে।

ধর্ম্ম ও বিশেষ যুগ।

সকল কালেই ব্যক্তিবিশেষই সত্য প্রচার করে, কোন যুগবিশেষ নহে। কোন বিশেষ যুগ, নৈশ ভোজনের জন্য সক্রেটিস্‌কে হেমলক্-বিষ দিয়াছিল। কোন বিশেষ যুগ হস্‌কে (Huss) আগুনে পুড়াইয়াছিল। যুগ চিরদিনই সমান।

পারমার্থিক অনুভূতির বিভিন্ন দিক।

আমার অন্তরাত্মা তো বিভিন্নদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, পারমার্থিক বিষয়ের কেবল একটা কোন দিক গ্রহণ করিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। কবি ও শিল্পীর হিসাবে আমি ন্যূনাধিক পরিমাণে বহুদেববাদী, প্রাকৃতিক তত্ত্ববেত্তার হিসাবে আমি জগৎ-ব্রহ্মবাদী; ইহার কোনটাই অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী নহে। আবার, আমি নৈতিক পুরুষ—এই হিসাবে যদি আমার সবিশেষ আত্মসত্তার জন্য একজন সবিশেষ ঈশ্বর আবশ্যক হয়, আমার মানসিক প্রকৃতির মধ্যে তাহারও একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রকৃত ধর্ম্ম।

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম মানবের অন্তরের বস্তু, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব জিনিস; কারণ, অন্তরাত্মার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কখন কখন অন্তরাত্মার জড়তা উপস্থিত হইলে, ধর্ম্ম অন্তরাত্মাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, কখন বা অশান্তি উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম অন্তরাত্মাকে স্নিগ্ধ করে। কেন না, কাহারও কাহারও অন্তরে বিবেকবুদ্ধি অসাড় নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এইরূপ নৈতিক জড়তার অবস্থায় ধর্ম্মই উত্তেজক মহৌষধি; আবার যখন পাপের গ্লানি ও তীব্র অনুতাপের অশান্তিতে জীবন ভারবহ হইয়া উঠে, তখন ধর্ম্মই তাহার সন্তাপ-হারিণী শান্তি-সুধা।

অকপটতা ও প্রাচীনপন্থা।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ে, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, রাষ্ট্র-নৈতিক বিষয়ে, আমি অনেক সময় নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতাম। কারণ, আমি ভণ্ড ছিলাম না; যাহা আমি অন্তরে অনুভব করিতাম তাহাই সাহস পূর্ব্বক বাহিরে প্রকাশ করিতাম।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতাম, প্রকৃতিতে বিশ্বাস করিতাম এবং অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের জয় হইবে—এইরূপ বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু ধার্ম্মিক লোকেরা ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা চাহিতেন, আমি অন্যান্য কথাও বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যের প্রতি আমার যে অনুরাগ ছিল ঐ সত্যানুরাগ সেই সব কথার বিরোধী ছিল। ঐ সকল কথা আমার যে একটুও কাজে আসিবে তাহা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিতাম না।

অমরতা।

মানুষের অমরত্বে বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। এই প্রকার বিশ্বাস তাহার প্রকৃতির অনুকূল ও প্রীতিকর। এবং এই বিষয়ে তাহার যে সহজ সংস্কার আছে, ধর্ম্মের আশ্বাসবাণী ঐ সংস্কারকে আরও দৃঢ়ীকৃত করে। আত্মার অমরত্বে আমার যে বিশ্বাস তাহা ক্রিয়াশীলতার ভাব হইতে উৎপন্ন; কারণ, যখন আমি অধ্যবসায় সহকারে শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম কর্ম্মচেষ্টার পথে চলিতে থাকি, তখন প্রকৃতির নিকট হইতে একপ্রকার আশ্বাস পাই যে, যখন আমার আত্মার চেষ্টা ও উদ্যমশীলতা বর্ত্তমান জীবনের পক্ষে অসম্যক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তখন প্রকৃতি আমার জন্য অধিকতর উপযোগী অন্য এক জীবনের ব্যবস্থা করিবেন।

যখন কোন মানুষের বয়স ৭০ বৎসর হয়, তখন সে মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। আমার যখন মৃত্যুচিন্তা উপস্থিত হয় তখন আমার মনে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে; কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বরূপতঃ আমাদের আত্মা অবিনশ্বর; সেই আত্মা-বস্তু অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কাজ করিতেছে। সূর্য্য যেমন আমাদের পার্থিব চক্ষুর সমক্ষে উদিত হইতেছে অস্ত যাইতেছে, কিন্তু আসলে অস্ত যায় না, অবিরাম দীপ্তি পাইতে থাকে, ইহাও সেইরূপ।

দৈনিক জীবনের ধর্ম্ম।

কতকগুলি লোক আছে যাহারা বারো মাসই সাংসারিক, কিন্তু বিপদের সময় তাহারা ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া আবশ্যক মনে করে। নৈতিক ও ধর্ম্ম-

সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই তাহারা ঔষধ বলিয়া মনে করে,—অসুস্থ হইলেই নাক মুখ শিটকাইয়া তাহা গলাধঃকরণ করে। ধর্ম্মাচার্য্যকে বা নীতি-উপদেষ্টাকে তাহারা চিকিৎসক বলিয়া মনে করে, কোন প্রকারে তাহার হাত হইতে রেহাই পাইলেই তাহারা যেন বাঁচে। কিন্তু আমি ধর্ম্মকে এক প্রকার পথ্য বলিয়া মনে করি। যখন আমি নিয়ত ধর্ম্মসাধনা করি, সমস্ত দ্বাদশ মাস ধর্ম্মকে চোখে চোখে রাখি, তখনই ধর্ম্ম আমার পথ্য হইয়া দাঁড়ায়।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থ।

ধর্ম্মের যেসকল গভীরতর বিষয়, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে ধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মব্যাখ্যান, এমন কি ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র—এ সমস্ত গৌণকল্পের জিনিস। ধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি,—যে ব্যক্তির নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাক্ষাৎভাবে তাহা প্রকাশ না করে, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য তাহার হৃদয় তাহাকে বলিয়া না দেয়, সে ব্যক্তি গ্রন্থ হইতে তাহা শিক্ষা করিতে পারিবে না। সাধারণত গ্রন্থগুলা আমাদের ভ্রমভ্রান্তির একএকটা নাম দেয় মাত্র, তা' ছাড়া বড় একটা কিছুই করে না।

পাশব সহজ-সংস্কার ও ঈশ্বর।

পশুদের সহজসংস্কারের মধ্যে আমি এমন একটা কিছু দেখি যাহাকে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রেমের একটা অংশ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং পশুর মধ্যেও অঙ্কুর স্বরূপে সেই সকল সদ্‌গুণের নির্দ্দেশ পাই যাহা উৎকৃষ্ট মানবদেহের মধ্যে পূর্ণ-রূপে বিকসিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।

বিশ্বমানবপ্রকৃতির মর্ম্মকথাই হইতেছে উপধর্ম্মের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। যখন আমরা ভাবি উপধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছি, আমরা দেখিতে পাই উহা একটা অজ্ঞাত কোণে লুকাইয়া আছে—একটু জো পাইলেই আবার অন্য আকারে বাহির হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ

জীবেতর বস্তুর অনুভূতি পরিচয়ে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর কার্য্য।

[গত ২০শে নবেম্বর দিবসে রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রদত্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।]

(শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

একবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বসু মহোদয় হারজীয় তরঙ্গ * সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে এরূপ গবেষণার উপযোগী যন্ত্রের বড়ই অসদ্ভাব ছিল। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নানাবিধ নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। সেই সকল যন্ত্রের মধ্যে তাঁহার হারজীয় তরঙ্গধারক যন্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই যন্ত্রটী এত উৎকৃষ্ট ও পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া বিলাতের বিজ্ঞানবিষয়ক শ্রেষ্ঠতম সাময়িক পত্র "ইলেক্ট্রিসিয়ান" সমুদ্রে আকাশের মধ্য দিয়া বিপদসম্বাদ দিবার জন্য তড়িৎচালিত "বাতিঘরে" (light house) এই যন্ত্রের উপযোগিতা ইঙ্গিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান তারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইবার অনেক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বসু উক্ত যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

এই তরঙ্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধানকালে তিনি একটী আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার যন্ত্রে তিনি অনেক সময়ে সামান্য তাড়িত আসিলেও সাড়া পাইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল একটানে ব্যবহারের পর অনেক সময় কঠিন আঘাতেও সাড়া পাইতেন না। ইহা হইতে আমরা যাহাকে জড় বলি সেই পদার্থেও প্রাণের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সেই অবধি তিনি অচেতন পদার্থেও চৈতন্যসত্তার প্রমাণ সংগ্রহে নিরত রহিলেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি সপ্রমাণ করিলেন যে চেতন পদার্থের ন্যায় ধাতু প্রভৃতি জড়পদার্থও দ্রব্যবিশেষের সংযোগে উত্তেজিত হয় এবং কোন কোন দ্রব্যের সংযোগে মরিয়া যায়। তড়িৎসাহায্যে উত্তেজনা প্রয়োগে একটী ভেকের স্নায়ুর ক্রিয়া ও সীসক

---

* সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত ছয় সাত ফুট দীর্ঘ বিদ্যুৎতরঙ্গ উৎপাদন করেন, সেই কারণে বিশেষ প্রণালীতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হারজীয় তরঙ্গ নামে অভিহিত হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহোদয় এক ইঞ্চি পরিমিত তরঙ্গ উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তরঙ্গ যত ক্ষুদ্র হইবে তাহা তত বেগবান হইবে।

প্রভৃতির ধাতুর ক্রিয়া, উভয়ের কার্য্যের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি নিজেই অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার গবেষণার ফল তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুনের অধিবেশনে লণ্ডনস্থ রয়াল সোসাইটীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। * এই সূত্রে তিনি দেখান যে প্রাণন কার্য্যে উদ্ভিদ যেন প্রাণী ও জড়ের মাঝামাঝি—উদ্ভিদও প্রাণীর ন্যায় বিষ, তাপ প্রভৃতির প্রয়োগে উত্তেজনা অবসাদ প্রভৃতি অনুভব করে ও তদুপযোগী সাড়া দেয়।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ডাক্তার বসু ধাতব পদার্থের সাড়া-রেখার প্রতিকৃতি রয়াল সোসাইটির সম্পাদক সার মাইকেল ফস্টারকে দেখানতে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ইহা কোন ভেকের স্নায়ুর সাড়ারেখার প্রতিকৃতি। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে এই রেখাগুলি ধাতু হইতে পাওয়া গিয়াছে, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বসু মহাশয়কে তাঁহার গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দুই বৎসর পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তিনি রয়াল সোসাইটিতে উদ্ভিদের যান্ত্রিক ও তাড়িত সাড়া বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠান এবং উহা ১৯০৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পঠিত হইয়াছিল।

ডাক্তার বসুর এই দুইটী প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটির একজন সভ্য বলিলেন যে ডাক্তার বসু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাহাই করুন, এই সকল জীবতত্ত্বের রাজ্যে তাঁহার হস্তপ্রসারণ অন্যায়। একজন সভ্য বসু মহোদয়ের কথিত সত্যগুলি স্বীয় পরীক্ষালব্ধ বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

দরিদ্র ভারতসন্তান সৌভাগ্যক্রমে তাহাতেও নিরাশ হয়েন নাই। তাঁহার শেষ প্রবন্ধের পর দশবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ পাশ্চাত্য জগত তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব একবাক্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই সূত্রে তিনি সাড়ামান (Response recorder) বলিয়া এক আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার বসুর যন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল বলিয়া আমরা এস্থলে তাহা দিতে বিরত হইলাম।

লাইব্রেরীতে বক্তৃতাকালে বসুমহোদয় তাঁহার যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের অনুভূতি কেমন সুন্দর রূপে দেখাইলেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সকল বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পরিচিত করিবার জন্য যে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা একটী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি যে সময় বিলাতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে তাজা বা সজীব উদ্ভিদ সেখানে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার একটী সহকারী ছাত্রের ও সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে কয়েকটী উদ্ভিদ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিলাতের শীতে ও ধোঁয়ায় দুইটী মরিয়া গিয়াছিল এবং দুইটী অতিকষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছিল। এই শেষ দুইটী তাঁহার সঙ্গে অতি যত্নের মধ্যে অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

ডাক্তার বসু এতদিনে তাঁহার অধ্যবসায়ের পুরস্কার পাইয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের পণ্ডিতসমাজ অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের গবেষণার সুবিধার জন্য তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বসম্বন্ধে একটী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং এক প্রস্থ তাঁহার যন্ত্র ভিক্ষা চাহিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভারতবাসীর আর কি গৌরবের বিষয় হইতে পারে?

ডাক্তার বসু একটী বৃক্ষ হইতে একটী শাখা ভগ্ন করিয়া কয়েকদিন পরে তাহার উপর পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহা হইতেও সাড়া পান। ইহা হইতে তাঁহার মনে একটী নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে—কি উপায়ে আমরা যাহাকে মৃত বলি সেই মৃত পদার্থ হইতেও সাড়া পাওয়া যাইতে পারে অর্থাৎ এক কথায়, কি উপায়ে মৃত প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখা যায়।

ভারতের গৌরব ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার কেবল একটী অর্থশূন্য আবিষ্কার নহে।

---

* Paper on "Electric Response of Inorgainc substances; Preliminary notice." Communicated by Sir M. Foster—Sec., Roy. Soc. London, May 7, 1901—Read June 6, 1901.

ইহার ফলে বিজ্ঞানের কত বিভাগে যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহা আজ কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না।

আয় ব্যয়।

১৮০৭ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত
ষাণ্মাসিক হিসাব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৩৪২।৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৯৮॥৵৬
সমষ্টি	...	৩৯৪১/০
ব্যয়	...	৩৪৮৯৶৯
স্থিত	...	৪৫১৸৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
দুই কেতা গভর্ণমেণ্ট কাগজ

	৪০০৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক—	৪৯/০
নগদ	২৸৩
	৪৫১৸৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৭১৭॥৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৬।৶০
পুস্তকালয়	...	২০৩৸৬
যন্ত্রালয়	...	৩০৪॥৯
সমষ্টি	...	৩৩৪২।৵৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৬৭৸৬
তত্ত্ববোধিনী	...	২৬২॥৩
পুস্তকালয়	...	৪৭।/৩
যন্ত্রালয়	...	১০১১॥৯
সমষ্টি	...	৩৪৮৯৶৯

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

উদ্বোধন।*
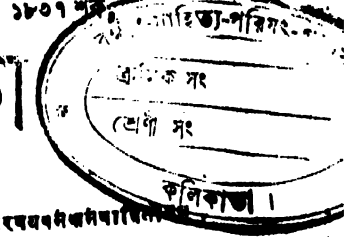
(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কত দুঃখ, কত দৈন্য, শোক তাপ জ্বালা, সংসারের শত কোলাহলের মধ্য দিয়ে একটি বৎসর কেটে গেছে। আবার আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, আজ আবার আমরা সেই অনন্ত প্রেমময় শান্তিময়ের চরণতলে আমাদের পাপে জর্জ্জরিত, দুঃখে অবসন্ন মলিন হৃদয়কে নত করে' তাঁর করুণার ভিখারী হ'য়ে এখানে সমবেত হয়েচি। আজ আমাদের আর কোন কথা নেই, আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু তাঁকে একবার প্রাণভরে' ডাক্‌ব,—যদি ক্ষণেকের জন্যেও দয়া করে' তিনি আমাদের দেখা দেন!

আজ এস আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে সুস্থির করে', একত্র করে', নয়নের জলে হৃদয়ের তার মার্জ্জিত করে' একটি সুরে বাঁধি। এ সুর জননীর উৎসঙ্গাভিলাষী শিশুর কাতর আহ্বানের সুর, এ সুর বিরহতাপিত দগ্ধ হৃদয়ের অশ্রু-নির্ঝরের সুর, এ সুর ভিখারীর মিনতির সুর! এস আমরা ব্যাকুল অন্তরে মা'র কোল পেতে চাই, নয়নের জলে কূল পাবার চেষ্টা করি, ভিখারী হ'য়ে রাজরাজেশ্বরের চরণসেবার অধিকার ভিক্ষা করি।

অনেক জেনেছি, অনেক বুঝেছি, তাঁকে ছেড়ে আত্মশক্তি, পুরুষকার, স্বাবলম্বন, এ সকল কথার কোনই ত অর্থ বুঝতে পারলুম না; শুধু বুঝি, যিনি আমাদের ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বেই মা'র বুকে এমন্ সুধার সরিৎ ছুটিয়েছেন, যিনি আমাদের জন্য যুগযুগান্ত ধরে' আকাশ ভরে' এমন্ রবিশশিতারার আলো জ্বেলে রেখেছেন, যিনি ধরাবক্ষে আমাদের জন্য ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি সঞ্চিত করে' রেখেছেন, যাঁর করুণায় আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর্‌তে পারছি, তাঁর শক্তিতেই আমাদের শক্তি, তাঁর চিন্তাতেই আমাদের আনন্দ, তাঁর দয়াতেই আমাদের জীবন, তাঁর সংস্পর্শ সহবাসে আমরা ধন্য কৃতার্থ। আমরা বৃথা তর্কযুক্তি চাইনে, আমরা প্রাণের ভক্তি চাই; আমরা নির্ব্বাণ-মুক্তি চাইনে, আমরা তাঁর প্রেমের বন্ধন চাই; আমরা আত্মশক্তির অহঙ্কার চাইনে, আমরা সেই মহাশক্তির আশ্রয় চাই।

ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের লালিত্যে, ধর্ম্মাচারের সৌখীনতায় আমরা তাঁকে পাব না, পাব না; ধনের আকাঙ্ক্ষায়, যশের লিপ্সায়, বাসনার উন্মাদনায় আমরা তাঁকে পাব না, পাব না; সুখের আশায়, অসার চিন্তায়, সংসার-মায়ায় আমরা তাঁকে পাব না, পাব না;—তাঁকে চাইলেই তবে তাঁকে পাব। শিশু যেমন বাইরে থেকে মার কাছে এসে সৌখীন্ রঙীন বস্ত্র সব খুলে ফেলে' মার বুকে মুখ রেখে পড়ে থাকে, সতী যেমন পতির সন্দর্শনে সব কাজ ফেলে' দীনবেশে পতিপাশে গিয়ে তাঁর চরণসেবা

* বেহালা-ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।

করে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে দেখে' কৃত্রিমতার সব আবরণ ঠেলে ফেলে' প্রাণের সমস্ত কথা প্রকাশ করে,—এম্‌নি ভাবে তাঁকে আমাদের চাইতে হবে—সরলপ্রাণে, অবিকৃতচিত্তে, স্থিরবিশ্বাসে দীন-ভাবে,—তবেই আমরা তাঁকে পাব। এ সরলতা বাতুলতা নয়, ঘরে পৌঁছবার সোজা পথ; এ দীনতা হীনতা নয়, পরিপূর্ণতার আয়োজন; এ লাভ অসার, অনিত্য অপদার্থের নয়, এ লাভ চিরদিনের সম্বল, চিরস্থায়ী সম্পদের!

আর কেন, এস আমরা গোড়াকে ধরি, গোড়াকে ধরি, মূলকে আঁকড়ে থাকি, অন্তরের সমস্ত প্রীতিভক্তিপ্রেমের সার দিয়ে সেই আদি-বীজকে জীবনে রক্ষা করি,—সব ভয়-ভাবনা দূরে যাবে, অভাব ঘুচে যাবে, কল্পতরু পাব,—ফুল ফুট্‌বে, ফল ফল্‌বে, ছায়া পাব, চিরদিনের আশ্রয় পাব, প্রাণ সুশীতল হবে, সব আশা মিটে যাবে!

ওগো চিরবাঞ্ছিত, চিতসঞ্চিত নয়ন-সলিলে এস; ওগো চিরদয়িত, প্রাণমনবিমোহন, নয়ননন্দন, দুখভঞ্জন, তুমি এস; ওগো প্রাণপতি, নয়নের জ্যোতি, জীবনের ভাতি, অগতির গতি এস; ওগো তৃষিতের বারি, করুণার ঝারি, পাপতাপহারি এস; ওগো এ বিরহবেদনাব্যথিত কাতর প্রাণে, ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে তুমি এস, প্রভু, তুমি এস! তোমার চরণে বারবার প্রণিপাত করি।

আত্মানমেব প্রিয় মুপাসীত।

বহুকাল পূর্ব্বে অরণ্যবাসী কোন ঋষি এক অতীব সত্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে পুত্র-বিত্ত প্রভৃতি কোন প্রকার পার্থিব বস্তুর কামনা করিয়া ভগবানের চরণে উপস্থিত হইও না—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই তাঁহার পথের পথিক হইতে হইবে এবং তাহাতেই তোমার মঙ্গল। সেই আরণ্যক ঋষি বজ্রদৃঢ় স্বরে বলিয়াছেন—আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত—স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্যপ্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না।

ঋষিশ্রেষ্ঠের এই উপদেশ অনুশাসনের ভিতর দুইটী কথা আমরা বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হইতেছি। একটী হইতেছে এই যে, পরমাত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবে—পরমাত্মা ভিন্ন অপর কোন কিছুরই উপাসনা করিবে না। কেবল এই একমাত্র ঋষিই ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে অনুশাসন করেন নাই। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে মুক্তির ইচ্ছা করিলে একমাত্র সেই অখণ্ড অনন্ত চিন্ময় ভগবানের উপাসনা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নাই—অন্য কোনই উপায় নাই। এই কারণে যাঁহারা কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে মুক্তির ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন, যাঁহারা মৃৎপাষাণাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া পূজার্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কে না জানেন যে শ্রীমদ্ভাগবতকার তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ তীব্র ও কঠোর তিরস্কার প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরমাত্মার উপাসনার অর্থে যদি আত্মা দ্বারা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হওয়া বুঝায়, তবে মৃৎ-পাষাণাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে কিরূপে যে তাঁহার সহিত আত্মা দ্বারা সংযুক্ত হইব, সেই সকল মূর্ত্তির নিকট প্রাণের কথা মর্ম্মের ব্যথা যে কি প্রকারে জানাইব, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর—সত্যসত্যই আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা ধ্যানে ও জ্ঞানে এইটুকু উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমাদের পিতামাতা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বর, আমাদের আত্মা সেই মহান আত্মারই এক একটী বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র, এবং আমাদের আত্মা প্রেমেতে জ্ঞানেতে ও নানা-প্রকারে সেই পরমাত্মার সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। শত শত ঋষিমুনির অভিজ্ঞতা ইহার স্বপক্ষে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে, তাঁহাকে প্রাণের কথা বলিতে হইবে, তাঁহা-তেই নিমগ্ন হইতে হইবে, তবেই আমাদের উপাসনা সার্থক হইবে। আমাদের আত্মা—যে আত্মা জ্ঞানেতে কোথায় ঐ অগণিত চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকাপরিবেষ্টিত ব্রহ্মচক্র এবং কোথায় এই জগতের মূল উপাদান পরমাণুই বল আর ব্যোমই বল, এই সকলের তত্ত্ব জানিবার অধিকারের দাবী করিতে পারে; যে আত্মা

এই সমগ্র ব্রহ্মচক্রের নিয়ন্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিবার অধিকার রাখে,—সেই আত্মা মৃৎপাষাণগঠিত মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রীতি সংন্যস্ত করিয়া কখনও কি পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে? অত ক্ষুদ্রভূমির পাষাণভারে আত্মাকে চাপিয়া রাখিলে সে আত্মা মহান প্রভুর্বৈ পুরুষের সন্নিধানে উপস্থিত হইবার উপযোগিতা কিপ্রকারে লাভ করিবে?

ঋষির উপদিষ্ট অনুশাসনের দ্বিতীয় বিশেষ কথা এই যে, সেই পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিতে হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবে? পুত্রকলত্র অথবা ধনপরিজন? যাঁহার আদেশে এই বিশ্বজগত নিশ্বসিত হইয়াছে এবং যাঁহারই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্বজগত স্থিতি করিতেছে, সেই বিশ্বাধিপতিকে ডাকিবার মত ডাকিয়া, ইচ্ছা যদি কর তো পুত্রকলত্রাদির জন্যই প্রার্থনা কর এবং তদভিমুখে যথাযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা নিয়োগ কর—তুমি সে সকলই পাইবে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। কিন্তু সেই সকল লাভ করিলেই কি সত্যসত্যই তুমি সুখী হইতে পারিবে? কখনই নহে। সে সকল যে নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসারেই অনিত্য, মরণশীল। তাহাদিগের সহিত তুমি কিছুতেই নিত্যসংযুক্ত থাকিতে পারিবে না। সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত তোমার কখন না কখন বিচ্ছেদ অবশ্যই হইবে। তাই ব্রহ্মবাদীগণ বলের সহিত বলেন যে "ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে।" ঐ যে আমেরিকানিবাসী ক্রোরপতি বাসনার অতিরিক্ত ধনলাভ করিয়াছিলেন—প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সহস্র মুদ্রা হস্তগত হইত, তাহাতেও তো তিনি সুখলাভ করিলেন না। তাঁহার অর্থ আরও কত উপায়ে খাটাইয়া অধিকতর অর্থাগমের উপায় করিবেন, তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইহাই তো সংসারসুখের পরিণাম! একটী ছোট শিশু যে তাহার কাগজনির্ম্মিত গৃহকে মহামূল্য বলিয়া বিবেচনা করে, অশিক্ষিত যুবকেরা যে মারামারি লাঠালাঠির ফলে একটা ঘুড়ী লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুত্রকলত্র ধনপরিজনে হর্ষোন্মত্ত অবস্থা হইতে উহাদের অবস্থার বিশেষ কোনই পার্থক্য উপলব্ধ হইবে না। সংসারসুখে নিমগ্ন হইবার পরিণামফল আজ আমরা ইউরোপীয় মহাসমরে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সত্য সত্য যদি আমরা প্রীতির পাত্র হইতে চিরকালের জন্য অবিচ্ছিন্ন থাকিতে চাই, তবে সেই পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে; তাঁহাতে প্রাণমন একেবারে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে, আমাদের জীবন যৌবন সকলই তাঁহারই চরণে ঢালিয়া দিতে হইবে, তবে তো আমরা নিত্যসুখে সুখী হইব। তাঁহাকে এমন ভাল বাসিতে হইবে যে মুহূর্ত্তেরও বিরহ যেন সহ্য করিতে না পারি। আমাদের প্রাণ যেন ভগবৎবিরহে ব্যাকুলাত্মা কবির সহিত একযোগে সর্ব্বদাই বলিতে থাকে—

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে,
হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার।
ঐহিকের সুখ যত জানি তা,
কাজ নাই সে সুখে সে ধনে।
হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক আশ্চর্য্য নিয়ম। ভগবৎ বিরহে যে কি কষ্ট কি যন্ত্রণা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও বড় আশ্চর্য্য যে সেই বিরহেরই মধ্যে ভগবৎভক্ত এক অতুল আনন্দ উপভোগ করেন।

প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া চিরসুখী হইতে ইচ্ছা করিলে সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, একমাত্র তাঁহাকেই প্রিয়তমের পদে বরণ করিতে হইবে। ইহা মনে করিও না যে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক অল্প বিস্তর জ্ঞানলাভ করিলেই তাঁহাকে পাইতে পারিবে, অথবা ঈশ্বরের বিষয়ে দুই চারিটা তত্ত্ব সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তাঁহাকে পাইয়াছ। ইহাও মনে করিও না যে কর্ম্মরাশির বৃথা আড়ম্বরের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন রাখিতে পারিলেই তাঁহাকে পাইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের পর কর্ম্ম আসিতে পারে, কিন্তু সে কর্ম্মের ভিতর তাঁহাকে পাইবে না।

তাঁহাকে পাইবার একটী মাত্র পথ—সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। নিজের স্বার্থ, নিজের বলিয়া যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহারই চরণে বলিদান করিতে হইবে। তাঁহার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া বলিতে হইবে—নাথ হে, আমার যাহা কিছু ছিল সকলই দিয়াছি তোমার চরণে; আমার বলে কিছু রাখি নাই হে। হৃদয়ের প্রতি অণুতে অণুতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার আর অন্য স্থান নাই। তাঁহাকে জীবনযৌবনের পূর্ণতা সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য এক কথায়, উন্মত্ত হইতে হইবে, তবে তাঁহাকে পাইবে।

তাঁহাকে ভাল বাসিলে বাস্তবিকই এমন অনেক কার্য্য করিতে হয়, যেগুলিতে সংসার তোমাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিবে, পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। এই উপহাস তোমাকে অকাতরে সহ্য করিয়া চলিতে হইবে। তোমার নয়নের ধ্রুবতারা যিনি, তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনবিষয়ক অনুরাগের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের শত সহস্র উপহাস সহ্য করিতে হইবে। বড় অসহ্য হয়, তাঁহাকেই ডাকিয়া বলিও, তিনিই তোমাকে সেই উপহাস উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখিবার উপযুক্ত এক আশ্চর্য্য বল প্রদান করিবেন। কেবল উপহাস নহে, সংসার তোমাকে কত শত প্রকারের ভয় দেখাইবে প্রলোভন দেখাইবে। এটী করিলে তোমার এত অর্থনাশ, ওটী করিলে তোমার এত মানমর্য্যাদার হানি, এইরূপ নানাবিধ ভয় ও প্রলোভন তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। তখনই তোমার পরীক্ষা—একদিকে তোমার প্রাণের ঈশ্বর, অপর দিকে সংসারের নানাবিধ ভয় ও প্রলোভন। সংসারের পথ এমন পিচ্ছিল যে একবার যদি তাহার দিকে অবনত হও, তাহা হইলে পদস্খলন হইয়া কতদূর যে গড়াইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বরের পথও তেমনি মুক্ত ও উদার। তুমি যদি সেই ভয় প্রলোভনের সময়ে একবার প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাণনাথকে রক্ষা করিবার জন্য ডাক, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং সেই সকল ভয়প্রলোভনের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তোমার হাত ধরিয়া তাঁহার পথের পথিক করিয়া দিবেন। সেই উন্মুক্ত জ্যোতির্ম্ময় পথে দাঁড়াইলে সংসারের উপহাস, সংসারের ভয়প্রলোভন কি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। সংসার তোমাকে যত বলে আঘাত দিয়া ঈশ্বরকে ছাড়িতে বলিবে, তোমার শরীর মন শতখণ্ডে ক্ষতবিক্ষত হইলেও তোমাকে তত বলে ঈশ্বরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে—তিনি আর আমি, আমি আর তিনি। এই ভাবে তাঁহাকে প্রীতি করিলে তবে তাঁহাকে লাভ করিবে—তাঁহাকে লাভের আনন্দ এক অনির্ব্বচনীয় অতুল আনন্দ।

হে পরমাত্মন্, তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? এইটুকু প্রার্থনা করি যে তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রতি এরূপ দৃঢ় প্রীতি দাও যে আমরা তোমার নিকট আর যেন সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অধিক করিয়া না মানি। তোমার আদেশ হইলে যেন সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ করিতে পারি। আমাদের অন্তরে সমস্ত প্রাণমন দিয়া তোমার উপাসনা করিবার সামর্থ্য প্রদান কর।

ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষা প্রবর্ত্তন।

মুখবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির জন্য যেমন রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের স্থিতিসাধনের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের স্থিতিসাধনের উদ্দেশ্যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতি সংস্থাপনরূপ উপায়সমূহের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাগ্রহণের প্রণালীও প্রবর্ত্তন করেন। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের দিবস। এই দীক্ষাগ্রহণের ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। এই দীক্ষাগ্রহণ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে বল আনয়ন করিয়াছিল, সেই বলের সাহায্যেই তিনি অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই দীক্ষাগ্রহণেরই স্মরণার্থ তিনি বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনরূপ ব্রহ্মতীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ৭ই পৌষ উক্ত শান্তিনিকেতনে প্রতি

বৎসর সাম্বৎসরিক উৎসব এবং মেলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাপ্রণালী কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং দেবেন্দ্রনাথই বা কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্রাহ্মের অবিদিত। তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার এবং দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আজ তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ সবিস্তার প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলাম।

প্রথম বার বিলাত যাত্রার পর যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি নিজের সুবিস্তৃত বিষয়কর্ম্ম লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই সংসারের কাজকর্ম্ম একপ্রকার দেবেন্দ্রনাথেরই উপর অর্পিত হইয়াছিল। আর দেবেন্দ্রনাথেরও তখন পূর্ণ যৌবন—২৬ বৎসর বয়ঃক্রম। এ সময়ে তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই বিষয়েরই উন্নতিকল্পে যে একটীর পর একটী অনুষ্ঠান করা তাঁহার মনে সমুদিত হইবে, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে।

ব্রাহ্মসম্প্রদায় গঠনে দেবেন্দ্রনাথের অভিলাষ।

১৭৬১ শকে ডফসাহেব হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের উপর তীব্র নিন্দাবাদ করাতে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি লোকবল ও উপায়ের অভাবে সে সময়ে তাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চাহিলে আপনার লোকবল আবশ্যক, আপনার দলে অনেক লোক থাকা দরকার। উপযুক্ত লোকবল না থাকিলে বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম চলিতেই পারে না। তাই তিনি যেমন একদিকে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিলেন, তেমনি সেই সঙ্গে একটী পাঠশালা ও একখানি মাসিক পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া লোকসংগ্রহের উপায় করিলেন। এই সভা, পাঠশালা ও পত্রিকার সাহায্যে পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষে লোকবল বাড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও বুঝা গেল না যে ঠিক কয়জন লোক সত্য সত্য তত্ত্ববোধিনী সভার এবং ব্রাহ্মসমাজের মতানুসারে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক—বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রয়োজন হইলে কয়জন লোক ব্রাহ্মসমাজের পতাকার নিম্নে সমবেত হইবে। এই বিষয়ে চিন্তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিবার পরেই ব্রাহ্মদিগের একটী সম্প্রদায় সংগঠন করিবার অভিলাষী হইলেন। এই সম্প্রদায় গঠনে অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রথমত বঙ্গদেশের এবং দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজকে অতিক্রম করে নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্রপৌত্রাদির সহিত আলাপ পরিচয় হইবে, সময়ে অসময়ে তাঁহাদের নিকটে প্রয়োজনমত সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে, এই সকল সাংসারিক সুবিধার আশায় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় অনেকে ব্রাহ্মসমাজেও আসিতেন এবং নামেমাত্র ব্রাহ্মসাম্প্রদায়ভুক্তও হইতেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্প্রদায়গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাগ্রহণের একটী প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া উহারই মধ্যে একটু পাকাপাকি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলেন—"যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।"

প্রথম প্রতিজ্ঞাপত্র।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং তন্মধ্যে "গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিধান" বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। এই ব্রহ্মোপাসনা-বিধান দেখিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল। তিনি প্রথম যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা

করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি যে তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা অভুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল। আমরা কিন্তু যে মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার কথা উল্লিখিত দেখি না। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

ওঁতৎসৎ।

অদ্য সপ্তদশ শত শকে দিবসে বাসরে ব্রাহ্মের সম্মুখে ঈশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া একান্তচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

১। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বররূপে প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস সূর্য্যোদয় পরে মধ্যাহ্নকালের মধ্যে কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া পবিত্র মনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনাপূর্ব্বক ন্যূন সংখ্যা দশবার প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। প্রতি বুধবারে প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে দৈনিক উপাসনান্তে সূর্য্যাস্ত পরে অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে রোগ বা বিপদগ্রস্ত না হইলে কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার যাহাতে হয় এমত সকল কর্ম্ম করিব না।

৮। কুকর্ম্ম সকল হইতে নিরস্ত থাকিব।

৯। যদি মোহ দ্বারা কোন কুকর্ম্ম দৈবাৎ করি তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিরা পুনর্ব্বার সে কর্ম্ম করিব না।

১০। কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।

১১। আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমেশ্বর এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাক্ষী শ্রী

ব্রাহ্ম শ্রী

ব্রাহ্ম।

প্রথম প্রতিজ্ঞাতে "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" নাম।

উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে আমরা তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কয়েকটী তথ্য অবগত হইতে পারি। প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে বুঝিতেছি যে ১৭৬৫ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নাম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" হয় নাই, "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" ছিল। তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্মমতগুলি উপনিষদুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, সেইগুলিই নিজেদের মত বলিয়া স্বীকার করিতেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা উপনিষৎসমূহকেই ধর্ম্মমতের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাদ্বয়ে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতে দেখি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মগণ কার্য্যত গায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা যতটা করুন আর না করুন, অন্তত কথায় সেই ব্রহ্মোপাসনাকে শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করিতে উদ্যত ছিলেন। গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা এবং পারমার্থিক উন্নতিকল্পে তাহারই শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথ

এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণ সভ্যদিগের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরও তো অনেক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন স্বসমাজে গায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন? বলা বাহুল্য যে এই দুই প্রতিজ্ঞা অধিকাংশস্থলেই প্রতিপালিত হইত না। আর অনুমান হয় যে অনেকেই এইরূপ ব্রহ্মোপাসনাবিধি নিতান্ত নীরস এবং নিরর্থক বোধ করিতেন। আরও, হিন্দু ব্যতীত খৃষ্টীয় প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিলে তাঁহাদের পক্ষে গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপানাবিধি কেবল নিরর্থক নহে কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত, এ ভাব অথবা এই দুইটী প্রতিজ্ঞার সাম্প্রদায়িক ভাব দেবেন্দ্রনাথের মনে আসিয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু আমরা দেখি যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের পরিবর্ত্তে এক সহজসাধ্য, সাম্প্রদায়িক ভাববিরহিত, উদারতম ভাবাপন্ন এবং সাধারণের গ্রহণীয় এই একটী প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হইয়াছিল যে "রোগ বা বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।"

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞাতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মদিগের ভিতরে জাতিভেদ উঠাইবার সূত্রপাত স্বরূপে অন্তত উপাসনার সময়ে "কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিবার" বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই বিধি হইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরই প্রাধান্য ছিল। তদ্ব্যতীত, সেই প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক ব্রাহ্মণও প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা হিন্দুকলেজের ডিরোজিও, ডফ প্রভৃতি সাহেবদিগের ব্রাহ্মণ্যবিরোধী শিক্ষার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। অনুমান হয় যে দেবেন্দ্রনাথ ইহাঁদিগের সমবেত শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া এই দুইটী প্রতিজ্ঞাতে ঐ কথাগুলি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ বিধিপ্রবর্ত্তনের ফলে যে সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে, এটা সেই সময়কার ব্রাহ্মগণ, এমন কি দেবেন্দ্রনাথও বুঝিতে পারেন নাই। নিজেদের একটি দল হইবে এবং সেই দল প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে, এইরূপ ভাবের মধ্যে তদানীন্তন ব্রাহ্মগণ দূরদৃষ্টি হারাইয়াছিলেন।

রাখালদাস হালদারের উপবীত পরিত্যাগ প্রস্তাব।

একটি বৃহৎ সম্প্রদায় সংস্থাপনের কথা যে ব্রাহ্মদিগের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা তদানীন্তন অন্যতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্ম রাখালদাস হালদার মহাশয়ের প্রস্তাবেই বুঝা যায়। "রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে 'ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণপ্রভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ। অলখ নিরঞ্জনের উপাসক শিখ সম্প্রদায় বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিয়া "সিংহ" এক উপাধি দিয়া সকলে এক হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এত ঐক্যবল হইল যে, দিল্লীর দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব বাদসাহকেও পরাজয় করিয়া তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল'।" রাখালদাস বাবু বুঝেন নাই যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয়ত, শিখগণ অন্ধভাবে নেতার আদেশ পালন করিত, কিন্তু স্বাধীনচিন্তাশীল শিক্ষিত বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে যে নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা অসম্ভব, রাখালদাস বাবু বোধ হয় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, শিখগণের মধ্যে নানা কারণে যতই ঐক্যবল হউক না কেন, তাহারা যে অসাম্প্রদায়িকতা হইতে সরিয়া গিয়া ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার কঠোর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মগণ শিখসম্প্রদায়ের অনুসরণ করিলে যে ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র অসাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদসাধনের সম্ভাবনা থাকে, রাখালদাস বাবু বোধ হয় সে বিষয় চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সকল জাতি মিলিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে, এই স্বপ্নে পড়িয়া তদানীন্তন ব্রাহ্মগণের কেহই বোধ হয় এ বিষয় ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। দেবেন্দ্রনাথও সেই সময়ে এই বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ অনুমান হয় যে

দেবেন্দ্রনাথও আশা করিয়াছিলেন যে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র অবলম্বনে "বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য-ধর্ম্মের" প্রচার হইতে থাকিলে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, ভারতবাসীদের পরস্পরের বিচ্ছিন্ন-ভাব বিদূরিত হইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে এবং ভারতের পূর্ব্ববিক্রম জাগ্রত হইয়া উঠিবে ও যথাসময়ে স্বাধীনতা লাভ হইবে। সৌভাগ্যক্রমে উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ এই দুইটি প্রতিজ্ঞার সাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করিয়াই হউক বা এরূপ বিধি অবলম্বনে সমাজসংস্কারের অপকারিতা বুঝিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক উহা প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে উঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে সাম্প্রদায়িকতাকূপে চিরনিমগ্ন হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই দুইটি প্রতিজ্ঞা না উঠাইয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত এবং ব্রাহ্মসমাজের অসাম্প্রদায়িক আদর্শ তিরোহিত হইয়া যাইত। সম্ভবত একটি ঘটনা ঐ দুই প্রতিজ্ঞার অপকারিতা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল—"রাখালদাস হালদারের পিতা (রাখালদাসের) উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ একুশজনের প্রথম দীক্ষাগ্রহণ।

যাই হোক, প্রথম প্রতিজ্ঞাপত্র পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ এই ব্রতগ্রহণের দিন স্থির হইল। "সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা জবনিকা দিয়া আবৃত হইল। বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান হইল। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল, সেই বেদীতে (রামচন্দ্র) বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন।" * * * "প্রথম শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে দেবেন্দ্রনাথ। তাহার পরে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারিলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।" ইহাদের মধ্যে অনেকে দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন এবং অবশিষ্ট অনেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অধীনে অথবা তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন। আমাদিগের জানিতে কৌতূহল হয় যে উপরোক্ত একুশ জনের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কয়জন উপবীত খুলিয়া গায়ত্রী অবলম্বনে উপাসনা করিতেন।

দীক্ষিত ব্রাহ্মগণের উৎসাহ।

অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবার পর নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রের পার্শ্বে নিজ নিজ মনোমত অনেক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল প্রতিজ্ঞার দু'একটি দেখিলে আমরা এখন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিব না, কিন্তু সে গুলিতে ব্রাহ্মসমাজের কৈশোর অবস্থার উপযুক্ত তদানীন্তন ব্রাহ্মদিগের মনোভাব সুন্দর ব্যক্ত হয়। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা নন্দকিশোর বসু তাঁহার ১৭৬৬ শকের ১২ই চৈত্র দিবসে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্রে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন—"কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার জপ না করিতে পারি তবে তদ্দিবসে অন্যসময়ে কিম্বা তৎপর দিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে জপ যে বক্রী থাকিবেক, তাহা সম্পূর্ণ করিব।" অর্থসম্বন্ধীয় দেনা পাওনার ন্যায় জপেরও যেন হিসাব পরিষ্কার করা আবশ্যক ছিল। নন্দকিশোর বাবু আবার দশম প্রতিজ্ঞার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—"এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিও"—যেন ব্রাহ্ম হইলে জনসাধারণকে সাহায্য করা নিষিদ্ধ ছিল!

অনেক দীক্ষিত ব্রাহ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

১৭৬৭ শকের পৌষমাসের মধ্যে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া ব্রাহ্মসম্প্রদায়-

ভুক্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে এতগুলি স্বাক্ষরকারী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হনীয় হইতেন।" প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করা একটা বহিশ্চিহ্ন মাত্র। অন্তরে প্রতিজ্ঞারক্ষার বল বা ইচ্ছা না থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অন্তরে প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন অবশ্য সেবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে।

লালা হাজারীলাল।

আমাদিগের মতে অধিকারীনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ব্রাহ্মসম্প্রদায় সংগঠিত করিতে যাওয়াই এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার অন্যতর কারণ। লালা হাজারীলালের মত অত্যুৎসাহী প্রচারকদিগের দ্বারাই এইভাবে ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল। লালা হাজারীলালই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী প্রচারক ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতা যখন "বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হাজারীলালকে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের (দেবেন্দ্রনাথের) বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহার জীবনের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পক্ষে বিপরীত ঘটিল। সে কলিকাতায় আসিয়া নগরের পাপস্রোতে ভাসিয়া গেল। তাহাকে কে বা দেখে, কে বা তার সংবাদ লয়—অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাহার জীবন পাপময়, কলঙ্কময় হইল।" হাজারীলাল ইন্দোরের অধিবাসী এবং জাতিতে লালা অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন। ইনি নিরামিষভোজী ছিলেন। শস্য ও তরকারী প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় আহার করিলে অধিক বলসঞ্চয় হয় এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইতি জীবনের শেষাংশে কাঁচা বেগুন ও কাঁচা লাউ খাইতেন।

পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইবার কিছু পরে ইনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে পাপস্রোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্যের সোপানে পদনিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে একুশজন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতর ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ ইহাঁকেই প্রচারকপদে বরিত করিয়া দেশবিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করেন। ইনি কলিকাতায় ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী নির্ব্বিচারে সকলের নিকট যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন এবং সকলকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অল্পকালের মধ্যে তখন যে অত লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যত্নে।" তিনি লোকের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেই কাহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। স্বাক্ষর করিবার পর প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীকে একটী করিয়া "ওঁ" খোদিত স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। হাজারীলাল যে কয়জনকে ব্রাহ্ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া আনিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের প্রতিজনের হিসাবে তিনি একটী করিয়া মোহর বা ষোল টাকা পুরস্কার পাইতেন। ব্রাহ্মসমাজে মাসিক উপাসনার শেষে এই অঙ্গুরী ও পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হইত। একবার এক মাসিক সভার পর হাজারীলাল দেবেন্দ্রনাথের হস্তে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র সমূহ দিবার জন্য পশ্চাতের বেঞ্চি হইতে এত ব্যস্ততার সহিত বেঞ্চি টপকাইয়া বেদীর সম্মুখে আসিতেছিলেন যে, সমাগত ভদ্রলোকদিগের গায়ে পা লাগিল কি না সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। পুরস্কারাদি বিতরণের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন যে তাঁহাকেও ব্রাহ্ম করা হউক। দেবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোকটী তাঁহাকে বলিলেন যে "ব্রাহ্ম হইলে তিনিও সমাগত ভদ্রলোকদিগকে পদাঘাত করিবার সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।" বলাবাহুল্য এই প্রণালীতে

ব্রাহ্মসম্প্রদায় বুদ্ধির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে যে কোন উপকার হয় নাই তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস কলিকাতার জনসাধারণে এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রতিজ্ঞাপত্র।

বর্ত্তমানে আদিব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণকালে যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল ঃ—

"ওঁতৎসৎ।

আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশত কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্, সম্যক্‌রূপে এই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

সাক্ষী শ্রী (স্বাক্ষর) শ্রী"

বর্ত্তমানে প্রচলিত এই প্রতিজ্ঞাপত্র উদারতম ভিত্তির উপর সংরচিত হইয়াছে। ইহাতে কোন বিশেষ ধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উপাসনার কথাও নাই এবং এক ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া অপর ধর্ম্মের স্তুতিবাদও নাই। এই প্রতিজ্ঞাপত্র উদারতম ভিত্তিমূলক হইলেও আমরা জানি যে দীক্ষাগ্রহণের পর স্বাক্ষর করিবার বিভীষিকাতে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে।

এই দীক্ষাপ্রবর্ত্তন হইতেই ধরিতে গেলে প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রথম দীক্ষাগ্রহণের দিবস ৭ই পৌষ ব্রাহ্মসমাজের একটী স্মরণীয় দিবস।

প্রার্থনা।

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

সুঘন সুনীল ওই গগনের তলে
ওই নব দুর্ব্বাদলে বিজনে বিরলে
আমি থাকি করজোড়ে মুদিত নয়নে—
এস তুমি নেমে এসো হৃদি পদ্মাসনে।
অমৃত-বিধৌত হোক সকল হৃদয়,
দূরে যাক দৈন্য শোক, দূরে যাক ভয়।
অসীম অবাধ মুক্তি আনন্দের মাঝ
লয়ে যাও মোরে হে দেব হৃদয়-রাজ।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনয়ারিলাল চৌধুরী)

অনুবাদের অনুরোধে আমাদের অনেকগুলি শব্দের মৌলিক তাৎপর্য্য বদলাইয়া গিয়াছে। Religion কথাটার প্রতিশব্দ খুঁজিতে যাইয়া "ধর্ম্ম" এখন পূর্ণ মাত্রায় "religion" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ এ যুগে বাঙ্গালায় science শব্দের অর্থ হইতেছে বিজ্ঞান। ইংরাজী প্রচলনের পূর্ব্বে সম্ভবত "ধর্ম্ম" শব্দে বুঝিতে হইত স্বভাব, আর বিজ্ঞান শব্দের প্রচলিত অর্থ ছিল পরা বিদ্যা। আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থেই শব্দ দুইটি এখানে ব্যবহার করিব। অনেক সময় উপদেশ ও বক্তৃতাদিতে "ধর্ম্ম" ও "বিজ্ঞান" দুইটি বিরোধাত্মক শব্দরূপে বর্ণিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এখানেও আমার মনে হয় মূল বিবাদ শব্দার্থ লইয়া। বিজ্ঞান (Science) জড় পদার্থ (matter) লইয়া আলোচনা করে—অতএব বিজ্ঞানের সঙ্গে (materialism) জড়বাদের

বুঝি তারি একটা নিকট সম্বন্ধ। কথাটা শুনিতে বড় হাস্যকর বলিয়া মনে হয় প্রকৃত অবস্থা তত অসম্ভব নহে। আমরা একাধিকবার ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ধর্ম্মের একটা দিক এবং বিজ্ঞানের আর একটা দিক, এই ভাবের আলোচনা ও উপদেশ শুনিয়াছি। শুনিয়া কখনও কখনও মনে হইয়াছে বাস্তবিকই কি তাই? ধর্ম্মের আলোচনা ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধান, ইহারা কি দুই বিভিন্ন পথের যাত্রী? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা কখনও ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য স্থানান্তরে * "বৈজ্ঞানিক গবেষণা"কে "বিধিলিপি পাঠ" বলিয়াছিলাম।

মনুষ্যেতর প্রাণীতে ধর্ম্মের আলোচনার স্থান নাই, তাহাদের মধ্যে "বৈজ্ঞানিক গবেষণা" প্রসারেরও কোন সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যেতর প্রাণীর একটা উচ্চ অঙ্গের অধিকার আছে যাহা হইতে সৃষ্টির তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। সেটি হইতেছে আত্মজাত সহজ জ্ঞান (instinct)। Instinct জাতির (species) আপদুদ্ধারকারী স্মৃতিসমষ্টি। কোনও জাতি- (species) বিশেষের মস্তিষ্কে বা সংযুক্ত স্নায়ুমণ্ডলে যখন ধারাবাহিকরূপে কোনও একটি স্মৃতি সংরক্ষিত হইয়া যায়, তখন সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির (individual) সেই জ্ঞান বা স্মৃতি জন্মলব্ধ সহজ জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মস্তিষ্ক এই জাতীয় ও জন্মজাত স্মৃতিসম্পদে অতি দরিদ্র। কিন্তু এই দরিদ্রতার পরিবর্তে মানুষের মস্তিষ্ক অপরিসীম উর্ব্বর ও বিস্তৃতভাবে গঠিত। দেহপরিমাণের তুলনায় মেরুদণ্ডীদের মধ্যে ওজনে ও বিস্তারে মানুষের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা বড়। বড় হইয়াও জন্মলব্ধ সহজ জ্ঞানে ইহা অতিশয় খাটো। অন্যপক্ষে মানুষের মস্তিষ্কের ব্যক্তিগত শিক্ষালব্ধ জ্ঞানগ্রহণের শক্তি (Educability) অত্যন্ত বেশী। এই উর্ব্বর মস্তিষ্কের বলে, সুদীর্ঘ শৈশবকালের আনুকূল্যে এবং মানুষের স্বভাবজাত জ্ঞানার্জ্জনপ্রবৃত্তির সহায়তায় আত্মরক্ষোপযোগী স্বভাবদত্ত আহরণ গ্রহণের প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট না হইয়াও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানে মানুষ জীবরাজ্যের রাজা। মানুষের এই উর্ব্বর অথচ অগঠিত মস্তিষ্ক, শিক্ষাসানুকূল সুদীর্ঘ শৈশরকাল, আর এই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা—এ তিনই প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বা বিধিনিয়োজিত বিধান। এই তিনের সাহায্যে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেই ধর্ম্মের গ্লানি এবং মনুষ্যসমাজের বিনাশ অবধারিত। জ্ঞানার্জ্জন, সত্যাবধারণা, প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদ সকলই বিধিনিয়মে মনুষ্যের আত্মরক্ষার এবং মনুষ্যজাতির রক্ষার একমাত্র উপায়।

আদিমানবের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিংশ শতাব্দীর মানবের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আয়োজন ও প্রকরণের প্রভেদ থাকিলেও মানবের এ চেষ্টা বিধিপ্রণোদিত ও অত্যন্ত প্রাথমিক। বাষ্পীয় কলের আবিষ্কারক আর কৃত্রিম উপায়ে অগ্নির উৎপাদনক্রিয়ার আবিষ্কারক ইহার মধ্যে কাহার কৃতিত্ব অধিক তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। তবে অতি প্রথম হইতেই লোকজগতের চেষ্টালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যসমষ্টি চিরকালই তাহার ধর্ম্মভাবকে মার্জ্জিত ও পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। ইহাই মানবের ও তাহার ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিবাদ। এই প্রাকৃতিক সত্যান্বেষণে উদাসীন হইলেই ধর্ম্মে মলিনতা প্রবেশ করিয়া থাকে। বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাসত্য লক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সৃষ্টি করার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সমসাময়িক বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আবার ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে সেস্থানে বসাইলেও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানে শৈথিল্য, আলস্য বা সহজ পথের স্থান নাই। এ কঠোর সাধনায় ঢিলা পড়িলেই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। স্থানান্তরে একবার কাচপোকার কথাটা পাড়িয়াছিলাম।* আজ ভ্রান্ত বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন ঋষিদের অনেকে এই কাচপোকার (বা কুমরিয়া পোকার) অদ্ভুত লীলাখেলা অনেকটা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিল তিল

* প্রবাসী—১১শ খণ্ড ৪৮১ পৃঃ।

* সাহিত্য পরিষদে পঠিত জীব বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ।

করিয়া মাটি সংগ্রহ করিয়া এই পোকারা বাসা (বা সূতিকাগার) নির্ম্মাণ করে, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ তৈয়ার করিয়া থাকে। প্রথম প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইলেই তাহাতে সারবান ডিম্ব স্থাপন করিয়া ইহারা শীকারান্বেষণে বাহির হয়। আরসোলা, মাকড়সা বা অন্য যে কোন জাতীয় ছোট পোকা আক্রমণ করিয়া সেই ধৃত পোকার সংযুক্ত স্নায়ুমণ্ডলে হুল ফুটাইয়া একপ্রকার সম্মোহন বিষ ঢুকাইয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াটা অনেকটা আধুনিক ডাক্তারদের হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দ্বারা মরফিয়া বা ইউরারি প্রয়োগের মত। সুপ্রবিষ্ট বিষের জোরে ধৃত জীব অগৌণে মোহগ্রস্ত হয়। একবার হুল প্রয়োগ করিয়া কাচপোকা একটু সরিয়া অপেক্ষা করে। মাত্রার ন্যূনাধিক্যে পূর্ণ মোহ বা অর্দ্ধ মোহ ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ মোহ না হওয়া পর্য্যন্ত কাচপোকা অল্প সময় ব্যবধানে ধীর ও অবহিত চিত্তে একাধিকবার এই সম্মোহন বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইলে কাচপোকা এই হৃতচৈতন্য শীকারকে নিজ প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে। এইরূপ প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পূর্ণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ ও মাটালিপ্ত করিয়া তাহা হইতে অদৃশ্যে কাচপোকা সরিয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন দর্শনবেত্তা ঋষিরা কাচপোকার এই কার্য্যটি অনেকটা সূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধে ও অপোরক্ষানুভূতিতে কাচপোকার এই কার্য্যটি বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিরা এই কার্য্য পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন নিরাভরণা আরসোলা বা কদাকার গোবরেপোকা অনন্য-সুন্দর কাচপোকা বা ভ্রমরকীট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে, এবং একাগ্র মনে সেই ভ্রমরচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানের অধিকারে রাজার জন্যও সরল পথ প্রস্তুত হইতে পারে না। অর্দ্ধেক অনুসন্ধানে সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই ভ্রমপূর্ণ মত আসিয়া পড়ে। ঋষিরা দেখিয়াছিলেন আরসোলার সম্মোহন ভাব এবং কাচপোকার কুটীরে তাহার আশ্রয়লাভ, আর দেখিয়াছিলেন সেই প্রলেপিত রুদ্ধ দ্বার ছিদ্র করিয়া নূতন কাচপোকার বহির্গমন; সিদ্ধান্ত হইয়াছিল সেই মুগ্ধ আরসোলার কাচপোকাত্ব প্রাপ্তি। পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে গুরুতর ত্রুটী রহিয়া গেল তাহা আর কিছুই নহে— তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষার ত্রুটী। কাচপোকার অর্দ্ধগঠিত ও পূর্ণগঠিত কয়েকটি মাটির প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাঙ্গিয়া দেখিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে উহা নির্ম্মাতার বাসগৃহ নহে, তাহার সূতিকাগার মাত্র। প্রথম প্রকোষ্ঠে কাচপোকার ভ্রূণযুক্ত ডিম্ব, তার পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে ভ্রূণের আহারের উপাদান লুপ্ত-চেতন আরসোলা প্রভৃতি ধৃত পোকা। পোকাগুলির পচন নিরাকৃত। ধৃত পোকার চারিদিকে কাচপোকার পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ভ্রমরের ধ্যানে পোকার সম্মোহন নহে, উহা কাচপোকাপ্রদত্ত পচননিবারক ও অসাড়তা উৎপাদক পদার্থবিশেষের প্রয়োগের ফল। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠে এইরূপ খাদ্যসম্ভার যোগাইয়া মাতা কাচপোকা সূতিকাগার সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। অন্যদিকে ডিম্বস্থিত ভ্রূণ ক্রমে চেতনাসম্পন্ন হইয়া দেহাবয়বের পরিবর্ত্তনের (metamorphosis) সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত ধৃত পোকাগুলি নিঃশেষ করিতে করিতে রুদ্ধ দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে ডিম্বনিঃসৃত কীটটী দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিতর হইতে ছিদ্র করিয়া সূতিকা-প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। প্রকোষ্ঠগঠন, কাচপোকা মাতার তাহাতে পুনঃপুনঃ প্রবেশ, লুপ্তচেতন কীটাদির প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি, প্রলেপিত প্রকোষ্ঠ হইতে নূতন কাচপোকার নির্গমন এবং পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠাবলীতে সঞ্চিত লুপ্তচেতন কীটাদির নিরুদ্দেশ, এই সকল পর পর ঘটনাগুলি সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কেবল কল্পনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া ঋষিদের এবিষয়ে ভ্রম ঘটিয়াছিল। দোষ হইতেছে তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালীর। প্রণালীর বিশুদ্ধতাই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এখানে সেই ভিত্তির পত্তনে ভ্রম, কাজেই সিদ্ধান্তও অতিশয় ভ্রমসঙ্কুল।

বেঙের শীতকালীন নিদ্রা, ছোট সজারুর ষাণ্মাসিক মোহ, খঞ্জনের দেশান্তর প্রয়াণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ ঘটনাকে প্রকৃতির নিয়মের

বিরুদ্ধাচারী ঘটনা মনে করাও এই প্রকার অবিশুদ্ধ প্রণালীসম্মত ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ফল।

সত্য অবধারণ করিতে হইলেই ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা (observation and experiment) উভয়ই সমানভাবে আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে পুনঃপুনঃ পরীক্ষার অভাবে কেবল ভূয়োদর্শন ও কল্পনার সাহায্যে অনেকগুলি অপসিদ্ধান্ত দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের পাপে ভারত আজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের আলোচনা, বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচার ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, সত্য মাত্রই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ক্যাণ্টারবেরির ভূতপূর্ব্ব আর্কবিশপ ম্যাণ্ডেল ক্রেটন বলিয়াছেন—"আমাদের চরম লক্ষ্যের এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায়ের জ্ঞানই হইল ধর্ম্ম" "Religion means the knowledge of our destiny and the means of fulfilling it"।

মানুষের চরম লক্ষ্যের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে আত্মতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে যে ধর্ম্ম (religion) প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা সত্যধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা কেবল কুসংস্কারেরই নামান্তর মাত্র। ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পথ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি ধর্ম্মের প্রচলিত মত ও প্রণালীর বিশুদ্ধতা সাধন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে সত্যধর্ম্মকে অগ্রগামী করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্যই যুগে যুগে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সত্যের কখনও সংস্কার হইতে পারে না। বিজ্ঞানের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত, অনুসন্ধান বা পরীক্ষার প্রতি উহার বিরুদ্ধতা নাই, সত্য গ্রহণে দ্বিধা নাই, প্রচলিত মতে ভ্রম প্রদর্শিত হইলে সেই মতের অন্যায় সমর্থনে বা রক্ষণে কোনও পক্ষপাত নাই। ইহাই সত্যের পথ—ইহাই একমাত্র ধর্ম্মপ্রণালীর খাঁটি পথ। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যাঁহারা বিরোধ কল্পনা করেন তাঁহারা ধর্ম্মপ্রণালীতে জঞ্জাল জড়াইয়া প্রচলিত মতবাদকে সত্যের সিংহাসনের উপরে বসাইতে চাহেন। আকাশে দুর্গনির্ম্মাণের ন্যায় সেই সত্যভ্রষ্ট মতবাদ উপধর্ম্মে পরিণত হইয়া মনুষ্যসমাজের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ভগবান ব্রাহ্মসমাজকে এই বিপদের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিয়া উন্নতিশীল বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর ইহার মতবাদ ও কার্য্যপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

আজ বঙ্গবাসী কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের কিরূপ ভীষণ প্রকোপ চলিতেছে। আমরা "বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর" সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের নিকট হইতে এই দুর্ভিক্ষ বিষয়ক একটী বিবরণ ও আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এইবারেই আমরা পত্রস্থ করিলাম। আমরা বাঁকুড়ার অধিবাসীদিগের নিকট অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে আগামী বৎসরেও এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হয় কি না সন্দেহ। এ অবস্থায় আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। চারিদিকে শত শত ধনভাণ্ডার খোলা হইতেছে এবং কোথাও বা প্রাণের সহিত, কোথাও বা খাতিরে পড়িয়া আমাদিগকে সেই সকল ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইতেছে তাহা আমরা বেশ জানি। তবু আমরা বলিব, শতবার অনুরোধ করিব, করযোড়ে পায়ে ধরিয়া বলিব যে তোমাদের অনাহারক্লিষ্ট ভাইদিগকে ভুলিও না। আমরা ভিখারীর জাতি বটে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে প্রেমের আধিপত্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে সে প্রেম কি মিষ্ট! ভিখারীগণের অনেকেই ভিক্ষা করিয়া কত কষ্টে নিজের জন্য যে আহারটুকু সঞ্চয় করে, অপর ভিখারীকে অনাহারী দেখিলে দয়ার্দ্রহৃদয়ে সেই কষ্টসঞ্চিত একটুকরো আহার হইতেও তাহাকে একটু ভাগ দেয়। আমরা জানি যে আমাদের অন্নসংস্থান কত অল্প—কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল ভাইভগ্নী এক সময়ে নিজেদের সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাদের সেই অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছে, আজ তাহাদের বিপদের সময় তাহাদের প্রতি, তাহাদের পুত্রকন্যাদের প্রতি একটীবারও কি তোমরা মুখ তুলিয়া চাহিবে না? নিজেদের আহার্য্য হইতে অন্তত এক মুষ্টি চাউলও সঞ্চিত করিয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ কর। এক

পয়সা, অর্দ্ধ পয়সা, এক মুষ্টি চাউল, যিনি যাহা দিতে পারিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। দাতাগণ হয় তাঁহাদের দাতব্য আবেদনে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, অথবা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলেও তাহা অবিলম্বে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর আবেদন।

"বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এই যে, সাধারণতঃ বাঁকুড়াজেলায়, বিশেষতঃ সদর বিভাগে, জমি প্রায়ই শুষ্ক ও অনুর্ব্বর; তাদৃশ নদী, জলাশয় বা পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত নাই যদ্দারা বৃষ্টির উপর নির্ভর না করিলেও চলে। সমভাবে সর্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না; সুতরাং প্রায়ই অল্প অনাবৃষ্টিতেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়।

গত ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যায় বাঁকুড়ার উত্তরাংশে বহুস্থান জলপ্লাবিত হইয়া যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর বৎসরে (১৯১৪) ভাদ্র মাসেই বর্ষার শেষ হওয়ায় ফসল ভাল হয় না। এতদুপরি এই বৎসর আষাঢ়মাস হইতে অনাবৃষ্টি হওয়ায়, উচ্চভূমির ত কথাই নাই—নিম্নভূমিস্থ সহস্র সহস্র বিঘায় আদৌ ফসল রোপিত হইতেই পারে নাই। ইহা ব্যতীত নিকটস্থ বহু কয়লার খনির কার্য্য বন্ধ হওয়ায় সহস্র সহস্র লোক নিরন্ন ও বিপন্ন হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ৭০; তন্মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়াছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, দিনের গাড়িতে বাঁকুড়া জেলার ভিতর দিয়া যাইতে দুইধারে বহুমাইলব্যাপী পতিত অকর্ষিত ধান্যক্ষেত্রের দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। আউষ ধান এ বৎসর আদৌ হয় নাই। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব লিখিয়াছেন, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা নীরবে যে কি কষ্ট সহ্য করিতেছে, তাহা আমরা কেহই কল্পনা করিতে পারি নাই এবং অনেকেরই অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে অবিলম্বে তাহাদিগকে সাহায্য না করিলে তাহাদের অনশনে মৃত্যু হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সেবকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হৃদয়বিদারক। সহস্র সহস্র পুরুষ, নারী ও শিশু অনাহারে ও ক্লেশে অস্থিকঙ্কালসার ও মৃতপ্রায়। অনাহারে মৃত্যুও ঘটিতেছে। বহুসংখ্যক লোক চাউল বিতরণের দিন চাউল লইতে আসিয়া অনাহারে ক্লান্তিতে পথেই পড়িয়া যাইতেছে, কেহ কেহ আর উঠিতেছে না। শিশুসন্তানদের অনশন-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতামাতা একত্রে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে ও "কেহ কেহ খাইতে দিতে অসমর্থ হইয়া ২।১ টাকার লোভে অপরকে সন্তান বিক্রয় করিতেছে।" আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী (সোস্যাল সার্ভিস লীগ্) সেপ্টেম্বর মাস হইতে উত্তরে বড়জোড়া ও বাঁকুড়ার পশ্চিমে ছাতনায় দুইটি প্রধান সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। আমাদের সেবকগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর নিতান্ত নিরুপায় ও বিপন্নদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া (নিদর্শন-পত্র দ্বারা) চাউল বিতরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যেই মণ্ডলীর সাহায্যপ্রাপ্ত, লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সপ্তাহে প্রায় ৫০০০ হইয়াছে। ইহা ক্রমশঃ আরো বাড়িবে। কারণ, আগামী বৎসরের ভাদ্রের পূর্ব্বে আর কোনো ফসলের আশা নাই—তাহাও সুবৃষ্টির উপর নির্ভর করিবে।

ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণরূপ ধারণ করিবে। সম্মুখে দারুণ শীত। উদরে অন্ন নাই; শরীর জীর্ণশীর্ণ; শীতনিবারণের জন্য বস্ত্র কিনিবার সামর্থ্য নাই। অনাহারেও যেটুকু প্রাণশক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, শীতযন্ত্রণায় তাহাও অপহৃত হইবে!

ন্যূনকল্পে চারি আনায় দুইসের চাউলে একজন লোক একসপ্তাহকাল কোনক্রমে বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ ১৲ বা ৫৲ বা ১০৲ টাকার মাসিক দানে আমরা প্রত্যেকে ১ বা ৫ বা ১০ জন লোককে কোনও মতে একমাস করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারি। এইরূপ দানে কাহারও অন্নগ্রাসের বিশেষ হ্রাস হইবে না অথচ সহস্র সহস্র মৃতপ্রায় দেশ-

বাসী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবে। অনশনহেতু শীতক্লেশ আরও নিদারুণ বোধ হয়। প্রত্যেকে যদি স্বীয় স্বীয় পরিত্যক্ত বা পরিত্যাজ্য দু-এক খানি জামাকাপড় দান করেন বা তদর্থে অর্থ সাহায্য করেন, তবে তদ্দ্বারা বহুসহস্র বিপন্ন লোক শীতক্লেশ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়া প্রাণে বাঁচিবে।

এইরূপ ক্ষেত্রে দান একবারমাত্র করিলেই শেষ হয় না; আর, অনেকেই ত এপর্য্যন্ত কোন সাহায্যই করেন নাই। আর ভাবিবার কিছুই নাই, দেরী করিবারও সময় নাই। আমাদের উদাসীনতা দূর হউক। সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে একপ্রাণ হইয়া প্রত্যেকেরই এখন যথাসাধ্য সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করিছে যে জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

অর্থ বা বস্ত্রাদি হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদক (Secy., Social Service League) ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, মেও হস্পিটাল (Mayo Hospital, Calcutta) কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায়।

কৃষি শব্দের অর্থে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালকদিগের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতি যথা সামঞ্জস্য সাধিত হইবে, সেই শিক্ষাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। আবার, বাল্যশিক্ষাতে কৃষিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমরা শিক্ষাসমস্যা বিষয়ক আলোচনাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে কৃষিশব্দের অর্থে আমরা কেবল ধান্যাদি চাষমাত্র করা বলিতেছি না, গোপালন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহ কৃষিকর্ম্মের অর্থে কৃষিশব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম অত্যাবশ্যক।

আমরা যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে ভারতবাসীর পক্ষে সাঙ্গ কৃষিবিদ্যা কেবলমাত্র নানাবিধ লাভের কারণে অত্যাবশ্যক নহে। যে সকল বিষয়ের শিক্ষা ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়ন করিতে পারে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে অন্যতর প্রধান বিষয়। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম একদিকে কৃষিপ্রধান ভারতের অধিবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিশেষ সহায়, অপরদিকে ইহা কৃষিপ্রধান ভারতের সর্ব্বকালেই প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

সংগ্রামের কালে কৃষিকর্ম্ম।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন, কৃষিকর্ম্ম যে দেশের প্রাণরক্ষা বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করে তাহা আমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের ন্যায় প্রলয়ব্যাপারের আঘাতে দেশ যখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য যখন যুদ্ধের গোলযোগে অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখনই কৃষিকর্ম্মের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কৃষিকর্ম্মে বাণিজ্যের অর্দ্ধেক লাভ হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা দেশের শান্তিময় অবস্থাতেই প্রযুজ্য। যুদ্ধের সময় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কথা। সে সময়ে বরঞ্চ বাণিজ্যেই কৃষিকর্ম্মের অর্দ্ধেক লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মনি যে এতদিন বাণিজ্য অবরোধের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিয়াও দাঁড়াইতে পারিয়াছে, প্রচণ্ডবলে মিত্রসংঘকে আঘাত দিতে সক্ষম হইতেছে, তাহার অন্যতর প্রধান কারণ জর্ম্মনির প্রকর্ষকর কৃষিকর্ম্ম। আমাদিগের স্মরণ হয় যে আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, জর্ম্মনির নিজ দেশে উৎপন্ন শস্য সমগ্র জর্ম্মনিবাসীদিগকে এক বৎসর সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে। ভাল চাষ হইলে বিদেশের শস্যের আমদানীর উপর জীবনরক্ষার জন্য জর্ম্মনিকে খুব অল্পই নির্ভর করিতে হয়। মহাসমরে কৃষিকর্ম্মের এইরূপ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইংলণ্ডেও এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত গ্রেটব্রিটেন কৃষিকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ

প্রদান করিত, কিন্তু নৈপোলিয়ন সমরের পর চারিদিকে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেটব্রিটেন ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইয়া উঠিল। এখন ইংরাজদিগের মহা আশঙ্কার কারণ হইতেছে এই যে, ইংলণ্ডের বাণিজ্য কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তথায় অন্নের জন্য হাহাকার উঠিবে। ইংলণ্ডবাসী কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই, কারণ আশা হয় যে, ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে স্বদেশবাসীগণও কৃষিকর্ম্মের পক্ষপাতী হইবেন।

কৃষিকর্ম্মের অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ধনীসম্প্রদায়। তাঁহাদিগের অনেক অর্থ সঞ্চিত থাকাতে তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন দ্রব্য মূল্যের দ্বারা কিনিতে পারেন। সেইটুকু পারেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বিলাসিতা ও ভোগস্পৃহা প্রভৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া অব্যবহার ও অপব্যবহারের ফল দুর্ব্বলতা এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহারা শরীরে মনে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং নিজেদের দুর্ব্বলতা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে বংশপরম্পরায় অনুক্রামিত করেন। তাঁহারা নিজেদের সেই দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার জন্য হাতেহেতেড়ে কাজমাত্রকেই হেয় চক্ষে দেখিয়া মানহানিকর ও "ছোটলোকের" কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি হাতেহেতেড়ে কাজগুলিকে ছোটলোকের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে চাহেন, সেই সকল কার্য্য ব্যতীত, সেই সকল "ছোটলোকের" সাহায্য বিনা তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সম্পূর্ণ অভাব হইত। শ্রমের যে একটা মূল্য আছে, মর্য্যাদা আছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। ধনীরা মনে করেন যে, চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকা, নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহে নিজের ধনবত্তার পরিচয় প্রদান করা এবং পরগাছার ন্যায় অপরের ঘর্ম্মাক্ত পরিশ্রমের উপর নিজেদের ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করাতেই যত কিছু মান ও যত কিছু মর্য্যাদা—হাতেহেতেড়ে শ্রমজনক কার্য্যের কোনই মান বা মর্য্যাদা নাই।

ধনীদের সহরপ্রীতির কারণ।

মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার উপযোগী নানা দ্রব্য সহজে পাওয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষক প্রভৃতির রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিয়া, আন্তরিক না হইলেও মৌখিক প্রশংসা পাইবার অনেক লোকজন পাওয়া যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া ধনীরা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। ধনীরা তোষামোদকারীদিগের মুখে স্বকৃত সকল বিষয়ে সায় প্রাপ্ত হইলে এবং প্রশংসা শুনিতে পাইলেই পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। সেই সকল প্রশংসার ভিতরে কতটুকু বা সত্য, আর কতটুকুই বা মিথ্যা আছে, সে বিষয়ে ধনীরা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসরও পান না এবং দেখিতে চাহেনও না।

দরিদ্র শিক্ষিত পল্লীবাসীগণের সহরপ্রীতির কারণ।

ধনী সহরবাসীগণের ঐশ্বর্য্য ও তজ্জনিত বাহিরের জাঁকজমক ও সুখভোগ কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কানাঘুষায় সেই সকল বিষয়ের কথা খুব বৃহদাকারে শুনিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীগণ সহরে গিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ এবং তাহার ফলে সুখের সাগরে চিরকাল অবগাহনের অবসর পাইবার কল্পনায় ও মহা সুখস্বপ্নে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা সুখভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইবার অভিলাষী হইয়া পড়েন। এইরূপে পল্লীবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার ফলে সহরে আসিয়া চাকরী, ব্যবসায় বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের সক্ষমতা ধারণ করেন, তাঁহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সহরে আসিয়া সহরবাসী হইয়া পড়েন।

সক্ষম লোকদিগের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের কুফল।

যাঁহারা পল্লীগ্রামের কোন উপকার করিতে পারিতেন, সেই ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার কারণে তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান সকল অমনোযোগের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন সেই সকল স্থানের জলাশয়গুলি পানা ও মাটিতে ভরাট হইয়া যায় এবং গ্রামগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া

নানাবিধ রোগের আশ্রয় স্থান হইয়া পড়ে। তখন আবার, সেই সকল ধনী ও শিক্ষিত সহরবাসীগণ রোগের দোহাই দিয়া, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়জলের অভাব প্রভৃতির দোহাই দিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে অস্বীকার করেন। পরিণামে পল্লীগ্রামের উন্নতির সকল সম্ভাবনাই রুদ্ধ হইয়া যায়। অপরদিকে, অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ রোগজীর্ণ শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে চাহে না এবং সমর্থও হয় না—তাহারা চিরকালের জন্য বংশপরম্পরায় রোগজরাময় অবস্থাতেই যথাকথঞ্চিৎ-রূপে জীবন রক্ষা করে। অবশেষে যখন সেই সকল পল্লীবাসীগণ রোগজরাজীর্ণ দেহে নূতন নূতন রোগের আক্রমণফলে চাষবাষ করিতে নিতান্তই অক্ষম হয় এবং অগত্যা তাহাদের নিকট হইতে খাজানা প্রভৃতি আদায়ের বিলম্ব হওয়ায় ধনীদিগের বিলাসভোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সহরবাসীদিগের অন্নবস্ত্র মহার্ঘ হইয়া উঠে, তখন সকলে মিলিয়া দরিদ্র পল্লীবাসী-দিগের স্কন্ধে ধনীদিগের বিলাসের অভাব ও সহর-বাসীদিগের অন্নবস্ত্রের মহার্ঘতার সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের প্রতি অলস ও দুষ্ট প্রভৃতি কতকগুলি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া হাহুতাশ করিতে থাকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মে বিমুখতার কারণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে দেশে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন কৃষিকর্ম্মের প্রতি অমনো-যোগী হইবার কুফল আমরা ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষা নিয়মিতভাবে ও অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি বলিয়া আমরা কৃষিকর্ম্মকে একঘেঁয়ে মনে করি এবং তাহাকে অলাভজনক বলিয়াও যে মনে না করি তাহা নহে; কাজেই তাহাকে হেয় চক্ষেও দেখিতে অভ্যাস করি। আমা-দের দেশের ধনীদিগের মধ্যে আজকাল প্রদর্শনী সমূহে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় বাগান করা একটা সখের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হই-লেও তাঁহারা কৃষিকর্ম্মকে হেয়চক্ষে দেখিবার ফলে সেই বাগান সম্বন্ধেও স্বহস্তে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন—সকল কার্য্যই মালী প্রভৃতি কর্ম্ম-চারীদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন। আর, বাগানেও তাঁহারা ক্রোটন প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করেন, তাহারও অধিকাংশ বাগানকে কেবলমাত্র সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করিবার উদ্দেশ্যেই রোপিত হয়, লাভের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না। সহরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলে আমরা দেশের সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক বড় বড় বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা করি, কিন্তু কৃষি-কর্ম্মের বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকই মনে করি না।

পল্লীগ্রামে শ্রমজীবীর অভাব ও তাহার কারণ।

ধনী পল্লীবাসীদিগের সহরে আসিবার দৃষ্টান্তে কেবল যে শিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীগণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে সহরে বাস করিতে আসেন তাহা নহে। অশিক্ষিত দরিদ্র পল্লীবাসীদিগেরও মধ্যে অনেকে সহরে মজুরী করিয়া অধিকতর উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় পল্লীগ্রামের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসে। পল্লীগ্রামে এই সূত্রে শ্রমজীবীর অভাব একটী গুরু-তর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাল্য-কালে দেখিয়াছি যে পল্লীগ্রামে ছয়টী পয়সা দিলেই মজুর পাওয়া যাইত, অর্থাৎ ছয়টী পয়সাতে একটী পরিবারের একটা দিনের জীবনধারণের উপায় হইয়া কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকিত এবং যিনি মজুরকে নিযুক্ত করিতেন তাঁহারও কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু আজ সেই স্থলে ছয় আনার কমে একটা মজুর পাওয়া যায় না। অথচ এক একটী পরিবারের আয় যে খুব বাড়িতেছে তাহা তো মনে হয় না—বরঞ্চ, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে আয় ক্রমাগত হ্রাসের দিকেই চলিয়াছে। আর, এদেশবাসীর আয়ই বা কি যৎসামান্য! * সেই আয়ের উপর আমাদের ব্যয় যদি চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের দাঁড়াই-বার স্থান কোথায়? আমরা খাইব কি? যদি দেশের ধনীলোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ জমীদারীতে অথবা পল্লীগ্রামস্থিত আদিম বাসস্থানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অসংস্থানজনিত দুঃখকষ্টের অনেকটা লাঘব হয় এবং বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিক ভাবও

* আমাদের স্মরণ হইতেছে, আমরা আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীর গড়ে আয় ত্রিশ টাকা, সেখানে প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে আয় মাত্র দুই টাকা।

অনেকটা কমিয়া যায়। বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার অভাব বর্ত্তমান দুর্নীতি ও বৈপ্লবিকভাবের অন্যতর প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে অন্নবস্ত্রের অভাব-জনিত কষ্টও সেই বৈপ্লবিকভাবের অগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করে।

কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়।

দেশে যখন শান্তির রাজত্ব থাকে, তখন আরও এক কারণে কৃষিবিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দেশের ধান্য প্রভৃতির অকুলান পড়িলে বাণিজ্যসূত্রে বিদেশ হইতে প্রয়োজন মত তাহার আমদানী হয় বলিয়া সেই অকুলানের কথা আমাদের মনেই আসে না। কাজেই দেশের জমী যে কি হইতেছে সে বিষয়ে কোন দৃষ্টিই পড়ে না; কৃষকদিগের যে কি অবস্থা হইতেছে তাহার কোন সংবাদই রাখা হয় না। কিন্তু একটু খানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কৃষিকর্ম্মই অর্থাগমের মূল ও নিশ্চিত উপায়, এবং যদি কোন শিল্প শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হয় তবে তাহা কৃষিকর্ম্ম।

কৃষিকর্ম্মে শারীরিক উন্নতি।

আমরা বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি যে কৃষিকর্ম্মই বালকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের অন্যতর প্রধান উপায়। কৃষিকর্ম্ম যে শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায় তাহা কৃষকদিগের মাংসপেশীবিশিষ্ট এবং অক্লান্তভাবে রৌদ্রবৃষ্টিসহিষ্ণু দৃঢ় ও বলিষ্ঠ শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষকদিগকে আদর্শস্থলে রাখিয়া আমরা এ কথা বলিতেছি না বটে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত কৃষকদিগেরও মধ্যে অনেককে সহরবাসীদিগের অপেক্ষা কত অধিক দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকর্ম্ম করিতে থাকিলে পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগসমূহ দূরে পলায়ন করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। আমরা অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা দিবারই কথা বলিয়া আসিয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত কৃষক তাঁহার ক্ষেত্রের প্রয়োজনমত ড্রেন জলাশয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং কাজেই তাঁহার বাসস্থানের নিকটে রোগও সহজে পদার্পণ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত কৃষক গোজাতির উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে বাধ্য হইবেন। গোজাতির উন্নতি সাধিত হইলেই দেশের ছেলেরা একটু খাঁটি দুধ ঘি খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে এবং পুষ্টিকর আহারের অভাবে যে সকল রোগের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল রোগের হাত হইতে তাহারা নিস্তার পাইবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি কৃষিকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ শারীরিক উন্নতিলাভ হয়, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সুপ্রসিদ্ধ পুষ্পকৃষক শ্রীযুক্ত এস, পি, চাটার্জ্জি মহাশয়।

কৃষিকর্ম্মে মানসিক উন্নতি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম চালাইতে গেলে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিও যে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমত, স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতে গেলেই কৃষকের নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসারবৃদ্ধির ফলে তো মানসিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কৃষককে কৃষিবিদ্যার সঙ্গে আরও নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম বলিতে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে ধান্য কাটিয়া মরাইবাঁধা পর্য্যন্ত কার্য্যগুলিকেই যে বুঝাইবে তাহা নহে। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মের অর্থে আমরা চাষকরা, আহার্য্য, পশুপক্ষী পালন, হংস প্রভৃতি বাটীর সৌন্দর্য্য বিধায়ক পশুপক্ষী পালন, পশুপক্ষী চিকিৎসা, ফল উৎপাদন, শাকসবজী উৎপাদন, গোপালন, মৎস্যপালন, মধুমক্ষিকাপালন, দুগ্ধদোহন, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, ফল প্রভৃতি হইতে মোরব্বা চাটনী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ, অন্তত এগুলি সমস্তই বুঝি। উপরোক্ত বিষয়গুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুশিক্ষিত হইতে গেলে কতপ্রকার বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক।

কৃষিবিদ্যার আনুষঙ্গিক বিদ্যা বিষয়ে ইঙ্গিত।

জমীজমা রাখিতে গেলেই তো জমীমাপ করিতে হইবে, ফসলের হিসাব রাখিতে হইবে, দেনাপাওনার

হিসাব রাখিতে হইবে; এ সকলের জন্য গণিত শিক্ষা আবশ্যক। জমীজমায় প্রতি পদে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়; গণিত না জানিলে তোমাকে প্রতিপদে প্রতারিত হইতে হইবে। তার পর কোন্ জমীতে কি প্রকার শস্য বা বৃক্ষ সুবিধামত হইবে, কোন্ জমীর কত নীচে জল পাওয়া যাইতে পারে, প্রস্তরাদি পাওয়া গেলে কি প্রকারে পাওয়া গেল, এ সকল জানিবার জন্য মৃৎতত্ত্ব ভূবিদ্যা প্রভৃতি জানা আবশ্যক। গণিতের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও প্রতিপদে আবশ্যক—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না জানিলে অনেক বিষয়ে অন্ধের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে হয়। যেখানে বৃক্ষ প্রভৃতি লইয়াই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, সেখানে যে উদ্ভিদবিদ্যা নিতান্তই আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তারপর, কোন্ বৎসরে কত বৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কোন্ বৎসরেই বা অনাবৃষ্টি হওয়া সম্ভব, এ সকল জানিয়া ভাবী অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলে নভোবিদ্যা (meteorology) জানা আবশ্যক। পশুপক্ষীদের পালন ও রক্ষণের জন্য প্রাণীতত্ত্ব ও প্রাণীচিকিৎসা জানিতে হইবে। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নানা যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়নবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায়, যতপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মনুষ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসিতে পারে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে সুকৃতকার্য্য হইতে গেলে ততপ্রকার বিদ্যাই আয়ত্ত করিতে হইবে।

কৃষিকর্ম্মে আধ্যাত্মিক উন্নতি।

কৃষিকর্ম্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও যে সম্ভাবনা আছে, এ কথা শুনিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রথমেই তো দেখা যায় যে কৃষিকর্ম্মে যতপ্রকার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, দৈবানুগ্রহ ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার কোনই সম্ভাবনা নাই। যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি না হইলে শতসহস্র উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও কৃষকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কৃষকের হৃদয় আধ্যাত্মিক উন্নতির একটী অতি শ্রেষ্ঠ সোপান ভগবানের প্রতি নির্ভর অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। আর, তাহার উপর, পল্লীবাসী কৃষক সহরের বৃথা কোলাহল প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপক বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া নির্জ্জনে আত্মচিন্তা করিবার সুন্দর অবসর পায়। সহরে সহরবাসী ঘরে বাহিরে লোকসমাগমের মধ্যে পড়িয়া থাকে; তাহার সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে কেবলই জনস্রোত চলিয়াছে, সকলেরই চিত্ত বিষয়চিন্তাতে নিমগ্ন—বিশ্রামের যেন অবকাশ মাত্র নাই। এ অবস্থায় সে ভগবানের চিন্তা করিবে কখন্? ওদিকে পল্লীবাসী কৃষক সমস্ত দিবস কৃষিকর্ম্মের পর যখন সায়াহ্নের আলো-আঁধারের ছায়ার মধ্য দিয়া গরুগুলিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করে তখন সে তাহার হৃদয়ে কি অগাধ শান্তি অনুভব করে, সে তখন সেই শান্তির মধ্যে স্বভাবতই সেই শান্তির আকর ভগবানের করুণারই কথা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়।

পল্লীবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে কৃষিকর্ম্ম যেমন আপদকালে দেশের প্রাণরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তেমনি তাহা দেশের ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনেরও অন্যতর প্রধান সহায়। সেই কৃষিকর্ম্মকে আমরা বন্ধুভাবে গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে আত্মহত্যা ও পুত্রহত্যার পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা যদি নিজেদেরও উন্নতির জন্য কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন না করি, তথাপি ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ও আত্মরক্ষার এমন একটী উপায় হেলায় পরিত্যাগ করা আমাদের কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। ইহাও যেন আমরা না ভুলি যে পল্লীবাসী সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের উপরেই দেশের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। পল্লীবাসীদিগের তুলনায় সহরবাসী কয়টী?—মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই পল্লীবাসীগণের বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয়, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কৃষিকর্ম্মপ্রধান বিদ্যালয়ের যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি রাখা দরকার।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল।

কেবল দেশের লোকের নহে, কৃষিকর্ম্মের বন্দোবস্ত বিষয়ে এবং পল্লীবাসীদের মঙ্গলসাধনে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান

মহাসমর যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে গবর্ণমেন্টকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগের দ্বারা সেনাদল সংগঠনে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সেনাদল সংগঠনে বঙ্গবাসীদিগকে কিছুতেই একেবারে বাদ দিতে পারা যাইবে না, অথচ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগকাতর বাঙ্গালীদিগকেও সেনাদলে লওয়া চলিবে না। এই সেদিন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন যে এখনকার ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীরবাহী বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে কনষ্টেবল করিবারও উপযুক্ত লোক পাওয়া দুর্ঘট। এ অবস্থায় কৃষিকর্ম্মে দেশবাসীদের মনোযোগ দেওয়াইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ মঙ্গল। আমাদের মতে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে যেমন বৈপ্লবিক ভাব অনেকটা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি উপায়ে এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিলে দেশ হইতে বিপ্লব দূর করিবার আর একটী বিশেষ উপায় বিধান করা হইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আয় ব্যয়।

১৮৩৭ শকের কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৬৸৶
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৪৫১৸/৩
সমষ্টি	...	৫০৮॥৶৩
ব্যয়	...	৫৮৸৶৩
স্থিত	...	৪৪৯৸/

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদিব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ দুই কেতা গভর্ণমেণ্ট কাগজ ৪০০৲

সেভিংস ব্যাঙ্ক—	৪৯/০
নগদ	৸০
	৪৪৯৸/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৫।০

মাঘোৎসবের দান।

পি, মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	১০৲
গচ্ছিত আদায়	২৫।০
	৩৫।০

তত্ত্ববোধিনী	...	২০৸৶০
পুস্তকালয়	...	॥৶০
সমষ্টি	...	৫৬৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১॥/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৻৩
যন্ত্রালয়	...	২৮।৩
সমষ্টি	...	৫৮৸৶৩

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সান্ধ্য উপাসনায় উদ্বোধন।

অদ্যকার এই উপাসনার মধ্যে আমাদিগকে সেই উপাসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। চারিদিকে রোগশোক, যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষ মহামারীর অশান্তির যেন একটা মহা আবর্ত্ত চলিয়াছে। এই অশান্তির মধ্য হইতেও সেই শান্তিময়ের শান্তিরাজ্যে আমাদিগের মনকে লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আমাদিগকে সেই কথাই শিক্ষা দেয়। যখন আমরা অশান্তির মধ্যে পড়িয়া শান্তিসমুদ্র অতিগভীর সেই পূর্ণপুরুষের কথা ভুলিয়া যাইবার উপক্রম করি, সংসারের কোলাহলে পড়িয়া যখন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি, তখনই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা অন্তরে সবলে আঘাত করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে অশান্তির রাজ্যের মধ্যেও সেই শান্তিস্বরূপ সর্ব্বদাই বিরাজমান; তাঁহাকে ডাকিলেই সকল অশান্তি কাটিয়া যাইবে, হৃদয় শান্তিসমুদ্রে অবগাহন করিবে। ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া দেয় যে, তুমি ভীত হইও না—সকল ভয়ের ভয় যিনি, তিনিই যে আমাদিগকে মাভৈ রবে অভয় দিতেছেন। ধর্ম্মের পথে ব্রহ্মের পথে তুমি একাকী চলিতেছ মনে করিও না। তোমার মত এই দেখ কতশত ব্যক্তি সেই পথে চলিতেছেন। তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া সাহস অবলম্বন কর। মৃত্যুর বিভীষিকাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। মৃত্যুকেই বা কিসের ভয়? এখানেও যে মৃত্যুঞ্জয়ের রাজ্য, পরলোকেও সেই একই মৃত্যুঞ্জয়ের রাজ্য। শত অশান্তির মধ্যে যখন আমরা আমাদের হৃদয়ের শান্তি হারাইব না, শত মৃত্যুর মধ্যেও যখন আমরা অমৃত পুরুষের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিব, তখনই ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা।

এসো আজ আমরা সেই শান্তিদাতা হৃদয়নাথকে ডাকিয়া বলি, হে প্রাণনাথ, আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল, সংসারের অশান্তির ভার আর বহন করিতে পারিতেছি না, তুমিই একমাত্র দুর্ব্বলের বল, তুমিই আমাদের হৃদয় হইতে সেই মহাভার উঠাইয়া লইয়া আমাদিগকে লঘুভার করিয়া দাও।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমরা কেবলই সংসারের কথা লইয়াই অতিবাহিত করিয়াছি। ভগবান স্বয়ং যে আমাদের অন্নবস্ত্রের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া দুই মুষ্টি অন্ন এবং দুএকখানি পরিধেয় বস্ত্র পাইবার জন্য চারিদিকে কত না ছুটাছুটি করিয়াছি। কিন্তু আজ এই পবিত্র মুহূর্ত্তে কি সেই অন্নবস্ত্রেরই কথা মনে করিব? অন্নবস্ত্রের দাতা ভগবানের কথা কি একটীবারও স্মরণ করিব না? দিনের দিন চলিয়া যাইবে, তাঁহারই অন্নজলে আমরা পরিপুষ্ট হইব, তাঁহারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া আমরা মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইব, অথচ তাঁহাকে একটীবারও স্মরণ করিব না? তাহা কখনই হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ঘোষণা করিতেছে যে, যদি বা আমরা

সম্পদে বিপদে, শান্তিতে অশান্তিতে তাঁহাকে ভুলিয়া কর্ম্মজালে নিমগ্ন থাকি, অন্তত সপ্তাহে একটীবার সেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আমাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবে যে "যাঁহারই কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।"

হে ব্রাহ্মসমাজের দেবতা, তুমিই আমাদের নয়নের তারা। তুমি আমাদের দৃষ্টিকে তোমার দিকে তুলিয়া ধর। সংসারের পঙ্করাশি পশ্চাতে পড়িয়া থাক, আমাদিগকে তোমার নির্ম্মল পথের পথিক করিয়া দাও। আমরা তোমার কৃপার কণা-মাত্রের ভিখারী হইয়া এখানে আসিয়াছি; তোমার বিন্দুমাত্র করুণা পাইয়া সংসারসাগর সহজে উত্তীর্ণ হইব বলিয়া বড় আশা করিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি আমাদিগের প্রতি মুখ তুলিয়া না চাও, তবে আমরা আর কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইব? তুমি আমাদিগের করুণাময় পিতা, তুমি যদি আমাদিগের প্রতি বিমুখ হও, তবে আর কে আমাদিগের প্রতি সদয় হইবে?

এসো, আমরা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে বলি, জীবননাথ, তোমাকে আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না; তোমার সত্যসুন্দরমঙ্গল মূর্ত্তি না দেখিয়া আজ গৃহে ফিরিব না।

তাঁহাকে এই মুহূর্ত্তেই জীবন উৎসর্গ করিয়া দাও—প্রাণের বিনিময়ে নবপ্রাণ পাইয়া কৃতার্থ হইবে, ধন্য হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা।

(১) মণ্ডলীর প্রয়োজন।

আদিসমাজের কর্ম্মপরিসর।

ভগবানের ইচ্ছাতে মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে পিতামাতার ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া সযত্নে লালিত পালিত হয়। বাল্যে পদার্পণ করিলে সে নানাবিষয়ের জ্ঞানলাভ ও শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করে এবং যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ব্যক্তিগত মনুষ্যের ন্যায় মনুষ্যসমাজেরও জীবনে এইরূপ কার্য্য ও সময়ের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইবার কাল পর্য্যন্ত আমরা আদিব্রাহ্মসমাজের শৈশবকাল ধরিতে পারি। তাহার পর, মহর্ষিদেব যে সময় অবধি আদিসমাজের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, সেই সময় অবধি মহর্ষির দেহান্তরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমরা উহার বাল্যকাল বিবেচনা করিতে পারি। এই সমস্ত বাল্যকালটা মহর্ষি উহাকে সযত্নে যথাপথে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছিলেন, উত্তরকালে আদিসমাজকে কি ভাবে কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহারই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তরপ্রাপ্তির পর এখন সেই শিক্ষার ফলপ্রদর্শনের সময় আসিয়াছে। এখন অবধি আদিসমাজকে নিজের উদ্যম ও চেষ্টার উপর, নিজের শিক্ষার উপর দাঁড়াইয়া দেখাইতে হইবে যে মহর্ষিদেবের প্রদত্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে আদিসমাজের কার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে—রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড অনুসারে সাপ্তাহিক উপাসনা বজায় রাখা প্রভৃতি দু-একটী কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কাজ নাই। তাঁহাদিগের এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আমরা পুনঃ পুনঃ আমাদিগের সমস্ত বলের সহিত বলিব যে তাঁহাদিগের এই ধারণার কোনই মূল্য নাই—ইহা সম্পূর্ণ ভুল—ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা মহর্ষিদেবেরই কথায় বলিতেছি যে আদিসমাজের কার্য্য হিমালয়ের সমান উচ্চ, আকাশের ন্যায় বিস্তৃত এবং সাগরের ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ।

আদিসমাজের কার্য্যকাল আরম্ভ।

আদিসমাজের কার্য্য ফুরাইয়া যাইবে কি? আমাদিগের মতে তো ইহার কার্য্যকাল সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তোমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবে যে, তবে মহর্ষির জীবদ্দশায় যে সকল কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, সেগুলিকে কি বলিব? আমরা বলিব যে, সেগুলি মহর্ষির নিজের পরীক্ষা করিবার ও তাঁহার শিক্ষাদানেরই অঙ্গীভূত। বাল্যকালে বালকেরা শিক্ষালাভ করিবার কালেই কি পাঁচ রকম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না? শিক্ষকেরাও কি সেই সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখেন না যে কি ভাবে শিক্ষা দিলে বালকদিগের উপকার হইবে এবং

সেই সূত্রে কি তাঁহাদিগকেও নানাবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না? আদিসমাজের বাল্যকালে মহর্ষির নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাও সেই প্রকার। খৃষ্টীয় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মসমাজেরও ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে সেই সকল ধর্ম্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাদিগের জীবদ্দশা অপেক্ষা তাঁহাদিগের দেহান্তরপ্রাপ্তির পরেই যৌবনোপযোগী সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র জনসাধারণের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। আমাদিগেরও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হয় যে আদিসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদিগের দেহান্তর প্রাপ্তির পরে আজ তাহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র অল্পে অল্পে জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে। আদিসমাজের বয়স ধরিয়া যেন কেহ ইহার কার্য্যকাল ফুরাইয়াছে বলিয়া বিবেচনা না করেন। আদিসমাজ এখন ছিয়াশি বৎসরে চলিতেছে। কিন্তু একটী সমাজের পক্ষে ছিয়াশি বৎসর কতটুকুই বা সময়? ছিয়াশি বৎসরকে ছিয়াশি দিন বলিয়াও পরিগণিত করিব কি না জানি না। মানবের জীবনকালের তুলাদণ্ডে সমাজের জীবন পরিমাপ করা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহাই যদি হইত, তবে খৃষ্টীয় সমাজ তো আজ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইত। এক একটী সমাজের জীবনের শৈশব বাল্য প্রভৃতি এক একটী বিভাগই তো পঞ্চাশ, একশত বা এক সহস্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ কালের দ্বারা পরিমিত হইতে পারে।

আদিব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র।

রাজা রামমোহন রায় আদিসমাজকে যে মূলমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া আদিসমাজের কার্য্যক্ষেত্রের সুবিস্তৃত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই নিজেদের জীবনে যে মূলমন্ত্রকে ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মূলমন্ত্রের ভিত্তি অতীব উদার। কোন মাঘোৎসবে উপদেশ উপলক্ষে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মূলমন্ত্রটী সুন্দর ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপ থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।" রাজা রামমোহন রায় "এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য" এই প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তরে যখন বলিলেন যে "শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়। অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থাবিরুদ্ধ হয়", তখন তিনিও বিভিন্ন ভাষায় আদিসমাজের ঐ মূলমন্ত্রই সমর্থন করিয়াছেন বলিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার বিষয়ে এরূপ উদারতম ভিত্তির উপর আর কোন সমাজ দাঁড়াইয়া আছে কি না সন্দেহ।

সমাজ প্রভৃতির সংস্কারে আদিসমাজের প্রণালী।

আদিসমাজের মহর্ষিসমর্থিত মত এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও সকল কর্ম্মে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করাকেই ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্র বা মূলমন্ত্র করা উচিত। সেই মূলমন্ত্রের সাধনে সমাজ প্রভৃতি সংস্কার করা আবশ্যক হইলে তাহা করিতে হইবে, কিন্তু সেই সকল সংস্কার স্থান ও কালের উপযোগীভাবে সাধন করিতে হইবে। পরমাত্মার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনায় আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেই হইবে—এই স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিকূল ব্যবধান অপসারণে আমরা কোন বিঘ্নকেই বিঘ্ন বলিয়া মনে করিব না। কিন্তু জাতিভেদ পরিত্যাগ প্রভৃতি যে সকল বিষয় থাকিলেও এখনই পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, সে সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থান কাল ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে আদিসমাজের মতে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক ধারা (tradition) উৎপাটিত করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইতে যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু যে স্থলে ঐতিহাসিক ধারা উক্ত প্রত্যক্ষ যোগের ব্যবধান স্বরূপে দাঁড়াইবে, সেখানে আদিসমাজ সেই ধারা বিচ্ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবে না। অনু-

ষ্ঠানে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা থাকিলে গৃহ্যকর্ম্মে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনে ব্যবধান পড়ে বলিয়া আদিসমাজ অনুষ্ঠানকে অপৌত্তলিক করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না; এমন কি, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে অপৌরুষের ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত সংযোগ বিধায়ক মানবাত্মার স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করা হয় বলিয়া সেই অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্ততা অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

আদিসমাজে ঐতিহাসিক ধারা অবিচ্ছিন্ন।

এই দুই বিষয়ে প্রচলিত প্রথা বা মতের ঐতিহাসিক ধারা বিচ্ছিন্ন করিতে হইলেও সৌভাগ্যক্রমে আদিসমাজকে ঋষিদিগের হইতে অবতীর্ণ ঐতিহাসিক ধারা বিচ্ছিন্ন করিতে হয় নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে এতটুকু স্বাধীনতা ছিল, যাহার বলে অনেক ঋষি আপনাদিগের গৃহ্য অনুষ্ঠানে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের আড়ম্বর রক্ষা করিতেন না; এতটুকু স্বাধীনতা ছিল, যাহার বলে ঋষিরাও ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করিয়া বেদ প্রভৃতিকে ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার সহিত সমসূত্রে অশ্রেষ্ঠ বা অপরা বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যখন সহসা উপবীতত্যাগের কথা আসিল, জাতিভেদ এক কথায় উঠাইবার কথা আসিল, তাহাতে আদিসমাজ পশ্চাৎপদ হইল; এ বিষয়ে প্রচলিত প্রথার ঐতিহাসিক ধারা বিচ্ছিন্ন করিতে সম্মত হইল না। এ বিষয়ে আদিসমাজের মত এই হইল যে এমন অনেক কার্য্য আছে সংস্কার আছে, যেগুলি করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে দেশের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু সহসা এক মুহূর্ত্তের কথায় কি সেই সকল কার্য্য করা সেই সকল সংস্কারসাধন সম্ভব? এই উপবীতত্যাগ ও জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়াও একটী করিলে-ভাল-হয় বিষয়—ইহাও এক কথায় উঠাইবার বস্তু নহে। আদিসমাজের মতে এই করিলে-ভাল-হয় বিষয়ে সহসা গোলযোগ আনিলে সুবৃহৎ হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছিন্ন হওয়া অত্যন্ত সম্ভব এবং সে বিচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল নাই। সুবৃহৎ প্রাচীনতম হিন্দুসমাজেও দেখা যায় যে জাতিভেদত্যাগরূপ সংস্কার অনেকবার সাধিত হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে উপবীতত্যাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া উপবীত ও জাতিভেদত্যাগী নবীনপন্থী এবং উপবীত ও জাতিভেদপক্ষপাতী প্রাচীনপন্থী উভয় মণ্ডলীই অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মঙ্গল। আদিসমাজের মতে ব্রহ্মসাধনের পথে সহসা জাতিভেদত্যাগ অনাবশ্যক এবং বিঘ্নকর মনে হয়—বিশেষত যখন ইহার ফলাফলের ভালমন্দ বিচারসাপেক্ষ। আর্য্যসমাজপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও জাতিভেদ উঠাইবার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু তিনি তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইতে যান নাই। ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ রক্ষা লইয়া যেমন এক ঘূর্ণাবায়ু বহিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ কিছুকাল অতীত হইল পঞ্জাবের আর্য্যসমাজে ঐ করিলে-ভাল-হয় প্রকারের একটী বিষয়, আমিষ বা নিরামিষ আহারের কর্ত্তব্যতা, লইয়া মহা বিতণ্ডা চলিয়াছিল, এমন কি আর্য্যসমাজের মধ্যে দুইটী দল হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আর্য্যসমাজ বিজ্ঞজনের পরামর্শে আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী উভয়বিধ লোককেই আপনার ভিতরে রাখিয়া আপনাকে অবনতির মুখ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার বিষয়ে আদিসমাজের এই মূলমন্ত্রের সমীচীনতা ও উপযোগিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অভ্রান্ত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ যুবক ব্রাহ্মগণ সে মন্ত্রের উপযোগিতা বুঝিতেই পারিলেন না। না বুঝিবারই কথা। এই মন্ত্রসাধনে কোনপ্রকার উত্তেজনা নাই, কোনপ্রকার মত্ততা নাই। প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া, প্রকৃতির কার্য্যের সূক্ষ্মপ্রণালী বুঝিয়া এই মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। নদীর স্রোতে বেতবৃক্ষ যেমন অবনত হইয়াই আপনার গৌরব রক্ষা করে, এই মন্ত্রের সাধনেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়া মহাকলরব আনয়নের পরিবর্ত্তে প্রকৃতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হইবে। যুবক ব্রাহ্মদিগের রক্তের সেই নূতন তেজ, অদম্য উৎসাহের সেই নূতন বলের নিকট এই ধীরভাবে মন্ত্রসাধনের কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্ষে, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে নির্দ্দয় বিচ্ছেদের ছুরিকাঘাত করিয়া আদিসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ অটলভাবে স্বীয় রক্তের বিনিময়ে চিরজীবন ঐ মূলমন্ত্রের সাধন করিয়া আসিয়াছেন এবং বিচ্ছেদের কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিততনু আদিসমাজকে আপনার পক্ষপুটতলে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মন্ত্রসাধনের জন্য মহর্ষির নিজের জীবনবিনিময় সার্থক হইয়াছে। আজ তাঁহার দেহান্তরপ্রাপ্তির পর আদিসমাজের বহির্ভূত ব্রাহ্মমণ্ডলীও ঐ মন্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন। সেই সকল ব্রাহ্মমণ্ডলীর নেতা ও লেখকদিগের উপদেশ প্রবন্ধাদি হইতে ইহার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের অনুশাসনের প্রকৃত অর্থ।

রাজা রামমোহন রায় যে শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ইহা নহে যে শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়া আহার ব্যবহার করিবে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রাণ লইয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য লইয়া আহার ব্যবহার করিবে। উনবিংশ সংহিতা আছে, তাহার মধ্যে একটী সংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার অন্যায় নিন্দাবাদ আছে। এখন অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে গিয়া কি আমাদিগকে স্ত্রীশিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে? তাহা নহে। এইখানে আমাদিগকে আরও পাঁচটা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি যুক্তি কি অনুশাসন পাই। তখন দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষেই নানা প্রমাণরত্ন শাস্ত্রসাগর মন্থন করিলে পাওয়া যায়। আর, যদি বা তাহা না-ও পাইতাম, তাহা হইলেই কি তাহা পরিত্যাগ করিতাম? তাহাও নহে— এইখানে যুক্তিযুক্ত বিচার করা চাই এবং শাস্ত্রে আমরা একথা পাই যে যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়। রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে স্বেচ্ছাচারী না হইয়া যে কোন একটী শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে—অবশ্য যে শাস্ত্র তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে সায় পাইবে, যে শাস্ত্র পরমাত্মার সহিত তোমার আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ সাধনে প্রতিকূল না হইবে, সেই শাস্ত্রই অবলম্বনীয়। এই পুরাতন ভারতে সত্যধর্ম্মের চর্চ্চা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এবং মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য এতবার সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে যে এ দেশে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিপোষক শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব হইবে না।

আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তির প্রকৃত অর্থ।

আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ যে প্রত্যেক জাতির জাতীয় প্রথা, প্রত্যেক কুলের কৌলিক প্রথা অব্যাহত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অর্থ এরূপ যেন কেহ না বুঝেন যে ঐ সকল প্রথা বিকৃত হইলে বা দেশকালের অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিলেও অব্যাহত রাখিতে হইবে, প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে রামমোহন রায়ও যেমন ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন ও আহার ব্যবহারকে সমসূত্রে দাঁড় না করাইয়া পৃথকভাবে ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত জাতীয় বা কৌলিক প্রথাকে একসঙ্গে বিচার্য্যরূপে না ধরিয়া পৃথক ভাবে বিচার করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুটী সনাতন বস্তু, কিন্তু জাতীয় বা কৌলিক প্রথা সকল পরিবর্ত্তনশীল। বৈদিককালে নিয়োগপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার অনিষ্টকারিতার কারণে সংহিতার কালেই তাহা অপ্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি বৈদিক প্রথা বলিয়া সংহিতায় তাহাও একটী প্রথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া সেই প্রথাকে কি হিন্দুদিগের জাতীয় প্রথা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে? কখনই নহে। শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারই সহিত উক্ত প্রথাও অবলম্বনীয় কখনই বলা যাইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মোপাসনাকে সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পদ্মপুষ্পের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা প্রচলিত প্রথাসমূহের মধ্যে কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ বাছিয়া লইতে পারিবেন; এবং এই সকল প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক কুলের ভিতর হইতে সংসাধিত হওয়া আবশ্যক।

আদিসমাজের মণ্ডলীর প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎসকদিগের মধ্যে একটী কথা আছে যে "অস্ত্রকার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়াছিল কিন্তু অস্ত্রাঘাতের প্রতিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী

অকালে প্রাণত্যাগ করিল।" * সুচিকিৎসকের কার্য্য হইতেছে রোগী সেই প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে কিনা অথবা কতটুকু পারিবে তাহা বিবেচনা করিয়া যথাযুক্তরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করা। রোগীই যদি প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তবে তোমার অস্ত্রচিকিৎসা ভাল হইল বা মন্দ হইল তাহাতে রোগীর কি লাভ হইল? সেইরূপ কেশববাবু প্রমুখ ব্রাহ্মমণ্ডলী আদিসমাজের মূলমন্ত্রের গভীরতা বুঝিবার অক্ষমতার কারণে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছেদের যে কঠোর অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহাতে আদিসমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কেবল মহর্ষিদেবের সেবাশুশ্রূষার ফলে তাহার জীবন বহির্গত হইতে পারে নাই। সেই আঘাতের ক্ষত শুকাইয়া গেলেও পাছে সেই ক্ষত নূতন কোন আঘাতে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে সেই ভয়ে আদিসমাজ বহুকাল যাবৎ অপর পাঁচজনের সহিত মিলিয়া কাজকর্ম্ম করা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করাতে তাহার দেহ যথেষ্ট অসাড় হইয়া আছে। অপর পাঁচজনের সহিত মিলিতভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া নিশ্চেষ্টভাব দূর না করিলে সেই অসাড়ভাব দূর হইবে না।

ভগবানের উপাসনার দুইটী মুখ্য অঙ্গ—ভগবৎপ্রীতি এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন। তন্মধ্যে ভগবানকে প্রীতি করা, তাঁকে ভক্তিভরে ডাকা, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করা, এ সকল অনেকটা আমাদের ব্যক্তিগত যত্ন ও চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে গেলে আমার একাকী দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয় না, তাহাতে অপর পাঁচজনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ আবশ্যক। দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, এইরূপ অপরের মঙ্গলসাধক কার্য্যই হইল ভগবানের প্রিয়কার্য্য। কাজেই যাঁহাদিগের হিতসাধক কার্য্য করিব, তাঁহাদিগের তাহা হিতসাধক হওয়া চাই। আমরা সর্ব্বজ্ঞ নহি, কাজেই যাঁহাদিগের হিতসাধন করিব, অনেক স্থলে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত আমার একাকী দ্বারা যতটুকু শুভকার্য্য সাধিত হইবে, পাঁচজনের সাহায্য পাইলে তদপেক্ষা যে অনেক অধিক শুভকার্য্য করিতে পারিব তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রকার নানা কারণে কার্য্যের সুবিধার জন্য ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে একটী সুগঠিত মণ্ডলীর প্রয়োজন। একটী ধর্ম্মনিষ্ঠ সুগঠিত মণ্ডলী থাকিলে আমাদিগের ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবারও অনেক সুবিধা হয়। একজন হয়তো যে পথে চলিতেছে, অপর একজন হয়তো স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে তদপেক্ষা অনেক সহজ পথ প্রদর্শন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ব্যক্তিকে একই পথে চলিতে দেখিলে পরস্পরের সাহস কত না বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—অনেক সময়ে সমাজের ভিতর দিয়া মণ্ডলীর ভিতর দিয়া ভগবানের বাণী শুনিতে পাইয়া কত সাধুসজ্জন তাঁহার পথে অগ্রসর হইবার অতুল বল লাভ করে।

আদিসমাজ এতদিন শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য অপর পাঁচজনের সহিত মিলিতভাবে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া উপাসনার অন্যতর অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিল। মহর্ষিদেব তাঁহার জীবদ্দশায় আদিসমাজের নেতাস্বরূপে সাহায্যদান প্রভৃতি নানা উপায়ে দেশের শুভকার্য্যসমূহে সাধ্যমত সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন, মহর্ষিদেবের তিরোভাব অবধি আদিসমাজকে নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে হইতেছে। এখন অবধি এক-আধজনের উপর আদিসমাজের নির্ভর করা চলিবে না। সমাজের উন্নতির জন্য একটী মণ্ডলীর অত্যন্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভগবৎপ্রীতির সাধন করিতে থাকিলে সমাজের আর চলিবে না, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনেও সমাজের বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সমাজভুক্ত মণ্ডলীর প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কিসে সাধুতা দ্বারা প্রেমভক্তি দ্বারা এবং পরস্পরের প্রতি সাহায্য দ্বারা সমগ্র মানবসমাজকে আপনাদিগের মণ্ডলীভুক্ত করিতে পারা যায়। আমরা সাম্প্রদায়িকতার হিসাবে জনসাধারণকে মণ্ডলীভুক্ত করিতে বলিতেছি না—লোককে প্রেমে ভক্তিতে জ্ঞানে কর্ম্মে উন্নত করিয়া স্বীয় মণ্ডলীর মধ্যে আনিতে হইবে, স্বর্গরাজ্যকে ধরাতলে নামাইয়া আনিতে হইবে, পৃথিবীকে দেবরাজ্যে পরিণত করিতে হইবে। মণ্ডলীর অভাবে আদিসমাজ যদি দেশের মঙ্গল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিল, তবে দেশ

* The operation was very successful but he died of the shock.

তাহাকে রক্ষা করিবে কেন? এই মনে কর, দেশের কত স্থান এ বৎসর বন্যাতে ভাসিয়া গেল, কত স্থান দুর্ভিক্ষরাক্ষসের করালগ্রাসে পড়িল, এই সকল বিষয়ে মণ্ডলীর অভাবে আদিসমাজ যে কোন প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই, ইহা কি কম দুঃখের কথা! অথচ আদিসমাজের মণ্ডলী-ভুক্ত হইতে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ আদিসমাজ উদারতম ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এই সকল কারণে আমরা দেশের সাধুসজ্জনদিগকে আদি-সমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং আশা করি যে তাঁহারা স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকেও এই মণ্ডলীভুক্ত করিয়া সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দিবেন। সমাজভুক্ত এক একটী লোক বিশেষ শক্তিমান হইলেও যে কার্য্য করিতে পারি-বেন, মণ্ডলীর সমবেত শক্তি তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য্য করিবার ক্ষমতা ধারণ করিবে নিঃ-সন্দেহ।

মিলন ও বিচ্ছেদের ফল।

হিতোপদেশ প্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশ আমা-দের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

ক্ষুদ্র বস্তুসমূহও মিলিত হইলে অনেক গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারে; তৃণরাশি দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিলে তাহা দ্বারা মত্ত হস্তীও বাঁধা যাইতে পারে। এই সঙ্গে সেই সবল ইংরাজী প্রবচনটীও আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য—United we rise, divided we fall—সংহতিতেই উন্নতি এবং বিচ্ছেদেই পতন।

মাদকতা মহাপাতক।

(১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত)

"মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মদ্য কাহাকেও দিবে না, মদ্য পান করিবে না, মদ্য গ্রহণ করিবে না; প্রাচীন ঋষিগণ সুরাপানকে পঞ্চ মহাপাতকের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুসলমান শাস্ত্রে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আজকাল চিকিৎসকগণ বলিতে-ছেন, সুরাপান আর বিষপান সমান; এখন ঔষধার্থও সুরা দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না; সুতরাং মদ্য-পান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ। এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে যে সুরাপান ছিল না তাহা নহে। প্রাচীন আর্য্যগণ সোমরস পান করিতেন; উহা উত্তেজক সুরা বিশেষ; কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ বুঝিয়াছিলেন, সুরাপান নানা অনর্থের মূল; তাই তাঁহারা সুরা-পানকে মহাপাতক বলিয়াছেন। এ দেশে পানদোষ তত প্রবল ছিল না; তান্ত্রিক সাধন প্রচলিত হইলে পর, ঐ সাধনাবলম্বী কেহ কেহ মদ্যপান করিতেন বটে, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অল্পই ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের সময় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে সুরাপান সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়া-ছিল। জ্ঞানে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা মদ্যপানেও সকলের অগ্রবর্ত্তী থাকিতেন; কত যুবক, সুরাপানে সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুরাপান ও মাংসভক্ষণ কুসংস্কার বর্জ্জনের পরিচায়ক ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও স্বর্গীয় প্যারী-চরণ সরকার প্রমুখ মহাত্মাগণের চেষ্টায় সুরার স্রোত অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়; শিক্ষিতসম্প্রদায়ে সুরাপানের প্রাবল্য হ্রাস পায়; ব্রাহ্মসমাজ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সুরাপান নিবারণ কল্পে মহা আন্দোলন উপস্থিত করেন; তাহাতে দেশের স্রোত পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এখন আবার যেন সুরারাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া আসিতেছে; শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পানদোষ প্রবেশ করিয়াছে; সমাজের নিম্নস্তরে বিশেষতঃ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সুরাপান আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরই মদ্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় বর্দ্ধিত হইতেছে। সুরা বিষ; উহা পান করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, যকৃত খারাপ হয়; অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। সুরাতে কত পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হইয়াছে; কত ধনী পরিবার পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে; স্বামী সুরাপানে বিভোর, সতী নারী কত দুঃখ সহ্য করিয়া আছেন, দিনরাত্রি অশ্রুপাত করিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। শ্রমজাত অর্থ সুরাতে ব্যয়িত হইতেছে, অথচ গৃহে স্ত্রী পুত্র পরিবার অনাহারে হাহাকার করিতেছে,

এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে হইলে সুরাস্রোত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, সুরাতে তেজ বীর্য্য বর্দ্ধিত করে, কার্য্যে উৎসাহ জন্মায়; যুদ্ধক্ষেত্রে সুরাপান দ্বারা সৈন্যগণ সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত হয়। এখন ডাক্তারগণ বলেন, সুরাপানে আপাততঃ উন্মত্ততা আসিলেও অল্প পরেই অবসাদ আসে; যুদ্ধক্ষেত্রে সুরাপানে উপকার না হইয়া অনিষ্ট হয়, সেইজন্যই বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স রুসিয়া সৈন্যদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তত্তৎ দেশেও সুরাপানের স্রোত বন্ধ করা হইতেছে; আমাদের রাজা স্বয়ং সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুরা মানবের শত্রু; উহা তেজ বীর্য্য নষ্ট করে, মানুষকে চরিত্র-হীন করে, দুর্ব্বল করে, নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি করে এবং অকালমৃত্যু ঘটায়। এই সুরাপান নিবারণ-কল্পে সকলেরই দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। সুরা ব্যতীত আরও অনেক মাদক দ্রব্য আছে। গাঁজা সিদ্ধি প্রভৃতি অনেকে সেবন করিয়া থাকে; ইহাতেও ভয়ানক অনিষ্ট করে। তামাক চুরট সিগারেটেও মানুষের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে; অল্প বয়সে তামাক চুরট ত বিষতুল্য; সেইজন্য আমেরিকার অনেক ষ্টেট ছাত্রদিগের ধূমপান নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে গ্রামের অতি অল্পবয়স্ক ছেলেরাও তামাক খায়। আর যাহারা স্কুল কলেজে পড়ে, তাহাদের অনেকেই সিগারেট খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এ যে ভয়ানক অবস্থা! রাস্তা দিয়া চল, দেখিবে, অতি অল্প বয়স্ক বালকেরও মুখে চুরট; কাহাকেও সে গ্রাহ্য করে না, চুরট মুখে দিয়া বুক টান করিয়া সে চলিতেছে। মাদকতানিবারিণী সভা-সমূহ এইজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; এই সুরা-রাক্ষসী ও অন্যান্য দোষের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন। যাহারা দোষী তাহাদিগের পানদোষ দূর করিতে হইবে; যাহারা এখনও পাপ-সক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে নির্ম্মুক্ত রাখিতে হইবে; নতুবা দেশ যে ক্রমে নরকে যাইয়া ডুবিবে। এই গরীব দেশে যে সুরাপান ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। প্রত্যেকের আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। সমবেত শক্তি দ্বারা মাদকতার স্রোত রুদ্ধ করা আবশ্যক। যাহারা মদ্যপান করে, তাহা-দিগকে উহার অনিষ্টকারিত্ব বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন; যাহারা আমোদের জন্য মদ্যপান করে, তাহা-দিগের জন্য অন্য প্রকার বিশুদ্ধ আমোদের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যে সকল শিক্ষিত লোক সুরাপান করেন এবং অন্যকেও সুরাপান করিতে প্রলুব্ধ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। তাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজেদের ও অন্যদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন; নিজেদের পরিবারের ও সমাজের কি মহা অনিষ্ট তাঁহারা সাধন করিতেছেন। সকলে সমবেত হউন, সুরারাক্ষসীকে বধ করিতে হইবে; সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন যাহাতে নিবারিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

উদ্ধার।

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

তোমার কাছে ত চাহি নাই যেতে
আপনি নিলে যে টানি।
দুঃখেরে আছিনু জড়ায়ে জড়ায়ে
সুখ দিলে তুমি আনি॥
আঁধারের পথে চলিয়াছি শুধু
আলেয়ার আলো দেখি।
বারবার তবু ফিরায়ে এনেছ
তোমার করুণা একি!
তোমার চরণে রাখি নাই প্রাণ
পড়ে ছিনু ধূলিতলে।
আপনি উঠায়ে লয়েছ সন্তানে
মুছায়ে নয়ন জলে॥

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।

প্রাচীন ও নবীন হিন্দুসমাজের ভাবসংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি।

প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ দিবসে যে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল প্রাচীন ও নবীন সম্প্রদায়ের ভাবসমূহের সংঘর্ষে। একদিকে মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রভৃতি সূত্রে প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভণ্ডামী কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে "ছুঁই ছুঁই" ভাব এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে এই সম্প্রদায়স্থ কেরাণীগণ সাহেবদের আফিস্ হইতে গৃহে ফিরিবার পথে গঙ্গাস্নান করিলে আপনাদিগকে শুচি বোধ করিয়া আহারে বসিতেন। অথচ, তাঁহারা লুকাইয়া ফৌজদারী বালাখানার মুসলমানদিগের হস্তপক্ক পাঁউরুটী ও মাংস ভোজনে দ্বিধা করিতেন না। অপর দিকে ইংরাজীশিক্ষার নূতন আলোকপ্রাপ্ত নবীন সম্প্রদায় এই প্রকার লুকাচুরি ও ভণ্ডামীর মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না—সর্ব্বতোভাবে বিরোধী ছিলেন। প্রাচীনদিগের ভণ্ডামীর প্রতিঘাত স্বরূপে তাঁহারা বিপরীত সীমায় গিয়া প্রকাশ্যে মদ্য ও মাংস খাইতে সূত্রপাত করিলেন। নবাবী আমলের গতানুগতিকতা-মূলক আলস্য-পরিবৃত অবস্থার পরিবর্ত্তে ইংরাজ আমলের নূতনপ্রিয়তার একটা জাগ্রতভাব আসিয়া সেই গঙ্গাস্নান ও ফোঁটাকাটা প্রভৃতি ক্রমেই দূর করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আহারাদি সম্বন্ধে জাতিভেদের অতিমাত্র বিচারও অল্পে অল্পে অপসৃত হইতে বাধ্য হইল।

ইতিপূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় "বজ্রসূচী" নামক এক বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া জাতিভেদ প্রথার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান, সুতরাং মানবমাত্রেরই মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত করা আবশ্যক, এই ভাবটী সেই সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সর্ব্বথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের মধ্যে একতার ফলও প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতে লাগিল। আবার তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজদিগের অনুকরণে সভাসমিতি করিয়া একটী "চক্রবর্ত্তীর দল" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় জাতিভেদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন ব্যতীত নানাবিধ গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অল্প বিস্তর ব্রহ্মোপাসনার দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। এই সকল নানা ঘটনা মিলিত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভগবান জগতের প্রয়োজন জানিয়া পুরাতনের জীর্ণ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন সেতু নির্ম্মাণের উপকরণ সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই নূতন সেতুই ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার আদিমতন আদর্শ আত্মীয়সভা।

ইউনিটেরীয় কমিটি ও উইলিয়ম অ্যাডাম।

একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজকে রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও নবীন সম্প্রদায়ের ভাবসংঘর্ষের ফল বলিতে পারি, সেইরূপ ইহাকে তদানীন্তন খৃষ্টীয় সমাজেরও প্রাচীন ও নবীন ভাবসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতের ফল বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের তর্কযুদ্ধ সর্ব্বজনবিদিত। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহাদিগের সহিত রামমোহন রায় তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, উইলিয়ম অ্যাডাম নামক এক ইংরাজ তাঁহাদিগের অন্যতর ছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অ্যাডাম এবং য়েট্স্ নামক দুই মিশনরি রামমোহন রায়ের সাহায্যে বাইবেলের শেষাংশ নিউটেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। এই অনুবাদ সূত্রে স্বভাবতই বাইবেলের নানা বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ হইত। বলা বাহুল্য যে একদেশদর্শী মিসনরিদ্বয়কে অনেক সময়ে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। ফলে, য়েট্স্ সাহেব অনুবাদ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অ্যাডাম সাহেব অনুবাদ কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত লিপ্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি খৃষ্টপ্রচারকের পরিবর্ত্তে একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িলেন। একজন বাঙ্গালীর হস্তে একজন ইউরোপীয়ের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন সেকালে যে কিরূপ মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইউরোপীগণ অ্যাডাম সাহেবকে "পুনঃ পতিত অ্যাডাম" বলিয়া মনের জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেন। বিলাতে ইউনিটেরীয় খৃষ্টান নামক এক সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না। অ্যাডাম সাহেব নিজের মিসনরিসমাজ পরি-

ত্যাগ করিয়া ইউনিটেরীয় সমাজভুক্ত হইতে বাধ্য হইলেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ফলে ইউনিটেরীয় সমাজও স্বমত প্রচারে খুবই উৎসাহিত হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "কলিকাতা ইউনিটেরীয় কমিটি" নামক এক সমিতি স্থাপিত হইল। তাহার সভ্য ছিলেন—(১) তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার থিয়োডোর ডিকেন্স, (২) তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর ম্যাকিন্টষ কোম্পানীর অংশীদার জর্জ্জ জেমস্ গর্ডন, (৩) এটর্ণী উইলিয়ম টেট, (৪) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসক বি, ডব্লিউ, ম্যাকলাওড, (৫) নরম্যান কার, (৬) রামমোহন রায়, (৭) দ্বারকানাথ ঠাকুর, (৮) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, (৯) রাধাপ্রসাদ রায় এবং (১০) উইলিয়ম অ্যাডাম। সংস্থাপনের কিছু পরে এই সমিতি একটী প্রচার বিভাগ খুলিলেন। এই সমিতির হস্তে রাম মোহন রায় ৫০০০৲ টাকা এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বনামে ২৫০০৲ টাকা এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে ২৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। অ্যাডাম সাহেবই এই সমিতির নিযুক্ত প্রচারক হইলেন।

ইউনিটেরীয় কমিটির প্রচার কার্য্য।

প্রথম প্রথম এই সমিতির প্রচার বিভাগের কার্য্য এরূপ উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল যে, বিশপ হীবরকে ভারতে পদার্পণ করিবামাত্রই উহার প্রভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল। ভারতে পদার্পণের ছয় দিন পরেই তিনি কোন বন্ধুকে এক পত্রে লিখিতেছেন—"কতকগুলি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণ আমাদের প্রচারের প্রধান অন্তরায়; তাঁহারা আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া এক নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপনে ইচ্ছুক। এই সকল ব্রাহ্মণ ব্যতীত আমাদের "প্রতিবাদীগণের" (Dissenters) কয়েকজনও নামেমাত্র আমাদের সহিত একই কর্ম্মে (খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে) নিরত বটে, কিন্তু তাঁহারা আমাদের বিঘ্নস্বরূপ।" *

প্রচারকার্য্য নিষ্ফল হইবার কারণ।

ইউনিটেরীয় কমিটির প্রচারবিভাগের কার্য্য প্রথম প্রথম খুব ভাল রকম চলিয়া ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। একেতো বিষয় হইল ধর্ম্ম, তাহার উপর বাইবেলের উপর ভিত্তি করিয়া একেশ্বরবাদবিষয়ক বক্তৃতা। সেই বক্তৃতা হয় ইংরাজী ভাষায় অথবা খৃষ্টানী বাঙ্গালায় করা হইত। এরকম বক্তৃতা সেকালে কয়জন লোকেরই বা শুনিতে আগ্রহ ছিল? ক্রমশ এমন অবস্থা আসিয়াছিল যে অ্যাডাম সাহেবকে শূন্য গৃহের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

অ্যাডাম সাহেবের নবোৎসাহে প্রচারকার্য্য।

বৎসর ছয় পরে তিনি এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। একটী সংখ্যাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু লিখিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রচার রহিত করিয়া দিলেন। তখন অ্যাডাম সাহেব অবসর পাইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নূতন উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিরত হইলেন। এই সময়ে একদিকে ইউনিটেরীয় কমিটির অধীনে একটী উপাসনাস্থান ও বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সন্নিহিত একখণ্ড ভূমি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অপর দিকে ইংলণ্ডস্থ ইউনিটেরীয়গণ তাঁহাদিগের কলিকাতাস্থ সধর্ম্মীগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে পঞ্চদশ সহস্র টাকা পাঠাইয়া দিলেন। প্রস্তাবিত গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই অ্যাডাম সাহেব হরকরা সংবাদপত্রের আফিসের সংলগ্ন কয়েকটী ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রাতঃকালীন উপাসনা বিশেষ ফলদায়ক হইল না। অবশেষে তিনি সান্ধ্য উপাসনাও আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে কারণে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবারেও সেই একই কারণে তিনি তাঁহার প্রচারকার্য্যে বিফলমনোরথ হইলেন। অশীতিসংখ্যক হইতে শ্রোতৃসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অ্যাডাম সাহেব ভগ্নহৃদয়ে প্রচারকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মসভা সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব।

দেখা যায় যে, অ্যাডাম সাহেব তাঁহার প্রচার

---

* "Our chief hindrances are some Deistical Brahmins who have left their old religion and desire to found a sect of their own, and some of those who are professedly engaged in the same work with ourselves, the "Dissenters." Miss Collet's "Life of Ram Mohan Ray."

কার্য্য নিষ্ফল হইবার মূল কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বদেশীয় ভাষায় স্বদেশীয় লোকের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া যাহাতে একেশ্বরবাদ প্রচার করা হয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এদিকে, একদিন হরকরা আফিসসংলগ্ন উপাসনা-গৃহ হইতে প্রত্যাগমনকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করিলেন যে বিদেশীয় লোকের গৃহে উপাসনার জন্য নিত্য যাইবার পরিবর্ত্তে নিজেদের একটী উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে ভাল হয়। রামমোহন রায়ের প্রাণে কথাটী বড়ই ভাল লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং টাকীর জমীদার মুন্সী কালীনাথ রায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় এবং হাবড়ার অন্তর্গত আন্দুলনিবাসী মথুরানাথ মল্লিক এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।*

ব্রহ্মসভার প্রথম প্রতিষ্ঠা।

অবশেষে ঘটনাবশে চিৎপুর রোডের উপর যোড়াসাঁকোস্থ ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাটী (বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজের সম্মুখস্থ বাটী) ভাড়া লইয়া স্বদেশীয়দিগের প্রথম ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট ব্রাহ্মসমাজের আদিমতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজের ভূমিক্রয়।

এই সভা সংস্থাপনের অল্পদিন পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে চিৎপুর রোডের পার্শ্বে উক্ত সভাগৃহের সম্মুখস্থ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি বর্ত্তমান সমাজগৃহ নির্ম্মিত হইল। ভূমিবিক্রেতা হইলেন কালীপ্রসাদ কর এবং ক্রেতা হইলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সী কালীনাথ রায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং রামমোহন রায়। ভূমির পরিমাণ চার কাঠা আধ পোয়া মাত্র। জমীর মূল্য হইল ৪২০০৲ টাকা—প্রায় এক হাজার টাকায় এক কাঠা। সেকালের পক্ষে জমীর মূল্য কিছু অতিরিক্ত বোধ হইতেছে। বেশ বুঝা যাইতেছে যে বিক্রেতা কালীপ্রসাদ ব্রহ্মসভা অথবা তাহার প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতি অনুরাগ বশত জমীটুকু বিক্রয় করেন নাই—অতিরিক্ত মূল্যের লোভেই বিক্রয় করিয়াছিলেন। এদিকে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপকগণ ব্রহ্মসভার বিরোধী নন্দলাল ঠাকুর প্রভৃতির বাসস্থানের সন্নিকটে ব্রহ্মসভা সংস্থাপনের জন্য যে এতটুকুও ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইলেন, ইহাতেই বোধ হয় আপনাদিগকে যথেষ্ট উপকৃত বোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এত স্থান থাকিতে সেকালের দুর্গন্ধপূর্ণ যোড়াসাঁকো অঞ্চলে ব্রহ্মসভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে ইহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের অপ্রতিহত প্রভাবের আশ্রয়ে উন্নতিলাভ করিবে, সহজে কেহ ইহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না; এবং দ্বিতীয়ত, এই স্থান বিস্তর ধনীলোকের আবাসস্থান হইয়া পড়াতে অন্তত সঙ্গীতাদি শুনিবার জন্য দুই চারি পদ বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা ব্রহ্মসভায় পদার্পণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারিবেন—অন্যত্র ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হইলে সেই সকল ধনীলোকের ব্রহ্মসভার সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনামাত্রও থাকিত না। ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ অবধি এই ভূমির উপরিস্থিত নূতন গৃহে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ব্রহ্মসভা সংস্থাপনে বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের প্রভাব।

জনসাধারণের মিলিত ভাবে উপাসনা করিবার জন্য সমাজ সংস্থাপনের ভাব খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় ও মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মজ্জাগত ভাব এই যে প্রত্যেকে আপনাপন পৈতামহ প্রণালীতে ধর্ম্মাচরণ করিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে মিলিত ভাবে সবিস্তার উপাসনা করিবার ভাব আমরা দেখিতে পাই না। তবে হিন্দুসমাজে এ ভাব যে একেবারেই নাই সে কথা আমরা বলিতে পারি না। দেবমন্দিরে আরতিকে উপাসনার অন্যতর অঙ্গ ধ্যানেরই রূপান্তর বলিতে পারি। ইহা ব্যতীত দেবমন্দিরসংলগ্ন দালান প্রভৃতিস্থানে শাস্ত্রব্যাখ্যা হয়, সঙ্গীতাদি হয় এবং লোকেরা ইচ্ছামত জপাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

ব্রহ্মসভার ট্রষ্টডীড (ন্যাসপত্র) সম্পাদন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ব্রহ্মসভার ভূমি-

* আডাম সাহেবের আন্দোলনের ফলে অথবা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ স্বদেশীয়গণের কথায় রামমোহন রায় হরকরা আফিসের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের উপাসনাসভা সংস্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিলেন এই বিষয় লইয়া রামমোহন রায়ের জীবনী সমূহে তর্কবাহুল্য দৃষ্ট হয়। আমরা এই তর্কবাহুল্যের উপযোগিতা দেখি না।

খণ্ডের ক্রেতাগণ ইহাকে ট্রষ্ট বা ন্যস্তসম্পত্তি করিয়া কয়েক জন ট্রষ্টীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। প্রথম ট্রষ্টী হইলেন (১) টাকীর বৈকুণ্ঠনাথ রায়, (২) রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় এবং (৩) দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈমাত্রের ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর। এই ট্রষ্টডীডের (ন্যাসপত্রের) কয়েকটী জ্ঞাতব্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ট্রষ্টডীডের কয়েকটী অনুজ্ঞা।*

[ক] যে পুরুষ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না, যিনি এই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তাঁহার উপাসনা ও আরাধনার জন্য যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভাবে আসিবেন এবং কোন গোলযোগ করিবেন না, তাঁহাদিগের সাধারণ মিলনস্থলরূপে এই সমাজগৃহ ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত উপাধি সেই নিত্যপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

[খ] কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি ছবি বা খোদিত কাষ্ঠ ফলক, চিত্র প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিবে না।

[গ] কোন প্রকার বলিদান বা আহুতি প্রদান হইবে না। ধর্ম্মের বা আহারের উদ্দেশে কোন প্রাণীহত্যা হইবে না।

[ঘ] ঘটনাক্রমে প্রাণরক্ষার্থ আবশ্যক না হইলে এখানে পানাহার বা ভোজ অথবা মারামারি করিতে দেওয়া হইবে না।

[ঙ] কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক পূজিত কোন পদার্থের প্রতি উপাসনাকালে কোন নিন্দাসূচক বাক্য প্রযুক্ত হইবে না।

[চ] স্রষ্টা ও পাতা পুরুষের ধ্যানপ্রবর্ত্তক এবং দয়া, নীতি, বদান্যতা ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে মিলনসাধক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উপদেশ, প্রার্থনা বা সঙ্গীত হইতে পারিবে না।

[ছ] খ্যাতিবিশিষ্ট এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুনীতির জন্য সর্ব্বজনবিদিত কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী পরি-

* [ক] * * * Shall and do from time to time and at all times for ever hereafter permit and suffer the said * * building * * to be used * * and appropriated so and for a place of public meeting of all sorts * * of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings by any man or sect of men whatsoever.

[খ] No graven image statue or sculpture carving painting picture portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage.

[গ] No sacrifice offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein. No animal or living creature shall within or on the said messuage * * be deprived of life either for religious purposes or for food.

[ঘ] No eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein.

[ঙ] In conducting the said worship and adoration no object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognised as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage.

[চ] No sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preservor of the Universe, to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening of the bonds of union between men of all religious persuations and creeds.

[ছ] A person of good repute and well-known for his knowledge piety and morality be employed by the said trustees or the survivors of them * * as a resident Superintendent and for the purpose of superintending the worship so to be performed as is hereinbefore stated.

[জ] Such worship be performed daily or at least as often as once in seven days.

দর্শক রূপে উপাসনা কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইবে।

[জ] প্রতিদিন অথবা অন্তত সপ্তাহে একদিন এই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

রামমোহন রায়ের বিলাত গমনে ব্রাহ্মসমাজের পরোক্ষ লাভ।

ব্রাহ্মসমাজ ট্রষ্টীদিগের হস্তে ন্যস্ত হইবার কয়েক মাস পরে রামমোহন রায় ১৫ই নবেম্বর বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করিলেন। এই দিন অবধি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বিলাত গমনের ফলে পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে ভারতবাসীদিগের সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে বাধা ভাঙ্গিয়া গিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি পথ যথেষ্ট প্রশস্ত হইয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনে ব্রাহ্মসমাজ অনেক গণ্যমান্য ইংরাজের নিকট বিশেষ শক্তিরূপে পরিচিত হইয়াছিল। তাঁহার বিলাতে অবস্থান কালে সতীদাহের পক্ষে ধর্ম্মসভায় প্রেরিত দরখাস্ত যখন বিচারার্থ গৃহীত হইয়াছিল, তখন তাহার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় বুঝাইয়া দেওয়াতে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল এবং ব্রাহ্মসমাজের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। ইহা ব্যতীত এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি স্বাধানভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া ইংরাজ জাতির হৃদয়ে নিজেও অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার উদ্যোগে সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজও গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের দেহান্তর প্রাপ্তি।

ন্যূনাধিক তিন বৎসর বিলাত বাসের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে গ্যয়টের মতামত।

(শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নামের অপব্যবহার।

সেই পরম পুরুষ যিনি বুদ্ধির অগম্য, এমন কি চিন্তারও অতীত, লোকে এমন করিয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করে যেন তিনি তাহাদের নিতান্ত একজন সমকক্ষ লোক। বিশেষত পাদ্রিরা প্রতিদিন এরূপ কতকগুলি নাম ব্যবহার করে যাহা শুষ্ক মৌখিক বচন মাত্র, যাহার অর্থ তাহারা ভাবিয়া দেখে না। যদি তাঁহার মহিমা সত্যই তাহাদের মনে গভীর রেখাপাত করিত, তাহা হইলে তাহারা মূক হইয়া থাকিত এবং ভক্তিতে অভিভূত হইয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে অনিচ্ছুক হইত। *

ইহকাল ও অনন্তকাল।

যাঁহারা পদার্থসমূহের নশ্বরতা এবং মানব-জীবনের অসারতার কথা ক্রমাগত বলেন, তাঁহাদের জন্য আমি অন্তরের সহিত দুঃখিত; কারণ, নশ্বরের উপর অবিনশ্বরের ছাপ দিবার জন্যই আমরা এখানে আছি; ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য; এবং নশ্বর ও অবিনশ্বর এই উভয়ের কেবল যথাযথ মূল্য অবধারণ করিয়াই এ কাজ সাধিত হইতে পারে।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম একটা লক্ষ্য নহে; ধর্ম্ম এমন একটা উপায় যাহার দ্বারা আত্মার পরম শান্তির মধ্যদিয়া আমরা পরম উৎকর্ষে উপনীত হইতে পারি।

কেবল দুইটি সত্যধর্ম্ম আছে; এক,—যে ধর্ম্ম, কোন বিশেষ আকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত নহে এরূপ এক পবিত্রস্বরূপকে অন্তরে ও বাহিরে স্বীকার করে ও ভজনা করে; এবং দ্বিতীয়—যে ধর্ম্ম, পবিত্রস্বরূপকে পরম সুন্দর বা সুন্দরতম আকারের মধ্যে স্বীকার করে ও ভজনা করে। আর সমস্ত মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্মগুলি পুতুল পূজার বিভিন্ন রূপ মাত্র।

প্রেত-তত্ব, পূর্ব্বানুভূতি, স্বপ্ন ইত্যাদি।

যতপ্রকার কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম আসিয়া দুর্ব্বল মানব-মস্তিষ্ককে অধিকার করে তন্মধ্যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্বানুভূতি, ও স্বপ্নফলের বিশ্বাস আমার মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও অনিষ্টজনক। নিরুপদ্রব সময়ে এই সকল খেয়ালের কারবার করিয়া দৈনিক জীবনের সচরাচর ঘটনার সম্বন্ধে একটা কৃত্রিম ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন এক-একটা গুরুতর বিপদের কাল উপস্থিত হয়, যখন জীবন গুরুতর পরিণামগর্ভ হইয়া উঠে, গুরুতর ব্যাপারের ক্ষেত্র হইয়া উঠে, যখন চতুর্দ্দিকে ঝটিকা

* এই ভক্তির ভাব হইতেই আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের নাম উচ্চারণ করে না।

(অনুবাদক)

গর্জ্জন করিতে থাকে, তাড়না করিতে থাকে, তখন এই দুর্ব্বল মস্তিষ্কপ্রসূত ছায়ামূর্ত্তিগুলি সেই ভীষণ বিভ্রাটকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলে।

ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা।

বিশ্বজগতের সমস্যা সমাধানের জন্য মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে নাই; পরন্তু কোথায় সেই সমস্যার আরম্ভ তাহাই নির্দ্ধারণ করা এবং তাহার পর, জ্ঞেয় বস্তুর সীমার মধ্যে আপনাকে সংযত রাখাই মানুষের কাজ। বিশ্বজগতের বিচিত্র চেষ্টার পরিমাণ করিবার পক্ষে মানুষের শক্তি পর্য্যাপ্ত নহে; এবং মানুষের সংকীর্ণ দর্শনভূমি হইতে যুক্তির দ্বারা বাহ্যজগতের ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা সে বৃথা চেষ্টা। মানুষের জ্ঞান ও ভগবানের জ্ঞান—এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। মানুষের স্বাধীনতা যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা আর থাকে না; কারণ, যদি ভগবান জানেন আমি কি করিয়া কাজ করিব, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে সেই কাজ করিতেই হইবে। আমরা কত অল্পই জানি, ইহার দ্বারা আমি তাহার একটু ইঙ্গিত করিতেছি মাত্র, এবং ইহাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য যে, ভগবানের নিগূঢ় রহস্য লইয়া নাড়াচাড়া করা আমাদের পক্ষে ভাল নহে। তাছাড়া, যে সকল পরম সত্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারে সেই সকল সত্য প্রচার করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাহা সাধারণের প্রবৃত্তি, রুচি ও গ্রহণশক্তির অতীত তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যেই বদ্ধ রাখা উচিত এবং তাহা প্রচ্ছন্ন সূর্য্যের মৃদু কিরণের ন্যায় আমাদের কার্য্যের উপর প্রভাব বিকীর্ণ করিবে।

প্রার্থনা ও বিধাতা।

অজস্র দানে যথা রাজ-পরিচয়;
(অল্প যাহা তাঁর কাছে, মোদের নিকটে
অতুল ঐশ্বর্য্য;) তব কৃপা সেইরূপ
বহুপূর্ব্ব হতে রেখেছে সঞ্চিত
কত ধন মানবের প্রয়োজন তরে।
কেননা, তুমিই জান মহাশক্তিমান্
কিসে হয় মানুষের ভাল; রহিয়াছে
প্রসারিত তব দৃষ্টির সম্মুখে
দূর ভবিষ্যৎ; সান্ধ্য কুয়াসায় ঢাকা
দু'একটি তারা উঁকি দেয় আমাদের
ক্ষুদ্র দৃষ্টি পথে। মোরা শিশুর মতন
অধীর হইয়া করি তোমার নিকটে
প্রার্থনা; চাহি মোরা উত্তর তখনি;
তুমি কিন্তু ধীরভাবে শোনো সে প্রার্থনা;
যাহা ভাল, তাই দেও;—যে সুবর্ণ-ফল
শাখা হতে ঝুলে, তাহা তুমি নাহি দেও
অকালে কাহারে, সেই শাখাটিরে ভাঙ্গি;
কি দুর্দ্দশা তার যেই না শুনিয়া কথা
তাড়াতাড়ি তুলি লয় অপক্ক সে ফল;
সুতিক্ত তাহার রস করি আস্বাদন
অবশেষে মৃত্যুমুখে করে সে প্রবেশ।

ধর্ম্ম, ঈশ্বর, বলিদান।

দেবতা দয়ালু, নহে শোণিত-পিপাসু।
যারা তাঁরে বলে প্রতিশোধ-পরায়ণ
—পার্থিব প্রকৃতি নিজ লয়ে যায় তারা
স্বর্গে, আর তাহে দেয় মানবের ছাপ।

ধর্ম্ম-জীবন।

সংসাধন করিবারে পৃথিবীর কাজ
দেবতার প্রয়োজন—মহাত্মা জনের;
সে গণনায় আছি আমি, আছ তুমি।

ঈশ্বর।

সে দেব করে না মোর পূজা আকর্ষণ
যিনি নিজ অঙ্গুলিতে ঘুরাণ জগৎ,
—যাহা বাহিরের শুধু; আমার ঈশ্বর
রাজেন অন্তরে; আমি যাঁরে বলি মোর
স্রষ্টা, পিতা, পাতা,—তাঁহাতে প্রকৃতি,
প্রকৃতিতে তিনি; প্রেমালিঙ্গনে
তাঁর বদ্ধ হয়ে করে জীবন ধারণ,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড;—হয়ে ওতপ্রোত
রহে বিদ্যমান সেই আত্মার মাঝারে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী)

বেদান্তদর্শনই শাক্তবৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের মূল। বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য আছে এবং সেই বিভিন্ন ভাষ্য অনুসারে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগীবর শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার নাম বিবর্ত্তবাদ। তিনি অদ্বৈতবাদী

ছিলেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বাক্যটির অর্থ তাঁহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন আর কিছু নাই। ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা—সব ভেল্কি বাজি। আমি, তুমি, নদী, পর্ব্বত বৃক্ষ লতা সৌরজগত ইত্যাদি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মায়ার খেলা, আসলে কিছু নাই। ভ্রমবশতঃ যেমন একটী বস্তু অপর একটী বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সেইরূপ। প্রকৃত বস্তু ব্রহ্ম; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই নয়—ব্রহ্ম। আমরা সেই ব্রহ্মকে না দেখিয়া ভ্রমবশতঃ বিশ্ব দেখিতেছি। যাহা দেখিতেছি তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত অস্তিত্ব যাঁহার আছে তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম; মায়া বা অবিদ্যা আমাদের ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে আর সেই ভ্রমে পড়িয়া আমরা প্রকৃত বস্তু ব্রহ্মকে না দেখিয়া ব্রহ্মেতে জগত দেখিতেছি। যেমন অন্ধকার রাত্রে একটা বৃক্ষমূল দেখিয়া মানুষ কিংবা ভূত মনে করিয়া সময় সময় ভয় পাওয়া যায় ইহাও সেই জাতীয় ভ্রম। ব্রহ্ম হইতে জগৎ আইসে নাই, ব্রহ্মেতে জগতের ভাণ হইয়াছে। ইহাই বিবর্ত্তবাদ। আচার্য্য শঙ্কর এই মত অবলম্বনে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে "তুমিই ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম হইতে তুমি আইস নাই।

যাঁহারা ভগবানকে প্রভু বোধে পূজা করিতে চান কিংবা তাঁহাকে ভালবাসিতে চান, তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত মতটী কোন প্রকারে প্রীতিকর হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব উহাকে লুকায়িত বৌদ্ধমত বলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা বেদ মানিয়াও বেদের অর্থ বিকৃতভাবে করেন তাঁহারা বেদবিরোধী নাস্তিক অপেক্ষাও অধম। আমি কেহ নহে, আমার নিজত্ব কিছুই নাই, আমি ভগবানের দাস বা সুহৃদ্ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারিব না,—পক্ষান্তরে আমি যাহা তাহাও নহি,—আমি স্বয়ং ভগবান;—ভগবদ্ভক্তেরা এভাব কথনও মনেও স্থান দিতে পারেন না। কাজেই যাঁহারা ভগবানকে প্রেম দিয়া পূজা করিতে চান, তাঁহারা যোগিবর শঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া পরিণামবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। পরিণামবাদ নূতন নহে। উহা মহর্ষি কপিলের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহর্ষি কপিলই দার্শনিক দিগের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া সাধারণের সংস্কার। সংস্কারটী ভিত্তিবিহীন নহে। সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত এই তিন খানি দর্শন আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এই তিনের মধ্যে সাংখ্যই আদিম গ্রন্থ, পাতঞ্জল সাংখ্যের ক্রমবিকাশ, বেদান্ত পাতঞ্জলের ক্রমবিকাশ। সুতরাং বলিতে হইবে পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের বহুপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছিল।

পরিণামবাদীদের মতে মূল কারণ ক্রমশ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ ও কার্য্যের অভেদ,—কারণ কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু পরিণত বা রূপান্তরিত অবস্থায় থাকে। কারণের রূপান্তরই কার্য্য; কিন্তু রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়াই যে কারণ কার্য্যে বর্ত্তমান নাই, একথা বলা যায় না। তিল হইতে তৈল হইয়াছে। তিল কারণ—তৈল কার্য্য। তৈল আর কিছুই নহে তিলেরই রূপান্তর মাত্র। উহা তিলই—ভিন্ন রূপমাত্র ধারণ করিয়াছে; সুতরাং তৈলেতে রূপান্তরিত অবস্থায় তিল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৈল বলিলে আমরা বুঝিব যে উহা রূপান্তরিত তিল। এইরূপ ইষ্টক বলিলে আমরা বুঝিব যে উহা রূপান্তরিত মৃত্তিকা। কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক বস্তু, তবে ভিন্নরূপ অবলম্বন করে বলিয়া কার্য্যটী কারণ হইতে বিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ কার্য্য, কারণের অবস্থাবিশেষ।

উপরোক্ত তিল ও তৈল এবং মৃত্তিকা ও ইষ্টকের উদাহরণটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্বন্ধেও খাটে। তিল যেমন পরিণাম দ্বারা তৈল হয়, তেমনি এই জগতের মূল কারণও পরিণাম দ্বারা জগতে পরিণত হইয়াছে। মূল কারণ ও জগত এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটী কারণ, দ্বিতীয়টী কার্য্য; ইহারা বাস্তবিক অভেদ হইলেও একটী হইতে অপরটী বিশিষ্ট। একটী মূল কারণ, অপরটী পরিণামপ্রাপ্ত মূল কারণ, সুতরাং এক হইলেও পরস্পরের ভেদ আছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই এই জগতের মূল কারণ। ব্রহ্মই পরিণত হইয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি তুমি আমরা সকলে সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পরিণাম মাত্র, সুতরাং আমাদের মধ্যেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আছেন। কিন্তু কি ভাবে আছেন? কারণ ভাবে নাই, কার্য্য ভাবে আছেন। আমরা প্রত্যেকে তাঁহার পরিণামসম্ভূত কার্য্য, আর তিনি আমাদের সকলের একমাত্র কারণ। তিনি এক, আমরা বহু; আমরা বহু হইলেও আমাদের প্রত্যেকেতে তিনি কার্য্যরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমরা সকলে তাঁহা হইতে আসিয়াছি, আবার তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া যাইব; তখন আর জগত থাকিবে না।

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়;
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন;
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন।
ভগবান বহু হইতে যবে কৈল মন;
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।"

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রেমময়। কারণের গুণ কার্য্যে থাকে;

সুতরাং পূর্ণভাবে না হই, অন্তত আংশিক ভাবে আমরাও প্রেমময়। আমাদের প্রকৃত অবস্থাটী প্রেম ছাড়া আর কিছুই নহে; তবে পানাপুকুরের পানায় যেমন পুকুরের জল ঢাকিয়া রাখে আমাদের প্রেমময় ভাবটীও তেমনি বাহ্যিক আবর্জ্জনায় ঢাকিয়া গিয়াছে। ঐ পানাগুলিকে সরাইয়া দাও, সচ্চিদানন্দের প্রেমরূপ নির্ম্মল সলিল দেখিতে পাইবে। পানাগুলি আছে বলিয়াই আমরা ভগবান হইতে পৃথক না হইয়াও পৃথক হইতেছি। জল হইতে বরফ হইয়াছে। বরফ শক্ত, জল তরল। যদিও দুইটী বস্তুই এক, তথাপি পৃথক। বরফকে আবার উষ্ণ করিয়া জলে পরিণত কর, দুই এক হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা দুই না হইলেও দুই এবং আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে না থাকিলেও কার্য্যত আছে, সুতরাং আমিই ভগবান একথা আমরা বলিতে পারিনা; আমি ভগবানের একজন, একথা বলিতে পারি। তাঁহার দাস, সন্তান, সখা, স্ত্রী ইত্যাদি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারি এবং সেই ভাব লইয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারি। উপরোক্ত যুক্তির উপর বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদান্তের ব্যাখ্যা করে এবং ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মিশ্র মল্লার—রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি-ভবনে।
এ ভব-সংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল, এ দুখ শোকানল দূরে যাক্‌.
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্‌।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে তখন কার মুখ-চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন, কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

০ ১ ২ ॥ ০ ১ ২
II রা রা রা। মাঃ -গঃ। রগা রা I রা পা মা। মাঃ -গঃ। মগরা সা I
চ লে ছে ত • র• ণী প্র সা দ প • ব• নে

০ ১ ২ ০ ১ ২
I রা মা মা। পা -ধা। র্সা ণধা I পা -ধা পা। মাঃ -গঃ। মগরা সা II
কে যা বে এ • স হে• শা ন্‌ তি ভ • ব• নে

০ ১ ২ ০ ১ ২
II { মা পা পনা। না -া। না নর্সা I র্সা র্সা র্রা। না -া। র্সা র্সা I
এ ভ ব• সং • সা রে• ঘি রে ছে আঁ • ধা রে

০ ১ ২ ০ ১
I না র্সা র্রা। র্রা র্রজ্ঞা। র্রা র্সা I নর্সা -নর্রা র্সা। ণাঃ -ধঃ।
কে ন রে ব সে• হে থা ম্লা• •• ন মু •

২ ০ ১ ২ ০ ১
। -পধা -া } I { মা ধা ধা। ধণা -র্সণধা। পা ধা I র্সা র্সা র্রা। র্সধা -র্সণা।
•• খ্‌ প্রা ণে র বা• ••• স না হে থা য় পূ• ••

২ ০ ১ ২ ০ ১
| ধা পা } I ধা ধা পা | মা মগা | রা -সা I রা -পা মা | পা -া |
রে না হে থা য় কো থা০ প্রে ম্‌ কো ০ থা সু ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| -া -া I মা পা পনা | না না | না -া I মা মা মা | মা মা |
০ খ্‌ এ ভ ব০ কো লা হ ল্‌ এ পা প হ লা

২ ০ ১ ২ ০ ১
| পা -া I মা ধা ধা | ধা ধা | ধা -না I না -র্সা র্সা | না -র্সা |
হ ল্‌ এ দু খ শো কা ন ল্‌ দূ ০ রে যা ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| -ধা না I না র্সা না | নর্সা -র্রর্গা | র্রা র্সা I মা মা মা | মমা -পা |
০ ক্‌ স মু খে চা০ ০০ হি য়ে পু ল কে গা০ ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| পা পা I মা ধা পা | ধা ধা | ধা না I না -র্সা র্সা | না -র্সা |
হি য়ে চ ল রে শু নে চ লি তাঁ ০ র ডা ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| -ধা -া I { মা ধা ধা | ধণা -র্সণধা | পা ধা I র্সা র্সা র্রা | র্সধা -র্সণা |
০ ক্‌ বি ষ য় ভা০ ০০০ ব না ল ই য়া যা০ ০০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| ধা পা } I { ধা -া পা | মা মগা | মগরা সা I রা -পা মা | পা -া |
ব না তু ০ চ্ছ সু খ০ দু০ খ প ০ ড়ে থা ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| -া -া } I রা মা মা | মধা পা | মা পা I ধা র্সা র্সা | ধা পা |
০ ক্‌ ভ বে র নি শী থি নী ঘি রি বে ঘ ন

২ ০ ১ ২ ০ ১
| মা মজ্ঞা I { জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা | রা -া | সা সা I রা -পা মা | পা -া |
ঘো রে০ ত খ ন কা র্‌ মু খ চা ০ হি বে ০

২ ০ ১ ২ ০ ১
| -মা -জ্ঞা } I { মা পা পনা | না না | না নর্সা I র্সা র্সা র্রা | না -া |
০ ০ সা ধে র০ ধ ন জ ন০ দি য়ে, বি স ০

২ ০ ১ ২ ০
| র্সা র্সা } I র্সা র্রা র্সা | ণা ণধা | পধা পা I মপা -ণধা পা |
র্জ ন কি সে র আ শে০ প্রা০ ণ রা০ ০০ খি

১ ২
| মরা -মজ্ঞরা | -সরা -া II II
বে০ ০০০ ০০ ০

৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

জীবনোৎসর্গ।

(গান)

(শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)

চিরভক্ত অনুরক্ত দাস আমায় করহ,
তোমা ভক্তি মম হৃদে সদা জাগায়ে রাখহ ;
তোমার সেবাতে
জীবন কাটাতে—
পুলকিত চিতে
উৎসর্গ করিতে
প্রভু তুমি সখা তুমি নিত্য আমারে শিখিও ;
যেন নিত্যকাল
বাসনার জাল
কাটি', বিশ্বজনে
সেবা বিতরণে
অবিশ্রাম থাকি রত—এই মম মতি দিও।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক বিবরণ।

৭ই পৌষের পুণ্য দিবস পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের দিন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এক ব্রহ্মের অনুসন্ধিৎসু কয়েকজন তরুণ যুবক নূতন অনুপ্রেরণার সহিত ব্যগ্র হৃদয়ে ৭ই পৌষের শুভ্র প্রাতঃকালে শুদ্ধস্নাত হইয়া একযোগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তন্মধ্যে মহর্ষিদেবই অগ্রগামী।

কালে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ-অঙ্কুর তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহীরূহে পরিণত হয়। সেইজন্য এই পুণ্য দিবসকে স্মরণীয় করিবার জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমে গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ উৎসব হইয়া থাকে।

গত ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চবিংশতি উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীতাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা পরিচালনা করেন। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনার পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্র ও অতিথি সজ্জনগণ গান করিতে করিতে মহর্ষিদেবের প্রিয়স্থান ছাতিমতলায় বেদীর চতুঃপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে একটি মেলার অধিবেশন হয়। এই মেলায় এতদঞ্চলের যাবতীয় লোক যোগদান করে। বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র এই একটি মেলাই হইয়া থাকে।

রাত্রে উপাসনার পর সাধারণের আমোদের জন্য বাজি পুড়ানো হয়, এবং মেলার সঙ্গে সঙ্গে এক পালা যাত্রাও হইয়া থাকে।

এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানীয় মহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালের উপাসনায় কলিকাতা হইতে আগত অতিথিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কয়েক জন অতিথি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। জনসাধারণের জন্য এই উৎসবটি বিশেষ করিয়া করা হয়। স্থানীয় এবং দূরাগত লোক জন এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবকে সার্থকতা দান করে।

আমাদের এই আশ্রমবিদ্যালয় ৭ই পৌষের পবিত্র দিনে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বৎসরে আজ পদার্পণ করিল। বাঙ্গালা সনের ১৩০৮ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর হইল এই শান্তিনিকেতনে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহার স্থাপয়িতা স্বয়ং মহর্ষিদেব। এইখানে আশ্রম স্থাপন একটা দৈবের ব্যাপার বলিলেও হয়। সুরুলের নিকটস্থ রায়পুরের সিংহ-পরিবারের সহিত মহর্ষিদেবের বন্ধুতা ছিল ; একদিন বোলপুর হইতে তাঁহাদের ভবনে নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য যাইবার কালে পথে কিয়ৎকালের জন্য তিনি এই তৃণশূন্য প্রান্তরে ঐ সপ্তপর্ণ তরুতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কি অনুভব করিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না—তবে এই স্থানটিই তাঁহার সাধনার স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। এখানে তাহার পর তিনি কতবার তাঁবু ফেলিয়া বাস করিয়াছেন, পরে এই মরুভূমিতে বাগান হইল—বাসের জন্য অট্টালিকা উঠিল—তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আত্মার শান্তিদাতা"র পূজার জন্য কাঁচের মনোরম মন্দির নির্ম্মিত হইল।

তাহার পর ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল—এই মরুভূমির মধ্যস্থিত মরূদ্যানে একদিন একটি শতদল ফুটিবে সে আশা বাহিরের লোকে না করিলেও মহর্ষিদেব তাঁহার প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই ইহার সার্থক রূপটির আভাস পাইয়াছিলেন—তাঁর সেই আশা পূর্ণ করিলেন আমাদের আচার্য্যদেব রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও ১৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

তাহার ব্যাপক আলোচনার স্থান ইহা নহে। আমরা কেবলমাত্র গত বৎসরের কথা এখানে উত্থাপিত করিব।

গত বৎসরের আশ্রমের ইতিহাসটুকু আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বৎসরের প্রারম্ভে আমরা যে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলাম তাহারই কথা মনে হয়। সেটি আমাদের প্রিয় শিশুছাত্র যাদবচন্দ্রের মৃত্যু। প্রিয়দর্শন বালক তাহার স্বল্পকালের আশ্রমবাসেই সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মেধা ও সুবুদ্ধি দেখিয়া তাহার অধ্যাপকগণ মুগ্ধ হইতেন—তাহার কর্ম্মতৎপরতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার সহপাঠিগণ আনন্দিত হইতেন। আজ তাহার অভাব তাহার ছাত্রবন্ধু ও অধ্যাপকগণ সমভাবে অনুভব করিতেছেন।

আশ্রমের বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ১৪৯। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা কমিয়াছে। ১৩২০ সালে ৭ই পৌষ তারিখে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮৭। ১৩২১ সালে উহা নামিয়া ১৬৭ হয় এবং ১৩২২ সালে ১৪৯ দাঁড়াইয়াছে।

এই ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ গতবার আমরা ছাত্রগ্রহণ-সম্বন্ধে খুবই কড়াকড়ি করিয়াছিলাম এবং একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বিদ্যার্থীকে গ্রহণ করি নাই। তাছাড়া গত বৎসর বঙ্গদেশের নানা-স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বহু সমৃদ্ধ গ্রাম জনপদে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে তদ্দেশীয় অধিবাসীরা এখনো মুক্তি পায় নাই। সুতরাং সেদিক হইতে নূতন ছাত্রের প্রবেশলাভ হয় নাই।

বর্ত্তমানে যে ১৪৯ জন ছাত্র আছে তন্মধ্যে ১৫ জন ১ বৎসর, ৩৬ জন ২ দুই বৎসর, ২১ জন তিন বৎসর ও ২৩ জন ৪ চারি বৎসর আশ্রমে বাস করিতেছে। এই ৯৫ জন ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৪ জন ৪ বৎসরের অধিক কাল আশ্রমে বাস করিতেছে তন্মধ্যে কয়েকজন ৮।১০ বৎসরও আছে।

আমাদের পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে আজ এই বার্ষিক উৎসবে সকলে যে যোগদান করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, তবুও আজ আমরা তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি আর যাঁহারা আজ সুদূর দেশে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি। শ্রীমান্ কাশীনাথ দেবল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্করশিল্প শিক্ষা করিয়া গত আশ্বিন মাসে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; শ্রীমান্ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা গত বৎসরের ইয়াঙ্কিস্থানের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ সিংহ এখনো গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন—তাঁহার পাঠ এখনো সাঙ্গ হয় নাই। শ্রীমান্ সুর কুমার সেনও সেইখানে অধ্যয়ন করিতেছেন। শ্রীমান্ অরবিন্দমোহন বসু এক্ষণে জার্ম্মানীর হাইডিলবার্গে পাঠ করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাইয়া অচিরে বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুন ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা। গত বৎসর শ্রীপ্রমোদকুমার রায় ও শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপী অশান্তির দিনে তাঁহারা সকলে সুস্থদেহে ও সবলমনে দিনাতিপাত করিয়া জ্ঞানবান হউন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

অন্যান্য কৃতবিদ্য পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন গত বৎসর St. Stephens College এর ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে ও শ্রীসুজিত কুমার চক্রবর্ত্তী পাটনার বেহার ন্যাশনাল কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ, শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বি, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন।

তৎপরে যে সকল অধ্যাপক প্রাণপণ করিয়া আশ্রম বিদ্যালয়ের সেবা করিয়া এক্ষণে নানা অনিবার্য্য কারণে আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই বিশেষ দিনে স্মরণ করিতেছি। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় নয় বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করিয়া গত বৈশাখ মাসে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ আইচ মহাশয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩।৪ বৎসর পরেই আশ্রমকার্য্যে যোগদান করিয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অনন্যমনে আশ্রমের সেবা করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনিও শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিনোদবিহারী রায় শ্রীযুক্ত মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় এমবি, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বর্দ্ধন, শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, আশ্রম হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে নিম্নলিখিত নূতন অধ্যাপক ও সেবক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন—যথা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এসসি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ বি, এসসি গণিত-অধ্যাপনার জন্য; শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী চিকিৎসালয়ের কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত বৎসর শিক্ষকদিগকে সপরিবারে বাস করিবার জন্য গৃহ দেওয়া হইয়াছে। এখন শিক্ষকদের কেহ কেহ সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেছেন।

শিক্ষা বিভাগ—

গত বৎসর শ্রীযুক্ত আচার্য্যদেব বহু দিন ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়া বালকগণের পাঠাভ্যাস দেখিয়াছেন, আদর্শ পাঠপ্রণালী দেখাইয়াছেন। গত বৎসর শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বি, এ, ইংরাজী শিক্ষার পরিচালক, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম, এ, বাংলা শিক্ষার, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ সংস্কৃত ভাষার, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় গণিতে, শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ ঘোষ এম, এ, বি, টি, ইতিহাসের, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভূগোলের পরিচালক ছিলেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার বিজ্ঞানের পারদর্শক ছিলেন। আগামী বৎসরেও ইহার কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আশ্রমের সকল প্রকার কার্য্য করিবার জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। এই ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ সভ্য ছিলেন—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আগামী বৎসরের জন্য তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

মহাশয় দীর্ঘ চারি বৎসর কাল সর্ব্বাধ্যক্ষতার কার্য্য সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আগামী বৎসর হইতে অবসর লইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আদ্য বিভাগের অধ্যক্ষতা গত বৎসর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল. আগামী বৎসর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় উক্ত কর্ম্মের জন্য মনোনীত, মধ্যবিভাগে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ও শিশুবিভাগে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

বহুকাল হইতে দেখা যাইতেছিল যে, আশ্রমের নানাবিধ কার্য্য এতই জটিল ও বিচিত্র আকার ধারণ করিতেছে যে সেগুলি অধ্যাপন-কার্য্য করিয়া অধ্যাপকগণের পক্ষে সুচারুরূপে করা দুঃসাধ্য। এই জন্য একজন পরিদর্শকের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়কে শিশুবিভাগ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রন্ধনাদি ও পাকশালার কার্য্য পরিদর্শন, দুগ্ধ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য, ভাণ্ডারাদি পরিদর্শনের জন্য দুই জন করিয়া ছাত্র প্রতিদিন এই সকল কার্য্য তদারক করিয়াছিল এবং মাসে মাসে হাটেও গিয়াছিল।

গত বৎসর পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত করমচাঁদ মোহনচাঁদ গাঁন্ধি মহাশয়ের দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রমে বাস করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ত্রিশ ছিল। এই কর্ম্মনিপুণ শ্রমশীল বিদ্যার্থীগণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে আমাদের ছাত্রেরা পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাঁহাদিগের দেখাদেখি নানা সদনুষ্ঠানে ইহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

গত ফাল্গুন মাসে গাঁন্ধি মহাশয় বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া তাঁহার জীবন্ত প্রাণের আবেগ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। আমরা সেই আবেগের প্রেরণায় একটা অসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। গাঁন্ধি মহাশয় তাঁহার ছাত্রদিগকে যে শিক্ষাদানে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতেছিলেন, সেই শিক্ষার খানিকটা আমাদের মধ্যে সৃজন করা যায় কিনা, তাহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পাচক-ভৃত্যগণকে বিদায় দিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ স্বহস্তে সকল কর্ম্ম করিতে রত হইলেন। দুই মাস কাল এই কার্য্য চলিয়াছিল কিন্তু নানা দিকের নানা বাধাতে এবং অভিভাবকগণের ঘোর আপত্তিতে এই অসম্ভবনীয় অনুষ্ঠান অঙ্কুরে লুপ্ত হইল। কিন্তু এই দুই মাসে বালকগণ পুঁথির পড়া ক্ষতি করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার দাম যে অনেক সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

গত বৎসরে আশ্রমে যে সকল সম্ভ্রান্ত অতিথির সমাগম হইয়াছিল—তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গদেশের সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলই প্রধান। গত চৈত্র মাসে তিনি সস্ত্রীক ও অপর রাজকর্ম্মচারিসহ আসিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের শুভ আগমন ব্যতীত আরও কয়েক জন ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীর আগমন উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, জজ সাহেব, বর্দ্ধমান বিভাগের School Inspecter Mr. Durn, ঢাকার Training College এর অধ্যক্ষ বিস্ সাহেব, মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে শিক্ষা দান কার্য্যের জন্য ভার প্রাপ্ত সহকারী Inspector টেলর সাহেব আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ডাঃ ল্যাঙ্কাষ্টার মিঃ রবার্টসন মিসেস আর্ণল্ড্ প্রভৃতি কয়েক জন বিদেশীয় অতিথি আসিয়াছিলেন।

আমাদের স্বদেশবাসী যে সকল সজ্জন আশ্রমে কিছুকাল বাস করিয়া ইহার মঙ্গলবিধানের জন্য সাধ্যমত সেবা ও সাহায্য করিয়া এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের নাম এইখানে কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতেছি। মহারাষ্ট্র দেশীয় দত্তাত্রেয় ব্রহ্মচারী, চিন্তামণি শাস্ত্রী, ও তামিল দেশ হইতে রাজাম মহাশয়, দ্রাবিড় স্থান হইতে নাইডু ও সুব্বারাও মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতাত পশ্চিমাঞ্চলের লালুভাই সমলদাস নামক জনৈক ধনী আগমন করেন, এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আশ্রমে আসিয়াছিলেন।

গত বৎসরের সেবাভাণ্ডার হইতে পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ তহবিলে টাকা ও কাপড় প্রেরণ করা হইয়াছিল। এজন্য আবার আমাদের বন্ধু ও সহযোগী অধ্যাপক মিঃ পিয়ার্সন সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন সাহেব আজ সুদূরে ভারতের উৎপীড়িত নরনারীর সাহায্য বিধানকল্পে গমন করিয়াছেন—তাঁহাদের দীর্ঘপ্রবাসের দিনগুলি নিরাপদে ও আনন্দে অতিবাহিত হউক ও তাঁহারা আমাদের যে লাঞ্ছনা ও অপমানকে দূর করিবার জন্য গিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা সার্থকমনোরথ হউন ইহাই শুধু আমাদের প্রার্থনা নয়, এই কোটি কোটি দেশবাসীরও ইহাই নীরব প্রার্থনা।

আশ্রমের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই ছিল, তবে গত বৎসরের প্রথমভাগে যে জলবসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর হইতে প্রায় তিন মাস লাগিয়াছিল।

আশ্রমে যে গোশালা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ব্যয়ভার বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কতকগুলি গাভী রাখিয়া অবশিষ্ট গোমহিষাদি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে গ্রাম হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সরবরাহ হইতেছে। সন্তোষ বাবুর গোশালা হইতেও দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে।

ষড়শীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে ভক্তজনের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
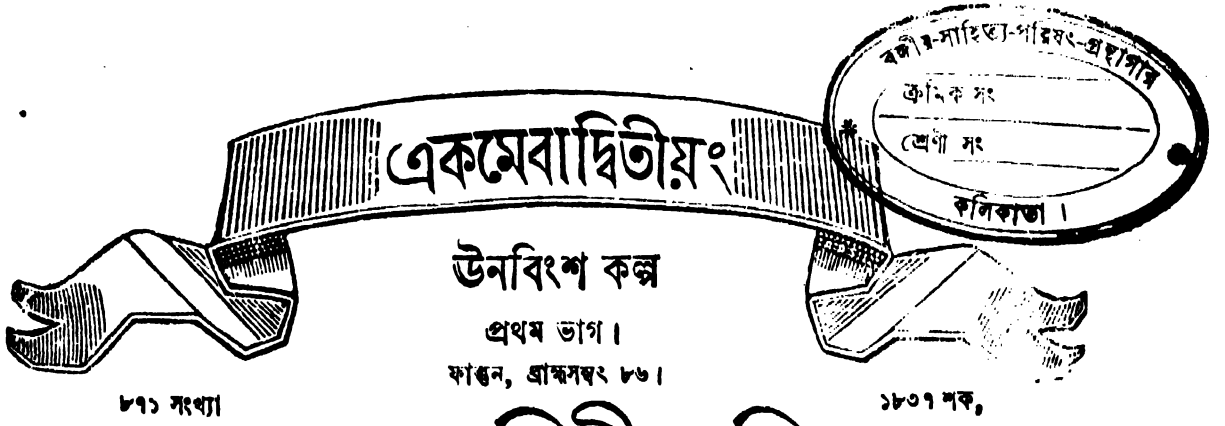
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ভক্ত।

কোন চিহ্ন রাখে নাই তব ভক্ত বলে'—
যাহা কিছু করে কাজ শুধু ভক্তিবলে;
নাহি চায় বুদ্ধি বিদ্যা, নাহি ধনরাশি,
নাহি চায় লোকবল, নাহি দাস দাসী;
প্রীতিপুষ্পডালি দিয়ে তোমারেই পূজে;
নিভৃতে বসিয়া শুধু তোমারেই খুঁজে।
দিবারাতি যদিও সে পায়ে পড়ে থাকে,
জানিতে পারে না কেহ আড়ালে সে ডাকে;
কভু বা সে বসে' থাকে দুটি চক্ষু মুদে'—
প্রস্তর-মূরতি যেন রাখিয়াছে কুঁদে'।
তোমারে সে বারবার করে নমোনম—
তুমি তার অন্তরের দূর কর তম।
ঈশ্বর কভু না যান ভক্ত হ'তে দূরে;
ভক্ত সাথে ভগবান বাঁধা এক সুরে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা।

(২) মণ্ডলীর গঠনপ্রণালী।

মণ্ডলীর প্রথম শ্রেণী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এবং উপনয়ন ও জাতিভেদ প্রথা।

আদিসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হওয়া যাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব, তাঁহাদিগকে আমরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহি। প্রথম শ্রেণী হইতেছেন যাঁহারা আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে গৃহ্য অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রধানতঃ মহর্ষিদেবের পরিবার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাহা যে উক্ত পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তি কর্ত্তৃক একেবারেই গৃহীত হয় নাই তাহা নহে। এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে প্রচলিত প্রথামত জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উপবীত প্রথা রক্ষিত হইয়াছে। মতে (theoretically) আদিসমাজ প্রচলিত জাতিভেদপ্রথার বিরোধী হইলেও কার্য্যত তাহাকে ঐ দুইটী প্রথা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কেশব বাবুর পক্ষপাতী মণ্ডলী আদিসমাজের মূলমন্ত্রের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া অতিমাত্র ত্বরা সহকারে যদি জাতিভেদ উঠাইবার কল্পনা হৃদয়ে স্থান না দিতেন এবং সেই সূত্রে যদি civil marriage সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া ব্রাহ্মসমাজকে সাম্প্রদায়িকতার একটী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথা উঠাইবার পথ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত ও নিরীশ্বর আইন বিধিবদ্ধ করাইবার কারণে আদিসমাজের সম্মুখে একটী সমস্যা উপস্থিত হইল—উক্ত নিরীশ্বর বিবাহের অধীনে গিয়া নূতন একটী সম্প্রদায় সংগঠিত করিবে, অথবা প্রচলিত উপনয়ন ও জাতিভেদপ্রথা রক্ষা করিয়া সুবৃহৎ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত থাকিয়া তাহার প্রচলিত

প্রথাসমূহের দোষ সংশোধনে যত্নবান হইবে—প্রচলিত উপনয়ন ও জাতিভেদপ্রথা রক্ষা না করিলে হিন্দু-বিবাহের এবং সুতরাং আদিসমাজেরও বিবাহের বৈধতা বর্ত্তমান অবস্থায় স্বীকৃত হইতে পারিত না। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রমতে আহার ব্যবহারের কথা বলিয়া এবং আমৃত্যু উপবীত ধারণ করিয়া যে মূলমন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই মূলমন্ত্র অনুসরণ করিয়া আদিসমাজ নিরীশ্বর বিবাহের অধীনে নূতন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইবার অপেক্ষা প্রাচীনতম সুবৃহৎ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া উপরোক্ত দুইটী প্রচলিত প্রথা রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিল—আশা রহিল এই যে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে ভিতর হইতে তাহার প্রথাগুলির দোষসংশোধন সহজ হইবে। আপাতত হিন্দু ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক আদিসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বলিয়া হিন্দু অনুষ্ঠানপদ্ধতিকেই সংস্কৃত করিয়া এবং উহা হইতে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে হিন্দু পদ্ধতির মূল বিষয়গুলি সম্পূর্ণই রক্ষিত হইয়াছে। যে সকল হিন্দুসন্তান আদিসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া গৃহ্য অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাদিগকে আপাতত ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও জাতিভেদ এই দুইটী প্রথা কার্য্যত স্বীকার করিতেই হইবে, এবং হয় তাঁহাদিগকে আদিসমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে গৃহ্য অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে হইবে, অথবা তাঁহাদিগের নিজের নিজের পরিবারে প্রচলিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে করিলেও চলিবে—কেবল তাহা হইতে মূর্ত্তিপূজার অংশ বাদ দিয়া তাহার স্থলে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যদি অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি আদিসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহেন, তবে তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হইতে মূর্ত্তিপূজার অংশ বাদ দিয়া করিলেই আদিসমাজের মূলমন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। মণ্ডলীর মধ্যে এই সকল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগেরই অধিকার অধিকতর থাকা উচিত, কারণ তাঁহারা আদিসমাজের সুবিধা অসুবিধার কথা যেরূপ উপলব্ধি করিবেন, আদিসমাজের ভালমন্দের বিষয়ে তাঁহাদিগের যেরূপ মনোযোগ পড়িবে, মণ্ডলীর অপর কোন শ্রেণীর সভ্য সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না অথবা তাঁহার মনোযোগও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের ন্যায় আকৃষ্ট হইবে না।

মণ্ডলীর দ্বিতীয় শ্রেণী।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের পর অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলেও যাঁহারা সমাজের আচার্য্য পুরোহিত প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রস্তাবিত মণ্ডলীর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ধরিব। সমাজচ্যুতির ভয় প্রভৃতি নানা কারণে ইহাঁরা গৃহ্য অনুষ্ঠান সকল অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলেও স্বীয় সমাজ কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। আমরা জানি যে সমাজের বেদীতে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করা এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগকে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করাইবার জন্যও ইহাঁদিগকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় এবং অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। ইহাঁদিগের হৃদয়দৌর্ব্বল্য মার্জ্জনীয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে অনুষ্ঠানাদি জনসাধারণের মনোগ্রাহী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে ইহাঁদিগের নিকটে সুপরামর্শ পাওয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা।

মণ্ডলীর তৃতীয় শ্রেণী।

সমাজের নিয়মিত উপাসক এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকদিগকে লইয়া মণ্ডলীর তৃতীয় শ্রেণী গঠিত করিতে হইবে। ইহা ধরা যাইতে পারে যে আদিসমাজের মূলমন্ত্রের সহিত এই তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তবে, নানা কারণে তাঁহারা অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অক্ষম এবং তাঁহারা হয় সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ অথবা যে কারণেই হউক সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে কোন অধিকার পান নাই। আদিসমাজের কি উপায়ে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারা যায় সে বিষয়ে ইহাঁদিগের নিকটে উৎসাহ ও উপদেশ লাভের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্যলাভের সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

মণ্ডলীর চতুর্থশ্রেণী।

মণ্ডলীর চতুর্থ শ্রেণীর সভ্য ধরিব প্রধানত হিন্দুসমাজের এবং অবান্তর ভাবে প্রত্যেক জাতির যে কোন ব্যক্তি জগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বহিতা পরমপুরুষে শ্রদ্ধাবান। এইরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি

সাকারবাদী বা নিরাকারবাদী হউন, একেশ্বরবাদী বা বহু ঈশ্বরবাদী হউন অথবা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন, তাঁহাকে মণ্ডলীভুক্ত করিতে কোনই আপত্তি উঠিতে পারে না। আমাদিগের আশা এই যে চতুর্থ শ্রেণীর সভ্যগণ মণ্ডলীভুক্ত থাকিতে থাকিতেই ক্রমে আদিসমাজের মূলমন্ত্রের পক্ষপাতী হইবেন। অপর দিকে আদিসমাজও এই সকল সভ্যদিগের নিকটে সমাজ ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত অবগত হইয়া নিজের দোষগুণ যথাদৃষ্টিতে আলোচনা করিতে পারিবে।

আপাতত তিন শ্রেণীতে মণ্ডলীগঠন।

আপাতত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোক লইয়াই মণ্ডলী সংগঠিত করিতে হইবে। চতুর্থ শ্রেণীর লোকদিগকে কি ভাবে মণ্ডলীভুক্ত করা হইবে তাহা যথাসময়ে মণ্ডলীই বিবেচনা করিতে পারিবে। প্রথম তিন শ্রেণীর সভ্য লইয়া মণ্ডলীর কার্য্যপ্রণালী কি ভাবে পরিচালিত হইতে পারে আমরা নিম্নে সেই বিষয়ে দুইচারিটী ইঙ্গিতমাত্র করিব। বলা বাহুল্য যে কার্য্যনির্ব্বাহকালে সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া মণ্ডলী যথাযুক্ত কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বৎসরে দুইবার সাধারণ সভা।

মাঘোৎসবের সময়ে একবার এবং বৈশাখ মাসে একবার, অন্তত এই দুইবার মণ্ডলীর সাধারণ সভা আহ্বান করা উচিত। মাঘোৎসবের সভায় সম্মুখবর্ত্তী প্রতি বৎসরের জন্য একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিতে হইবে। তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপনকাল অবধি এইরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অধ্যক্ষসভা বলা হইত, আমরাও তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অধ্যক্ষসভা বলিয়াই উল্লেখ করিব। বৈশাখের সভায় বিগত বর্ষের কার্য্যাবলী আলোচিত হইবে।

অধ্যক্ষসভা সংগঠন।

অধ্যক্ষসভা ৭ জন, ৯ জন বা ১১ জনে সংগঠিত করিলে ভাল হয়। অধিক লোকের দ্বারা গঠিত হইলে নানা বিষয়ের আলোচনা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। ৭ জনে অধ্যক্ষসভা গঠিত হইলে ৩ জন প্রথম শ্রেণীর, ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ৩ জন তৃতীয় শ্রেণীর হওয়া উচিত। সেইরূপ ৯ জন হইলে ৪ জন প্রথম, ১ জন দ্বিতীয় এবং ৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর হওয়া উচিত; ১১ জন হইলে ৫ জন প্রথম, ১ জন দ্বিতীয় এবং ৫ জন তৃতীয় শ্রেণী হইতে লইতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে একজন মাত্র সভ্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে উক্ত শ্রেণীতে স্বভাবতই অল্প সংখ্যক লোক থাকিবেন।

আচার্য্য নির্ব্বাচন।

অধ্যক্ষসভার এবং তাহার অধীনে সম্পাদকের আচার্য্য নির্ব্বাচন এবং সমাজসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অধ্যক্ষসভা আচার্য্য নির্ব্বাচিত করিয়া সাধারণ মণ্ডলীর নিকটে মত গ্রহণ করিবেন। যদি মণ্ডলীর তিন চতুর্থ অংশ উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মত প্রদান করে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে আচার্য্য পদে নিযুক্ত করা হইবে না। যদি তদপেক্ষা ন্যূন অংশ উক্ত নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে ট্রষ্টীগণের মত হইলে নির্ব্বাচন গ্রাহ্য হইবে। এক বৎসরের মধ্যে কোন আচার্য্যকে স্বীয় পদ হইতে সরাইতে হইলে মণ্ডলীর বিশেষ অধিবেশনে সে বিষয়ের একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ট্রষ্টীগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে। নির্ব্বাচিত আচার্য্য কোন দোষে দোষী না হইলে যাবজ্জীবন আচার্য্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, এই দুই জনকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সহকারী যে কোন শ্রেণীর সভ্যমণ্ডলী হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ট্রষ্টীদিগের ক্ষমতা।

বলা বাহুল্য যে ট্রষ্টীগণ যদি অধ্যক্ষসভা বা মণ্ডলীর কোন কার্য্যে আদিসমাজের অনিষ্টকর অথবা তাহার মূলমন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী কোন কার্য্য ঘটিতে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন। এক কথায়, আদিসমাজ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ট্রষ্টীদিগের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা আছে এবং সুতরাং আদিসমাজের অনিষ্টকর প্রভৃতি কার্য্যে যে তাঁহাদিগের প্রতিরোধক ক্ষমতা (Vetoing power) আছে তাহা বলা বাহুল্য। ট্রষ্টীদিগের

এইরূপ ক্ষমতা থাকার উপকারিতা এই যে যুবক ব্রাহ্মগণ নবীন উৎসাহে নূতন তেজে কাজ করিতে গিয়া আদিসমাজের নামে হঠকারিতার সহিত কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।

পুরোহিত নিয়োগ।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতেই সমাজের পুরোহিত নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়। তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইলে অনমুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্যে সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা উচিত। আদিসমাজের পদ্ধতির অনুযায়ী উপনয়ন এবং বিবাহ প্রভৃতির বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে আমরা পুরোহিত পদে ব্রাহ্মণ নিয়োগের কথা ইঙ্গিত করিলাম। যিনি আদি-সমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠান করিতে চাহিবেন তাঁহার সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করানো পুরো-হিতের প্রধান কার্য্য হইবে। তাহা ব্যতীত, তিনি মণ্ডলীর সভ্যগণের বাটীতে বাটীতে যাইয়া যাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হয় সেই বিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাঁহাদিগের বাটীতে উপাসনাদি কার্য্য করিবেন, এবং রোগ প্রভৃতির সময়ে নিজেও যথাসাধ্য সাহায্য করি-বেন এবং রোগীর যথাযথ সেবাব্যবস্থার বিধান করি-বারও চেষ্টা করিবেন।

চাঁদার কথা।

মণ্ডলীর প্রতি সভ্যকে কিছু না কিছু চাঁদা দিতে হইবে—অন্তত দেওয়া উচিত। বিনা অর্থে সংসারে কোন বৃহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। অর্থের শক্তি কে অস্বীকার করিবে? আমরা ইহাও জানি যে বর্ত্তমানে অনেক পরিবারেই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক এবং সেই কারণে চাঁদার কথা বলিলে হয়তো অনেকে মণ্ডলীভুক্ত হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন। অনেকের এইরূপ পশ্চাৎপদ হইবার ভয় সত্ত্বেও আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে প্রত্যেক সভ্যের কিছু-না-কিছু চাঁদা দেওয়া নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, তাহাতে সমাজের এবং ব্যক্তিগত ভাবে মণ্ডলীভুক্ত প্রতি সভ্যের মঙ্গলই হইবে। সেই চাঁদার অর্থ হইতে প্রয়োজনমত মণ্ডলীর সভ্যদিগের কত-প্রকারে সাহায্য করা যাইতে পারে; এই কথা ভাবিয়া দেখিলেই আশা করি কেহই চাঁদা দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। একথা অবশ্য স্বীকার করি যে চাঁদার পরিমাণ এরূপ অল্প হওয়া উচিত যে, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি সহস্র ব্যয়শীল বা ঋণ-গ্রস্ত হইলেও হাসিয়া খেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, প্রত্যেকের আয়ের উপর প্রতি টাকায় অর্দ্ধ পয়সা মাত্র নিম্নতম দেয় চাঁদা ধরিলে কেহই অসঙ্গত বলিতে পারিবেন না। এইটী আমরা ইঙ্গিতমাত্র করিলাম। যদি মণ্ডলীর বিবেচনায় তদপেক্ষা ন্যূন চাঁদা নির্দ্দিষ্ট করা উচিত হয় তবে তাহাই ধরা যাইবে। কিন্তু আমরা বারম্বার বলিব যে প্রত্যেক সভ্যের কিছু-না-কিছু চাঁদা দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

ব্রাহ্মদিগের আহার বিহার।

আদিসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্যদিগকে বাহিরের লোকে অনুষ্ঠান ব্যতীত আহার প্রভৃতি বিষয়েও নানা প্রশ্ন করেন। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা ইহা বলিতে পারি যে ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে, তেমনি আহারের বিষয়েও সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মভাবে ও বিস্তৃতভাবে কোন্ বস্তু খাদ্য এবং কোন্ বস্তু অখাদ্য তাহা লিখিত নাই; মোটের উপর এই কথা বলা আছে যে, যে খাদ্য শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাহাই আহারের উপযুক্ত। আর, ইহাই বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় মত। গীতাতেও এই ভাবেরই সমর্থনে উক্ত হইয়াছে যে "আয়ু, সত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-বিবর্দ্ধক আহারই সাত্বিকদিগের প্রিয়—

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥

আহারাদি বিষয়ে এরূপ উদারতার পরিবর্ত্তে কঠোর-তর বন্ধন দিতে গেলে তাহা হইতে মুক্তিলাভের দিকে যে উন্নতিমুখী সমাজের স্বাভাবিক গতি হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

মণ্ডলীভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান।

উপরে আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আমাদের বিশ্বাস যে ইহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হইবে যে, আদিসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইবার পক্ষে সত্যসত্য কাহারও কোনই বাধা নাই। এখন ধর্ম্মবিষয়ে একটা জাগরণের ভাব আসিয়াছে। এই জাগরণের সময় অবহেলায় কাহারও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। এই সময়ে যিনি নিজের হৃদয়কে ধর্ম্মের দিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিবেন, তিনিই তাহার

আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিবেন। হৃদয়কে ধর্ম্মের দিকে উন্মুক্ত করিবার পক্ষে ধর্ম্মমণ্ডলী একটী পরম সহায়। এই কারণে পুরী ভারতী পরমহংস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও স্ব স্ব ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে থাকিতে চাহেন—তাহাতে তাঁহারা ভজন-সাধনের পক্ষে অত্যন্ত সহায়তা প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তার জন্য যদি একটী ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রয়োজন হয় তবে আদিব্রাহ্মসমাজের উদারতম অথচ বর্ত্তমান কালের সর্ব্বথা উপযোগী ভিত্তির উপরে গ্রথিত ধর্ম্মমণ্ডলী ছাড়িয়া আর কোন্ ধর্ম্ম-মণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমরা দৌড়াইব? সত্যসত্যই দেশের মঙ্গলের জন্য, প্রতি ভারত-বাসীর মঙ্গলের জন্য আমরা ভারতবাসীমাত্রকেই আদিসমাজের মণ্ডলীভুক্ত হইতে অনুরোধ করি।

ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি এবং যিনি ভারতের ও জগতের প্রয়োজন জানিয়া ব্রাহ্মসমাজকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে এই মণ্ডলীগঠনে ও তাহার কর্ম্মসাধনে শুভবুদ্ধি ও সামর্থ্য প্রদান করুন।

মাঘোৎসবের উদ্বোধন। *

আমাদিগের সম্মুখে মাঘোৎসব উপস্থিত। যে মাঘোৎসবে দেবতারাও মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করেন, যে মাঘোৎসবে দেবমানব সকলে একপ্রাণে মিলিত হইয়া সমস্বরে সেই দেবদেব মহাদেবের জয়কীর্ত্তনে উদ্যুক্ত, আজ আমাদিগের সেই প্রিয়তম মাঘোৎসব সম্মুখে উপস্থিত। আমি তো ভাবিয়া আকুল হই-তেছি যে কি বলিয়া আমি সেই মাঘোৎসবে সাধু-সজ্জনদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিব। কি প্রকারে বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয় অগ্নিময় করিয়া তুলিব, কি প্রকারে তাঁহাদিগের গভীরতম অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিব, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি তো সেরূপ ভাষার বিন্যাস শিখি নাই। কেবল ভাষায় নহে, আমি জানি যে ধর্ম্মে জ্ঞানে ভাবে সকল বিষ-য়েই আমি অত্যন্ত দরিদ্র; ইহা এতটুকু অতিরঞ্জিত কথা নহে যে আমি কীটাণুকীটের ন্যায় অতীব অকি-ঞ্চন ব্যক্তি। যে ব্রহ্মাচক্রে অগণিত গ্রহতারকা, অগণিত সূর্য্যচন্দ্র নিত্যনিয়ত জীবন ও মৃত্যুর পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, যে বিশ্বজগতে কতশত মহা-জ্ঞানী ও মহাধার্ম্মিক জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেই অনন্তজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরম পুরুষের মহি-মার ইঙ্গিতমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি কি জানি না যে সেই ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের ভিতরে আমি কত ক্ষুদ্র। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নাই যে আমি আজ এই মহোৎসবের জন্য বন্ধুবান্ধবদিগকে উদ্বোধিত করিতে পারিব, জাগাইয়া তুলিতে পারিব—তাঁহা-দিগের প্রাণের ভিতরে তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিব।

আমার নিজের শক্তি নাই বটে, কিন্তু যিনি সেই অকিঞ্চনগুরু তাঁহার সে শক্তি আছে। যাঁহার শাসনে সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, যাঁহার শাসনে অহোরাত্র ঋতু সম্বৎসর সকল নিয়-মিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার চক্ষু হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রহরীস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। অনাদিকাল ও এই অনন্ত গগন যাঁহার মহিমাকীর্ত্তনে সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত, তাঁহার সে শক্তি আছে। আজ সেই পরমগুরুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমি পাপী-তাপী সাধু অসাধু সকলকেই এই মহোৎসবে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পঙ্গু যে সেও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সকল অতিক্রম করিতে পারে, যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মূক যে সেও বাগ্মিতা লাভ করিতে পারে, তাঁহারই শক্তিতে আমার শক্তি। এখন আমি দেখিতেছি যে আমি ক্ষুদ্র কীট নহি, আমি দরিদ্র নহি। আমি সেই অনন্তজগতের অধীশ্বরের কেবলমাত্র উত্তরাধিকারী নহি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আমি তাঁহারই অংশ। তাঁহা হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া ইহাও দেখিতেছি যে জগতের প্রত্যেক প্রাণ, প্রত্যেক মানবাত্মা তাঁহারই অংশ। আজ তাই আমি সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সহিত একপ্রাণ হইয়া গিরিনদী ভূধরসাগর জীব-

* বিগত ৮ই মাঘে আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

জন্য দেবমানব সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে এই মহোৎসবের মহান অবসরে সেই পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া লও। অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। এই মহোৎসবের সময় দুঃখ শোকের কথা, পাপতাপের কথা, নিরাশা নিরানন্দের কথা অবিশ্বাসের কথা সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাক; যাহা কিছু মলিনতা সমস্ত ছিন্ন কন্থার ন্যায় আজ পরিত্যাগ কর। প্রসন্নমুখে বিমল হৃদয়ে আনন্দের নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই আনন্দস্বরূপের উৎসবে উপস্থিত হও। এসো, সেই প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথকে এই মুহূর্ত্তেই ডাকিবার মত ডাকিতে আরম্ভ করি— এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগের হৃদয় নবোৎসাহে নৃত্য করিতে থাকিবে, আমরা এই মুহূর্ত্তেই নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইব।

এই মহোৎসবের দিনে ভগবানের করুণার উপর, তাঁহার মঙ্গলভাবের উপর অশ্রদ্ধাবান হইবার সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? আমরা যদি আমাদিগের জীবন ভালরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে তিনি আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে তাঁহার করুণার ছায়াতে কেমন সুন্দর পরিচালিত করিয়া চলিয়াছেন। আমরা এত ক্ষুদ্র, এত দীনদরিদ্র যে তাঁহার এত অযাচিত করুণাও অনুক্ষণ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা যে বাঁচিয়া আছি, আমরা যে কতশত প্রকারে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতেছি, এটা কি কম কথা? আমরা প্রণিধান পূর্ব্বক এ বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করি না বলিয়া, ইহার গুরুত্ব হৃদয়ে ঠিক অনুভব করিতে পারি না।

ছোটখাটো কৃপাকণা সকল আমরা নিত্যই এত পাইতেছি যে সেগুলি আর আমাদিগের দৃষ্টিতেই পড়ে না। সেগুলি ছাড়িয়া দিলেও বৃহৎ বৃহৎ যে সকল ঘটনায় তাঁহার কৃপা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি তাহারই বা সংখ্যা কত! আমরা আজ ইচ্ছা করিলেও সেগুলি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু যে ঘটনাতে আমরা আজ এই মহোৎসবের সময়ে তাঁহার করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সে বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কি নিরস্ত থাকা যায়? সে ঘটনাটী হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে আমরা তাঁহার করুণা, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইতেছি। যে সময়ে ভারতবর্ষ, ভারতের হিন্দু-সমাজ একটীর পর একটী করিয়া অগণ্য অসংখ্য পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের ও আত্মার স্বাধীনতা হারাইতে বসিয়াছিল এবং প্রকৃত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া মানবাত্মার স্বাধীনতার বীজ নবতররূপে প্রোথিত করিলেন। একবার ধ্যানচক্ষে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার দ্বারা কি মহান কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যে মানবাত্মার স্বাধীনতারূপ বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, আজ সেই বৃক্ষ হইতে দেশে বিদেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে কত বিভিন্ন আকারে শিকড় নামিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার আশ্রয়ের ভিতর আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

দয়াময় পরমেশ্বরের এত দিকে এত রকমে মঙ্গলভাবের শুভ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইলেও আমরা যুদ্ধ, নরহত্যা, দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য দেখাইয়া তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হই। ইহলোকে আমরা দেখিতে পাই যে পিতামাতা সন্তানের শিক্ষালাভের জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাহার শারীরিক প্রভৃতি কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে দেশে বিদেশে প্রেরণ করেন—তখন তো সে পিতামাতাকে আমরা নিষ্ঠুর বলি না, বরঞ্চ এরূপ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসাই করি। আর, আমাদিগকে যথাযুক্ত শিক্ষা দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য ভগবান যখন দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য যুদ্ধ মহামারী প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে যথোপযুক্ত স্থানসমূহে লইয়া যান, তখন তাহাতে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠুর প্রভৃতি অপবাদ প্রয়োগ করিব কেন? তাঁহার রাজ্য কি শুধু এই পৃথিবীটুকু? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডচরাচর যে তাঁহার রাজ্য। তিনি আমাদিগকে যেথানেই লইয়া যান না কেন, আমরা তো তাঁহারই রাজ্যে বাস করিতে থাকিব—তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া তো কোথায়ও যাইতে পারিব না। দুর্ভিক্ষদারিদ্র্যই বল, যুদ্ধ

মহামারীই বল, এ সকলের প্রতীকার সাধনে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কারণে যদি মৃত্যু আসে, তবে তাহাতে বিমূঢ় হইতে হইবে না। মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, দেখিবে যে মৃত্যু তোমা হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে।

মৃত্যুর বিভীষিকামূর্ত্তিতে কেনই বা আমরা ভীত হইব? যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় এবং যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব যে আমাদিগের অন্তরতম প্রাণসখা। সেই প্রাণেশ্বর একদিকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আবার তিনিই আমার মত সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত মানুষেরও সকল তাপ সকল ব্যথা স্বীয় কোমল হস্তে মুছাইয়া দিয়া আপনার সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লন। তাঁহার করুণার কথা আমি যে কি ভাষায় ব্যক্ত করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতেছি না। কোন্ ভাষায় যে আমার প্রাণেশ্বরের গুণগান করিলে হৃদয় সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিবে, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হয় যে আমার সকল কথা সকল ভাষা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হউক, কেবল তাঁহাকে প্রাণনাথ হৃদয়েশ বলিয়া ডাকিবার ভাষা আমার জিহ্বাগ্রে জাগ্রত থাকুক। বিপদ আপদে, মৃত্যুর নিকটে আমরা এত ভীত হই, কিন্তু একবার তাঁহাকে ডাকিবার মত ডাকিলেই দেখিব যে তিনি আমাদিগকে তাঁহার সূক্ষ্মতম অথচ অচ্ছেদ্যতম ভালবাসার বর্ম্মে কেমন করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। কাহার সাধ্য যে কেহ আমাদের একটী কেশগাছিও স্পর্শ করিতে পারে?

এমন প্রাণসখাকে আজ এই মহোৎসবের সম্মুখে সকলে মিলিতভাবে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার অবসর পরিত্যাগ করিও না।

হে প্রাণনাথ, তুমি আমাদিগের সর্ব্বস্ব লও, কিন্তু তুমি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিও না। তুমি যখন আমাদিগের চক্ষের অন্তরালে যাও, তখন চারিদিকে নানা বিভীষিকা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি। প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ—আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর—আমাদিগের আর যাহাই কর, তোমার সঙ্গে আমাদিগের নিত্য যোগ মুহূর্ত্ত-কালেরও জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে দিও না।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হইয়াছিল।

প্রাতঃকাল।

(১)

মন জাগো মঙ্গল লোকে
অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগন-ভরি জাগে সুন্দর
জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

(২)

মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা
হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী॥
আমার বীণাখানি পড়চে আজি
সবার চোখে।
হের তারগুলি তার দেখচে গুণে
সকল লোকে!
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে
আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে
করুণ রবে;—
যখন তুমি তারে বুকের পরে
লবে টানি।

(৩)

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে।
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয়মাঝে আসি লাগে।

রহি' রহি' মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবিরাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে
মোর পথের আগে॥

(৪)

নিশিদিন মোর পরাণে
প্রিয়তম মম কত না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে,
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি
প্রেমে প্রাণে গানে হায় থাকি আড়ালে।

(৫)

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলোনা আমারে ছড়ায়ে॥
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা
বাঁচাও তাঁহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

(৬)

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা
ধূলার ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

সায়ংকাল।

(১)

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগনতলে॥
তৃণের সারি তুল্‌চে মাথা
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥
সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?

(২)

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন পরে।
বাজে বলেই বাজাও তুমি
সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে
সকল সবে।

বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে।

(৩)

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে॥

(৪)

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেইত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেইত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষপেতে রয়েছে যেই গেহ
সেইত তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেইত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেইত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেইত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেইত আমার তুমি।

(৫)

মেঘ বলেছে যাব যাব ;
রাত বলেছে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমিত আর নাই।
দুঃখ বলে রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে ;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।
ভুবন বলে তোমার তরে
আছে বরণ মালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন তরী বাই॥

(৬)

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায় ?
আসুক নাকো গহন রাতি,
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস
মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্‌না তারার শোভা।
সাথী যারা আছে, তারা
তোমার আপন বলে’

ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বে রে ঝড় দুল্‌বেরে বুক্‌
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

(৭)

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচল খানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে
পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

কৃষিকর্ম্মের প্রণালী।

কৃতকার্য্যতার প্রথম মূল মন্ত্র—জমীর উপর ভালবাসা।

ভগবান আমাদের অন্তরে আমিত্ব বলিয়া একটি পদার্থ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই আমিত্বকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমরা সংসারে অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করি। কোন কিছুকে যদি আমরা নিজস্ব বলিয়া বুঝি, তখন তাহার প্রতি আমার একটা মায়ামমতা জন্মে। তখন তাহারও যাহাতে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় এবং আমারও হিতসাধনের পক্ষে তাহার যাহাতে উপযোগিতা জন্মে, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা হয়। ভক্তদিগের অহেতুকী প্রীতি ছাড়িয়া দিলে, সংসারের মায়ামমতা, সংসারের ভালবাসাকে নিতান্ত নিঃস্বার্থপর বলা যায় না—উহার ভিতরে অনেকটা স্বার্থ থাকে। তুমি আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তাই তোমাকে আমি ভালবাসি। একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রেমই প্রেমকে আকর্ষণ করে। তুমি যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই আমার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার কি প্রীতি থাকিতে পারে? সেইরূপ কৃষিকর্ম্মকে ভালবাসিতে হইবে। একদিকে আমাকে তাহার উন্নতিসাধনে যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে তাহাকে আমার হিতসাধনে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। এখন, কৃষিকর্ম্মকে ভালবাসিতে গেলে তাহার বিষয় জমীকে ভালবাসিতে হইবে। জমীকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেটুকু জমী আমার নিজস্ব বলিয়া জানিব, কৃষিকর্ম্মের সাহায্যে তাহারই উন্নতিসাধনে আমার সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা হইবে। তার পর যখন দেখিব যে সেই জমী হইতে আমার বেশ লাভ হইতেছে আমার ভরণ-পোষণ হইতেছে, তখন তাহার প্রতি আমার ভালবাসা গাঢ়তর আকার ধারণ করিবে, তাহার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনে স্বভাবতই আমার প্রবল ইচ্ছা হইবে। এইভাবে জমীকে ভালবাসিয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিলে যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা তাহা কাহাকেও বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তবেই দেখিতেছি যে কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার সর্ব্বপ্রধান মূলমন্ত্র জমীর উপর ভালবাসা।

কৃতকার্য্যতার দ্বিতীয় মূল মন্ত্র—শৃঙ্খলা।

কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতার দ্বিতীয় মূলমন্ত্র হইতেছে শৃঙ্খলা। ইহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে বিনা শৃঙ্খলায় কার্য্য করিলে তাহা সুনিষ্পন্ন হইবে না, আর শৃঙ্খলামত কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ হয়। ভগবানের সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় কারণ তাঁহার সকল কার্য্যেরই ভিতর একটা শৃঙ্খলা আছে—সমগ্র বিশ্বই শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। নেপোলিয়ন যে অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধে পদে

পদে জয়লাভ করিতেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপারে শৃঙ্খলার ত্রুটিহীনতা। আমাদের দেশের কৃষকেরাই বল বা অন্য কোন ব্যবসায়ীই বল, বিদেশীয়দিগের নিকটে পদে পদে পরাজিত হয় কেবল শৃঙ্খলার অভাবে। কৃষকগণ ধান ছড়াইয়া দিল, বৎসরান্তে কতকটা ধান পাইল, তাহাতেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তার পরে, দায়ে পড়িয়া বা ঘরে কিছু টাকা আনিবার লোভে পড়িয়া প্রায় সমস্ত ধানই সস্তাদরে বেচিয়া দিল, পরে মহাকষ্টে পড়িল। সমগ্র দেশে কত ধান হইয়াছে, নূতন বৎসরে ধানের মূল্য কিরূপ উঠিতে পারে, শৃঙ্খলার অভাবে তাহারা এ সকল বিষয়ের কোন তথ্যই রাখে নাই, কাজেই সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনা তাহাদের মস্তকে প্রবেশই করে না। অপরদিকে দেখ, বিদেশীয় বণিকগণ সমস্ত পৃথিবীর ধানের হিসাব রাখিবে, অনেক বৎসরের হিসাবের গড়পড়তা ধরিয়া নূতন বৎসরের জন্য সম্ভবপর একটা মূল্য স্থির করিবে এবং সেই মূল্যকে ভিত্তি করিয়া ধানের ক্রয়বিক্রয় করিবে। বিদেশীয় কৃষকেরা সুনিয়মে নিজের জমী চাষ করে, একটা ফসল হইয়া গেলেই তাহাতে নূতন করিয়া সার ভালরূপে দেয়, কেবলমাত্র অল্পস্বল্প গোময় ছড়াইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না, এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে জমীর প্রকর্ষসাধন করে। তাহারা অনেক বৎসরের ঝড়ের কালনিরূপক তালিকা, বৃষ্টির পরিমাণনিরূপক তালিকা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নের সহিত সংগোপনে রাখিয়া দেয়। এই সকল কারণে আমাদের কৃষকেরা বিদেশীয় কৃষকবণিকদিগের নিকটে পদে পদে পরাজিত হয়। ছোটখাটো বিদেশীয় বণিকেরা নিজে এই সকল তালিকা সংগ্রহ করিতে না পারিলেও স্বজাতীয় বড় বড় সওদাগরদিগের নিকটে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জানিবার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আমরা শুনিয়াছি যে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের ফলে অল্পদিন হইল একটি বিদেশীয় কোম্পানী তিসির খেলায় সমস্ত দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে পরাজিত করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কালের মধ্যে ন্যুনাধিক তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিল। শৃঙ্খলাই হইল জগতের সকল কার্য্যের ছন্দ। ছেলেরা সহজেই ছন্দ ধরিতে পারে, তাই তাহারা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কবিতা সর্ব্বাগ্রে কণ্ঠস্থ করিতে পারে। কাজকর্ম্মেরও ভিতরে যদি তাহাদিগকে শৃঙ্খলা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেগুলি তাহাদিগের সহজে আয়ত্ত হয়। এই কারণে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিবার কালে শৃঙ্খলা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষিকর্ম্মের তৃতীয় মূল মন্ত্র—অন্যোন্যসাহায্য।

কৃষিকর্ম্মের তৃতীয় মূলমন্ত্র হইতেছে অন্যোন্য সাহায্য। কৃষিকর্ম্ম একাকী সুসম্পন্ন করিতে পারা যায় না। কৃষিকর্ম্মে অপর পাঁচজনের সাহায্য অত্যন্ত আবশ্যক। যতই পাঁচজনের সাহায্য পাওয়া যাইবে, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম ততই সুসম্পন্ন হইবে। দিনরাত্র সমভাবে পরিশ্রম করিলেও কোন কৃষকই সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। কৃষকেরা স্বদেশীয়দিগের নিকটেই এই সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে, বিদেশীয়দিগের নিকটে নহে। বড় বড় ব্যাঙ্ক হ্যাটকোটপরিহিত পাশ্চাত্য নামধারী ব্যক্তিকে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রয়োজনমত ঋণ দিবে, কিন্তু তোমার আমার উপর তাহাদের বিশ্বাসের বড় একটা পরিচয় পাইবে না। এই দৃষ্টান্তে আমাদিগেরও পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে হইবে, সাহায্য করিতে হইবে। এইটুকু এখনও পারি না বলিয়াই আমরা ব্যবসাবাণিজ্যে কাজকর্ম্মে আজ জগতের এতটা পশ্চাতে পড়িয়া কথায় কথায় পদাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি। একথা সত্য হইতে পারে যে আমরা অনেকবার পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছি; তৎসত্ত্বেও আমরা স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা পরস্পরকে বিশ্বাস ও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া এবিষয়ে লোকশিক্ষা দিন। বিশ্বাস বিশ্বাসকে আকর্ষণ করিবে এবং এইরূপ পরস্পরে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইলে অবিশ্বাসের কার্য্যও আপনা হইতে অন্তর্হিত হইবে। পাশ্চাত্য জাতিদিগেরও মধ্যে কি একসময়ে এই প্রকার পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ছিল না? ছিল, কিন্তু অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে এখন তাহারা পরস্পরকে যে প্রকার বিশ্বাস ও সাহায্য করে তাহারই পরিণামে আজ মূল মালিক হয়তো সুদূর আমেরিকায় বাস করিতেছেন, আর তাঁহার ব্যবসায়বাণিজ্যের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে সহস্র সহস্র ক্রোশ

দূরবর্ত্তী এই ভারতবর্ষ। আর, আমরা এই দেশে বাস করিয়া, এই দেশে কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া কর্ম্মচারীদিগের প্রতারণার ফলে প্রতি পদে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উদ্যোগ করি।

কৃষিকর্ম্ম একঘেঁয়ে নহে।

আমরা কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে তিনটী মূল মন্ত্র বলিয়া আসিয়াছি, সেই গুলির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যদি কোন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, তবে বলা বাহুল্য যে সেই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে সর্ব্বপ্রথম যাহাতে প্রত্যেকের নিজের নিজের জমীর উপর একটা বিশেষ ভালবাসা আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীর উপর ভালবাসা আসিবে, যদি ছাত্রদের মন হইতে কৃষিকর্ম্ম একঘেঁয়ে ও অলাভজনক এই ভাবটী দূর করিয়া দিতে পারা যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে উহাদের মনে যদি কৃষিকর্ম্মের মনোগ্রাহিতা ও লাভজনকতা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মের মধ্যে আমরা মোটামুটি যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছি, সেই সকল বিষয়ের তত্ত্ব গ্রন্থপাঠে ও হাতে হেতেড়ে কাজের দ্বারা আয়ত্ত করিতে গেলে কেহই কৃষিকর্ম্মকে একঘেঁয়ে বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। কেবল যদি শিক্ষার্থীদিগকে গ্রন্থসাহায্যে কৃষিতত্ত্ব বুঝান যায়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই তাহাদিগের অপ্রিয় হইয়া উঠিবে। ভগবান বালকদিগের শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি নিহিত করিয়া রাখেন; তাহার ফলে তাহারা বসিয়া বসিয়া পড়াশুনা করিবার অপেক্ষা ঘরের বাহিরে শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ হাতেহেতেড়ে কাজ করিতে ভালবাসে—তাহাদের সেই অতিরিক্ত শক্তি বহিঃপ্রকাশের একটা মুখ পাইয়া শান্ত হয়। আবার, বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম করে, তাহাতে কৃষিকর্ম্ম অনেকটা একঘেঁয়ে লাগিবার কথা বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত কৃষক যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কৃষিকর্ম্ম কখনই একঘেঁয়ে লাগিবে না। সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মের এক-একটা অঙ্গ হইতেই কত আলোচ্য শাখাপ্রশাখা বাহির হইবে। এক একটী শাখাপ্রশাখা আয়ত্ত করিতে গেলে কত প্রকার বিদ্যাই বা আয়ত্ত করিতে হইবে। এইভাবে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহার একঘেঁয়ে হইবার অবসর কোথায়?

বিদ্যালয়ে সুপণ্ডিত শিক্ষক রাখা আবশ্যক।

শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে গেলেই বিদ্যালয়ের কথা সম্মুখে উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষার কাল ছয় বৎসর বয়স হইতে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি এবং এই বাল্যশিক্ষার মধ্যেই কৃষিশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছি। বাল্যশিক্ষার দশ বৎসরের মধ্যে বাস্তবিক মোটামুটিভাবে সাঙ্গ কৃষিবিদ্যার শিক্ষা সমাপ্ত করা আবশ্যক। তাই আমরা কৃষিশিক্ষাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতে চাহি—নিম্ন আদ্য ও উচ্চ আদ্য, মধ্য এবং শেষ। বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে যে কিরূপ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যপরিষদ প্রভৃতির উপর ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমানে যেরূপ নিম্ন শ্রেণীসমূহে অল্পবেতনের শিক্ষক রাখিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে শিক্ষাদান কার্য্য সারিয়া লওয়া হয়, সেরূপ স্বল্প বেতনে স্বল্পবিদ্য শিক্ষক রাখিয়া ছাত্রদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করা উচিত নহে। বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষাই বলিতে গেলে ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। ইহা হইতেই তাহাদিগের চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই মূল সংগঠিত হয়। যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন, সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে তাঁহাদিগের সুপণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে তাঁহারা ছাত্রদিগের মন হইতে কৃষিকর্ম্মের প্রতি একঘেঁয়েমীর ঘৃণা কি প্রকারে দূর করিতে পারিবেন?

কৃষিকর্ম্ম কিসে লাভকর হইবে।

এই সকল শিক্ষকদিগের ছাত্রদিগকে বুঝান কর্ত্তব্য যে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্ম যেমন একঘেঁয়ে নহে; সেইরূপ তাহা অলাভকরও নহে। তাঁহাদিগের শিক্ষার গুণে ছাত্রদিগের মনে যেমন জমীর উপর ভালবাসা আসা উচিত, তেমনি শৃঙ্খলার ভাবও আসা উচিত। এই দুইটী মনে বসিয়া গেলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অবলম্বিত কৃষিকর্ম্ম কিছুতেই

অলাভকর হইতে পারে না। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা এই আছে যে কৃষিকর্ম্মকে লাভজনক করিতে চাহিলে তাহাতে সপরিবারে লাগিতে হইবে—নচেৎ শৃঙ্খলার অভাব হইবে। পরিবারের মধ্যে যে যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহার সেই কার্য্যের ভার লইয়া সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিতে হইবে। যেন মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যবহারে নষ্ট না হয়। কৃষকপত্নী তো আর লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষক যখন বাহিরে লাঙ্গল দেওয়াইতেছে, কৃষকপত্নী কি সেই সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন ? তাহা নহে, শৃঙ্খলার বলে তিনিও সেই সময়ে বাটীর অভ্যন্তরে গোপালন, ঘুঁটিয়া প্রস্তুত, পশুপক্ষীপালন প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন এবং পুত্রকন্যাদিগের মধ্যেও কতকগুলি কর্ম্মের যথোপযুক্ত বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তাহার ফলে তাহারা ঐ সকল কার্য্যে সুশিক্ষিত তো হইয়া উঠিবেই, আবার তাহাদের শ্রমের ফলে যেটুকু লাভ হইবে, তাহাতে তাহাদের অন্তত মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থাও তো অনায়াসে হইতে পারে। নিজের রোজগারে নিজের ভরণপোষণ হইতেছে এটা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মমর্য্যাদা অভিব্যক্ত হইবে। আমাদের এই বঙ্গদেশে অধিকাংশ লোকেই বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ বড়লোক হইবার ইচ্ছা করে। দুই ছত্র লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াই আমরা আপনাদিগকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মনে করিয়া অধিক বয়সে ব্যবসায়-বাণিজ্যে হাত দিয়া পদে পদে ঠকিয়া যাই। যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইবে তাহার মূল পত্তন করিতে হয় বাল্যকালে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। আমার একটী পার্শী বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সন্তানগণকে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কাজকর্ম্মে শিক্ষা দিবার সূত্রপাত করেন। একটী মাড়োয়ারি বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম যে তাঁহাদের অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছেলেরাও যে দিন কিছু না কিছু রোজগার করিয়া না আনিতে পারে, সেদিন গৃহে তাহাদের আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল হইতে কেমন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কৃষিকর্ম্মে কৃতকার্য্যতা ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে বাল্যকালাবধি সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে।

কৃষিকর্ম্মে বিধবা প্রভৃতির উপকার।

কত শত বালিকা ও বয়স্কা রমণী ক্ষুধার তাড়নায় বিপথে চলিতে বাধ্য হয়। আমাদিগের প্রদর্শিত পথে কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থা করিলে আহার সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে আর হাহুতাশ করিতে হইবে না। পরিবারের বিধবা সধবা কুমারী সকল স্ত্রীলোকেই গৃহকর্ত্রীকে নানাবিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। আর, স্ত্রীলোকেরা একবার ঐ সকল কার্য্যে একটু বিশেষভাবে নিযুক্ত হইলে সেগুলিকে নীচকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইবে না।

বিদ্যালয়ে বসিবার সময়।

বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমানের ন্যায় ১০॥টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা রাখা উচিত নহে—প্রাতে ৭টা হইতে আন্দাজ ১১টা পর্য্যন্ত খোলা রাখা উচিত। তাহা হইলে ছাত্রেরা ঘরে গিয়া স্নানাহারের পর কিছু বিশ্রাম করিয়া পিতামাতাকে কৃষিকর্ম্মে সাহায্য করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়ের সহিত এক একটী "যাদুঘর" বা মিউজিয়ম সংলগ্ন থাকিবে—সেই সকল যাদুঘরে কৃষিকর্ম্ম বিষয়ক যন্ত্র শস্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রাখা উচিত।

অটনশীল বিদ্যালয়।

এই সকল বিদ্যালয়কে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি অটনশীল বিদ্যালয়ও খোলা আবশ্যক। সুদূর পল্লীগ্রামে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হওয়াতে তাহাদের শিক্ষকেরা জ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্ত হন না। রাজধানী ও সহরে সে বিষয়ে অনেক সুবিধা থাকে। তাই অটনশীল বিদ্যালয়গুলির মূল আড্ডা থাকিবে সহরের মধ্যে। যাঁহারা কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধনে বিশেষ আগ্রহ আছে, এরূপ কোন সুপণ্ডিত উচ্চ কর্ম্মচারীর অধীনে এই অটনশীল বিদ্যালয়গুলি রাখা উচিত। এই সকল বিদ্যালয় পল্লীস্থ বিদ্যালয়সমূহে যথাক্রমে পরে পরে গিয়া সাঙ্গ কৃষিবিষয়ক নানা নূতন তত্ত্বপূর্ণ উপদেশাদি প্রদান করিবে। এই সকল বিদ্যালয়েরও সঙ্গে উন্নত যন্ত্রাদিপূর্ণ এক একটী যাদুঘর থাকা আবশ্যক। ইহাদের তত্ত্বাবধায়ক উন্নত কর্ম্মচারীদিগের কেবল বক্তৃতা দেওয়াই কার্য্য হইবে না—তাঁহাদিগকে প্রত্যেক পল্লীর স্থানীয় কৃষকদিগের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখিতে হইবে।

কৃষিকর্ম্মে সমবায় প্রণালীর উপকারিতা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে কৃষিকর্ম্মে অন্যোন্যসাহায্য অত্যাবশ্যক—কৃষিকর্ম্মের ইহা একটী মূল মন্ত্র। এই মূলমন্ত্রের কার্য্যকারিতা যে কেবল-মাত্র কৃষিকর্ম্মেই প্রকাশ পায় তাহা নহে। কৃষিকর্ম্মে বিশেষভাবে লাভবান হইতে ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কিছু না কিছু বাণিজ্যসংযোগ রক্ষা করিতে হয়। কৃষির উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে তবে তো অর্থাগমের উপায় হইবে। এই বাণিজ্য সূত্রেও ঐ মূলমন্ত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। যে শিক্ষাপ্রণালী কৃষিকর্ম্মে অন্যোন্যসাহায্যের সুফল প্রত্যক্ষ করাইতে পারিবে, বিদ্যালয়সমূহে সেই শিক্ষাপ্রণালীই প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে সমবায় পদ্ধতিই এই মূলমন্ত্রের উপকারিতা সর্ব্বা-পেক্ষা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করাইতে পারে। কৃষি-কর্ম্মে উৎপন্ন ফল মাখন প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য মনে কর কোন সুবিধাজনক স্থানে একটী দোকান খোলা হইল। এখন সেই দোকান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের দ্রব্যগুলি কিপ্রকারে আনা যাইবে? প্রচলিত প্রথামত শকট বা মনুষ্যের সাহায্যে সে গুলি আনয়ন করিলে অনেক খরচ পড়ে। আর, যদি গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়া সমবায় পদ্ধতিতে একটী লঘু রেলওয়ে (Light Railway) চালায় তাহা হইলে কেবল দূরতম স্থানের নহে, অন্তর্বর্ত্তী স্থানগুলিরও কত সুবিধা হয় ও কত উন্নতির সম্ভা-বনা। সমবায় পদ্ধতিতে দোকান খুলিলে গ্রাম-বাসীদের বিস্তর সুবিধা হয়।

কাড়িয়া প্রথা ও সমবায়ী ব্যাঙ্ক স্থাপন।

নানা বিষয়ে সমবায় পদ্ধতি সুচারুরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি অতীব প্রয়ো-জনীয় বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেটী পল্লীগ্রামে সমবায়ী ব্যাঙ্ক স্থাপন। বর্ত্তমানে কৃষকেরা যে চিরজীবন অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় দিন-পাত করিতে বাধ্য হয়, তাহার অন্যতর কারণ অতি ভয়াবহ "কাড়িয়া" প্রথা। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ভারতের অধিকাংশ স্থানেই প্রচলিত আছে। আজ-কাল কাবুলীদের নিকট টাকা ধার করিবার সুখ অনেক নিরীহ ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। একতো, অধিকাংশ স্থলেই কাবুলীরা শতকরা ৭৫৲ টাকা সুদে টাকা ধার দেয়। তুমি সেই টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুদসহ পরিশোধ করিতে যাও, তাহারা অনায়াসে সুদটী লইবে, কিন্তু পারতপক্ষে আসল টাকা লইবে না—নানা ওজরে তাহা ফেরত লইতে অস্বীকার করিবে। এই কারণে কাবুলী মহাজন-দিগের হাত হইতে অধমর্ণদিগের মুক্তির আশা বড়ই অল্প। সেইপ্রকার, বিদেশী পাঠান মহাজনেরা এবং তাহাদের দেখাদেখি মাড়োয়ারি ও অনেক দেশীয় মহাজনও পাষাণতম হৃদয় লইয়া আজকাল নিরীহ কৃষক প্রভৃতির কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কাড়িয়ার সাধারণ সর্ত্ত এই যে, কৃষকেরা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যে টাকা বা ধান্য ধার লইবে, তাহা স্থান ও অবস্থাবিশেষে শতকরা ৫০৲ বা ৭৫৲ সুদ সহ পৌষ মাঘ মাসে ধান কাটিবার সময় পরিশোধ করিতে হইবে। ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিলে সুদ প্রায় শতকরা ১০০৲ টাকা পড়িয়া যায়। কৃষকেরা এই সুদ সহ আসল পরি-শোধ করিবে, তাহার পর জমিদারের খাজানা পরিশোধ করিবে এবং জমিদারের দাদনী টাকারও সুদ শোধ দিবে—এসকল করিয়া সুখে বাঁচিয়া থাকা মনুষ্যের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব। কাড়িয়া প্রথা প্রচলিত থাকিতে কৃষকদিগের দারিদ্র্যদুঃখ দূর হইবার আশা করা বৃথা। কৃষকেরা শিক্ষিত হইলে ঐ সকল মহাজন শকুনিদিগের নিকট হইতে তাহারা কখনই ধার লইতে স্বীকৃত হইবে না। অথচ কৃষক-দিগের অনেকের সময়ে টাকা ধার না লইলেও চলে না। তখন তাহারা সমবায়পদ্ধতিতে একটী ব্যাঙ্ক খুলিলে তাহাদের কত উপকার হয়।

সমবায়প্রণালীর নানাবিষয়ে প্রয়োগ।

সমবায় প্রণালীতে কৃষকেরা আপনাদিগের মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যবিভাগ করিয়া লইয়া সেগুলি সুনিয়মে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশের যে কি সুমহান মঙ্গল সাধিত হয় তাহা এক-মুখে বলা যায় না। ইহাতে পল্লীগ্রামেও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কত ভাববিনিময় হইতে পারে, জমিদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার সম্ভা-বনা আসে এবং দেশের সর্ব্বত্র উন্নত শ্রেণীর পরিশ্রমী শ্রমজীবী ও শিল্পীর অভাব বিদূরিত হইবে।

কৃষিকার্য্যে জমিদারদিগের সহায়তা আবশ্যক ও তাহার সুফল।

যে তিনটী মূলমন্ত্রের উপর কৃষিকর্ম্ম ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী দাঁড় করাইতে চাহি, সেই তিনটী মূলমন্ত্র অনুসারে কার্য্যগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রজা এ সকলের সমবেত সাহায্য আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহার ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু জমীদারের সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—জমীদারের সহিত কৃষকদিগের যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই কাড়িয়া প্রথা বন্ধ করিতে ও সমবায়ী ব্যাঙ্ক স্থাপনে জমীদারের সাহায্য যেরূপ আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইবে এমন ফল আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। জমীদারগণ এ বিষয়ে মনোযোগ করিলে প্রজাগণ সত্যসত্যই বিনাশ হইতে রক্ষা পায় এবং জমীদারেরা নিজেও ভাবী মহাসর্ব্বনাশের হাত হইতেও নিস্তার পান। অনেক অপরিণামদর্শী জমীদার এখনও এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন না। ফরাসিবিপ্লব প্রভৃতির ইতিহাস যাঁহারা একটুকুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে জমীদারদিগের কিরূপ মহাবিপদ। তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে পরিণামে তাঁহাদের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য নানাস্থানে ধর্ম্মগোলা ও কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করাইয়া এ বিষয়ে সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। জমীদারগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজেরা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়া প্রজাগণেরও রক্ষাসাধন করেন এবং আপনাদিগের মানমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। জমীদারগণ কত জমী পতিত রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়! সামান্য দু'একটাকা খাজানার জন্য মারামারি করিয়া দুইশত একশত টাকার শস্য উৎপাদনে সমর্থ জমী হয়তো নিঃসঙ্কোচে ফেলিয়া রাখিবেন। জমীদারগণ এরূপ পাষাণ হৃদয় লইয়া জমীদারি করিলে তাঁহাদেরই পক্ষে অমঙ্গল। এইরূপ অনেক বিষয়ে জমীদারেরা প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদিগকে সাহায্য দান করিয়া সমূহ মঙ্গলের কারণ হইতে পারেন।

প্রার্থনা।

ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে "হে পুরাতন ভারতের চিরন্তন দেবতা, তুমি যদি তোমার ভারতবর্ষকে এখনও কিছুমাত্র ভালবাস, তাহা হইলে তুমি ভারতবাসীদিগকে সাঙ্গ কৃষিকর্ম্মে মনোযোগী কর—তাহারা দুর্ভিক্ষের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট হইয়া তোমারি জয়গান করিতে থাকুক।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মুখবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহযোগী বলিয়া যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য, আদিসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগের অন্যতম।

বিষ্ণুচন্দ্র আদিসমাজের বা রাজা রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের * সংস্থাপন কালাবধি গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুচন্দ্র সপ্তষষ্ঠি বৎসর একাদিক্রমে তাহার গায়কের কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকালের মধ্যে একটী দিনেরও জন্য তিনি সমাজে অনুপস্থিত হয়েন নাই।

বিষ্ণুচন্দ্রের জন্মবিবরণ।

বিষ্ণুচন্দ্র ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাট অঞ্চলের "আন্দুলে কায়েৎপাড়া" গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। কালীপ্রসাদ একজন শাস্ত্র ব্যবসায়ী কণৌজী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালীপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাণ্যকুব্জ হইতে কাঁকুড়গাছা গ্রামে প্রথম উপনিবেশ করেন। পরে তাঁহারা নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নবদ্বীপরাজ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী শিবনিবাসে বসতি সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে বিষ্ণুচন্দ্রের পিতৃপুরুষেরা প্রায় তিন চার পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছিলেন।

---

* রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রথম কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত ছিল; পরে আদিব্রাহ্মসমাজ (সংক্ষেপে আদিসমাজ) বলিয়া বর্ত্তমানে উহা প্রখ্যাত হইয়াছে।

বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীত শিক্ষা।

কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম স্বীকার করেন। অবশিষ্ট চার ভ্রাতার মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ ও বিষ্ণুচন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। নবদ্বীপের রাজসভায় কলাবিদ্যার যে প্রকার সমাদর ছিল, তাহাতে তিন ভ্রাতার একসঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না।

এই তিন ভ্রাতার সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমানে অপর কাহারও ভাগ্যে সেরূপ সুবিধা লাভ বড়ই দুর্ঘট। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ কলাবৎ হসন্নু খাঁর নিকট ধ্রুপদ প্রভৃতি এবং সুবিখ্যাত কাওয়াল মিয়া মীরণের নিকট খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলেন। হসন্নু খাঁ দিল্লীর বাদসাহের চৌকীর গায়ক ছিলেন।

বিষ্ণু ইহার উপর বিশেষভাবে তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণপ্রসাদ, হসন্নু খাঁর ভ্রাতা দেলওয়ার খাঁ এবং সুপ্রসিদ্ধ রহিম খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেলওয়ার খাঁ নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্রের সভার গায়ক ছিলেন এবং রহিম খাঁ রামমোহন রায়কে পারসী গান শুনাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রহিম খাঁ রামমোহন রায়ের অধীনে কর্ম্মপ্রাপ্তির মাস তিন চার পরেই পরলোক গমন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দিবসাবধি বিষ্ণুচন্দ্র গায়ক।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই বিষ্ণুর অন্যতর ভ্রাতা দয়ানাথ দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিবসাবধি কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তাহার গায়কদ্বয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই দুই ভ্রাতাকে তাঁহার নিকটে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদেরও দেহান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে একা বিষ্ণুই বহুকাল যাবৎ আদিসমাজের গায়কের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্রের গান সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের উক্তি।

বিষ্ণু তাঁহার কার্য্য যে কিরূপ সুনির্ব্বাহ করিতেন তাহা মহর্ষিদেবের নিম্নের উক্তির ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে—"তখনকার লোকের মধ্যে আর কাহারও যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনো যে বিষ্ণু গান করিত, এখনো সেই বিষ্ণু আছে।" জীবনের শেষ ভাগেও মহর্ষিদেব বলিয়া গিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্র গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। 'বিগত বিশেষং" সঙ্গীতটী রাজার অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটী মধুরস্বরে গান করিতেন। ঐ প্রিয় পুরাতন সুর এখনও আমার কাণে বাজিতেছে।" বিষ্ণুচন্দ্র যে তাঁহার ৬৭ বৎসর কর্ম্মকালের মধ্যে শত ঝড়বৃষ্টি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একটী দিনেরও জন্য অনুপস্থিত হয়েন নাই, ইহাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে।

বিষ্ণুচন্দ্রের চরিত্র।

বিষ্ণুই ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত গায়ক ছিলেন। তিনি যে সময়ে আদিসমাজের গায়কের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন সে সময়ে, কেবল সে সময়ে কেন, আজ পর্য্যন্ত, গায়ক শ্রেণী যে সাধারণতঃ নানাবিধ নেশাকর দ্রব্যে আসক্ত হয় ইহা সকলেরই বিদিত আছে। তাহার উপর বিষ্ণু উচ্চ শ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে শত শত মদ্যপান প্রভৃতিতে আসক্ত ধনীদের সভায় প্রায় নিত্যই নিমন্ত্রিত হইতেন। এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে কোনপ্রকার মাদক দ্রব্যে আসক্ত না হওয়া কেবল আশ্চর্য্য নহে, তাহা তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলেরও সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। জীবনের শেষভাগে শরীর রক্ষার্থ চিকিৎসকের পরামর্শে অতি অল্প মাত্রায় অহিফেনের জলমাত্র সেবন করিতেন।*
তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল।

* সিকি ভরি অহিফেন জলে ভিজাইয়া সেই জল চারদিন ব্যবহার করিতেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই মাত্রা সমান ছিল, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিষ্ণুচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

বিষ্ণুচন্দ্র কেবল বেতনের জন্য সমাজের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন করেন নাই। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এই কয়জনের উপর তাঁহার কেমন একটা গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেই তিনি অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় এবং যাহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সহযোগী, এবং যে ব্রাহ্মসমাজে তিনি একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। শুনিয়াছি যে দ্বারকানাথ ঠাকুর যে ৮০৲ টাকা সমাজে সাহায্য প্রদান করিতেন তাহা হইতেই বিষ্ণুকে ৪০৲ টাকা দেওয়া হইত। কিন্তু নানা কারণে সেই বেতন কমিয়া গিয়া ১০৲ টাকাতে পরিণত হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্র বেতনের এতটা হ্রাস হওয়াতেও সমাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। শারদীয়া পূজার সময় বিজয়ার রাত্রে আগমনী ও বিজয়া গীত গাহিয়া কত বৎসর তিনি কেবল "প্যালাতে" * দুই তিন হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হোলি উৎসবে বিবাহ প্রভৃতি সভাতে তিনি প্রতি বৎসরই বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইচ্ছা করিলে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেও তিনি অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসভার দলে মিলিত হইলে সে সময়ে তাঁহার অর্থের অভাব হইত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পাছে সমাজে উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে, সেই কারণে তিনি সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বাহিরে অন্য কোন বাটীতে কাহারও শিক্ষকতা কার্য্য স্বীকার করেন নাই অথবা ধর্ম্মসভার দলেও মিশিতে যান নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিষ্ণুচন্দ্রের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সমাজে অর্থ সাহায্যের জন্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিয়মিতরূপে সমাজের বেদীর কার্য্য করিবার জন্য যদি আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাসহযোগী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি, তবে বিরোধী পক্ষ হইতে অত্যাচারের ভয় ও অর্থের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে প্রকার একনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অসামান্য ব্যক্তি ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রতিষ্ঠা-সহযোগী বলিয়া গণ্য না করি কেন? ব্রাহ্মসমাজেরই আজ পর্য্যন্ত অস্তিত্বের অন্যতর প্রধান কারণ আদি সমাজের সঙ্গীত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপনিষৎ ব্যাখ্যা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব ছিল, সেইরূপ বিষ্ণুর সঙ্গীত না থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। বিষ্ণুর ভাবের সহিত বিশুদ্ধ লয়তালে সঙ্গীত আদিসমাজের প্রতিষ্ঠালাভে অত্যন্ত সহায়তা করিয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্রেরই সাহায্যে আদি-সমাজের সঙ্গীত ধর্ম্মসাধনের অঙ্গস্বরূপে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বলিতে গেলে, বিষ্ণুর সঙ্গীতেরই কারণে আদিসমাজের নাম আজ দিগন্ত বিঘোষিত। আমরা বাল্যকালাবধি শুনিয়া আসিতেছি যে গানই হইল আদিসমাজের প্রধান আকর্ষণ। একা বিষ্ণুই বলিতে গেলে আদিসমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সকল গান গুলিরই সুর বসাইয়া দিয়াছেন। এক কথায়, বিষ্ণুচন্দ্রের জীবন এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস চিরসম্বদ্ধ থাকিবে। বিষ্ণুকে ছাড়িলে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আদিব্রাহ্মসমাজ বিষ্ণুচন্দ্রের নিকট অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার কর্ত্তৃপক্ষ সমাজের অর্থাভাব বশতই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার প্রতি ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিষ্ণুচন্দ্রের বেতন অনেককাল পরে দশ টাকা হইতে বাড়াইয়া কুড়ি টাকা মাত্র করা হইয়াছিল এবং

* গান অথবা নাচের মজলিসে ধনী লোকেরা বিশেষ বিশেষ গায়ক বা নর্ত্তকীর বিশেষ বিশেষ গান বা নৃত্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষের চিহ্নস্বরূপে অর্থ, শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি সকল দ্রব্য প্রদান করেন। ইহাকে প্যালা বলা যায়। থিয়েটারে আজকাল এরূপ অবস্থায় প্রায় ফুলের তোড়া দ্বারাই সন্তোষপ্রকাশের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক আবেদন নিবেদনের ফলে তাঁহাকে দশ টাকা পেন্সন দেওয়া হইয়াছিল। মহর্ষিদেবের অন্যতর পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি কুড়ি টাকায় অত্যন্ত সংসারিক কষ্ট হওয়ার কথা বলাতে হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বীয় পত্নী এবং পুত্রকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্ত বেতন পূর্ণ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে কুড়ি টাকা বেতনেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে নিজ উইলে দশ টাকা পেন্সন নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষ্ণুচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বেতন ব্যতীত প্রত্যেক গানের স্বরলিপির জন্য পুরস্কার দান প্রভৃতি অন্যান্য নানা উপায়ে হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া গুণীর সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্রের দেহত্যাগ।

জীবনের শেষভাগে তিনি হালিসহর গ্রামে কিছু জমি ক্রয় করিয়া স্বীয় পরিবারের জন্য একটী বাসস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। হালিসহর অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপূর্ণ বলিয়া তিনি নিজে বৃদ্ধ বয়সে সেখানে বাস করিতে না পারিয়া কলিকাতায়ই বাসা বাটীতে বাস করিয়া প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ষড়শীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মাঘোৎসবে যেন অধিকতর জীবন দেখা গিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের যত্ন ও চেষ্টায় ১১ই মাঘের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। ৫ই মাঘ বুধবার মাঘোৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর ভাবপূর্ণ ভাষায় সমাগত উপাসকবর্গকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোধান উপলক্ষে তদীয় ভবনের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাঙ্গন ভক্তজনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহর্ষিজীবনের অজ্ঞাত অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যৎবংশীয়দিগকে তাঁহার গুণাবলী অনুকরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবৃত কথাগুলি বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ৭ই মাঘ সায়ংকালে শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজে বিশেষভাবে উপাসনা করেন। ৮ই মাঘ সায়ংকালেও আদিব্রাহ্মসমাজে বিশেষভাবে উপাসনা হয়। সেই সূত্রে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠন সম্বন্ধে সমবেত উপাসক মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ৯ই মাঘ শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি বাবু উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১১ই মাঘ প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের বাটীতেই আদিব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জ্বলন্ত ভাষায় উদ্বোধন সমাগত উপাসকমণ্ডলীর কর্ণে বহুকাল ধরিয়া বাজিতে থাকিবে নিঃসন্দেহ। তিনি "সম্বন্ধ ও বন্ধন" বিষয়ে অতীব মনোজ্ঞ একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শ্রীযুক্ত অজিত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু বড়ই শেষ মুহূর্ত্তে তিনি অসুস্থতাবশত আসিতে না পারাতে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিবার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, আমরা যতদূর সম্ভব, তাঁহার অমূল্য উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। তিনি বলেন যে "যদি কোন কিছু আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু আমরা সেটাকে যদি বাঁধিতে না পারি, তবেই তাহা আমাদিগের পক্ষে বন্ধন। কিন্তু যেখানে দুইটী বস্তু পরস্পরকে বাঁধিতে পারে, তখন তাহা সম্বন্ধ নাম পায়। এই সম্বন্ধকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ, বন্ধুর সহিত বন্ধুর সম্বন্ধ, এগুলি সম্বন্ধ,

এগুলিকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। এই সম্বন্ধ বন্ধনে পুত্রের যেমন কর্ত্তব্য আছে, পিতারও তেমনি কর্ত্তব্য আছে; স্ত্রীর যেমন কর্ত্তব্য আছে, স্বামীরও তেমনি কর্ত্তব্য আছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে বলিয়া গিয়াছেন "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", তাহা এই সম্বন্ধকে বন্ধন মনে করিয়াই বলিয়াছিলেন। সে কথা মোটেই ঠিক নহে। এই সম্বন্ধকে বন্ধন ভাবিয়া কাটাইবার চেষ্টাতেই নানা গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধনকে আমরা কাটিতে পারি, কিন্তু সম্বন্ধকে পারি না। ঈশ্বরের সহিত সংসারের যে সম্বন্ধ, তাহাও সম্বন্ধ—তাহা বন্ধন নহে। সেখানে আমাদিগেরও যেমন তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারও তেমনি আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। তিনি করুণার বন্ধনে স্নেহের বন্ধনে আমাদিগকে তাঁহার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরাও প্রীতি দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে এই যে আমাদের সম্বন্ধ, ইহারই অনুশীলনে মানবজন্মের সার্থকতা, ইহারই পূর্ণ উপলব্ধিতে মনুষ্যের দেবত্ব।" রবীন্দ্র বাবু বেদী হইতেই দুইটী সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীতাধ্যাপকও গুটী দুই সঙ্গীত করিয়া উপাসকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিয়ন্তৃত্বে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অবশিষ্ট গীতগুলি অতি সুন্দরভাবে গান করিয়াছিলেন—তাহা অতি মধুর হইয়াছিল।

সায়ংকালে ৬টার সময় মহর্ষিদেবের বাটীতে উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্র বাবু চিন্তামণি বাবুকে সঙ্গে লইয়া বেদী অধিকার করেন। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক আবেগময়ী ভাষায় জনসঙ্ঘকে উদ্বোধিত করেন এবং চিন্তামণি বাবু উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্র বাবু বেদীর পার্শ্ব হইতে একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্র বাবুর প্রদত্ত উপদেশের দুই চারিটী কথামাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতে সক্ষম হইলাম, "পৃথিবীর যেমন গতি আছে, মনুষ্যসমাজেরও সেইরূপ একটী গতি আছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমরা সেই গতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইউরোপ গত দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া তাহার রাজশক্তির প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। এই রাজশক্তি বিস্তার করিতে গিয়া ইউরোপ যে প্রকার পীড়ন বিস্তার করিয়াছে, সে তাহা অনেককাল বুঝিতে পারে নাই। ব্যাঘ্র যখন অন্য প্রাণীর প্রাণ হরণ করে, তখন সে হিংসার অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু দুই ব্যাঘ্র যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহারা হিংসার বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। সেইরূপ যখন বিজিতজাতি বিজেতার অক্ষুণ্ণ তেজ নীরবে সহ্য করে, তখন সেই বিজিত জাতি আপনাকে দলিত ও পীড়িত বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকে বটে, কিন্তু সেই দলন ও পীড়নের ভাব বিজেতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু এই বর্ত্তমান মহাসমর বিজেতাকেও পীড়নের মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা উপলব্ধি করিবার অবসর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। জয় পরাজয়ের পর্য্যায়ক্রম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যখন এই দলন পীড়নের যাতনা ইউরোপের দেশ ও জাতিসমূহকে গভীরভাবে স্পর্শ করিবে, তখনই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটী গভীর আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িবে। এই যে ভীষণ সমর, যাহার বহ্নিকণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ঈশ্বরের রাজ্যে নিরর্থক হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে এই মহাসমরের অবসানেই হউক অথবা এইরূপ আরও দুই একটী ভীষণ বিপ্লবের পরেই হউক, সমস্ত জগতে এমন এক শান্তির রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা সুদূর ভবিষ্যতেও অটল অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এক সময়ে ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র ভূগোল ছিল, পাশ্চাত্যদেশের স্বতন্ত্র ভূগোল ছিল। ভারতবর্ষের ভূগোলে ক্ষীরসমুদ্র দধিসমুদ্রের উল্লেখ ছিল, লোকে ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটী দ্বীপে বিভক্ত বলিয়া জানিত। কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন একই ভূগোল ভারতবর্ষ ও ইউরোপের পক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা সরিয়া যাইতেছে। একই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত

সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জনপদ স্বীকার করিয়া লইতে শিখিয়াছে। সমস্ত জগত হইতে একটী মহা বিশ্বজনীন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান—এই বিজিত জাতির মধ্যে যাহার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়াছে, তাহাই অচির ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পূর্ব্ব সূচনা আমরা ইতি মধ্যেই চারিদিকে দেখিতেছি। ফল যখন পাকিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার একদিক সামান্য লাল হইয়া উঠে। কিন্তু ক্রমে দুই চারিদিন বিলম্বে সমস্ত ফলটাই লাল হয়। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। প্রাতঃসূর্য্যের অরুণ কিরণে পূর্ব্বদিক আলোকিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন সেই সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত হইবে তখন উহার দীপ্তিতে সমগ্র পৃথিবী দীপ্তিময় হইয়া উঠিবে।"

শোক সংবাদ।

বিগত ৪ঠা পৌষ আমরা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর দেহান্ত সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। অমায়িকতাপূর্ণ একটি নিরহঙ্কার জীবনের উপরে অসময়ে যবনিকাপাত হইল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এত নম্রতা এত ধীরতা এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপের সময় স্বচ্ছ সরোবরের অন্তস্তলের ন্যায় তাঁহার চরিত্রগত সরলতার যে চিত্র সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা নিতান্তই দুর্লভ। কর্ম্মক্ষেত্রে সাময়িক মাসিক পত্রিকার চিত্রাঙ্কনে তিনি যে সুরুচিপূর্ণ আদর্শ ও নৈপুণ্য রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরকালের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সঙ্গীত ক্ষেত্রে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের উৎসব সময়ে বেহালা বাদনে প্রতি বৎসর আমাদিগকে যে অমূল্য সাহায্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সহজে আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। তিনি নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইলেও তাঁহার জীবন ব্রাহ্মসমাজের কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার এমন একটী সদ্ভাব দেখা যাইত যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ দেখা যাইত না। তিনি সত্য সত্যই অজাতশত্রু ছিলেন। তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিকতা দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছেন, উপেন্দ্রকিশোরও চিত্রমুদ্রাঙ্কন বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার সংগতি বিধান পূর্ব্বক স্বীয় শীতলক্রোড়ে স্থানদান করুন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা আশা করি তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী পিতার ইংরাজী প্রবন্ধাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন।

মাঘোৎসব উপলক্ষে দান প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি :—

নাম	দান
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, ,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, ,, অবনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, ,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, ,, কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, ,, চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	২৲
,, ,, তুলসীদাস দত্ত	২৲
,, ,, বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	৫৲
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১৲
,, হেমাঙ্গিনী বসু	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত	২৲
,, ,, কালীকুমার পাইন	১৲
,, ,, বিনোদবিহারী দত্ত	১৲
,, ,, মনীন্দ্রকুমার দত্ত	৷৹
,, ,, মন্মথ নাথ দে	৷৹
,, ,, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত	⁄৹
,, ,, সুধীর রঞ্জন রক্ষিত	।৹
,, ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ,, চুনীলাল মজুমদার	১৲
,, ,, গৌরমোহন দে	।৹
,, ,, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	।৹
ডি, আর, চন্দ্র এস্কোয়ার	⁄৹
শ্রীযুক্ত বাবু সুবোধ চন্দ্র মজুমদার	।৹
,, ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	।৹
,, ,, জনৈক বন্ধু	।৹
এস, পি, মিত্র এস্কোয়ার	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুখেন্দ্রলাল মিত্র	১৲
,, ,, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	।৹
,, ,, সুশীলকুমার গুপ্ত	১৲
,, ,, খগেন্দ্রনাথ সেন	।৹
,, ,, অবিনাশ চন্দ্র বসু	১৲
,, ,, অক্ষয়কুমার চন্দ্র	১৲
,, ,, শ্যামলাল শেঠ	১৲
,, ,, ভগবতী চরণ মিত্র	১৲
,, ,, কালিচরণ ঘোষ	৷৹
,, ,, নরেন্দ্র লাল রায়	।৹

স্থানাভাবপ্রযুক্ত অবশিষ্ট নামগুলি প্রকাশ করিতে পারা গেল না—সেগুলি আগামীবারে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অভয়চরণ দাও।

হে প্রাণারাম, তুমি এসো, হৃদয়ে এসে বোসো। হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল স্পর্শ করে বোসো। তোমাকে এত করে ডাকছি, তবু তুমি দেখা দাওনা কেন? একটীবার মাত্র তোমার দেখা পাবার জন্য প্রাণের ভিতর যে কি গভীর ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তাতো তুমি দেখতে পাচ্ছ, তবু তুমি দেখা দাও না কেন? এই যে তোমার চরণে আছড়িয়ে পড়লুম—তুমি দেখা দাও—প্রাণেশ্বর, তুমি দেখা দাও। তোমার বিরহ যে আর আমার সহ্য হয় না। হে প্রভু, হৃদয়নাথ, তুমি এই অত্যন্ত দুঃখী মানবকে দয়া কর—আমা হতে আর দূরে থেকো না। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেহই নাই। এই সংসারের মধ্যে থেকে আমি হাসি কাঁদি, সকল কাজই করি—সেগুলি করে যেতে হয় বলে করে যাই, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে তোমার নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখবার জন্য প্রাণ যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করে তোমার কাছে অপরাধী হয়ে থাকি, তাহলে তুমি শত বজ্রে আমায় আঘাত কর, শাস্তি দাও, আমার তাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, আমি সে শাস্তি আনন্দের সঙ্গে বহন করব, কিন্তু আমার এইটুকু প্রার্থনা যে তুমি সেই শাস্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে আমার হৃদয়ে তুমি এসে বোসো। তোমার ঐ চরণতল থেকে আমাকে দূরে ফেলো না, তোমার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না। তোমার প্রেমের তুলনা কোথায়? তোমার সেই প্রেমের সাগরে আমাকে ডুবিয়ে রাখ।

নাথ! তুমি আমাকে পৃথিবীর কত সুখসম্পদে ঘিরে রেখেছ। কিন্তু তার মধ্যে যে অগ্নিময় জ্বালাযন্ত্রণার আস্বাদ পাই। সেই সুখসম্পদের কোলাহলে আমি কোথায় ভেসে যাই, আর তুমি কোথায় লুকিয়ে পড়—সময়ে সময়ে সেই জ্বালাময় সুখকেও মহাসুখ বলে বরণ করি। কিন্তু পৃথিবীর কোলাহল নিবৃত্ত হয়ে গেলে যখন নিশীথের গভীর নীরবতার মধ্যে তোমাকে একাকী পাই, তখন সেই সমস্ত সুখের আঘাতযন্ত্রণাতে বড়ই কাতর ও অস্থির হয়ে পড়ি। সেই নীরবতার মধ্যে তোমাকে সমস্ত হৃদয়ে পেয়ে অধীর হয়ে ভাবি যে কি সুখেরই প্রলোভনে তোমায় ছেড়ে ছিলুম। কোথায় পৃথিবীর সুখের অগ্নিময় আঘাত, আর কোথায় তোমার সঙ্গে নির্ম্মল যোগানন্দের শান্তি! সেইটুকু আনন্দ দাও বলেই তো আজও আমি বেঁচে আছি। সেই নিভৃত আনন্দ দেবার পর আবার কেন আমাকে সংসারের অগ্নিকুণ্ডে ফিরিয়ে পাঠাও? আমি তো আর সংসারের কোলাহলের মধ্যে ফিরতে চাই নে। আমি বড়ই দুর্ব্বল—সংসারের সম্পদবিপদের মহা আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে চারদিকের ধূলিরাশিতে এতই অন্ধ হয়ে যাই যে তোমাকে আর দেখতে পাই নে—তোমাকে

যে হারিয়ে ফেলি। আমাকে রক্ষা কর—আমাকে রক্ষা কর। তোমার ঐ সর্ব্বসন্তাপহারক চরণতলে আমাকে একটুখানি আশ্রয় দাও। তুমি তোমার অভয়চরণ আমার বুকে তুলে দাও—আমার দেহমন সকলই পবিত্র হোক। এই আশীষ দাও যে, তোমার আদেশে আমাকে যে লোকেই যেতে হোক না কেন, যেন সেই লোকলোকান্তরে যাবার সময়ে তোমার ঐ অভয় চরণখানি বুকে চেপে ধরতে ভুলে না যাই। প্রাণনাথ, তুমি এইটুকু আশীর্ব্বাদ দাও—আর তুমিই দেখো যেন তোমার সেই আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ না হয়।

মাঘোৎসবের শিক্ষা।

আমাদের প্রিয় মাঘ মাস অতীতের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মাঘোৎসব আসিয়াছিল, আবার মাঘোৎসব চলিয়া গিয়াছে। আমরা মাঘোৎসবের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলাম। মাঘোৎসব আসিতে আমরা তাহাতে মাতিয়া গিয়াছিলাম। মাঘোৎসব চলিয়া গেল, আমরা আমাদের নিজ নিজ কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন, সম্বৎসর পরে আবার একটী মাঘোৎসব আসিবে। কিন্তু আর একটী বৎসর প্রাণের ভিতর ধরিয়া রাখিবার মত, আমাদের কার্য্যনিয়ামক কি মন্ত্র গত মাঘোৎসবে লাভ করিলাম, সেই বিষয়টী একবার আমাদের অন্তরে আলোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে গত বৎসর কোন্ ভাবটী সমাজের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছিল। একথা বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে সমস্ত বৎসর সে ভাবটী সমাজের মধ্যে কতকটা বা ব্যক্ত এবং কতকটা বা অব্যক্ত আকারে বিশেষভাবে তরঙ্গিত হইয়াছিল, তাহাই মাঘোৎসবে ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছিল। কোন মার্কিন পণ্ডিতপ্রবর বলিয়াছেন যে মহৎলোকেরা সমাজের সাময়িকভাবের ব্যক্ত আকার। আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি যে সমাজের উৎসবপ্রকাশিত প্রধান প্রধান ভাবগুলি সম্বৎসরের অন্তঃসলিল ও ব্যক্তাব্যক্ত ভাবসমূহের বিশেষভাবে ব্যক্ত আকার মাত্র। সম্বৎসর ধরিয়া আমাদের সমাজে যে ভাবসমূহ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে, সেই ভাবগুলিই মাঘোৎসবে আচার্য্য প্রভৃতির উপদেশাদিতে পরিস্ফুট হইয়া ব্যক্ত আকার ধারণ করে, এবং মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। গত মাঘোৎসবে কোন্ সত্য এইরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের গন্তব্যপথ নির্ণয় করিবার বিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা লাভ করিব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা বুঝিতে পারিব, অন্তত আমাদের অন্তরে আলোচনা চলিতে থাকিবে যে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সহজে সেই সত্যকে আমাদের জীবনে পরিণত করিতে সক্ষম হইব।

গত মাঘোৎসবে আমরা যে মূলমন্ত্র লাভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে পারি—অন্যোন্যসাহচর্য্যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। সমাজেও থাকিতে হইবে অথচ ধর্ম্মসাধনও করিতে হইবে, সমাজে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, সমাজের অপর পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই ভাবের সত্যই গত মাঘোৎসবে বিশেষভাবে লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনের পথে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং" এক সঙ্গে গমন কর, একসঙ্গে কথা বল এবং তোমরা পরস্পরের মন অবগত হও, এই মহামন্ত্রই এবার মাঘোৎসবে লাভ করিয়াছি বলিতে পারি।

আমরা মাঘোৎসবে যে বাণী লাভ করিয়াছি, অন্যোন্যসাহচর্য্য কেবল যে আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে; অন্যোন্যসাহচর্য্য বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে যে সাঙ্গ সভ্যতা এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, অন্যোন্যসাহচর্য্যভাবের প্রাবল্যই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। সর্ব্বপ্রকার সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ভাবের মূলই হইল পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, পরস্পরের মধ্যে মামাসিধ আদান প্রদান, পরস্পরের সহায়তা, এক কথায় অন্যোন্যসাহচর্য্য। পরস্পরের সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য্য লাভ করিয়া মিলিতভাবে কর্ম্ম করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগের [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible]

বর্ত্তমান যুগে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ তীব্র-গতিতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা প্রত্যেকে একাকী সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিব, একথা মনে করিলে এখন আর চলিতেই পারে না। এখনকার সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যোন্যসাহায্য কেবল নিতান্তই আবশ্যক নহে, পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় দেখি না। সৈন্য-দল যেমন দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া শত্রু-পক্ষের পরাজয় সাধন করে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আমাদিগকে সেইরূপ মিলিতভাবে পর-স্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে হইবে। এই যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে চলিলে কোন বিষয়ে আমাদিগের কৃতকার্য্যতার আশা অতীব অল্প।

মাঘোৎসবে আমরা কেবলমাত্র অন্যোন্যসাহ-চর্য্যেরই বাণী লাভ করি নাই, কিন্তু আমরা এই বাণী পাইয়াছি যে অন্যোন্যসাহচর্য্যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে। পরস্পরের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পরস্পরের সাহায্যে বাসনার পথে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইলে চলিবে না। বাসনারই তো নামান্তর হইল স্বার্থপরতা। অন্যের ভালমন্দের দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া আজ আমার এইটা হইল, কাল আমার ঐটা হইবে এইরূপ একটার পর একটা স্বার্থ-সাধনের চেষ্টার নামই তো হইল বাসনা। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে যদি আমরা পরস্পরকে সহায়তা করিতে চাহি অথবা পরস্পরের নিকটে সাহায্য-লাভের প্রত্যাশা রাখি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমা-দিগের স্বার্থপরতাকে সংযত করিতে হইবে, যে বাস-নার নামান্তর স্বার্থপরতা সেই বাসনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

ভগবান অবশ্য আমাদিগের অন্তরে পরিমিত বাসনার ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই পরিমিত বাসনা হইতেই আমাদিগের কর্ম্মচেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। ঈশ্বর এই বাসনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যথাযুক্ত ব্যবহার করিবার শুভবুদ্ধিও নিরন্তরই আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিতেছেন। আমরা বাসনাকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে তাহাকে যথাযথ নিয়োগ করিলে আমাদের সমূহ মঙ্গল। আবার, সেই বাসনাকে সংযত না করিয়া তাহারই স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিলে আমা-দের বিনাশ অনিবার্য্য। ভারতবাসী আমরা—শৈশ-বাবধিই বাসনাসংযমের কথা, সামঞ্জস্যসাধনের কথা, যোগের কথা শুনিতে অভ্যস্ত, এবং আমরা ইচ্ছা করি বা নাই করি, আমাদের জীবনযাত্রা সেই মন্ত্রের দ্বারাই অনেকাংশে পরিচালিত হইতেছে। তাই আমাদের দেশে আজও শান্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং আমরা আজও শান্তভাবে শান্তিস্বরূপের আরাধনায় আপনাদিগকে নিমজ্জিত রাখিতে সমর্থ হইতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রতীচ্য ভূখণ্ড হইতে লোলজিহ্ব বাসনার জ্বালাময় বাতাস ভারতেরও যুবকদিগের গাত্রে আসিয়া লাগিয়াছে। এখন অবধি যদি তাঁহারা সেই বাতাসের গতি ফিরাইয়া দিবার পক্ষে মনো-যোগী না হন, তাহা হইলে সেই অগ্নিবায়ু অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের সমস্ত রক্ত শুষ্ক করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দিবে—তখন আর শতসহস্র হাহুতাশেও কোনই ফল হইবে না।

যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে গিয়া বাসনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে যে কি ভীষণ অমঙ্গল আসিতে পারে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ যে বাসনার অনুগামী হইয়া স্বার্থসাধনের জন্য কতদূর নামিতে পারে, বর্ত্তমান যুগের কুরুক্ষেত্র সংগ্রামই তাহার পরিচয়। শীতের পর বসন্তকাল আসিয়াছে। চারিদিকেই প্রকৃতি হাসিতেছে—তাহার সেই আনন্দহাসির বিরাম নাই। গাছপালা সকলই পাখীদের আনন্দসঙ্গীতের ধ্বনিতে ভরিয়া গিয়াছে। জীবজন্তুগণ আনন্দের এক নূতন বসন পরিধান করিয়াছে। কিন্তু আজ ইউরোপে মানুষ বাসনার অনুগামী হইয়া এমন নির্ম্মল বসন্তেও প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে আপনার প্রাণের তান মিলাইয়া ভগবানের জয়গান করিতে চাহে না—ভগবানের

সিংহাসন ঐ সুবিশাল আকাশের সঙ্গে আপনার হৃদয়কে বিস্ফারিত করিতে চাহে না। যে মানুষকে ভগবান জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত করিয়া আপনার সদৃশ করিয়া লইবার পথে পরিচালিত করিতেছেন এবং স্বীয় পবিত্র চরণকমল স্পর্শ করিবার অধিকার দিয়াছেন, সেই মানুষ আজ বাসনার অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়া সমগ্র ধরণীকে এক সুবৃহৎ শ্মশানভূমিতে পরিণত করিতে উদ্যত। আজ ইউরোপীয়গণের একমাত্র এই চিন্তা যে কে কোন্ উপায়ে কত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির বধসাধন করিতে পারে। জ্ঞান, প্রেম, ধর্ম্ম এই সকল বিষয়কে মানুষ আজ ভ্রান্তিপূর্ণ ইতিহাসের কথা বলিতে চাহে। এমন কি, জ্ঞানধর্ম্মকে মানুষ আজ বর্ত্তমান যুগের অযোগ্য ও উপহাসের বিষয় বলিয়া এবং পরস্পরের নিধন-সাধক সুদীর্ঘ সংগ্রামকে শ্রেষ্ঠতম নীতি বলিয়া সপ্রমাণ করিতে উদ্যত। মৃত্যু যে আমাদের চতুর্দ্দিকে কিরূপ বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া আছে, বাসনার ফলে বিনাশ যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবী, যুদ্ধক্ষেত্র তাহা আমাদের চক্ষের নিকটে আনিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখাইয়া দিতেছে, তথাপি বাসনার কি অজেয় বল, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষার কি অপরিমেয় শক্তি যে মৃত্যুকে এত নিকটে দেখিয়া এবং অশান্তির কঠোর দুর্জ্জয় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেও মৃত্যুকামী শক্তি-সমূহ সংগ্রামের অগ্নিকুণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না। এত অশান্তিও যে মানুষের সহ্য হয় ইহাই আশ্চর্য্য।

সংসারে যতই কেন বৃহৎ মৃত্যুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক না, অশান্তির যতই কেন বৃহৎ ঘূর্ণাবায়ুর বিভীষিকা আমাদিগকে ভয়প্রদর্শন করুক না, সেই যজ্ঞ ও বিভীষিকার মধ্যেও আমরা শান্তিচরধারী মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের মঙ্গলহস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই ঘোর অশান্তি, এই করাল মৃত্যু যজ্ঞ হইতেও গত মাঘোৎসবে আমরা যে মহাবাণী লাভ করিয়াছি, অন্যোন্যসাহচর্য্যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ সেই মহাবাণী বজ্রনির্ঘোষে স্বীয় বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চারিদিকের অস্ত্রের ঝনঝনা, লক্ষ লক্ষ গোলাগুলির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য হইতেও এই মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি দিবানিশি উত্থিত হইতেছে। চারিদিক হইতেই এই এক আর্ত্তনাদ উঠিতেছে যে, পৃথিবীর সুখে আর কাজ নাই, নিভৃতনীরব ধ্যান অবলম্বন কর, জ্ঞানে প্রেমে উন্নত হইবার পথে পরস্পরকে সাহায্য কর, এবং নরহত্যার পরিবর্ত্তে মানবপ্রীতির মহামন্ত্র অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধনে নিরত হও। ঐ যে ভারতের কুরু-ক্ষেত্র সংগ্রামের পর ধর্ম্মের জন্য মহা কাতরতা জাগ্রত হইয়াছিল, আজ ইউরোপেরও এই ভয়াবহ সমরের পর সেই প্রকার কাতরতা, ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মের জন্য সেই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে—যদিও এখনও তাহা অন্তঃ-সলিলভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সম্পূর্ণ ব্যক্ত আকার ধারণ করে নাই।

এই তো অবসর যখন আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ মহামন্ত্রের সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই তো সময় যখন আমা-দিগকে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সকল সাধু ঋষিদিগের সহিত একপ্রাণ হইয়া বাসনা, স্বার্থ-পরতা, আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া অজ্ঞা-নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে; জগতবাসীর নিকটে সকল হইতে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা স্থির কথা যে পাশ্চাত্য জাতিগণ মুখে যতই অস্বী-কার করুন না কেন, অন্তরে তাঁহারা এই ভারতের নিকটেই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব, তাঁহাকে লাভ করিবার প্রকৃত প্রণালী প্রভৃতি শুনিবার ও শিখিবার প্রত্যাশা করেন। আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার্থী-গণ যখন আমাদের নিকটে সেই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য উপস্থিত হইবেন, তখন যেন তাঁহা-দিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে না হয়।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা ভগবানের উপাসনার পথে সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে আমাদের কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সে বিষয়ে যেমন আমাদের নিজেরও শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি অপরাপর সাধুভক্তদিগের নিকটেও সাহায্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। সংসারের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়েও অন্যোন্যসাহায্য নিতান্ত

আবশ্যক—অপরিহার্য্য বলিতে পারি। এই অন্যোন্য-সাহায্য পাইবার জন্যই সমাজ, মণ্ডলী প্রভৃতির ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে আমাদের আপনাদিগকে সংবদ্ধ করিতে হয়—সংসারে থাকিতে গেলেই এইরূপ সংবদ্ধ না হইয়া উপায় নাই। একদিকে আমাদের হৃদয়কে বিশ্বজগতের সহিত এক সুরে বাঁধিতে হইবে; আবার সেই সুরের সঙ্গে সমতানে ঝঙ্কার দিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ সমাজের প্রতি নিজ নিজ মণ্ডলীর প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে অপরাঙ্মুখ হইতে হইবে। আমরা ব্রহ্মাণ্ডের এক অংশের অধিবাসী বলিয়া আমাদের চক্ষু আমাদের হৃদয় ঐ সুবিশাল আকাশের সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া যাইতে পারে না, আমাদের মনে সময়ে সময়ে তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধের কথা জাগ্রত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই পৃথিবীর যে ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রহিয়াছে, সেই অংশের প্রতি কি অমনোযোগী থাকিতে পারি? কখনই নহে। সেরূপ করিলে আমাদের পদে পদে বিপদে পড়িবারই সম্ভাবনা। আপনাকে বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া মানবপ্রীতির মহামন্ত্রে সংসিদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে অগ্রসর হও, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যোন্যসাহচর্য্যের মূল শিক্ষাস্থল নিজের পরিবার নিজের মণ্ডলী নিজের সমাজের ক্ষুদ্র ভূমিকেও ভুলিতে পারিবে না—ভুলিলে মহাভ্রান্তিকূপে পড়িয়া পরিণামে ক্লেশ পাইবে; বিশ্বপ্রেমে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বর যেমন সমগ্র বিশ্বচরাচরের নিয়ামক, তেমনি তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম কীটানুকীটেরও ব্যথার ব্যথী হইয়া তাহার যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন—এই কথাটার মর্ম্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে সংসারের অধিবাসী হইয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

উপসংহারে আমাদের শেষ কথা এইটুকু বলিতে চাহি যে ধর্ম্মসাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন আমাদিগের নিজের চেষ্টা আবশ্যক, যেমন পরস্পরের সাহায্য অপরিহার্য্য, সেইরূপ ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে ব্রহ্মকৃপা চাই-ই চাই। ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত সকলই পণ্ডশ্রম। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে গয়টের মতামত।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ধর্ম্মে উদার সমদৃষ্টি।

"পিতা নোঽসি"* প্রার্থনাটি অতীব উত্তম;
কত পাপী এই মন্ত্রে গিয়াছে তরিয়া;
যদি কেহ উল্টা করি' বলে "নোঽসি পিতা,"
ক্ষতি কি? তাতেও হবে পাপীর উদ্ধার।

দেব ও মানবের কাজ।

মানব যা' করে ইচ্ছা—মর্ত্ত্যলোকে হয় অনুভূত;
যা' দেওয়া উচিত তারে—দেবলোকে আছে শুধু জানা।
পূর্ণ মানবের মন সংকল্পে; কিন্তু লয়ে যাওয়া
চিরমঙ্গল চিরসুন্দরের পথে—সেই কাজ
দেবতার;—ছেড়ে দেও দেবতারে দেবতার কাজ।

জ্ঞান—মানবীয় ও দৈব।

বৃথা মানবের জ্ঞান, যদি নাহি করে কর্ণপাত
শুনিবারে মন দিয়া সুমঙ্গল দেবতার বাণী,
যদি কোন সাধুজন মোহবশে করে পাপাচার,
প্রায়শ্চিত্ততরে তার দেবতারা করেন বিধান
এ-হেন কঠোর কাজ—মানুষের যাহা সাধ্যাতীত;
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, দেখ—সেই বীর হইয়া বিজয়ী
অব্যর্থ সাধনাবলে সাধে সেই দেবতার কাজ,
আর, অবাক্ হইয়া যায় বিশ্বজন তাহে।

বিধাতার দুই মুখ—রুদ্র ও প্রসন্ন।

যে দেবতা প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিময়ী শক্তির প্রভাবে
জলদের বুকে ভরি' রেখে দেন সহস্র অশনি,
—ঝটিকা-ঝঞ্ঝার মাঝে, মুহুর্মুহু বজ্রনাদ সহ
বৃষ্টি আনি' তৃষাকুল ধরণীরে করেন প্লাবিত,
সেই রুদ্র দেবতারি দয়া আসি, ঘোর অমঙ্গলে
করে পুন মঙ্গলে পরিণত; তখন আবার
ভয়াকুল কম্পমান মানবের অন্ধকারমুখে
হাসিটি ফুটিয়া উঠে,—মেঘমুক্ত প্রভাকর যথা
গাছের পাতায় লগ্ন বিন্দু বিন্দু শিশির-দর্পণে
প্রতিবিম্বিত করে আপন মুরতি শতবার।

---

* *Pater noster* (ল্যাটিন ভাষা) অর্থ—"পিতা নোঽসি"

ভগবানের কার্য্য প্রণালী।

কেমনে? কোথায়? কবে?—নাহি দেন দেবতা উত্তর।
সংকল্প তাঁহার যা' নিশ্চয়ই তা' করেন সাধন,
তোমার 'কেন'র প্রতি লেশমাত্র না করি দৃক্‌পাত।

অসীম।

সসীম দৃষ্টিতে তব চাহ যদি দেখিতে অসীমে,
চাহ বামে, দক্ষিণে, সর্ব্বত্র সসীমমাঝারে।

আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর-জ্ঞান।

আপনা জানিতে চাহ, অথচ না মানিবে ঈশ্বরে?
যে আরম্ভে' এইরূপে, অবশেষে পূজা জেনো তার
মৃৎপিণ্ডে একদিন অন্ততঃ হবে অবসান।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপনের বিবরণে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া তাহারই ফলস্বরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এবং বিশেষভাবে তদানীন্তন খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের "ছেলে ধরা" রোগের প্রসার প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ উক্ত সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মিশনরিদিগের দৃষ্টান্তেই বুঝিয়াছিলেন যে সভার অধীনে একটী বিদ্যালয় খুলিলে তাহা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য সংসাধনের বিশেষ সাহায্য হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে বাল্যকাল অবধি যদি ছাত্রদিগের হৃদয়ে বেদান্ত প্রভৃতি জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তবেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রখর গতি অনেক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" সংস্থাপন করিলেন।

অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে ইংরাজী ভাষাতেই প্রধানত শিক্ষা দেওয়া হইত, দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। এই কারণে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে নাই। সে সময়ে ইংরাজী ভালরূপ শিক্ষা করিলে উচ্চপদ, সম্মান ও অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা ছিল। সে সকল সুবিধা ছাড়িয়া কয়জন পিতামাতা স্বীয় সন্তানদিগকে কেবল জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে প্রেরণ করিবেন? দেবেন্দ্রনাথ তীব্র জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে গঠিত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় অতটা জাতীয়ভাব গ্রহণ করিবার জন্য দেশ প্রস্তুত হয় নাই—আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে কি না সন্দেহ। অতিমাত্র জাতীয়তাই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার মৃত্যুর কারণ হইল। ১৭৬২ শকে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) ঐ পাঠশালা সংস্থাপিত হয় এবং ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বৎসর দুই চলিয়া ১৭৬৪ শকের শেষে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) ইহা কলিকাতা মহানগরী হইতে উঠিয়া গেল। পাঠশালাটী স্থায়ী হইলে সম্ভবত দেশের উন্নতি ক্ষিপ্রতর হইত।

"সভ্যেরা (তত্ত্ববোধিনী সভার) বিবেচনা করিলেন যে, এরূপ এক পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাহাতে বালকেরা স্বদেশীয় ভাষাতে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং সুশিক্ষিত হইয়া সভার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে তাঁহাদিগের সহযোগী হয়।" এই বিদ্যালয়ে "অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যত নানবিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইত।" "সভ্যদিগের অভিপ্রায়মত প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহাদিগের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয় ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তাহারা নয় ঘণ্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত।" "ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে (বালকেরা) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া পাঠশালা ভগ্নপ্রায় হইল।" তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বুঝিবার ভুল হইয়াছিল যে বালকেরা প্রাতঃকালে তিন ঘণ্টা ধরিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার পর যথারীতি পাঠাভ্যাস করিয়া আবার অন্য বিদ্যালয়ে যাইতে সক্ষম হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বৎসর দুই চলিবার পর দেবেন্দ্রপ্রমুখ সভ্যগণ নিজেদের ভ্রম

যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদিগের "এপ্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্ত বোধ হইল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্য অর্পণ করিতে পারে।" কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার এই সময়ে যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, অথবা বলিতে গেলে, প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভাতে যতটুকু সাহায্য করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহাতে সভার নিজের এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার পর অন্যান্য স্কুলকলেজের ন্যায় বিস্তৃত আকারের এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে পল্লীগ্রামে এরূপ এক বিদ্যালয় খুলিলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে পারিবে এবং সেই বিদ্যালয়ের সাহায্যে পল্লীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রভাব বিস্তার করা বিশেষ কঠিন হইবে না। এখন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্ গ্রামে পাঠশালাটী স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া এই স্থির হইল যে বংশবাটী গ্রামই (বাঁশবেড়ে) পাঠশালা স্থাপনের জন্য সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। এই গ্রাম পণ্ডিতদিগের আবাসভূমি বলিয়া খ্যাত ছিল এবং এই গ্রামে তত্ত্ববোধিনী সভারও কয়েকজন সভ্যের বাসগৃহ ছিল। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত হইল, তাহার পর বৎসর ১৭৬৫ শকে ১৮ই বৈশাখ রবিবার (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) দেবেন্দ্রনাথ নবোৎসাহে বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা খুলিলেন, কলিকাতার পাঠশালা উঠিয়া গেল।

কলিকাতায় এই পাঠশালা সংস্থাপিত হওয়া অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু তিনি মহানগরীর নানাবিধ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া বংশবাটী গ্রামে যাইতে অস্বীকার করায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত বংশবাটীনিবাসী কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন। রামগোপাল ঘোষ পাঠশালার পরিদর্শকের পদ স্বীকার করিলেন।

এই পাঠশালায় বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা হইত। একশতের অধিক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত না এবং ১৪ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন বালককে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইত না। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় বয়স ও সংখ্যা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বহুপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা মূলত সেই সকল নিয়মে পরিচালিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে বরণ করা, "এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করা এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ করা" তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনস্থ এই পাঠশালার জন্মগ্রহণের কারণ। এই পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় একটী ছাত্র দীননাথ রায় যে রচনা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইহার উদ্দেশ্য সহজে উপলব্ধ হইবে। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:—"নানা দেশের নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ও বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে অনায়াসে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান" করা হইতেছে। * * * "স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে? স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তন্নিমিত্তই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।"

এই বংশবাটীর পাঠশালার প্রথম পরীক্ষার পর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। "বিশেষত শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুই জন ছাত্রকে বঙ্গভাষাতে নিপুণতার জন্য পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। ৩৯ জন ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় একত্রিংশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন।"

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুদিগের কৌতূ-

হল চরিতার্থ করিতে পারিবে বিবেচনায় এই পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রথম শ্রেণী—৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—কঠোপনিষৎ; রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক; তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা; ব্যাকরণ; পদার্থবিদ্যা; ভূগোল; অঙ্ক। English studies —Reader No 4; Poetical Reader No2; Grammar; History of Bengal.

"দ্বিতীয় শ্রেণী—১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—ব্যাকরণ; জ্ঞানার্ণব; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No. 3; Poetical Reader No 1; Grammar; History of Bengal.

"তৃতীয় শ্রেণী—২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—বর্ণমালা ২ ভাগ; মনোরঞ্জন ইতিহাস; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No 2; Spelling No 2

"চতুর্থ শ্রেণী—২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—নীতিকথা ২ ভাগ; বর্ণমালা ২ ভাগ; অঙ্ক। English studies—Easy Primer.

"পঞ্চম শ্রেণী—২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—নীতিকথা প্রথম ভাগ; বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। English studies—Easy Primer.

"ষষ্ঠ শ্রেণী—৩৬ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য-গ্রন্থ—বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। English studies—Easy Primer.

বংশবাটীর ন্যায় পল্লীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয়ের জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিবার আশা করা বৃথা। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাদি পাঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের কারণে সাকারবাদী পণ্ডিতদিগের সেই পাঠশালার প্রতি কোনই সহানুভূতি থাকিবার কারণ ছিল না, আবার ইংরাজী অতি অল্পমাত্রায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকাতে চাকরীপ্রিয় অথবা ইংরাজী ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণেরও তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকিবার কথা ছিল না। আর তাহার উপর, ১৭৬৮ শকে (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে) বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোক প্রাপ্তির কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈষয়িক ব্যাপারেও কিছুকাল বিশেষ গোলযোগ পড়িয়া যাওয়াতে তিনিও এই পাঠশালায় প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করিতে পারেন নাই। অগত্যা ১৭৬৮ শকে পাঠশালাটী অর্থাভাবে উঠিয়া গেল।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করা এই পাঠশালার অন্যতর উদ্দেশ্য থাকাতে পাঠশালাটী স্বল্প জীবনকালের মধ্যেও বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। এই পাঠশালাসূত্রেই প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকপ্রকাশের সূত্রপাত হইল। ইতিপূর্ব্বে এ দেশের পাঠ্য পুস্তকগুলি প্রায়ই ইংরাজদিগের দ্বারা লিখিত বা অনুবাদিত অথবা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা ঠিক ইংরাজী আদর্শে সঙ্কলিত হইত। ভাষার জটিলতা ও কদর্য্যতায় সেগুলি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য হইত। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাসূত্রে দেশের সেই অভাব দূর হইবার সূত্রপাত হইল।

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্বকালের পাঠ্য পুস্তক— "(১) পুরুষ পরীক্ষা, (২) পশ্বাবলী, (৩) মার্ষম্যান সাহেবের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস, (৪) ফার্গুসন সাহেবের লিখিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা— শ্রীযুক্ত যাতি (Yate) সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত, (৫) শ্রীযুক্ত যাতি সাহেবের কৃত পদার্থবিদ্যাসার, (৬) শ্রীযুক্ত জান ম্যাক (John Mack) সাহেব কৃত কিমিয়াবিদ্যাসার, (৭) রাজাবলী, (৮) কীথ সাহেবের কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (৯) জ্ঞানার্ণব।"

তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যে রচিত অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি এবং সভার প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অধ্যাপনার নিমিত্ত বিরচিত হইয়া উত্তরকালের পাঠ্য পুস্তকের আদর্শ স্বরূপে ১৭৬০ শকে (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

মিলনের ভূমি।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমাদের দেশ নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নানা মতামতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, আধ্যাত্মিক জগতে নানা

---

* বিগত ২৫শে মাঘ খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে ষষ্ঠ বাৎসরিক সারস্বত সম্মিলন উপলক্ষে পঠিত।

কোলাহল কলরব চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইয়া অবিরাম বিচ্ছেদবিপ্লবের বাণী নিনাদিত করিতে থাকিলেও, সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে মিলনের কি ভূমি নাই? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব আছে বই কি,—উহা শ্রুতিনিহিত সত্য। শ্রুতির নামে সমস্ত দ্বন্দ্ব নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সমস্ত কলরব উপশান্ত হয়। সমগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে এমন কেহ আছেন কি না জানি না যিনি শ্রুতি প্রমাণের নামে, আপনার মস্তককে অবনত না করেন। শ্রুতির বিরোধী হইয়া স্মৃতি আপনার দোর্দ্দণ্ড শাসন পরিচালিত করিতে পারে নাই; বেদান্ত আপনার মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই, কোন নব ধর্ম্ম এদেশে তিষ্ঠিতে পারে নাই, কোন সম্প্রদায় এদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। বেদ উপনিষদের ভাব এমনই গুরু-গম্ভীর ভাবে সকলের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে এমনই বিচিত্র ভাবে নিয়মিত করিতেছে। সমগ্র মুসলমানসমাজ বাহাত্তরটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিলেও কোরাণের নামে, হজরত মহম্মদের নামে, সকলেই অবনতমস্তক। বাইবেলের নামে, ধর্ম্মপদের নামে, সমগ্র খৃষ্টিয়ান জাতি ও বৌদ্ধগণ মিলিত ও সন্ত্রস্ত। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ধর্ম্ম এক এক সুপ্রশস্ত মিলনক্ষেত্র, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রেমের চক্ষে পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে পারে, আপনার বলিয়া পরস্পরকে চিনিয়া লইতে পারে।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও হিন্দুমুসলমান আমাদের একটি বিশেষ মিলনক্ষেত্র রহিয়াছে,—তাহা ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন কর, যেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপ চলিতেছে, তুমি যদি কলাবিৎ হও, মিলনের ভূমি দেখিতে পাইবে, তোমারই সুপরিচিত সুর-লহরীর মূর্চ্ছনা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

তুমি যদি কাব্যরসের রসাস্বাদক হও, আরও উচ্চতর মিলনের ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে। শুধু এই ভারতের সঙ্কীর্ণ পরিধির ভিতরে কেন, সমুদ্র পারে দেশদেশান্তরে গমন কর, দেশবিদেশস্থ সকল কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভিতরে ভাবের চিন্তার কল্পনার অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া যাইবে। এই যে রসবোধ ইহা বিজিত ও বিজেতার সম্বন্ধ ভুলাইয়া দেয়, কৃষ্ণত্বক ও শুক্লত্বকের পার্থক্য ভুলাইয়া দেয়, এক উদার সৌহার্দ্দ্যে পরস্পরকে সম্বন্ধ করিয়া দেয়। এই যে সেদিন কবিচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ সুসভ্য ও স্বাধীন ইউরোপে নোবল প্রাইজ স্বরূপ অর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের মধ্যে ছোট খাট, বিশাল ও বিপুল, কত অসংখ্য মিলনের ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা সুকঠিন। ভাবের ও চিন্তার মিল রহিয়াছে বলিয়া পণ্ডিত পণ্ডিতের সহিত, ব্যবহারাজীব আইনজ্ঞের সহিত, দরিদ্র নিঃস্বের সহিত, ধনী ধনাঢ্যের সহিত মিলিত হইতে চাহে।

মহাসাগর মধ্যে দাঁড়াইয়া নানা ব্যবধান তুলিয়া পৃথিবীতে মহাদেশের সৃষ্টি করিলেও, দেশ নানা প্রদেশে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইলেও, নানা ভাব, নানা চিন্তা, নানা সাধনা মনুষ্যকে পৃথকীকৃত করিবার চেষ্টা পাইলেও মানুষ পরস্পর মিলিত হইবার জন্য চিরদিনের জন্য লালায়িত। সে মিলনের ক্ষেত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ যে আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি, কোন্ মিলনের মন্ত্র আজ আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া এখানে টানিয়া আনিয়াছে? অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিব, বঙ্গীয় কবিকুলের রসধারা পান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার দারুণ স্পৃহা। কবিকুল যে মধু সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র হইয়া সেই মধু পান করিয়া ধন্য হইব ইহাই আমাদের লক্ষ্য। প্রতিদিনের প্রতি অবসরে যাঁহাদের কবিতা পাঠে শোক-তাপ, দৈন্য-দুর্ভিক্ষ ভুলিয়াছি, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া আজ নিবেদন করিব;—তাহাই এই মিলনক্ষেত্রের সার্থকতা।

মিলনই প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব। প্রতি পরিবারের প্রত্যেক নরনারী আপনাপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া মিলনের মন্ত্র ঘোষণা করে বলিয়াই পরিবার-গঠন সম্ভবপর। কয়েকটি পরিবার যখন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া মিলিতে চায়, তখনই সমাজগঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি

সমাজ মিলিত হইয়া যখন আপনাপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে, তখনই আপনার দেশ বলিয়া একটি জিনিষ সম্ভবপর হইয়া উঠে। মিলনই মনুষ্যত্বের মধ্য-বিন্দু। অপ্রেম অমিল মনুষ্যত্বকে চূর্ণ করিয়া দেয়। এই মিলনের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত হইতে হইবে, মিলনক্ষেত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কবির নাম লইয়া হেমচন্দ্র পাঠাগার বলিয়া যে সভার প্রতিষ্ঠা, তাহার ভিতরে অমিলনের অপ্রেমের কোন স্থান নাই। আপনার স্বাতন্ত্র্য পরিহার কর, মাইকেলের নামে, হেমচন্দ্রের নামে, বঙ্গীয় কবিকুলের নামে সকল অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দাও।

আমাদিগকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমাদিগকে এই মহাসত্য পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় হৃদয়ে খোদিত করিয়া রাখিতে হইবে, যে এই সমস্ত ছোট খাট মিলনে যতই আমরা অভ্যস্ত হইতে পারিব, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা পরিহার করিতে পারিব, মিলনের ক্ষেত্র বাহির করিয়া প্রেমের সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে পারিব, এমন একদিন আসিবে যখন ভগবানের সহিত মহামিলন আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে, এবং আমাদের জীবন শতদল পদ্মের ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে এবং আমরা পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আমার বিবাহ।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যাদিগের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ সর্ব্বপ্রথম আদিব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে অপৌত্তলিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পরেই মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহও উক্ত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া মহর্ষির পরিবারের মধ্যে, বঙ্গদেশে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে অপৌত্তলিক হিন্দুবিবাহের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। সেই বিবাহের সমুদয় পদ্ধতিটী ১৭৮৫ শকের পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। হাবড়ার অন্তর্গত সাঁত্রাগাছি নিবাসী পরসেবানিরত মহাত্মা ৺হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নীপময়ী দেবীর সহিত হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সাঁত্রাগাছিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে ইহাই সর্ব্বপ্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে এই বিবাহ উপলক্ষে গঙ্গার উভয় উপকূলেই, কলিকাতা ও হাবড়া উভয়ত্রই, কি মহা আন্দোলন ও আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। হাবড়াতে এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে গুজব উঠিয়াছিল যে কন্যাকর্ত্তার বন্ধুগণ এ বিবাহ হইতে দিবেন না, পথের মধ্যেই বরপক্ষীয় যাত্রীবর্গকে মারিয়া তাড়াইয়া দিবেন, কন্যাকর্ত্তার গৃহে পৌছিতেই দিবেন না। বলা বাহুল্য যে ইহাতে দেবেন্দ্রনাথও পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না, অথবা মহাবলশালী হেমেন্দ্রনাথও ভীত হইবার লোক ছিলেন না। ঐ প্রকার গুজব উঠিবার কারণে দেবেন্দ্রনাথকে পুলিসের রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বোধ হয়, হেমেন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত কোথায় কি ভাবে কি কার্য্য হইয়াছিল তাহা সমস্তই "আমার বিবাহ" নাম দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান ঋতেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথের হস্তলিপিসংগ্রহের মধ্যে আজ কয়েক বৎসর হইল এইটী প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাহা আমাদিগের হস্তগত হওয়ায় উহার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে আমরাও তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবেন যে এই অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের সময়ে মহর্ষিদেবের পরিবারের সকলেই কিরূপ জ্বলন্ত ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মগণ সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণতার সহিত তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরেই নবশ্রী ধারণ করিবে সন্দেহ নাই।

"আমার বিবাহ"

সপ্তদশশত পঞ্চাশীতি শকীয় অগ্রহায়ণের দশম দিবসে ও বুধবাসরে বেলা অষ্ট ঘটিকার সময় আমার গায়ে হলুদ হয়।

বাহির ও অন্তঃপুর বন্ধুজনে ও বান্ধবীয় মহিলা-গণে পূরিত হইলে মাতা আমাকে অবরোধে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিকের হুলাহুলি ও বাদ্য-ধ্বনির মধ্যে আমার গাত্রে হরিদ্রাতৈল অর্পণ করিয়া স্নাত হইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আমি আদেশানুসারে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানশালায় স্নান সমাপনের পর পবিত্র বারাণসী-ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মাতার ক্রোড়সমীপে তাঁহার স্নেহ ও আনন্দ দৃষ্টে বিগলিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে মাতা কত স্নেহ ও কি আনন্দেই আমার কণ্ঠদেশ মুক্তামালা ও হীরকহারে, অঙ্গুলি ও মনিবন্ধ অঙ্গুরী ও বলয়ে ভূষিত করিয়া শিরোদেশে ও চন্দনচর্চ্চিত ললাট-স্থলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আশী-র্ব্বাদমাল্য লইয়া, "বৎস ঈশ্বর তোমার চিরমঙ্গল করুন" এই বলিয়া আমার কণ্ঠে দিলে, আমি সজল নয়নে তাঁহার চরণে অবনত হইয়া রহিলাম। অনন্তর মাতা মদীয় ভগিনী ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য পুরন্ধ্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হুলাহুলির সহিত অবরোধের উপাসনা মন্দিরে আমাকে লইয়া গেলেন। পিতা সেখানে বেদীতে আসীন ছিলেন, তিনি ঝটিতি উঠিয়া আসিয়া আমার সম্মুখবর্ত্তী হইলে আমি তাঁহার ক্রোড়ের সম্মুখে ভক্তিভরে ও অবনতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতে লাগি-লাম; পিতা তাঁহার হৃদয়দেশে আমাকে আকর্ষণ করিয়া মস্তকে হস্ত বুলাইয়া গদগদ বচনে বলি-লেন,—

"হেমেন্দ্র তুমি অদ্য নূতন সোপানে উত্থিত হইতেছ, জীবনে নূতন রাজ্যে আরোহণ করিতেছ, সাবধান পূর্ব্বক পদনিক্ষেপ করিবে; সম্মুখে রাশি রাশি বিপদ সম্পদ উপস্থিত হইবে, সকল বহন করিবে; ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হইবে, সকল বিপদ সম্পদ লঘু হইবে। তুমি যেমন আপনার উন্নতির চেষ্টা করিবে সেইরূপ তোমার সহধর্ম্মিণীরও উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইবে—একহৃদয়ে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল বিধান করুন। তাঁহাকে এই উপাসনামন্দিরে স্মরণ করিয়া ভক্তি-ভরে প্রণাম কর।"

আমি আদেশানুসারে ভক্তিসমাবেশিতচিত্তে পরমপিতার চরণে প্রণত হইয়া তৎপরে পিতার চরণে অবনত হইলাম। পিতা মস্তকে হর্ষজড়পাণি পরামৃশণ করিয়া 'ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল সম্পাদন করুন' এই বলিয়া অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ করি-লেন। তৎপরে মাতার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া উত্থিত হইলে তিনি শিরদেশে চুম্বন করিয়া 'বৎস পরমেশ্বর তোমার কল্যাণ করুন' আশীর্ব্বাদ করি-লেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে গুরুজনদিগের নিকট অবনত হইলে সকলেরই নিকট হইতে কল্যাণ-সূচক নানাবিধ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া পিতা ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবে একত্র হইয়া অবিবাহিত ভোজন সমাপন করিলাম।

পরদিবস একাদশ অগ্রহায়ণের বৃহস্পতিবারে রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় বিবাহ কর্ম্ম আরম্ভ হয়:—

প্রাতঃকাল পবিত্রভাবে চলিয়া গেল। বৈকালে বিবাহস্থলে গমন করিবার পূর্ব্বে মাতা আমার দেহকে সুমার্জ্জিত ললাটস্থল চন্দনে চর্চ্চিত এবং স্নেহের সহিত সেই সেইরূপে ভূষিত করিয়া হুলা-হুলির মধ্যে দিয়া স্ত্রীজনাকীর্ণ উপাসনামন্দিরে আমাকে লইয়া গেলেন। পিতা দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিলেন,—

"বৎস! শুভ বিবাহস্থলে যাত্রার পূর্ব্বে সেই মঙ্গলময়ী গৃহদেবতার চরণে প্রণিপাত কর; তিনি মাতার ন্যায় তোমার মঙ্গল বিধান করুন। আমি ঈশ্বরের চরণে অবনত হইয়া ক্রমে সকল গুরু-জনকেই প্রণাম করিলাম। মাতাকে "মা আমি তোমার সেবিকা আনিতে যাই" এই বাক্যটি বিশেষ ভাবে বলিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম। পরে মুকুটশিরে আনন্দহুলাহুলি ও বিবিধ বাদ্য-ধ্বনির মধ্যে ভ্রাতৃগণশোভিত চতুরস্রযানে আরোহণ করিয়া পিতা সুহৃদ সখা সহচর অনুচর অনুযাত্রে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে লৌহবর্ত্মীয় বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া গঙ্গা-নদীর শ্যামল পারে উপনীত হইলাম এবং আলোক-ময় পথের মধ্য দিয়া মনুষ্যবাহ্য চতুরস্রযানে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলে মহাড়ম্বরে বরযাত্র কন্যাযাত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধপ্রকার সুমধুর বাদ্যের তালে তালে আমার অগ্র পশ্চাৎ

ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহা ধূমধামে নিস্কোষিত-অসি শান্তিরক্ষক ও নগরপাল-দিগের ব্যূহরচনার অভ্যন্তরস্থ বিবাহস্থলে অবতরণ করিলাম। সেখানে দীপান্বিত সভামণ্ডপে কিশলয়-পুষ্পমালা-সুসজ্জিত অনুযাত্রবর্গ মহিলাগণের হুলাহুলি ও আতর গোলাপের ছড়াছড়ি মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলে এবং বৈতালিকগণ উচ্চরবে ঠাকুর-বংশ কীর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথাপদ্ধত্যনুসারে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক মঙ্গলবাচন, অর্চ্চনা, বরণ অন্তঃপুরবরণ, উপাসনা ও সম্প্রদান ও কন্যাগ্রহণ এবং দক্ষিণান্ত তাবৎ কার্য্য ঈশ্বরকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল।

ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি বিবাহপুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি এখানে পরিত্যক্ত হইয়া লিখিত হইল। অন্তঃপুরবরণ নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আমি অন্তঃপুরে নীত হইলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী পরিবারস্থ স্ত্রীজনসহকারে অগ্রসর হইয়া আমাকে আসনোপরি দণ্ডায়মান করিলেন ও বধূকে আমার চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আনয়ন করিলেন। অনন্তর মাল্য বদল হইলে অর্থাৎ আমার গলের মাল্য আমাকর্ত্তৃক বধূগলে ও বধূর গলের মালা আমার গলে অর্পিত হইলে, তিনি আমার বামভাগে আনীত হইলেন। অনন্তর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকটে উভয়ে অবনত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে সভাতলে প্রেরিত হইলাম। তখন সমস্বরীরব-মিশ্রিত সঙ্গীতপুরঃসর উপাসনা আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের অগ্রে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য বেদী হইতে এই উদ্বোধন বলিলেন—"সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ এই সমুদয় জগৎ শাসন করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন। তিনি এই শুভ বিবাহস্থলে বিরাজ করিতেছেন। আমরা মিলিত হইয়া শুভ বিবাহের অগ্রে প্রীতিপূর্ব্বক হৃদয় মধ্যে নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময় মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর দক্ষিণান্ত কন্যাসম্প্রদান সাঙ্গ হইলে আমাকে অন্তঃপুরের বাসর ঘরে লইয়া গেল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকারণ ব্রাহ্মপত্নী ব্যতীত অব্রাহ্ম মহিলারা প্রায় কেহই ছিলেন না; সুতরাং অব্রাহ্মিক পরিহাস সহ্য করিতে হইবে না দেখিয়া আমার মন আরো প্রসন্নতা লাভ করিল। তাঁহারা দুই রজত থালে দুই জনার জন্য মিষ্টান্ন সামগ্রী ও বাটাতে পানমশলা প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিলেন, এবং সেই সকল কিছু কিছু করিয়া আমা-কর্ত্তৃক বধূমুখে ও তাঁহা কর্ত্তৃক আমার মুখে উত্তোলন করিয়া দিলেন। অনন্তর নানান্ প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; পাছে কেহ আমার সহিত অসঙ্গত পরিহাস করেন এইজন্য আমি পড়াশুনা ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কথা উপস্থিত করিলাম এবং আমাদিগের ঘরের মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতভন্ত ও ইংরাজি পড়িতে পারেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আচম্বিত করিয়া দিলাম। এই প্রকার নানান্ কথায় দুই এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে শ্বশুর মহাশয় অনুযাত্রদিগের ভোজন বিধান সমাপন করিয়া, দেখি যে আমারি ঘরে আসিলেন। অসম্ভাবিতরূপে তাঁহাকে পাইয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; তিনি আনন্দাশ্রুর সহিত আমার মুখে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিলেন এবং নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি প্রণিপাত করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের রীত্যনুসারে বিবাহ দেওয়াতে তাঁহার অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে;—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় জনকজননী ও ভ্রাতাভগিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রী ও বাটীর সকলের বিশেষ স্নেহভাজন আপনার শিশু সমভিব্যাহারে স্থানান্তরিত এবং ভিন্ন হইয়াছেন; গ্রামের সকল লোকও তাঁহাকে একঘরী করিয়াছে। কিন্তু এ প্রকার হওয়াতেও শ্বশুর মহাশয়ের উৎসাহের কিছুই খর্ব্বতা দৃষ্ট হইল না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিষয় বলিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাগল; পাগল না হইলে কি ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হইতে পারে। আমাকে বলিলেন যে, "অদ্য তোমাকে পাইয়া আমার চির মনস্কাম পূর্ণ হইল। যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একমাত্র পৌত্রের তরে পরশ্ব হইতে নিরন্তর ক্রন্দন করিতেছি, কিন্তু আজ আহ্লাদ আমাতে ধরে না; যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইয়াছি, তেমনি বাবা আজ তোমাকে পাইয়াছি। এখন কেবল এই প্রার্থনা করি যে, ঈশ্বর তোমাদের নিত্য

নিত্য দুইজনার উন্নতি করিতে থাকুন।” অনন্তর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির কথা হইতে লাগিল—তিনি উৎসাহ পূর্ব্বক বলিলেন যে, “অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্ম ব্যতীত তো ব্রাহ্মই নয় এবং বলিলেন এ বিবাহ দ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের কম উন্নতি হইবে” ও নিজ রচিত দুটি একটি গীতও গান করিলেন, যথা—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিল।
মন প্রফুল্ল পুলকিত হইল।
ধর্ম্ম সত্যজ্যোতিঃ, জাতিকুল আহুতি,
আগেতে গ্রহণ করিল।
তাই অহংত্যাগে, ধর্ম্মের অনুরাগে,
ব্রাহ্ম ব্রহ্মদর্শন পাইল।
অভিমান মনে, আমার আমি জ্ঞানে,
ধন জাতি কুল ছিল;
সব বিনাশেতে, ভ্রাতৃভাব চিতে
উদয় হইতে লাগিল।
হলে ঐক্যভাব, হইবেক লাভ,
জ্ঞান আনন্দ সুখমঙ্গল।
অতএব ব্রাহ্ম,ত্যজি সর্ব্বকর্ম্ম,
ব্রহ্ম সুধাপানে মাতিল॥

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই মধুর শর্ব্বরী প্রায় অবসান হইয়া আসিল। আমরা সকলেই সেই এক ঘরে নিদ্রা গেলাম। এবং ঘণ্টাকাল নিদ্রিত থাকিয়াই উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় নবীভূত হইয়াই উত্থিত হইলাম।

দ্বাদশ অগ্রহায়ণ শুক্রবার প্রাতে শ্বশুরবাটী হইতে গৃহে পৌছিলে উদীচ্য কর্ম্ম আরম্ভ হয়—

বিবাহের রাত্রিতে পুরুষদিগের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেও প্রতিবেশিনীগণ প্রায় কেহই সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই, কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে প্রিয় প্রতিবাসীর নূতন প্রকার জামাতা দেখিতে তাঁহাদের কৌতূহল এত বর্দ্ধিত হইল, যে অনেকেই আমাদিগকে দর্শন করিতে তাড়াতাড়ি আগত হইলেন। কিন্তু বোধ করি নূতনবিধ জামাতা দেখিবার বিষয় তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা নানান্ প্রকার কথায় আমাদের প্রতি মনের উচ্ছ্বসিত সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ আমাদিগকে রথাঙ্গমিথুনের সহিত তুলনা করিলেন, আমাকে কেহবা হেমের সহিত উপমা দিলেন, কেহবা যেন ইংরাজের পুত্র এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং বধূবরের মধ্যে অধিক সুন্দর কে এই বিচার হইয়া মীমাংসা হইল যে উভয়েই পরস্পরের অনুরূপ। আমি এই সময়ে ইঁহাদের দৃষ্টি ও দৃষ্টান্তপ্রয়োগের স্থল হইয়া অপ্রস্তুত চৌরের ন্যায় এক একবার মাত্র বিহসন করিতে লাগিলাম। শ্বশ্রূঠাকুরাণী নানাদিক হইতে জামাতার প্রশংসা শুনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বধূবরে একত্রে শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকটে বিদায়কালের প্রণাম করিতে গেলাম। শ্বশুর সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিলেন “পথের বিঘ্ন সকল বিনাশ হউক। ঈশ্বর তোমাদের শান্তি করুন মঙ্গল করুন”। শ্বশ্রূঠাকুরাণী কেবল রোদনই করিতে লাগিলেন। বধূও তাঁহার মাতার অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; আমিও সেই সকল দেখিয়া আর্দ্র হইলাম। অবশেষে পরিবারস্থ নারীরা ঈষৎ বলের সহিত বধূকে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যানাভিমুখে আনয়ন করিতে লাগিলে, তিনি নিষাদনীয়মান একায়ন মৃগীর ন্যায় মাতৃমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতেই যানে আরোহিত হইলেন। এই প্রকারে প্রহৃষ্টমনে অথচ নাতিপ্রহৃষ্ট মনে লোকজনশুদ্ধ সপত্নীক আমি পথিকগণ কর্ত্তৃক নেত্রপেয় হইয়া এবং ত্যক্তান্যকার্য্য যথা তথা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে সমগুণযোগপ্রীতা পুরন্ধ্রীজনার শ্রোত্রপেয় কথা শুনিতে শুনিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

এই সময় হইতে উদীচ্য কর্ম্ম আরম্ভ হইল।

মাতা অন্তঃপুরের নিম্নে আসিয়া যান হইতে পুত্রবধূকে সচুম্বন ক্রোড়ে করিয়া আনন্দের হুলাহুলি ও প্রশংসাবাদের মধ্যে তাঁহার মুখ সস্নেহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উপরে লইয়া গেলেন। আমি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম। অনন্তর মাতা আমাদিগকে দুই আসনোপরি পার্শ্বাপার্শ্বিরূপে দণ্ডায়মান করাইয়া মধুমুখ করিয়া দিলেন। অনন্তর প্রণিপাত পরে সেখান হইতে উপাসনা গৃহে লইয়া গেলে, কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিম্নলিখিতরূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

“যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন

করিলেন, শ্রদ্ধাপ্রীতি কৃতজ্ঞতার সহিত তোমরা তাঁহার পবিত্রচরণে প্রণিপাত কর, তিনি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।”

আমরা উভয়ে ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইলাম। তৎপরে সপত্নীক হইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে উপবিষ্ট হইলে সকলে দর্শনী দিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্নান সমাপন করিয়া বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম।

তাহার পরদিবস তেরই অগ্রহায়ণ শনিবার ১০ ঘটিকার সময় আমার পত্নীর ধর্ম্মদীক্ষা ও সহধর্ম্মিণীকরণ হইল। আমরা দুইজনায় উপাসনামন্দিরের মধ্যস্থলে বেদীর সম্মুখীন হইয়া একৈকবাসনোপরি উপবিষ্ট হইলে, উপাসনাগৃহরক্ষিতা আমার ভগিনী-জ্যেষ্ঠা এক ক্ষৌম উত্তরীয় বস্ত্রে আমাদের দুইজনার দেহ আবৃত্ত করিলে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা সাঙ্গ হইলে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ও নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞানুসারে বধূ ব্রাহ্মিকা হইলেন; পিতা ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন, যথা—

“বৎসে নীপময়ি! সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনদ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিবে। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না। রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবে। কায়মনোবাক্যে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। পাপচিন্তা পাপ-আলাপ ও পাপ-অনুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবে। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপ আচরণ কর, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইবে, পতিব্রতা হইয়া পতির হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

পরে আমি আদিষ্ট হইলাম,—

“সৌম্য হেমেন্দ্রনাথ! যাহাতে তোমার পত্নী এই ব্রাহ্মধর্ম্মব্রতপালনে সমর্থ হন তুমি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞানধর্ম্ম সুখশান্তি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে। * * * কায়মনোবাক্যে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবে। ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।”

অনন্তর নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন—

“হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের গৃহদেবতা; তোমারই এই পরিবার, তুমি এই পরিবারের প্রত্যেকের অন্তরে পবিত্র মঙ্গলভাব প্রেরণ কর, ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ কর। ইহলোকে পরলোকে এ পরিবারের একমাত্র তুমি নেতা; তোমার সঙ্গে আমাদের চিরকালের যোগ। সেই যোগ যেন আমরা সম্যক বুঝিতে পারি, পৃথিবীর অস্থায়ী সুখ দুঃখে যেন মুগ্ধ না হই। কিন্তু তুমি তোমার সহিত সহবাসানন্দ হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে প্রকাশ কর। এখানে সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্র যেরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে সেইরূপ সুখদুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে; তুমি একমাত্র অপরিবর্ত্ত কারুণ্যভাবে এই পরিবারের শিরোদেশে নিয়ত বিরাজ করিতেছ। জন্মের পূর্ব্বাবধি আমাদের উপর তোমার দৃষ্টি ছিল, এখনো তোমার দৃষ্টি, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার দৃষ্টি থাকিবে। তোমা ছাড়া হইলে আমাদের কি লাভ। যাহা কিছু সুখ ভোগ করি, তার জন্য যদি কৃতজ্ঞতা তোমাতে অর্পণ না করি তাহা অধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। তোমার সহিত আমাদের নিত্যকালের যোগ। আমাদের কাহারো হইতে তুমি দূরে থাকিও না; সকলকেই তোমার দিকে লইয়া চল, যাহাতে তোমার সহিত একত্রে থাকিয়া নিত্য সুখ ভোগ করিবার সকলেই অধিকারী হন।”

পরদিবস চোদ্দই অগ্রহায়ণ রবিবারে আমার পাকস্পর্শ হইল:—অবরোধের উপাসনামন্দিরে সকলে উপবিষ্ট হইলে পিতা উদ্বোধন করিলেন—

“সেই পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী; তিনি সকল আকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি পবিত্র উন্নত প্রেমদৃষ্টি এখানে বিকীরণ করিতেছেন। তিনি আকাশে যেমন ওতপ্রোত সেইপ্রকার এই উপাসনা-স্থলে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়-স্থলে উপবিষ্ট আছেন; সাধুভাবে পবিত্র যাঁহার হৃদয় সেই হৃদয়েই তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার জ্ঞানজ্যোতি আমাদের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার প্রীতি পবিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে

সঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা প্রত্যেক শুভকার্য্যে ব্যক্ত হইতেছে। তিনি আমাদের সহায়; তাঁহার উপাসনার জন্য আমরা নিলিত হইয়াছি। প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

তৎপরে উপাসনা সঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন—

"হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সহায় সম্পত্তি। তোমার প্রীতিদৃষ্টির উপরেই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি। তোমারই এই পরিবার; একা তুমিই ইহার মঙ্গল সাধন করিতেছ। তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের সকলি মঙ্গল হইতেছে। যদিও সকলে শত্রু, কিন্তু তুমি বিঘ্নবিনাশন; তোমার কৃপাবলে এ পরিবারের অভ্যুদয়মার্গ নিয়তই পরিষ্কৃত হইতেছে। আমরা ধনমানের গর্ব্ব করি না, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমারি আমরা সেবক দাস। তোমার করুণ দৃষ্টি, তোমার কৃপাদৃষ্টি আমাদের প্রত্যেকের উপর। আবার যখন সংসার হইতে অবসৃত হইব তখন যেন তোমারি নিকটে উপনীত হই। হে পরমাত্মন্! তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? যাহাতে দম্পতীর উন্নতি হয়, যাহাতে ইহাঁরা একত্রে সদ্ভাবে সংসারধর্ম্ম নিয়ত রক্ষা করেন এবং তোমার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিয়ত তোমার পদে অবনত থাকেন, এ প্রকার কৃপা কর। এই দম্পতীকে পরিবারের দৃষ্টান্ত ও উপদেশস্থল কর এবং এখানকার মোহপাশ ছেদ করিয়া তোমার নিকটবর্ত্তী কর। হে পরমাত্মন্! তুমি এই দম্পতীর সাধু মনোরথ পূর্ণ করিলে। এখনো ইহাঁদের নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতে থাক, এই আমার প্রার্থনা।"

উপাসনা সাঙ্গ হইলে পর, মাতা বধূকে রন্ধনশালায় লইয়া গিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্পৃষ্ট করাইয়া লইলেন। অনন্তর আপনার উপবেশনাগারে আমাদিগের দুই জনাকে দুই আসনোপরি বসাইয়া একটি রজত থাল অন্নবস্ত্রে পূর্ণ করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন। বধূহস্ত প্রসারিত হইতে আদিষ্ট হইলে, আমি সেই থাল লইয়া "আজীবন তোমাকে ভরণ পোষণ করিব" এই বলিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম। অনন্তর বাহিরে আসিয়া সকলে সৌহার্দ্দ্যরসে মিলিত হইয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক ঈশ্বরমণ্ডপে বধূভক্তভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম।

তাহার পরশ্ব দিবস ষোলই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আমাদের যুগ্মে শ্বশুরবাটী গমন হইল।

আমরা দুইজনে দুই মনুষ্যবাহ্য যানদ্বারা লোকসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া শ্বশুর শ্বশ্রূ সমীপে দর্শনীর সহিত প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলাম। পরে সেইখানে ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের ও পুরস্ত্রীজনের আশীর্যুক্ত হইয়া রুদতী বধূর সহিত সন্ধ্যার প্রাককালে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। সেখানে দাসীজনবেষ্টিত ভগিনীজ্যেষ্ঠা কর্ত্তৃক দর্শিতমার্গ হইয়া মাতার চরণে বধূবরে একত্রে প্রণিপাত করিলে, মাতা আমাদিগকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া উপাসনামন্দিরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন—"বৎস তোমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এখানে দণ্ডবৎ হও।" আমরা আদেশানুসারে ভক্তিভাবে সেখানে দণ্ডবৎ হইলাম। এই প্রকারে বিবাহ এবং উদীচ্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল।

মণ্ডলী সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা।

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকারিতার অভাব দেখিয়া আমাদের মনে সমাজের মণ্ডলীকে সম্বদ্ধ করিবার অভিলাস জন্মিল। আমরা এই বিষয়ক পুস্তিকা "আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা" নামে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই নামটী বোধ হয় সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হয় নাই। আদিব্রাহ্মসমাজ যখন অবধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অবধিই উহার মণ্ডলী তো সংগঠিত হইয়াই আছে। আমরা বর্ত্তমানে সেই মণ্ডলীকে সম্বদ্ধ বা organised করিতে চাহি। একটী পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি দূর দূরান্তরে কার্য্য করিতে গেলে কি সেই পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়? তাহা নহে। তবে যদি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বহুকাল যাবৎ পরস্পরের কোনই খোঁজ খবর না লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট মনে হইতে পারে বটে যে তাঁহাদের পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে আত্মীয়তাসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে চাহেন,

আদিসমাজের মণ্ডলীবন্ধনের চেষ্টাও ঠিক তদনুরূপ। ইহার নাম আমরা "আদিসমাজের মণ্ডলী সম্বন্ধন" বা "আদিসমাজের মণ্ডলীর পুনর্গঠন" দিতে পারি।

এই মণ্ডলী গঠনের সহিত যেন কেহ সম্প্রদায় গঠনের অভেদ না দেখেন। সম্প্রদায়ের সহিত মণ্ডলীর অনেক প্রভেদ আছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। সম্প্রদায় বন্ধনে সঙ্কীর্ণতা আসে, মণ্ডলী বন্ধনে তাহার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মভাবকে অবস্থানির্ব্বিশেষে কতকগুলি অবান্তর মতামত এবং আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ করিবার উপরেই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে, কিন্তু মণ্ডলীবন্ধন তাহার উপর নির্ভর করে না। সম্প্রদায় বন্ধনে মানব স্বাধীনতা হারাইতে অগ্রসর হয়, মণ্ডলীবন্ধনে স্বাধীনতা-ভিত্তির উপরে অন্যোন্য-সাহায্যের সুবিধা পাওয়া যায়। মণ্ডলীর অবশ্য একটী মূল মন্ত্ররূপে মিলনের কেন্দ্র আবশ্যক, কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য কোন গণ্ডীর প্রয়োজন নাই। স্বাধীনতা হরণেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি এবং স্বাধীনতার সংরক্ষণেই মণ্ডলী বন্ধন সম্ভব হয়। সম্প্রদায় গঠনের লক্ষণ অপরের সহিত বিচ্ছেদ, মণ্ডলীর লক্ষণ অপরের সহিত সম্বন্ধ সংরক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতার ফলে মানুষ স্বসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ খুঁটিনাটি প্রত্যেক মতের নিকট, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের নিকট অপরের মস্তক অবনত দেখিতে চাহে। প্রকৃত মণ্ডলী গঠিত হইলে মণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকটে অপরকে মণ্ডলীভুক্ত করিবার জন্য উক্ত প্রকার বলপ্রয়োগ আশা করা যায় না। এই কারণে আদিসমাজ বলেন যে যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা যে কুলের যে রূপ কৌলিক তাহা সেইরূপ থাকুক, কেবল সেই সকল প্রথার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে। বৃথা তর্ক উঠাইলে হয়তো তাহার ফলে মণ্ডলীর অর্থে সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ের অর্থে মণ্ডলী এরূপ উপসংহারে আমরা উপস্থিত হইতে পারি, কিন্তু উপরে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে আমরা এক অর্থে উক্ত দুইটী শব্দ ব্যবহার করি নাই, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে আদিসমাজের মণ্ডলীকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিবার পক্ষে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ ব্রাহ্মসমাজে সাম্প্রদায়িকতা আনয়নের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া বিচ্ছেদের ইন্ধন স্তূপাকার করিবার জন্য এই মণ্ডলীকে সম্বদ্ধ করা হইতেছে না। সমাজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্যই মণ্ডলী সম্বন্ধনের এই নবতর উদ্যোগ হইতেছে।

যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদিসমাজে দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তখন সমাজে মণ্ডলীবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পর যখন আদিসমাজ হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন আদিসমাজের সভাপতি মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মণ্ডলীর প্রয়োজন অনুভব করিয়া আদিসমাজের মণ্ডলীকে পুনরায় সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানা কারণে মণ্ডলী সম্বন্ধনে আদিসমাজ কৃতকার্য্য হয়েন নাই—তন্মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নূতন কোন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা রহিত করিবার চেষ্টা। বর্ত্তমান সময়েও আমরা ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী অনেক বন্ধু বান্ধবের সহিত আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে আদিসমাজে একটী সম্বদ্ধ মণ্ডলীর অভাব অনেকেই বড়ই তীব্ররূপে অনুভব করিতেছেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্যই আমরা এই সাধু কার্য্যে পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছি। বাইবেলে একটী সুন্দর কথা আছে—knock at the gate and it shall be opened unto you, দ্বারে আঘাত করিতে থাক, দ্বার খুলিয়া যাইবে। আমাদেরও বিশ্বাস এই যে, যখন সম্বদ্ধ মণ্ডলীর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, তখন আমাদের এই তৃতীয়বারের মণ্ডলীসম্বন্ধনবিষয়ক চেষ্টা বিফল হইবে না। বিফল হইবারও কোনই কারণ নাই, কারণ এবারে আদিসমাজের মূলমন্ত্র এবং বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহাদিগকে মণ্ডলীভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা বর্ত্তমানে এই মণ্ডলীভুক্ত

হইবেন, তাঁহারা সকল দিক দেখিয়া শুনিয়াই, চক্ষু কর্ণ খুলিয়া সকল বিষয় জানিয়াই মণ্ডলীভুক্ত হইবেন আশা করিতে পারি এবং কাজেই নবসম্বদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদের ভীতি আসিবার সম্ভাবনা অতীব অল্প।

এই মণ্ডলীর মূল কেন্দ্র ব্রহ্ম এবং ইহার চরম লক্ষ্যও ব্রহ্ম। আমরা সংসারের দিকে একটু পিছাইয়া বলিতে পারি যে ইহার কেন্দ্রভূমি বা ভিত্তি হইতেছে রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ। এই দুইটী ব্যতীত অন্য কোন কিছুকেই বোধ হয় ইহার ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। জাতিভেদ বল, বা আহার বিহারের অন্য যে কোন অংশ বল, সেগুলি এই মণ্ডলীর সভ্যগণের সংসারে বিচরণ করিবার এক একটী প্রণালী মাত্র।

এই সকল প্রণালীর সহিত মূলমন্ত্রকে অভিন্ন করিয়া দেখাতেই যত গোলযোগের উৎপত্তি হয় এবং তাহাই আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেয়। অবান্তর প্রণালীসমূহকে মূলমন্ত্রের স্থানে অভিষিক্ত করিলেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হয়। সাম্প্রদায়িকতা মাত্রই প্রকৃত উন্নতির অন্তরায়। প্রণালীসমূহের ভালমন্দ অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে। প্রণালীর কোনটী বা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া গঠিত হয় এবং কোনটী বা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতেও গঠিত হয়। সেগুলি মানুষ আপনার সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া অবলম্বন করে বা পরিত্যাগ করে। কিন্তু মূলমন্ত্র অবস্থানির্ব্বিশেষে মূলমন্ত্রই থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী এবং এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমিষ আহারের পক্ষপাতী। নিরামিষপক্ষপাতী ব্যক্তিগণের অনেকে বাস্তবিকই মনে করেন যে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে নিরামিষ আহার কেবল অত্যাবশ্যক নহে, কিন্তু অপরিহার্য্য—তাঁহারা নিরামিষ আহারকে অনেকটা মূলমন্ত্র বলিয়া ধরিতে চাহেন। ধর্ম্মপথের পথিকদিগের পক্ষে নিরামিষ আহার অপরিহার্য্য মনে করিয়া যদি তাহা কোন ধর্ম্মমতের মূলমন্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মমতকে আমরা খুব বলের সহিত সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মের পথে চলিবার পক্ষে নিরামিষ আহার বিশেষ সহায়—ইহা অবলম্বিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু ইহা যতই কেন ভাল হউক না, ইহাকে কিছুতেই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র বলিয়া আমরা ধরিতে পারি না। ইহাকে অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মসাধনের সহায়মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। আবার অবস্থাবিশেষে ইহা মানবের ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূলও হইতে পারে। যদি কোন রোগদুর্ব্বল সাধক নিরামিষ আহারে স্বীয় দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি দেখিয়াও আমিষ আহারে বিমুখ থাকেন, তাহা হইলে হয়তো কেহ কেহ তাহা ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল মনে করিবেন। কিন্তু এরূপ মনে করাও আবার বিচারসাপেক্ষ। আমরা একবিন্দু জীবন দান করিতে পারি না, তখন ভগবৎপ্রদত্ত অপর জীবজন্তুর জীবন আমাদের নিজের যে কোন কারণে হউক হরণ করিতে পারি কি না সন্দেহ। নিরামিষ আহার প্রকৃত সত্যধর্ম্মের অন্যতর মূলমন্ত্র নহে বলিয়াই এবিষয় স্বীকার করা না করা মানবের বিচারের উপর, ধর্ম্মবুদ্ধির উপর এবং অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বহিতা ঈশ্বর যে আছেন এবং তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ তাঁহার উপাসনাতেই যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, ইহা অবস্থানির্ব্বিশেষে ধর্ম্মসাধকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমিষ আহারের কারণে এই যে পৃথিবীর কত স্থানে বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ গোবধ হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে কত লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান দুগ্ধ ঘৃতের অভাবে, উপযুক্ত চাষবাসের অভাবে যে দুঃখদারিদ্র্যে নিপতিত হইতেছে, তথাপি আমরা তাহাকে মূলমন্ত্রের আসনে বসাইতে পারিব না, তাহাকে একটী হইলে-ভাল-হয় প্রণালী বলিয়া ধরিব।

এইরূপ হইলে-ভাল-হয় প্রণালীকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিবার কারণে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তর্কতরঙ্গ বিবাদবিসম্বাদ আজও নির্ব্বাপিত হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের এক সম্প্রদায় (এখানে সম্প্রদায় শব্দ ব্যবহার করিলাম) রাজভক্তিকে ধর্ম্মমতের অন্যতর মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের বহিঃস্থিত ব্রাহ্মগণ রাজভক্তিতে বিন্দুমাত্রও

ক্ষীণ না হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের অন্যতর বীজস্বরূপে স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। রাজভক্তি ধর্ম্মসাধনের একটী গুরুতর সহায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যে ভারতবাসীগণ সম্রাট বাহাদুরকে দেবগণের অংশ বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া নিয়তই তাঁহার কল্যাণ কামনা করে, ধর্ম্মসাধনের পথে ইহা বিশিষ্ট সহায় হইলেও আমরা ইহাকে কিছুতেই ধর্ম্মবীজ বলিতে প্রস্তুত নহি—ইহাকে একটী হইলে-ভাল-হয় প্রণালী বলিয়া ধরিতে পারি। এই রাজভক্তিই আবার অবস্থাবিশেষে অযথা পাত্রে নিপতিত হইয়া আজ জর্ম্মানদিগকে নরহত্যাপিপাসু স্ত্রীলোকের সতীত্বহারী ধর্ম্মের নামে সয়তানপূজক ভীষণ দস্যুরূপে পরিণত করিয়াছে। আজ জর্ম্মানির সম্রাটের প্রতি জর্ম্মানদিগের রাজভক্তিকে কি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অথবা কোন ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন?

আরও একটী হইলে-ভাল-হয় বিষয়কে ধর্ম্মের মূলমন্ত্রের আসনে বসাইবার কারণে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ আজও নির্ব্বাপিত হইতেছে না। সেই বিষয়টী হইতেছে জাতিভেদ। এক সময়ে জাতিভেদ এই ভারতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। এখন আমরা দেখিতেছি ও বলিতেছি যে ইহার ফলে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশের মতে জাতিভেদ গুরুতর অনিষ্টসাধক, কারণ আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে একমত নহেন। আর, জাতিভেদত্যাগই সমাজের সর্ব্বরোগহর মহৌষধ (panacea for all evils) কি না, সে বিষয় এখনও অভ্রান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। আমাদের স্মরণ হয় যে কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকায় কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভারতের জাতিভেদকে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তির উৎপাদক বলিয়া বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমাদের ইহাও স্মরণ হয় যে মনস্বী হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন যে প্রাচ্যবাসী ও প্রতীচ্যবাসীদিগের মধ্যে বিবাহ অশান্তি ও অমঙ্গলের কারণ এবং উভয়ের মধ্যে কখনই প্রকৃত মিলন হইতে পারে না। এই সকল মতামত ঠিক হউক বা ভ্রান্ত হউক, জাতিভেদ ভাল বা মন্দ এ বিষয় যখন বিচারসাপেক্ষ তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র বা বীজ বলিয়া গ্রহণ করিব কিরূপে? আর, এ বিষয় চিরকালই বিচারসাপেক্ষ থাকিবে, কারণ ইহার ভালত্ব মন্দত্ব দেশবিশেষের উপর, কালবিশেষের উপর ও অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে। জাতিভেদের কারণেই যে "দেশের কোটী কোটী লোক অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িয়া হীন হইয়া রহিয়াছে" একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ সম্মুখেই দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও মুসলমানধর্ম্মীদিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও কোটী কোটী লোক অজ্ঞান ও অশিক্ষার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে।

জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব কিনা তাহাও একটী ভাবিবার বিষয়। এ বিষয়ে প্রকৃতি হইতে প্রতিকূল সাড়া পাই। সমস্ত জীবজন্তু কখনই একটীমাত্র জীবশ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে না। সমস্ত বৃক্ষ একই বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। সমস্ত মানবজাতিও একটী জাতিতে পরিণত হইতে পারে না।

এইরূপে জাতিভেদের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা বক্তব্য থাকিলেও আদিসমাজেরও অধিকাংশের মতে বর্ত্তমানপ্রচলিত জাতিভেদ ভারতের মঙ্গলজনক নহে। সেই কারণে আমরা জাতিভেদত্যাগকে একটী হইলে-ভাল-হয় বিষয়ের মধ্যে ধরিয়াছিলাম। কিন্তু ভাল হইলেও আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে এই দেশের বর্ত্তমান কালে ও বর্ত্তমান অবস্থায় উহা ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ ধর্ম্মসাধনের পথে একটী মঙ্গলজনক প্রণালী মাত্র। জাতিভেদত্যাগকে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ বলিয়া ধরিতে হয় তবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ এত বিষয়কে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। বহুপূর্ব্বের বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া আমরা ব্রাহ্মমাত্রকেই নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি যে এরূপ প্রণালীগুলিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র বা বীজের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য কি না। বলা বাহুল্য যে আদিসমাজ একদিকে জাতিভেদকে নিজের ভিত্তি বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না এবং অপরদিকে

নবপ্রবর্ত্তিত সম্পূর্ণ ধারাবহির্ভূত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা নিজেকে একটী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতারও মধ্যে আবদ্ধ করিতে কিছুতেই সম্মত নহেন। এই কারণেই আদিসমাজ মূলত জাতিভেদ অস্বীকার করিলেও তাঁহাকে নানা কারণে বিবাহাদি কার্য্যে শাস্ত্রসিদ্ধ জাতিভেদটুকু রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য করিবার কারণে যদি আদিসমাজের মণ্ডলীকে অব্রাহ্ম বলিতে হয়, তাহা হইলে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রহ্মোপাসক বলা যাইতে পারে না এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও ব্রাহ্মসমাজে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার মধ্যে আর একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উপবীতত্যাগ প্রভৃতি উপায়ে বাহিরে জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া অন্তরে নবতর জাতিভেদের অভিমান পূর্ণমাত্রায় পোষণ করাও ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নহে।

এই মণ্ডলীর লক্ষ্য একমাত্র ব্রহ্ম। উপাসনা এবং অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল কার্য্যে ভগবানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হইল এই মণ্ডলীর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার অমোঘ উপায়। রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ হইল ইহার দুইটী সুদৃঢ় ভিত্তি। এবং সহানুভূতিই হইল এই মণ্ডলীর প্রাণ। প্রকৃত সহানুভূতি না থাকিলে কোন মণ্ডলীই বাঁচিতে পারে না, সুতরাং সহানুভূতির অভাব হইলে যে এই মণ্ডলীও জীবিত থাকিতে পারিবে না তাহা বলা বাহুল্য। মণ্ডলীর সভ্যগণের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সহানুভূতি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। সম্পদে বিপদে আনন্দে নিরানন্দে সকল অবস্থাতেই অন্যোন্যসহানুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। সহানুভূতি না থাকিলে একটী মণ্ডলী দীর্ঘকাল সম্বদ্ধ থাকিতে পারে না। সম্পদের সময় আনন্দের সময় সহানুভূতির উদ্রেক হওয়া সহজ। আমার কোন সূত্রে প্রচুর অর্থাগম হইল, মানযশ বৃদ্ধি হইল, মণ্ডলীর সভ্যগণ তাহাতে আনন্দিত হইলেন এবং হয়তো কোন প্রকাশ্য সভা প্রভৃতির সাহায্যে সেই আনন্দের প্রকাশ্য পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্পদের সময় এ প্রকার সহানুভূতিতে মণ্ডলীর শক্তি ও বলবৃদ্ধি হইলেও ইহা সহজলভ্য। কিন্তু বিপদের সময় সহানুভূতি পাওয়াই দুর্লভ, অথচ সেই সহানুভূতিতেই মণ্ডলীবন্ধন সার্থকতা লাভ করিতে থাকে এবং সেই সহানুভূতিরই সুমিষ্ট বারিতে মণ্ডলীর মহাশক্তির বীজ রোপিত হয়। সমাজের পক্ষে তিনটী ঘটনা সর্ব্বপ্রধান—জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। বিবাহের আনন্দে সহানুভূতি পাওয়া, বিবাহবাটীতে মণ্ডলীর সভ্যদিগের পরস্পরের সাহায্য করা দুর্লভ হইবে না, কারণ ইহা আনন্দের সহানুভূতি। সেই প্রকার সন্তান জন্মের আনন্দধ্বনিতেও সকলে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মহোল্লাসে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু গৃহে মৃত্যু উপস্থিত হইলে অথবা মৃত্যুর কারণ রোগ দেখা দিলে গৃহকর্ত্তার প্রাণ সহানুভূতি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সে সময়ে সহানুভূতির অভাব দেখিলে গৃহকর্ত্তা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তখন একরত্তিও সহানুভূতি গৃহকর্ত্তার নিকটে বড়ই মূল্যবান ও অত্যন্ত সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আহূত হইলে ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মৃতদেহ বহন করিবার জন্য আহূত ব্যক্তিগণের উপস্থিতির প্রথা দৃষ্ট হয়। এই মণ্ডলীকে যদি সত্যসত্যই আমরা সম্বদ্ধ রাখিতে চাহি, তবে ছোটখাটো মতামতের বিভিন্নতার জন্য কথায় কথায় বিবাদ বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত করিতে হইবে, পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরের রোগশোকে সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরস্পরের বিপদ আপদকে যথাসম্ভব নিজের বিপদ আপদ মনে করিয়া বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি নিজের সহায়হস্ত বিস্তার করিতে হইবে। এই সহানুভূতি দুর্লভ হইলেও কিছু অসম্ভব নহে।

যে দেবতা আমাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া মণ্ডলী সম্বন্ধনে আমাদিগের শুভবুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনিই আমাদের অন্তরে অন্যোন্যসহানুভূতিকে জাগ্রত করিয়া তুলুন এবং আমাদের এই শুভকার্য্যে সহায় হইয়া ইহাকে সংসিদ্ধ করুন।

অধ্যক্ষ সভার কার্য্যবিবরণ।

বিগত ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬) রবিবার প্রাতঃকাল সাড়ে আট ঘটিকার সময় ৬২

দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত অধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন—(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, (৩) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৪) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (৫) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত, (৬) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৭) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৯) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই আদিব্রাহ্ম-সমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনার কথা উত্থাপিত করিয়া মণ্ডলীগঠনের সপক্ষে ও বিপক্ষে উপদেশপূর্ণ অনেকগুলি কথা বলিলেন এবং যাহাতে মণ্ডলী-গঠনের ফলে সমাজের মধ্যে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা না আসিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে সকলকে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজমাত্রেই জন্মমৃত্যু ও বিবাহ এই তিনটি কার্য্য সংঘটিত হইবেই এবং এই তিনটী কার্য্যেই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অন্যোন্য-সাহায্য অপরিহার্য্য, এই বিষয়ক দুইচারিটী কথা বলিয়া মণ্ডলীগঠনের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারত্রিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক মঙ্গলও প্রার্থনীয় এবং সেই সূত্রে মণ্ডলী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও সমাজে থাকিতে গেলেই সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের একটি সম্বদ্ধ মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে সমর্থন করিলেন। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় একটী সম্বদ্ধ মণ্ডলীর উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত "আদি-ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের প্রস্তাবনা" সাধারণ-ভাবে গৃহীত হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল—"আদিব্রাহ্ম-সমাজের মণ্ডলীসংগঠনের প্রস্তাবনা" সাধারণতঃ গৃহীত হউক।

২। আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ আলোচিত হইল।

আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষ হইতে চাহেন তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া সভাপতিদ্বয়ের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রচারিত হইয়াছিল—

"ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক একটা বৃহৎ জাগরণের ভাব আসিয়াছে। ইহাও আপনার অবিদিত নাই যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতেই অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই জাগরণের মূল প্রোথিত হইয়াছিল। আজ এই জাগরণের সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উদারতম ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-দৃষ্ট উদারতম ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ যাহার দুইটি মূল ভিত্তি, সেই আদিব্রাহ্মসমাজই এই দেশব্যাপী জাগ্রত ধর্ম্মভাবকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিতে পারিবে। আদিসমাজের কার্য্য করিবার এমন শুভ অবসর অবহেলায় হারাইলে চলিবে না। দেশে দেশে, নগরে নগরে ইহার সত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে ইহার পতাকার নিম্নে সমবেত করিতে হইবে। কিন্তু একথা আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আদিসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র এ ভাবে বিস্তৃত করিতে গেলে একটি মণ্ডলী অত্যাবশ্যক। আপনি ব্রাহ্মসমাজের একজন হিতৈষী বন্ধু। আপনাকে উক্ত প্রস্তাবিত মণ্ডলীর সভ্যভুক্ত করিয়া লইলাম। এই সঙ্গে আদিসমাজের মণ্ডলীসংগঠনের একটি প্রস্তাবনাও আপনার নিকট প্রেরিত হইল। তাহা হইতেই আপনি এ বিষয়ে আমাদিগের মূল বক্তব্য অবগত হইতে পারিবেন। পুনশ্চ, ষ্ট্যাম্প-যুক্ত একখানি পোষ্টকার্ড পাঠান যাইতেছে, তাহাতে আপনি আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার (কার্য্য নির্ব্বাহক সভার) সভ্য হইয়া উহার কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক কিনা পত্রোত্তরে জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

প্রায় পঁয়ত্রিশখানি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিন চারিখানি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই সম্মতিজ্ঞাপক ছিল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে আগামী

বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিতরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগে ট্রষ্টীগণের সম্মতি লওয়া হউক।

সভাপতি।

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি,

অধ্যক্ষ

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে বা Ex-officio)
২। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (স্বপদে)
৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে)
৪। „ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (স্বপদে)
৫। „ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬। „ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। „ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮। „ সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৯। „ কেদারনাথ দাসগুপ্ত
১০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। „ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র লাল গুপ্ত
১৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মজুমদার
১৪। „ গোবিন লাল দাস
১৫। „ আশুতোষ রায়
১৬। „ পাঁচুগোপাল মল্লিক
১৭। „ সিতিকণ্ঠ মল্লিক
১৮। „ শরৎচন্দ্র চৌধুরী
১৯। „ শশধর সেন
২০। „ নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়
২১। „ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস
২২। „ রাজকুমার সেন
২৩। „ গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী
২৪। শ্রীযুক্ত এস, পি, মিত্র এস্কোয়ার

আচার্য্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

হিসাব পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩। আগামী বৎসরের আনুমানিক আয় ব্যয় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রস্তুত আগামী বৎসরের আনুমানিক আয় ব্যয় অনুমোদিত হউক এবং উহাতে ট্রষ্টীগণের সম্মতি গৃহীত হউক।

৪। বিগত বৈশাখ অবধি মাঘ মাস পর্য্যন্ত দশ মাসের হিসাব আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

৫। মণ্ডলীর সভ্যদিগকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদান করিবার বিষয় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে, যাঁহারা বাৎসরিক চাঁদা অন্যূন পাঁচ টাকা দিবেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

৬। মণ্ডলীভুক্ত সভ্যদিগের ন্যূনকল্প দেয় চাঁদা বিষয়ে আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে আপাতত মণ্ডলীভুক্ত সভ্যদিগের দেয় বাৎসরিক চাঁদা পাঁচ টাকা নির্দ্দিষ্ট হউক।

৭। সভারম্ভের প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যা বিষয় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে উপরোল্লিখিত কর্ম্মচারীগণের মধ্যে দুইজন এবং তদতিরিক্ত তিনজন অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকিলেই অধ্যক্ষসভার কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৮। বিবিধ বিষয় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে—

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুরাতন দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি অবসর মত মুদ্রিত করা হউক।

(২) ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ১ম ভাগ যথাসম্ভব মুদ্রিত হউক।

(৩) আদিসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতির মুদ্রণ যথাসম্ভব শেষ করা হউক।

(৪) আদিসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বসুকে অবসর প্রদানের বিষয় আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন যে দ্বিজেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান বৎসরে পঁয়ত্রিশ দিন অনুপস্থিত হইয়াছেন। এবারে তাঁহার পত্রে প্রকাশ যে তিনি বড়ই কঠিন পীড়াগ্রস্ত, কতদিনে যে তিনি আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু যাঁহার সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আজ জনসাধারণের নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার পুত্র বলিয়া নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে তাঁহাকে স্বীয় পদে স্থায়ী রাখিলে ভাল হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে আগামী চৈত্রমাস মধ্যে দ্বিজেন্দ্র বাবু কার্য্যে যোগদান করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীয় পদে রাখা যাইতে পারে। আর চৈত্রমাস মধ্যে কার্য্যে যোগ দিতে না পারিলে আগামী বৎসরে নূতন বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৫) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্তের পাথেয়ের জন্য আবেদন আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর সমর্থনে স্থির হইল যে সমাজের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া পাথেয় প্রদান করিবার ভার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হউক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক। সভাপতি।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

মাঘোৎসব উপলক্ষে দান প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি :—

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ,, পি মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	১০৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু আর রায়	।০
,, ,, রামচাঁদ শেঠ	।০
,, ,, কল্যাণ চন্দ্র বড়াল	॥০
,, ,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	।০
,, ,, বিধুভূষণ গুপ্ত	।০
,, ,, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী	।০
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র দত্ত	।০
,, ,, বীরেশ্বর মজুমদার	।০
,, ,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	।০
,, ,, যোগেশচন্দ্র সরকার	।০
,, ,, মণীন্দ্রলাল বসু	১৲
,, ,, জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাস	।০
,, ,, রাজকুমার সেন	।০
,, ,, যতীন্দ্র মোহন রায়	॥০
,, ,, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	।০
,, ,, শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী	।০
,, ,, আশুতোষ বাগচী	।০
,, ,, মুক্তারাম নন্দী	।০
,, ,, জিতেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	।০
,, ,, উমেশচন্দ্র দাস	।০
,, ,, উমেশচন্দ্র রায়	॥০
,, ,, আশুতোষ দাস	।০
,, ,, সতীশ চন্দ্র দত্ত	॥০
,, ,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ,, হরিশ্চন্দ্র মিত্র	॥০
,, ,, ধীরেন্দ্রনাথ সেন	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ মজুমদার	১৷০
,, ,, আশুতোষ রায়	॥০
,, ডাক্তার মতিলাল দত্ত	॥০
,, বাবু মুটবেহারী চট্টোপাধ্যায়	॥০
,, ,, নন্দলাল সরকার	১৲
,, ,, বিধুভূষণ রায় চৌধুরী	।০
,, ,, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
,, ,, অমল চন্দ্র গুপ্ত	।০
,, ,, সুরেন্দ্রনাথ বসাক	।০
,, ,, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	।০

আনুষ্ঠানিক দান।

মিসেস্ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জি	১০৲

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩১ শে চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষ শেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।